নীরবিন্দু

১

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৫৯,

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে,
দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকি

মুদ্রক : স্বপন কুমার দে,
দে'জ অফসেট ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

অগ্রজা ৺লতিকা রায়চৌধুরির স্মরণে

'নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে .....''

নী র বি ন্দু

১

কলকাতায় থাকি বটে, কিন্তু জন্মসূত্রে আমি বাঙাল। পুব-বাংলার যে গ্রামে আমার জন্ম, সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের রেল-ইস্টিশানটিও ছিল চব্বিশ মাইল দূরে। জেলার নাম ফরিদপুর, গ্রামের নাম চান্দ্রা। বড়দের কাছে শুনেছি, নামটা আগে চন্দ্রা ছিল। পরে সেটাই চান্দ্রা হয়ে যায়। বিকৃত উচ্চারণে অনেকে আবার চাঁদরাও বলতেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই। উচ্চারণের ঝোঁক সর্বদাই বিকারমুখী। নামের বিকার অতএব ঘটতেই পারে। নৃপেন্দ্র যখন নেপেন্দর হয়ে যায়, কিংবা নবকৃষ্ণ হয়ে যায় লবকেষ্টো, চন্দ্রা তখন চাঁদরা হবে, এ আর বিচিত্র কী।

তার উপরে আবার ফরিদপুর জেলার নিজের বলতে কোনও উচ্চারণও নেই। কী করে থাকবে। খুব বনেদি জেলা তো নয়, বয়সে অতি অর্বাচীন। আর-পাঁচটা জেলা থেকে খানিক-খানিক এলাকা খাবলে নিয়ে এটা তৈরি হয়েছিল। ফলে যে-এলাকার জায়গাজমি যে-জেলা থেকে খাবলে নেওয়া হয়, সেখানে চলত সেই জেলার উচ্চারণ।

আমার মামাবাড়ি ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়িতে। অথচ, একই জেলার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মামাবাড়ির লোকজনেরা আমাদের বাঙাল বলে ঠাট্টা করতেন। করতেই পারেন। কেননা, তাঁরা যে এলাকার বাসিন্দা, সেটা যে আগে নদে জেলার মধ্যে ছিল, এটা তাঁরা কখনও ভুলতে পারেননি। ওদিকে আবার নদীর খাত পালটে যাওয়ায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল, আর তার পুব-দিককার ভাগটা এসে গিয়েছিল ফরিদপুর জেলার মধ্যে। সেখানকার উমেদপুর গ্রামে আমার ছোটপিসির বিয়ে হয়। তো সেখানে গিয়ে 'খামু' 'যামু' ইত্যাদি শুনে আমার মায়ের চোখ একেবারে কপালে উঠে যায়। তারপর খানিক ধাতস্থ হয়ে তাঁর ননদকে তিনি বলেন, "ওঁরে পুঁটি, এ কী কথার ছিরি রে! তোর বাপের বাড়িও তো বাঙাল-দেশে, কিন্তু কই, তারা তো এমন অদ্ভুত রকমের বাঙাল নয়।"

মা নিজে বাঙাল-বাড়ির বউ। অথচ, ছোটপিসির কাছে মা যে কেন তাঁর নিজের শ্বশুরবাড়ির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোর বাপের বাড়িও তো বাঙাল-দেশে,' সেটাও এখন বুঝতে পারি। তিনি রাজবাড়ির মেয়ে। অর্থাৎ এমন জায়গার মেয়ে, যা কিনা আগে নদে জেলার অংশ ছিল! সেটাই ছিল তাঁর মস্ত বড় গৌরবের ব্যাপার। ফলে, যেখানেই বিয়ে হয়ে থাক, নিজেকে তিনিও বাঙাল বলে মানতে চাইতেন না। প্রায়ই আমাদের খোঁটা দিয়ে বলতেন, "দুঃখের কথা আর কী বলব, তোদের এই বাঙাল-বাড়িতে বিয়ে হয়ে দেখছি নিজেদের ভাষাটা পর্যন্ত ভুলে গেলুম!"

ফরিদপুর জেলা যে পদ্মা-নদীর ও-পারে নয়, এ-পারে, এ তো সবাই জানেন। কিন্তু তাতে কি আমাদের 'বাঙাল' হওয়া কিছু আটকে গিয়েছে? পরবর্তী কালে যাকে বন্ধু হিসেবে পাই, সেই সুরঞ্জন সরকার বলত, "মোটেই না।" কে বাঙাল আর কে বাঙাল নয়, সেটা ঠিক করবার

ব্যাপারে তার পদ্ধতিটা ছিল একেবারে তাক-লাগানো। সে বলত, "শেয়ালদা ইস্টিশান থেকে রেলগাড়িতে চেপে যারা দেশের বাড়িতে যায়, তারা সবাই বাঙাল!" কেন? না শেয়ালদা ট্রাম-ডিপো থেকে তো দুটো লাইনের ট্রাম ছাড়ে। একটা লাইনের ট্রাম যায় হ্যারিসন রোড দিয়ে, আর অন্য লাইনের ট্রাম যায় বউবাজার স্ট্রিট দিয়ে। কিন্তু দুটো লাইনেরই টার্মিনাস হচ্ছে হাইকোর্ট। "এটা কেন করা হয়েছে জানিস তো? বাঙালদের সুবিধের জন্যে। রেলগাড়ি থেকে নেমে শেয়ালদা ডিপো থেকে চোখকান বুজে যে-ট্রামেই তারা উঠুক না কেন, শেষপর্যন্ত সেই হাইকোর্টেই পৌঁছে যাবে।"

একটা কথা মানতেই হয়। আমাদের অর্থাৎ বাঙালদের অনেকেই অনেক সময় হাইকোর্ট দেখায় বটে, কিন্তু সুরঞ্জনের মতন এমন চমৎকার করে আর কেউ সেটা কখনও দেখাতে পারেনি। তার এই পদ্ধতির অবশ্য একটা মস্ত বড় ত্রুটি রয়েছে। এটাকে স্বীকার করে নিতে হলে নৈহাটির বঙ্কিমচন্দ্রকেও বাঙাল বলতে হবে, উপরন্তু কাঁচড়াপাড়ার গুপ্তকবিও তালিকা থেকে বাদ পড়বেন না।

ঘটি-বাঙালের ঝগড়াটা ছিল জবরদস্ত রকমের। মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে তার রেশ এখনও ফুটে উঠতে দেখি বটে, তবে কিনা ফুটবলের মরশুম শেষ হয়ে যাবার পরে আর সেই আকচা-আকচির জের কাউকে টানতে দেখি না। আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু কথায়-কথায় ঝগড়া লাগত। সে একেবারে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া! রাস্তাঘাটে ঝগড়া, হাটে বাজারে ঝগড়া, এমন কী ইশকুলেও খটাখটি। ঘটিরা যেমন বাঙালদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, বাঙালরাও তেমন ছেড়ে কথা কইত না। তখনও তো দেশভাগ হয়নি, বিশ-তিরিশের দশকের কলকাতায় বাঙালদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কিন্তু সেই কম্‌তিটা তারা গলার জোরে পুষিয়ে নিত। এখানকার মানুষদের তারা শুধু ঘটি বলেই ক্ষান্ত হত না, বলত ঘটিচোর। আর ঘটিরা ছড়া কাটত:

বাঙাল মনুষ্য নয়,
কিম্ভূত জন্তু;
লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে
ল্যাজ নাই কিন্তু।

ছড়াটা যাঁরা ভুলে যাননি, তাঁদের এটাও হয়তো মনে পড়বে যে, 'কিম্ভূত' শব্দটার জায়গায় অন্য একটা শব্দ ছিল, যেটার উল্লেখ করা সমীচীন হবে না।

এখনকার মানুষরা শুনে হয়তো হাসবেন যে, গোড়ার দিকে বাংলা চলচ্চিত্রেও অনেক সময় খুবই ক্যাবলাগোছের একটি বাঙাল-চরিত্র রাখা হত। ইংরেজিতে ওই যাকে 'বাট্ অভ দ্য জোক' বলা হয়, সেই রকমের চরিত্র আর কী। যাবতীয় ঠাট্টাবিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হত তারই উদ্দেশে। কলকাতায় যখন প্রথম আসি, মুখ থেকে বাঙাল-টানের কথা বেরিয়ে যাওয়ায় ঠাট্টাবিদ্রূপ তখন আমাকেও কিছু কম ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু সে তো আরও কয়েক বছর পরের কথা। গ্রামের কথা বলছিলুম, আগে বরং পুব-বাংলার সেই গ্রামটি সম্পর্কেই দু-একটা কথা বলে নিই। গ্রামের কথা বলতে গেলে সেখানকার মানুষজনের কথাও আসবে। সেইসঙ্গে কী রকমের জীবন তাঁরা যাপন করতেন, তাও।

চান্দ্রা খুবই ছোট গ্রাম। বাড়ির সংখ্যা বিশ থেকে বাইশের মধ্যে। পাকা বাড়ি কুল্যে একটি। তাও দোতলা নয়, একতলা। বাদবাকি সব বাড়িতেই মাটির মেঝে, দরমার বেড়া। খড়ের কিংবা ঢেউ-খেলানো টিনের চাল। বাঁশ কিংবা শালের খুঁটি। গ্রামের মধ্যে দুটো পাড়া। দুটো পুকুর। একটা পুকুর বেশ বড়। কিন্তু সেটা কেউ ব্যবহার করে না। সব সময়েই সেটা কচুরিপানায় বোঝাই

হয়ে থাকে। এমন জব্বর রকমের ঠাস-বোঝাই যে, তার তলাকার জল অন্তত আমি কখনও দেখিনি। দুটো পাড়াতেই ছোট-খাটো কয়েকটা ডোবা আছে। তাতে বাসনপত্র ধোয়া হয়।

সব বাড়িতেই আম জাম কলা খেজুর কুল পেয়ারা ইত্যাদি হরেক রকমের ফলের গাছ। মাটি নোনা, তাই নারকোল গাছও প্রচুর। আমাদের বাড়িতে উপরন্তু একটি বিলিতি গাবগাছও ছিল। ফল হত প্রচুর, আর খেতেও ছিল খুব সুস্বাদু। কিন্তু তার মগডালে এক ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় নিয়েছেন, এবং মাঝে-মাঝে তাঁর দর্শনও পাওয়া যায়, এইরকমের একটা কথা রটে যাওয়ায় গাছটাকে আর রক্ষা করা যায়নি। আমার বড় কাকিমার ছিল ফিটের ব্যামো, হঠাৎ-হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ওঝা এসে অনেক মন্তর-টন্তর ঝেড়ে তারপর বলল, 'এনার উপরে দত্যিবাবার নজর পড়েছে।' দত্যিবাবা কোথায়? না ওই গাবগাছে। ব্যস্, গাছটা সেইদিনই কাটা পড়ল।

ব্রহ্মদৈত্যের কথাটা যখন উঠেই পড়েছে, তখন এটাও জানিয়ে রাখি যে, আমরা যারা ছোট, তাদের তো বটেই, বড়দের জীবনও ছিল ভূত-পেত্নি দিয়ে ঠাসা। দূরের হাট থেকে জিনিসপত্র সওদা করে বাড়ি ফিরবার সময় মাঠের মধ্যে কে কবে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন, কিংবা ঘোমটায়-মুখ-ঢাকা একটি বউ কবে মাঝরাত্তিরে কার জানলায় উঁকি দিয়ে নাকিসুরে বলেছিল, গয়ায় পিন্ডি না দিলে সে মুক্তি পাচ্ছে না, আসরে বসে সে-সব গল্প তাঁরা অম্লানবদনে বলতেন, এ নিয়ে তাঁদের কোনও সঙ্কোচ ছিল না। শুনে আমরা ছোটরা যে কী ভয় পেতুম, সে আর কহতব্য নয়। ঠাকুমা কিংবা বড়কাকিমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ঘুমোবার চেষ্টা করতুম। পারতপক্ষে জানলার দিকে চোখ ফেরাতুম না। পাছে বিচ্ছিরি কোনও মুখ-টুখ দেখতে পাই। কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হত।

গাঁয়ের এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যেতে হলে পায়ে-হাঁটা পথের ধারে মস্ত একটা জঙ্গুলে জায়গা পড়ত। তার মধ্যে ফলের গাছ যে কিছু ছিল না, তা নয়, তবে তাতে কখনও ফল ধরতে দেখিনি। গাছের তুলনায় আগাছাই ছিল বেশি। দিনের বেলাতেও জায়গাটা একটু অন্ধকার হয়ে থাকত। সন্ধের পরে তো বটেই, ভরদুপুরেও সেখান দিয়ে হাঁটতে যে বেশ গা ছমছম করত, সেটা এখনও মনে পড়ে। একেবারে পরিত্যক্ত জায়গা। নাম 'চিন্তার বাগ'। কে চিন্তা, জানি না। জায়গাটা কার, তাও না। শুধু এইটুকু জানি যে, চিন্তার বাগের কথা উঠবামাত্র বড়রা হঠাৎ খুবই রহস্যজনকভাবে চুপ করে যেতেন।

ভূতের গল্প সকলেই কিছু-না-কিছু জানতেন। তবে, গল্প বলার ব্যাপারে সকলেই যে সমান দড় ছিলেন, তা নয়। একটা ব্যাপার অবশ্য সেই ছেলেবেলাতেও লক্ষ করেছি। সেটা এই যে, ভূতের গল্প যাঁরা করতেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ভূত দেখেছেন 'বালি-বালি জোচ্ছনা'র মধ্যে। ফটফটে জ্যোৎস্না নয়, এ হল কুয়াশামাখা ম্লান জ্যোৎস্না। কেন যে এই ধরনের জ্যোৎস্নার মধ্যেই ভূতেরা দেখা দেয়, ছেলেবেলায় সেটা বুঝতে পারতুম না। বড় হয়ে যখন কোলরিজের 'ক্রিস্টাবেল' পড়ি, তখন সেটা বোধগম্য হয়।

গ্রামের লোকেদের প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু জমি-জিরেত ছিল। কারও বেশি, কারও কম। বেশি বলতে অবশ্য মেরেকেটে পঞ্চাশ-ষাট বিঘে, তার বেশি নয়। কম বলতে বিঘে দশেক, কি তারও কম। দুটি পরিবারের আদৌ জমি ছিল না। এককালে ছিল হয়তো, কিন্তু অভাবে পড়ে বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে। তার মধ্যে একটি পরিবারের কর্তা বাইরে চাকরি করতেন। বড়-কিছু চাকরি নয়। কথাটা এইজন্যে বলছি যে, বাড়ির লোকেদের খাই-খরচার জন্যে মনি-অর্ডার করে মাঝে-মধ্যে তিনি যে টাকা পাঠাতেন, তাতে সংসার চলত না। ফলে তাঁর বউকে অন্যের বাড়িতে এসে চিঁড়ে কোটা কি এই রকমের কিছু কাজ করে দিতে হত। তার জন্যে তিনি কিছু চাল পেতেন।

দ্বিতীয় বাড়ির কর্তাটিও বছরের বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটাতেন। কিন্তু চাকরি-বাকরি করতেন বলে মনে হয় না। তাঁর বউকে সারা বছরই অন্যের বাড়িতে কাজ করতে দেখেছি।

আমাদের গ্রামের একটি মাত্র বাড়ির কথা যদি বাদ দিই, তো অন্য সব বাড়ির লোকেদের পদবি হল চক্রবর্তী, ঘোষ, বসু, শিকদার আর দাশ। এ-সব পদবির লোকেরা কক্ষনো নিজের জমি নিজের হাতে চাষ করে না। এরা ভদ্দরলোক, তাই অন্য লোককে দিয়ে জমি চাষ করায়। যে ঢেলা ভাঙে, লাঙল ঠেলে, বীজ বোনে, ফসল কাটে, সে সেই ফসলের অর্ধেকটা নিজের জন্যে রেখে বাকি অর্ধেক জমির মালিককে দিয়ে দেয়। আমাদের গ্রামেও কাউকে কখনও নিজের হাতে জমি চাষ করতে দেখিনি। এক ওই একটি বাড়ির লোকদের ছাড়া। বাড়িটি রসিকদার। রসিকদা আমাদের গোটা গ্রামের পরামানিক। সে ছোটদের চুল ছাঁটত, বড়দের দাড়ি কাটত; আর চাকরান বাবদে যে চাষের জমি লিখে দিয়ে তার ঠাকুর্দার বাবাকে এই চান্দ্রা গ্রামে এনে বসানো হয়েছিল, তার পিছনে খাটাখাটনি করত।

এই শেষের কাজটাতেই রসিকদার আগ্রহ ছিল বেশি। ফলে, বাড়িতে তাকে বলতে গেলে ধরাই যেত না। যখনই তার বাড়িতে যাই, বউদি অর্থাৎ রসিকদার বউ একগাল হেসে বলে, "ও ভাই, এখন তো তোমাগো দাদারে এইহানে পাবা না, সে তো মাঠে গেছে।" এই নিযে একবার বড় মুশকিল হয়েছিল। চুল ছাঁটতে আমার নিজের যে খুব গরজ, তা নয়, তবে কিনা গ্রাম-সম্পর্কে এক দাদার বিয়ে, আমাকে নিতবর হয়ে যেতে হবে, তাই চুল না-ছাঁটিয়ে উপায় নেই। অথচ রসিকদার বাড়িতে গিয়ে শুনি, সে মাঠে গিয়ে লাঙল ঠেলছে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে বউদিকে বললুম, "ঠিক আছে, তার যন্তরগুলো দ্যাও তো।" যন্তর মানে দাঁতভাঙা মোটা চিরুনি, কাঁচি আর ক্ষুর। সেগুলো একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে থাকে। সেই বাক্স ঘাড়ে করে মাঠে গিয়ে, আলপথের উপরে বাবু হয়ে বসে, রসিকদাকে দিয়ে চুল ছাঁটিয়ে সেবাবে বাড়ি ফিরি। চুল ছাঁটার কাজ শেষ হবার পরে রসিকদা কী বলেছিল, তা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। "ঠাউরভাই, কাউরে য্যান্ কইয়ো না যে, মাঠের মধ্যে আমি তোমার চুল ফালাইছি। কইলে কিন্তু রইক্ষা নাই। হক্কলে যদি এইখানে আইসা আমারে ধবে, তাইলে আর মাঠের কাম করন যাইব না।"

রসিকদার বাড়ি ছিল চিন্তার বাগের ধারে। বাড়ি মানে উঠোনের উত্তবে আর দক্ষিণে দুটো দোচালা ঘর। দক্ষিণ দিকের ঘরটায় থাকত নিবারণদা, তার বউ আব ছেলে। নিবারণদা আসলে অন্য গ্রামের মানুষ। রসিকদার দিদিকে বিয়ে করবার দু'চার বছর বাদেই সে তার নিজের বাড়িঘরদোর বেচে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ঘরজামাই হয়ে থাকতে হলে মেজাজ দেখানো চলে না। হয়তো সেই কারণেই নিবারণদাকে কখনও গলা চড়িয়ে কথা বলতে শুনিনি। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এমনিতেই মানুষটি ছিলেন একটু নিরীহ স্বভাবের। তিনি যে আদৌ কোনও কাজ করতেন না, স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থেকে শ্বশুরবাড়ির অন্ন ধ্বংস করতেন, তা কিন্তু নয়। দু-এক মাস অন্তর-অন্তর তিন মাইল দূরের গঞ্জ থেকে তিনি শাঁখা কিনে আনতেন, আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বিক্রি করতেন সেই শাখা।

নিবারণদার বউটিও ছিলেন ঠান্ডা মানুষ। রসিকদার তিনি দিদি। আমরাও তাঁকে দিদি বলতুম। তিনি তো বাইরে থেকে আসা বউ নন, গাঁয়েরই মেয়ে, ফলে কারও সঙ্গেই কথা বলবার ব্যাপারে তাঁর কোনও সংকোচ ছিল না। গ্রামের মধ্যে সর্বত্র তিনি যেমন-খুশি ঘুরে বেড়াতেন, সব বাড়িতেই তাঁর গতিবিধি ছিল অবাধ। শাঁখা বিক্রি করে নিবারণদার তেমন কিছু উপায়-রোজগার হত বলে মনে হয় না। একে তো অজ-পাড়াগাঁ, মাটির মেঝেতে আছাড় খেলেও শাঁখা ভাঙে না, তার

উপরে আবার লোকজনের হাতে পয়সাকড়িও কম, রোজ-রোজ কে আর কত শাঁখা কিনবে। ফলে নিবারণদার ওই তেতেপুড়ে শাঁখার বাক্স মাথায় নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ানোই সার হত, বিক্রিবাটা খুব-একটা হত না।

তবে ভুবনদিদি যে তাই নিয়ে খুব অশান্তি করতেন, তাও নয়। তিনি নিজে খাটতেন হাড়ভাঙা খাটুনি। কারও বাড়িতে ধান ভানতেন, কারও বাড়িতে চিড়ে কুটতেন, কারও বাড়িতে খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানাতেন, আবার কারও বাড়িতে গিয়ে বসে যেতেন জাক-দেওয়া পাটের আঁশ ছাড়াতে। তার চেয়েও বড় কথা, এ-সব কাজের সবটাই তিনি করতেন হাসিমুখে। নিবারণদার শাঁখের কারবারে যে সংসার চলে না, এইটে শুনে আমার ঠাকুমা একদিন তাঁকে বলেছিলেন, "তাইলে তুই ওই লোকসানের কাম অরে করতে দিস ক্যান?" শুনে, গালে হাত দিয়ে ভুবনদিদি বলেছিলেন, "কন কী ঠাউরদিদি, পুরুষমানুষ হইয়া বাড়ির মধ্যে বইসা থাকবে আপনাগো জামাই? হেইড়া ভাল দেখাইব? লোকে নিন্দা করব না?"

বর্ষাকালে অবশ্য হাত-পা-গুটিয়ে সব্বাইকেই বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে হত। একটু ভারী রকমের বর্ষা হলে তো কথাই নেই, যতক্ষণ না সাঁকো বাঁধা হচ্ছে অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত এক-ঘর থেকে অন্য-ঘরে যাবার পর্যন্ত উপায় থাকত না। মাঠ-ঘাট সব জলের তলায়, উঠোনেও এক হাঁটু জল। বারান্দায় বসে, বড়শিতে ভাত গেঁথে, উঠোনে ছিপ ফেলে টপাটপ পুঁটিমাছ ধরছি, দেখতে-দেখতে সেই জল এক সময় বারান্দার উপরে উঠে এল। বড়কাকিমা এসে বললেন, "ঘরে আয়, জলে পড়ে যাবি যে!"

তখন কত বয়েস আমার? মেরেকেটে পাঁচ বছর। কিন্তু জলে পড়লেও ডুবে মরার ভয় ছিল না। ডুবে মরব কেন, সাঁতারটা তারই মধ্যেই শিখে নিয়েছি যে। আমরা তো শুধু পুব-বাংলার মানুষ নই, পুব-বাংলার নাবাল অঞ্চলের মানুষ। মায়ের কোল থেকে মাটিতে নামবার পরে আর আমাদের দেরি করতে নেই, হাঁটতে শেখার পরে-পরেই আমাদের সাঁতার শিখতে হয়। নইলে নির্ঘাত ডুবে মরব।

আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই সত্যি জলে ডুবে মারা যায়। জ্যাঠামশাই আমার বাবার আপন দাদা নন, দালান-বাড়ির বড় কর্তা। তাঁর ছোট ছেলের নাম দুলাল। আমার চেয়েও কিছু ছোট। চার বছরের ছেলে, সদ্য জ্বর থেকে উঠেছে, তখনও খুব দুর্বল, জ্যাঠাইমা তাকে এক বাটি মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসিয়ে রেখে হেঁশেলে গিয়ে রান্না করছিলেন। সেই অবস্থায় মাথা ঘুরে গিয়ে সে বারান্দা থেকে উঠোনের জলের মধ্যে পড়ে যায়। সেই যে পড়ল, আর ওঠেনি। জ্যাঠাইমা এসে দেখেন, ছেলে নেই। জেলে ডাকিয়ে চতুর্দিকে জাল ফেলিয়ে, বাড়ির থেকে অনেক দূরে পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। স্রোতের টানে সে উঠোন থেকে মাঠের দিকে ভেসে গিয়েছিল!

দুলাল সাঁতার জানত না। চার বছরের ছেলে, অথচ সাঁতার শেখেনি, এখনও আমার মনে আছে যে, কথাটা শুনে গ্রামের লোকেরা প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইছিল না।

পাঁচে পৌঁছবার আগেই আমাকে সাঁতার শিখতে হয়েছিল। কীভাবে শিখেছিলুম? শহরের ছেলেমেয়েরা শুনলে হয়তো ভাববে যে আমি বাড়িয়ে বলছি, আর তাদের বাপমায়েরা সম্ভবত মন্তব্য করবেন যে, দূর দূর, এ একেবারেই গাঁইয়া ব্যাপার!

২

আগে যা ছিল মহকুমা, বাংলাদেশে এখন সেগুলিকে জেলা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ফরিদপুর জেলার মধ্যে ছিল চারটি মহকুমা। গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর, গোয়ালন্দ আর সদর। আমরা সদর-মহকুমার মানুষ। এমনিতেই নিচু জায়গা, তার উপরে আবার সদর-মহকুমার দক্ষিণ দিকটা একেবারেই নাবাল অঞ্চল। বর্ষা নামলেই মাঠঘাট জলে ভাসত। জল যেমন মাঠ ছাড়িয়ে উঠোনে চলে আসত, তেমনই আবার একটু ভারী রকমের বর্ষা হলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে কোনও বাধা ছিল না। গেরস্তকে তখন মাচায় উঠে ধান-চালের বস্তা আর গুড়ের নাগরির পাশে আশ্রয় নিতে হত। মানুষের পাশাপাশি ছাগল, কুকুর কি পোষা বেড়ালেরও যে সেখানে ঠাঁই হত না, তা নয়। হালের বলদ কি গাই-বাছুরের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। তাদের নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা হত কোনও উঁচু ভিটেয়। জল যতক্ষণ না উঠোন থেকে নেমে যাচ্ছে, ততক্ষণ সেই ভিটে থেকে তাদের নামিয়ে আনা হত না।

এই যেখানকার অবস্থা, স্রেফ প্রাণরক্ষার তাগিদেই সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঁতার কাটার বিদ্যেটা শিখে নিতে হয়। তা ছাড়া উপায় নেই। অ-আ শেখার আগেই যে আমাকে সাঁতার শিখতে হয়েছিল, তারও এই একই কারণ। আমার নাতনিটি যেখানে সাঁতার শেখে, বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সেখানে লাইফ-বেল্ট ধরিয়ে দিয়ে সাঁতার শেখাতে দেখেছি। তা ছাড়া আছে আরও হরেক রকমের আধুনিক সব ব্যবস্থা। গ্রাম-দেশের ছেলে-মেয়েরা ও-সব আধুনিক ব্যবস্থার ধার ধারে না। তারা কলাগাছের গুঁড়ি কি হাঁড়ি-কলসি আঁকড়ে ধরে সাঁতার কাটতে শিখে যায়। দুটো ঝুনো নারকোলের ছোবড়া খানিকটা ছাড়িয়ে নিয়ে, তাতে গিঁট বেঁধে দিয়ে যদি কেউ জলে নামে, তবে সেই ভাসন্ত নারকোলের ছোবড়া ধরেও জলের মধ্যে ভেসে থাকাটা কিছু কঠিন হয় না। আমি অন্তত ওইভাবেও অনেককে সাঁতারের বিদ্যেটা রপ্ত করতে দেখেছি।

আমার জন্যে অবশ্য না-কাটতে হয়েছিল কলাগাছ, না ভাসাতে হয়েছিল হাঁড়ি-কলসি, না দরকার হয়েছিল ঝুনো নারকোলেব। তার কারণ আর কিছুই নয়, আমার ঠাকুমা ছিলেন অতিশয় কঠিন ধাতের মহিলা। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর-ঘাটে যেতেন, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতেন জলের মধ্যে। তো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে আমি যখন জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি, তখন আবার ছোঁ মেরে আমাকে উপরে তুলে আনতেন। সুকুমার রায়ের আঁকা 'পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা'র ছবিটা যাঁরা দেখেছেন, আমার তখনকার অবস্থাটা তাঁরা কল্পনা করতে পারবেন। ওই যে জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া আর ছোঁ মেরে তুলে আনা, ওর ফলে জল যত না খেয়েছিলুম, হাত-পা ছুড়েছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি। তাতে লাভ হল এই যে, দিন তিনেকের মধ্যেই আমি সাঁতারটা শিখে গেলুম। পুকুরের পচা জল খেয়ে ওলাউঠো হয়ে যদি বা মারা যাই, জলে ডুবে মরবার ভয়টা আর রইল না।

ওলাউঠো অর্থাৎ কলেরার কথাটা যখন উঠেই পড়ল, তখন বলি, প্রায় প্রতি বছরই রোগটা একেবারে মহামারীর আকারে দেখা দিত। আমাদের চান্দ্রা গ্রামে এই রোগের প্রকোপ অবশ্য তেমন আমরা দেখিনি, কিন্তু চতুর্দিক থেকে রোজই যে-রকম হরিধ্বনি ভেসে আসত, তাতেই বুঝতে পারতুম যে, লোকজন সেখানে একেবারে পোকামাকড়ের মতন মারা পড়ছে। এটা হত গ্রীষ্মকালে। অর্থাৎ পানীয় জলের যখন খুব অভাব ঘটত, তখন। পানীয় জল মানে টিউবওয়েল কি ইঁদারার জল নয়, স্রেফ পুকুরের জল। সেটাও এই সময়ে মিলত না। বর্ষাকালে যে-জল ঘরের মধ্যে এসে ঢুকত, গ্রীষ্মকালে তা-ই নেমে যেত একেবারে পুকুরের তলায়। সে একেবারে কাদাজল ছাড়া আর কিছুই নয়। তা-ই দিয়ে যদি তেষ্টা মেটাতে হয়, তবে গ্রামের পর গ্রাম

যে কলেরায় উজাড় হয়ে যাবে, তাতে আর বিচিত্র কী।

কথা হচ্ছে, নাবাল অঞ্চলে ইঁদারা না হয় না-ই খোঁড়া যাক, টিউবওয়েলটা তো অন্তত বসানো যেত। সেটাই বা কেন বসানো হত না? এর একটাই উত্তর। টাকার অভাব। আমাদের গ্রামের কথাই বলি। চান্দ্রা মোটামুটি সচ্ছল গ্রাম। কিন্তু কেমন ধরনের সচ্ছল? না জমিতে যে ফসল হয়, তাতে না-খেয়ে কাউকে মরত হয় না। জমিতে কিছু পাটও হয় অবশ্য। সেই ক্যাশ-ক্রপের কিছুটা যেমন ঘরের কাজে লাগে, কিছুটা তেমন বিক্রিও হয় বই কী। কিন্তু বিক্রি বাবদে যে টাকাটা মেলে, পরনের কাপড় আর টুকিটাকি অন্য কয়েকটা জিনিস কিনতেই তা খরচা হয়ে যায়, তারপরে আর এমন টাকা কারও হাতে থাকে না যে, তাই দিয়ে একটা টিউবওয়েল বসাবে।

গ্রীষ্মকালে ভদ্দরলোকেরা তা হলে করবেটা কী? কী আর করবে, ইঁদারাও যখন খোঁড়া যাচ্ছে না, আর টিউবওয়েল বসাবার পয়সাও যখন নেই, তখন শুকিয়ে-যাওয়া ওই পুকুরের কাদাজলই তারা খাবে। কিন্তু না, তারা তো আর গরিব-গুর্বো ভাগচাষি নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলোও তারা ভালই জানে, তাই সরাসরি ওই কাদাজল তারা খাবে না, পুকুর থেকে তুলবার পরে ওটাকে তারা একফালি ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নেবে, চাই কী ফুটিয়েও নিতে পারে।

আমার ঠাকুমা ছিলেন সেকালের 'নর্মাল' পরীক্ষায় পাশ করা মহিলা। তাই জলটাকে ফুটিয়েও তাঁর শান্তি হত না। তার উপরে আবার সেটকে তিনি ফিল্টারও করে নিতেন। হরেক কোম্পানি আজকাল জল-শোধনের যে-সব ঝাঁ-চকচকে যন্ত্র ছেড়েছে, মানে ওই যার মধ্যে অজস্র-ফুটোওয়ালা সব পোর্সিলেনের ক্যান্ডল বসানো থাকে, আর হপ্তাখানেক ব্যবহার করতে-না-করতেই ময়লা পড়ে যার ক্যান্ডলগুলোর ফুটো একদম বন্ধ হয়ে যায়, ফলে যা দিয়ে আর জল গলতে চায় না, আমার ঠাকুমার ফিল্টার মোটেই সেই রকমের ব্যাপার নয়। এ একেবারে ষোলো আনা ইন্ডিজেনাস মানে খাঁটি স্বদেশি ফিল্টার। কাঠের র‍্যাকে পরপর কয়েকটা মস্ত-মাপের মাটির হাঁড়ি বসানো। একেবারে তলারটা বাদে সবক'টারই তলায় ফুটো, আর সেই ফুটোর মধ্যে খড়ের গুঁজি। উপরকার হাঁড়িগুলো আধ-ভর্তি। কোনওটা কয়লার গুঁড়ো দিয়ে, কোনওটা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে, কোনওটা-বা বালি দিয়ে। ব্যস, জল শোধনের পাকা ব্যবস্থা। উপরের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিতেন তিনি। চুঁইয়ে-চুঁইয়ে সে জল কয়লার গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো আর বালির গুঁড়োর ভিতর দিয়ে তলার হাঁড়িতে এসে জমত। বড়-কাকিমা মাঝে-মাঝেই তলার হাঁড়ির জলটা তুলে নিয়ে পাশেই একটা মস্ত জালার মধ্যে ঢেলে দিতেন।

কিন্তু তাতেই কি ঠাকুমার শান্তি আছে? তাতেও নেই। হাতখানেক লম্বা একটা বাঁশের খণ্ডের একদিকটা দা দিয়ে ফেঁড়ে ফেলে তিনি বেশ বড়-সাইজের একখানা ফটকিরি আটকে দিতেন সেই ফেঁড়ে-দেওয়া জায়গাটায়। তারপর শক্ত আর পরিষ্কার টোন-সুতোয় বেঁধে ফটকিরি-সুদ্ধ বাঁশের খণ্ডটিকে জালার মধ্যে ঝুলিয়ে দিতেন। একটু কষা স্বাদ হত ঠিকই, কিন্তু সে একেবারে নির্মল জল। আমি আমার ছেলেমেয়েদের সব সময়েই বলি যে, দ্যাখ্, এইরকম একখানা ঠাকুমা পেয়েছিলুম বলেই আজও বেঁচে আছি, নয়তো সেই পানাপুকুরের জল খেয়ে কবেই বেঘোরে মারা পড়তুম।

বাবা কলকাতায় থাকতেন। দেশের বাড়িতে আসতেন সাধারণত বছরে দু'বার। একবার পুজোর ছুটিতে, একেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে। কলেজে পড়াতেন। তাই দুটো ছুটিই ছিল মোটামুটি লম্বা মাপের। ঠাকুমাকে প্রায়ই বলতেন, "মা, এবারে বরং একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।"

ঠাকুমা রাজি হতেন না। বলতেন, "কেন, আমার নিজের হাতে ফিল্টার-করা এই জল খেতে তোদের ভয় করে?"

বাবা বলতেন, "আমাদের কেন ভয় করবে? কিন্তু তোমার তো কষ্ট হয়।"

"আমার কষ্ট নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।" ঠাকুমা বলতেন, "টিউবওয়েল বসাতে তো টাকা লাগবে। সেই টাকাটা বরং তোর বাবাকে দিয়ে যা। উনি আর দু'বিঘে জমি কিনবার কথা বলছিলেন।"

তা ঠাকুমা যতই আপত্তি করুন, বাবা শেষ পর্যন্ত টিউবওয়েল না-বসিয়ে ছাড়েননি। আমাদের চান্দ্রা গ্রামে সেটাই প্রথম টিউবওয়েল। যেমন আমাদের গোটা গ্রাম, তেমন আশপাশের আরও দু'তিনটি গ্রামের লোক সেই টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে যেত। সকাল থেকে সন্ধে অব্দি টিউবওয়েলের চাতালে ভিড় জমে আছে, ঘড়া আর বালতি হাতে লোকজন সারাক্ষণ আসছে তো আসছেই, এই দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। শব্দটাও কানে লেগে আছে। ঘটাং....ঘটাং....জল তোলার যেন কামাই নেই।

টিউবওয়েল বসানো নিয়ে এত যে আপত্তি ঠাকুমার, তা ওই শব্দ শুনে তিনিও মনে হত দারুণ খুশি। হামানদিস্তেয় পান ছেঁচতে-ছেঁচতে যেভাবে তিনি ঠাকুর্দার দিকে তাকাতেন, তাতেই বোঝা যেত যে, আমাদের ঠাকুরঘরের ঘণ্টাধ্বনির চেয়ে টিউবওয়েলের ওই শব্দটা তাঁর কানে কিছু কম মধুবর্ষণ করছে না।

আমার ঠাকুর্দা স্বর্গত লোকনাথ চক্রবর্তীর কর্মজীবন কেটেছে কলকাতায়। কিন্তু বয়স ষাট বছর পূর্ণ না-হতেই সেই যে তিনি ফরিদপুরের এই গাঁয়ে চলে আসেন, তারপরে আর পারতপক্ষে তিনি কলকাতার দিকে পা বাড়াতে চাইতেন না। সত্যি বলতে কী, ছানি কাটাবার জন্যে বাবাই অনেক বলে-কয়ে তাঁকে একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, তাঁর বয়স তখন সত্তর ছাড়িয়েছে, কিন্তু সেবারেও তাঁকে তিনদিনের বেশি সেখানে আটকে রাখা যায়নি, ছানি না-কাটিয়েই জোরজার করে তিনি তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে আসেন। এই নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বলেছিলেন, "ওরেব্বাপ রে বাপ, ওখানে কি কেউ থাকতে পারে নাকি? চাকরি করতে হলে কি মামলা-মোকদ্দমা করতে হলে ওখানে যেতে হয় ঠিকই, কিন্তু ওখানে থাকতে হয় না।"

জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন, ওখানে থাকলে কী হয়? তাতে তিনি গড়গড়ার নলটা তাঁর মুখ থেকে নামিয়ে বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর যেন দারুণ একটা গোপন কথা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন, এইভাবে খুব নিচু গলায় বললেন, "ওরে দাদু, কাউকে আবার বলিস না যেন, ওটা আসলে মস্ত একটা পাগলা-গারদ। ওখানে যদি যাস, তো পাগলদের সঙ্গে থাকতে হবে, আর থাকতে-থাকতে তুইও শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবি।"

অথচ, আমাদের গ্রামের এই যে পরিবেশ, এর সম্পর্কেই যে তাঁর খুব একটা মোহ ছিল, এমনও আমার মনে হয় না। কেন মনে হয় না, সেটা বলি। জাতকের অনুবাদক ও এককালের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ঈশানচন্দ্র ঘোষ ছিলেন আমার ঠাকুর্দার আশৈশব বন্ধু। ছানি কাটাবার জন্যে ঠাকুর্দা যখন কলকাতা যান, তখন খবর পেয়ে তিনি একদিন ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এ-কথা সে-কথার পরে ঠাকুর্দাকে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা লোকনাথ, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তো। যেখানে তুমি কাজ করতে তারা তো তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায়নি, যাতে তুমি আরও কয়েকটা বছর সেখানে চাকরি করো, তার জন্যে শুনি তারা খুব ঝুলোঝুলিও করেছিল, তবু তুমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেলে কেন?"

ঠাকুর্দা তাতে হেসে বলেন, "এর মধ্যে আর বোঝাবুঝির কী আছে! ঈশেন, তুমি পণ্ডিত মানুষ। তুমি জানো আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। তো আমি ঊনষাট বছর

বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছি। বড্ড দেরি হয়ে গেল রে ভাই, আরও ন'বছর আগেই আমার বনবাসে যাওয়া উচিত ছিল।"

তা যাঁরা শৈশব, বাল্য, কৈশোর আর যৌবন তো বটেই, প্রৌঢ় বয়সের দিনগুলিও কেটেছে কলকাতায়, চান্দ্রার জীবন যে তাঁর কাছে বনবাসেরই তুল্য ছিল, তাতে আর সন্দেহ কী। বাইরের জীবনযাত্রা থেকে আমাদের গ্রাম ছিল একেবারে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। সেখানে না ছিল একটা মাইনর ইস্কুল, না ছিল একটা দোকান, না পাওয়া যেত একজন ডাক্তারের সাহায্য। অনেক চেষ্টায়, বিস্তর লেখালিখি করে একটা ডাকঘর খোলাবার ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু পরপর কয়েকটা মনি-অর্ডারের টাকা মার যাওয়ায় আর পোস্টমাস্টার বাবুটির জীবনযাত্রার মান হঠাৎ খানিকটা পালটে যাওয়ায় সদর থেকে ইন্‌সপেকশনে এসে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে, আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরের গ্রাম কাইচালে যে ডাকঘরটি ছিল, তারই উপরে আমাদের নির্ভর করতে হত।

সেখান থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে চিঠিচাপাটি বিলি করবার ব্যবস্থা ছিল না। যেমন আর-পাঁচটা ডাকঘরে থাকে, তেমন কাইচালের সেই ডাকঘরেও কি আর একজন পিওন ছিলেন না? তা অবশ্যই ছিলেন। বড়রা তাঁকে 'সাতু' বলতেন, আর আমরা ছোটরা বলতুম 'সাতুদা'। চিঠিপত্র বিলির ব্যাপারে তাঁর ব্যবস্থাটা ছিল অন্যরকম। আমাদের গ্রামে হাটে বসত না, তবে আশপাশের গ্রামগুলিতে সপ্তাহের কোনও-না-কোনও দিন তো হাট বসতই, তো যে-দিন যে-গ্রামে হাট, চিঠিপত্রের ঝুলি নিয়ে সাতুদা সে-দিন সেখানে গিয়ে হাজিরা দিতেন। হরেক গ্রামের চিঠিপত্র বাঁধা থাকত হরেক বাণ্ডিলে। যখনই যে-গ্রামের অল্পবয়সী কোনও ছেলে-ছোকরাকে তিনি হাতের কাছে পাচ্ছেন, তারই হাতে সেই গ্রামের নাম লেখা বাণ্ডিলটা তুলে সাতুদা বলতেন, "এই, তোগো গেরামের এই চিঠিগুলান লইয়া যা তো। নামে-নামে বিলি কইরা দিবি। দেহিস য্যান্‌ গণ্ডগোল না হয়।"

গণ্ডগোল কি আর হত না? মাঝে-মধ্যে হত। একবার তো বেশ বড় রকমেরই গণ্ডগোল হয়েছিল। গ্রামের দুই বাড়িতে ছিলেন একই নামের ও পদবির দুই মহিলা। একজন বৃদ্ধা, অন্যজন এক অল্পবয়সী বউমানুষ। বৃদ্ধার চিঠি এসেছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছ থেকে, আর বউটির চিঠি এসেছিল তাঁর প্রবাসী স্বামীর কাছ থেকে। কোন্‌টা কার চিঠি, 'কেয়ার অব' দেখেই সেটা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাট থেকে যে-ছেলেটি সে-দিন চিঠি নিয়ে আসে, তাড়াতাড়ি চিঠি বিলি করতে গিয়ে অতটা সে নিশ্চয় খেয়াল করেনি, ফলে যে বিভ্রাট ঘটে যায়, তার পরিণাম কল্পনা করা বোধহয় কারও পক্ষেই খুব কঠিন হবে না। বউটি তার পরে অনেক দিন পর্যন্ত কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারেনি।

হাটে বসে সাতুদা যে শুধুই এর-ওর-তার হাতে চিঠিপত্রের বাণ্ডিল তুলে দিতেন, তা নয়। পোস্টকার্ড, খাম আর ডাকটিকিটও তিনিই বিক্রি করতেন। মনিঅর্ডার করবার ফর্মও তাঁর কাছে পাওয়া যেত। তবে গ্রাম থেকে আর কে কাকে টাকা পাঠাবে, বাইরে থেকে গ্রামেই বরং মাঝেমধ্যে কিছু-কিছু টাকা আসত। সেক্ষেত্রে অবশ্য সাতুদা নিজেই গ্রামে এসে প্রাপকের হাতে টাকাটা তুলে দিতেন।

সেদিক থেকে সাতুদাই ছিলেন বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। আসলে আমাদের গ্রামটা ছিল যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। বর্ষাকালে সেই বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটা আরও বাড়ত বই কমত না। পুকুর ভেসে গেছে, মাঠঘাটে এক-মানুষ কি তারও বেশি জল, বাড়ির উঠোনে জল ঢুকে পড়েছে, তার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে হরেক রকমের মাছ— পুঁটি,

ট্যাংরা, কই, মাগুর, কোনওটারই কিছু অভাব নেই। মস্ত বড় শোলমাছটাকেও বারান্দা থেকে দিব্যি দেখা যায়। পইঠার পাশেই রয়েছে সেটা। সমস্ত শরীর একেবারে স্থির, শুধু লেজটাই যা একটু-একটু নড়ছে। তার থেকে খানিক দূরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাঙাচির মতন ছোট্ট দেখতে একঝাঁক শোলের পোনা। জল একটু নড়ে উঠলেই বিপদের গন্ধ পেয়ে ওরা একছুটে ওদের মায়ের মুখের মধ্যে এসে ঢুকে পড়বে, আর যতক্ষণ না একেবারে নিশ্চিন্ত হচ্ছে, মা'ও ততক্ষণ তার মুখ থেকে ওই বাচ্চাগুলোকে ফের উগরে দেবে না।

এই ছিল আমার ছেলেবেলার বর্ষাকাল। বারান্দায় বসে এইসবই আমি দেখতুম। কখনও বা উঠে যেতুম আমাদের কাঠের বাড়ির দোতলায়। সেখান থেকে দেখতে পেতুম যে, দক্ষিণ দিকের মস্ত বড় মাঠ পেরিয়ে যে আলগি গ্রামে আমার বড় পিসির বাড়ি, সেই গ্রামের গাছপালা হঠাৎ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যেন মস্ত বড় একখানা সাদা রঙের চাদর দিয়ে ওখানকার গাছপালাগুলোকে ঢেকে রেখেছে কেউ। তার মানে তো আর কিছুই নয়, দক্ষিণ দিকে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টি কীভাবে জলের তলায় ঢাকা পড়ে যাওয়া বিশাল মাঠের উপর দিয়ে সাদা একপাল খ্যাপা ঘোড়ার মতন চড়বড়-চড়বড় করে ছুটে আসছে আমাদের দিকে, তাও দেখতে পেতুম।

বৃষ্টির আগে-আগে ছুটে আসত দামাল হাওয়া। আমরা বলতুম জল-বলা বাতাস। যেন ওই বাতাসই সবাইকে বলে দেয় যে, জল বাড়বে, আরও বাড়বে।

নীচের ঘরে নেমে দেখতে পেতুম, ঠাকুর্দা তাঁর খাটের উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। কিছুদিন আগে ডাকে যে খবরের কাগজখানা এসেছে, তার উপরে চোখ বুলোচ্ছেন তিনি। কাগজখানা সম্ভবত দ্বিতীয়বার কি তৃতীয়বার পড়ছেন। হাতে গড়গড়ার নল, মুখ থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া। গন্ধটা একটু মিষ্টি-মিষ্টি।

তখন আমার মনে কোনও প্রশ্ন জাগত না। পরে জেগেছে। বড় হয়ে মাঝে-মাঝেই ভেবেছি, জল-জঙ্গলের দেশের এই যে জীবন, এ তো তাঁর কাছে সত্যিই ছিল এক নির্বাসনের মতো। এই বিচ্ছিন্নতা তো তাঁর ভাল লাগবার কথা নয়। তা হলে কেন এই নির্বাসনকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি?

৩

ঠাকুর্দার কথা যখন ভাবি, তখন অবাক হতে হয়। শুনেছি যে, আমরা বর্ধমান জেলার মানকরের মানুষ। তবে আমার প্রপিতামহ মহেশ চক্রবর্তী সেখানে থাকতেন না। তিনি ছিলেন ফারসি-জানা ব্যবহারজীবী। যৌবন-বয়সে কিছুদিন বর্ধমান শহরে কাটিয়েছিলেন। তারপর কর্মসূত্রে সস্ত্রীক সেখান থেকে যশোরে চলে যান। মানকরে আর ফেরা হয়নি তাঁর। ফেরার সুযোগ পাননি বললেই অবশ্য ঠিক বলা হয়। কেননা, নাবালক দুই পুত্র আর একটি বালিকা-কন্যাকে রেখে যশোরে যখন তিনি দেহরক্ষা করেন, মহেশচন্দ্রের বয়স তখন পঁয়ত্রিশও পেরয়নি। প্রপিতামহী লক্ষ্মী দেবী মারা যান তার বছর দুয়েকের মধ্যে। ঠাকুর্দার বয়স তখন কত হবে? মেরে কেটে বছর বারো। তাঁর ভাইয়ের বয়স তখন দশ আর বোনের বয়স সাত। বোনের বিয়ে অবশ্য তার আগেই হয়ে গিয়েছিল। এতে অবাক হবার কিছু নেই। দুগ্ধপোষ্য নাবালিকার বিয়ে হওয়াটা সেকালে কোনও আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। আমার ঠাকুমার বিয়েই তো হয়েছিল তিন বছর বয়সে।

যে-কথা বলছিলুম। বাপ-মা-মরা দুই ভাই অতঃপর মানকরে ফিরে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মহেশচন্দ্রের পৈতৃক জমি-জায়গা ইতিমধ্যে বেহাত হয়ে যাওয়ায় সেখানে তাঁদের ঠাঁই মেলেনি। ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর্দা তখন কলকাতায় চলে আসেন। বয়স যদিও বারো বছর, তবু কাজও জুটিয়ে নিয়েছিলেন একটা। ভেবেছিলেন নিজের লেখাপড়া তো বলতে গেলে কিছুই হল না, এবারে ছোট ভাইটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু সেই আশাও তাঁর পূর্ণ হয়নি। তখনও একটা বেশ বড় রকমের ধাক্কা খাওয়া তাঁর বাকি ছিল। কলকাতার গঙ্গার ঘাট থেকে তাঁর ছোট ভাইটি হঠাৎ একদিন হারিয়ে যান। ঘাটেরই দু'একজন লোকের কাছে শোনা গেল যে, পশ্চিমী মাল্লাদের একটা নৌকো নাকি কলকাতা থেকে মালপত্র বোঝাই করে মুঙ্গেরের দিকে যাচ্ছিল, শেষ তাঁকে সেই নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িতে থাকতে দেখা গিয়েছে।

আমাদের চান্দ্রা গ্রামের বাড়ির বয়স এমন কিছু বেশি হবে না। বাড়িটা হবার আগে ঠাকুর্দা মাত্র দু'বারই ফরিদপুর জেলায় গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন বিয়ে করতে, আর দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন তাঁর পাঁচ বছর বয়সের জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে অর্থাৎ আমার বাবাকে তাঁর মামাবাড়িতে রেখে আসতে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমার ঠাকুমা নিত্যসুন্দরী দেবী ছিলেন বাঙাল-বাড়ির মেয়ে। শুনেছি, কর্মসূত্রে ঠাকুমার বাবাকে বছরে এক-আধবার কলকাতায় যেতে হত, সেখানেই খুব আকস্মিকভাবে আমার ঠাকুর্দার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, অতঃপর বংশপরিচয় জেনে ও কথাবার্তা বলে নাকি পিতৃমাতৃহীন বালকটিকে তাঁর এতই ভাল লেগে যায় যে, তৎক্ষণাৎ তিনি ঠিক করে ফেলেন, এরই সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ দেবেন। ভদ্রলোক যে খুবই খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ কী।

যা-ই হোক, বিয়েটা যখন হয়, ঠাকুর্দার বয়স তখন পনেরো বছর। আর ঠাকুমার বয়স যে তখন তিন, তা তো আগেই বলেছি। বিয়ের পরেই যে ঠাকুমা কলকাতায় চলে আসেন, তা নয়। সেটা সম্ভবও ছিল না। তিন বছরের কনেটি যতদিন না হেঁশেল ঠেলবার যুগ্যি হয়ে কলকাতায় আসেন, লোকনাথ চক্রবর্তীকেও অগত্যা ততদিন হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হয়েছে। ঠাকুমাও সেই যে বারো বছর বয়সে কলকাতায় এলেন, তারপরে আর ছত্রিশ বছরের মধ্যে একবারও তিনি পুব বাংলায় ফিরে যাননি। যখন গেলেন, তাঁর বয়স তখন আটচল্লিশ বছর। এ হল ১৯২০ সালের কথা। সেই বছরই চান্দ্রা গ্রামে তৈরি হয় আমাদের দোতলা কাঠের বাড়ি। জমি অবশ্য তার বছর কয়েক আগেই কেনা হয়েছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্ববঙ্গে তাঁর নিজের বাড়ি না হয় না-ই থাক, বাপের বাড়ি তো ছিল, তা ঠাকুমা তাঁর বাপের বাড়িতেই বা ইতিমধ্যে একবারও আসেননি কেন? বাপের তিনি একমাত্র মেয়ে। সেই মেয়েকে মাঝে-মাঝে নিজের কাছে নিয়ে রাখবার ব্যাপারে তাঁর বাবারই কি কোনও গরজ ছিল না নাকি? খুবই ছিল। এমনও শুনেছি যে, বছরে যে-মানুষ এক-আধবার মাত্র কলকাতায় যেতেন, আর কিছু নয়, স্রেফ মেয়েকে দেখবার জন্যেই তাঁর কলকাতা যাওয়ার মাত্রা ইতিমধ্যে বেড়ে গিয়েছিল। যখনই যেতেন, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফরিদপুরে ফিরবার জন্যে ঝুলোঝুলি করতেন, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই যেতে চাইতেন না। বলতেন, 'তোমার জামাইকে তা হলে কে দেখবে?'

বাপের বাড়িতে না-যাবার এই যে যুক্তি, ঠাকুমার বাবা আর মায়ের মৃত্যুর পরে এটা অন্য দিকে মোড় নেয়। তখন বলতেন, 'বাবা আর মা-ই যখন নেই, তখন আর ওখানে কার কাছে যাব? তা বাবা আর মা না-ই থাকুন, বড় ভাই তো একজন ছিলেন। ঠাকুমার কাছেই শুনেছি যে, তাঁর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় সেই দাদাটিও কিছু কম স্নেহশীল ছিলেন না। কিন্তু না, ঠাকুমা তবু অনড়, আমাদের চান্দ্রা গ্রামের বাড়ি যতদিন না তৈরি হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত তিনি ঠাঁইনাড়া হননি।

আমার ধারণা, ঠাকুমার এই একটা মস্ত অভিমান ছিল যে, নিজের বলতে কোনও বাড়িই তাঁর নেই। কলকাতায় থাকতেন দুটো খুপরি ঘর আর একচিলতে রান্নাঘরের বাসাবাড়িতে। তাকে বাড়ি বলা চলে না। যেখানেই হোক, তাঁর একটা নিজের বাড়ি চাই। কথাটা তিনি ঠাকুর্দাকে কখনও খুলে বলেছিলেন কি না কে জানে, তবে না-বললেও ঠাকুর্দা সেটা নিশ্চয় আঁচ করতে পারতেন। নিত্য অনটনের সংসারেও হয়তো সেই কারণেই তিনি ধীরে ধীরে সামান্য কিছু টাকা জমিয়ে যাচ্ছিলেন। সে-টাকায় কলকাতায় এক টুকরো জমি না-ই কেনা যাক, দূর গ্রামাঞ্চলে যায়। চাকরি থেকে অবসর নেবার আগে সেই টাকাটাই ঠাকুমার দাদার হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন, আর তা-ই দিয়েই ঠাকুমার বাপের বাড়ির গ্রাম তুজারপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে চান্দ্রায় আমাদের বসতবাড়ির জমি কেনা হয়েছিল।

বয়স একটু বাড়বার পরে এসব কথা বড়দের কাছে শুনেছি। যা শুনেছি, তাতে মনে হয় যে, ঠাকুমা সত্যিই বড় কঠিন ধাতের মহিলা ছিলেন। বাইরে তিনি হরেক রকমের যুক্তি দেখাতেন, কিন্তু মনের মধ্যে এই একটা জেদ তাঁর ছিলই যে, আগে তাঁর নিজের বলতে একটা বাড়ি হোক, একমাত্র তা হলেই তিনি সিমলে-পাড়ার বাসাবাড়ি ছেড়ে পা বাড়াবেন, তা নইলে নয়।

কর্মজীবনে আমার ঠাকুর্দা কখনও সাচ্ছল্যের মুখ দেখেননি। দশ টাকা মাস-মাইনেয় সেকালের এক নামজাদা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কনিষ্ঠ কর্মচারী হয়ে কাজে ঢুকেছিলেন। সেই কারবারে কবেই লালবাতি জ্বলেছে, তবে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট অর্থাৎ এখনকার বিধান সরণি দিয়ে আসতে যেতে দেওয়ালের গায়ে আঁটা তাদের শ্বেত পাথরের ফলকটা আজও দেখতে পাই। যখনই দেখি, সেই

মানুষটির কথা মনে পড়ে। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি? আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর অবসর-জীবন চলছে। নিভাঁজ পরিপাটি বিছানার উপরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বই কিংবা কাগজ পড়ছেন, চোখে চশমা, হাতে গড়গড়ার নল, এই ছবিটা কখনও ভোলা যাবে না। কথা বলতেন কম, কিন্তু যখন বলতেন, চোখে একটু কৌতুকের ছোঁয়া লাগত।

একদিনের কথা বলি। আমার বয়স তখন বছর ছয়েক। খেলাধুলোর শেষে, সন্ধের দিকে বাড়ি ফিরে, ভাল করে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর্দার খাটের পাশে একটা টুলে বসে রোজই তাঁকে কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে কিছু-না-কিছু অংশ আমাকে পড়ে শোনাতে হত। তো সেদিন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার অংশে সেই যেখানে অর্জুনের বর্ণনা রয়েছে, সেইখানটা পড়ছিলুম। পড়তে পড়তে এক সময় একটা কঠিন কথার মানে জিজ্ঞেস করব বলে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, ঠাকুর্দা যেন ভারী অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তাঁর চমক ভাঙল। পরক্ষণেই ঠাকুমাকে ডেকে বললেন, "খোকাকে কার মতো দেখতে হয়েছে বলো তো?"

ঠাকুমা বললেন, "বাপের মতো টকটকে রং তো পায়নি, একেবারে তোমার মতোই কেষ্ট ঠাকুরটি হয়েছে।"

মাথা নেড়ে ঠাকুর্দা বললেন, "রঙের কথা হচ্ছে না। ওর মুখের আদল ওর বাপের মতোও নয়, মায়ের মতোও নয়। একেবারে আমার বাবার মতো। তাই না?"

ঠাকুমা বললেন, "সে আর আমি কী করে বলব, তাঁকে তো আমি দেখিনি।"

"তাও তো বটে।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুর্দা বললেন, "পড়ো দাদা....দ্যাখো দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি, পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি....পড়ে যাও।"

ওই একদিনই মাত্র ঠাকুর্দার বিছানায় আমি উঠতে পেরেছিলুম। বিছানায় তাঁর পাশে বসিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "একটা কথা মনে রেখো দাদা। পড়াশুনো করবার কোনও সুযোগই আমি পাইনি; কিন্তু যেমন তোমার প্রপিতামহ, তেমন তোমার বাবা, দু'জনেই মস্ত পণ্ডিত। তাঁদের মুখ রাখা চাই।"

তা আর রাখতে পারলুম কোথায়। সেই ছেলেবেলাতেই কী যে কবিতার ভূতে ধরল, তাবৎ পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই আর রইল না। তো সে প্রসঙ্গ এখন থাক, যে-কথা বলছিলুম, এখন বরং সেটাই বলি। সেদিন রাত্তিরে আমাকে খাওয়াতে বসিয়ে বড়কাকিমা বললেন, "তোর তো বড় সাহস হয়েছে দেখছি, দুম করে তুই তোর দাদুর খাটে উঠে পড়লি! একটুও ভয় করল না?"

অবাক হয়ে বললুম, "ভয় করবে কেন, উনিই তো আমাকে ওঁর খাটে উঠতে বললেন।"

শুনে বড়কাকিমা বললেন, "তোর ভাগ্যিটা তা হলে ভালই বলতে হবে। উনি তো ওঁর বিছানা কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দেন না।"

তা সত্যিই দিতেন না। শুধু বিছানা নয়, জামাকাপড় থেকে শুরু করে পড়ার বই আর লেখার কাগজ-কলম, সব কিছুতেই তাঁর পরিচ্ছন্নতা ছিল প্রায় একটা বাতিকের মতো। বইয়ের ছাপায় সামান্য একটু গণ্ডগোল দেখলেই কুঁচকে যেত তাঁর ভুরু। নিজের মনেই বলতেন, 'ছি ছি, এমন করে কেউ বই ছাপে?'

নিজে একসময় কাজ করেছেন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে, হয়তো সেই জীবনের কথা তখন তাঁর মনে পড়ত। তা নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে আলোচনা করা তো দূরের ব্যাপার, সামান্য দু-একটা কথাও তাঁকে বলতে শুনিনি। কিন্তু অনুমান করতে পারি যে, পরিচ্ছন্নতার এই বোধ নিশ্চয়ই তখনও ছিল তাঁর। হয়তো কর্মনিষ্ঠাও ছিল আর-পাঁচজনের চেয়ে অনেক বেশি। তা যদি না-ই

থাকবে, তা হলে বাল্যবয়সে সেখানে যিনি সর্বকনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ঢুকেছিলেন, ক্রমে ক্রমে একদিন সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া হত না।

তাঁর মাইনে তখন তিরিশ টাকা। খুব কম? মনে রাখতে হবে, টাকাটা তখনও টাকাই ছিল, পয়সা হয়ে যায়নি। ১৯৪০ সালেও তিরিশ টাকা মাস-মাইনেয় অনেককে আমরা সংসার চালাতে দেখেছি। আর এ হল গিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার কথা, তিরিশ টাকার ক্রয়-ক্ষমতা তখন ছিল এখনকার অন্তত তিন-চার হাজার টাকার সমান। তা সেই টাকাতেও ঠাকুর্দা যে তখন সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যেতেন, তার কারণ আর কিছু নয়, তাঁর সংসারটাই ইতিমধ্যে অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল।

না, যাকে সাচ্ছল্য বলে, কর্মজীবনে ঠাকুর্দা সত্যিই তার মুখ কখনও দেখতে পাননি। তবে, সাচ্ছল্য না থাকলেও সুখ ছিল সেই জীবনে। একটা সুখের কারণ তাঁর বন্ধুভাগ্য। ঈশানচন্দ্র ঘোষ যে তাঁর আশৈশব বন্ধু, সে-কথা আগেই বলেছি। বন্ধুত্বের সূচনা যশোরে, সেখানে একই পাঠশালায় তাঁরা পড়তেন। শুধু তা-ই নয়, দু'জনেই তাঁরা পিতৃহীনও হয়েছিলেন একেবারে বাল্যবয়সেই। সমবয়সী এই দুই বালকের জীবনধারা অতঃপর দুই ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। পরবর্তী জীবনে লোকনাথ চক্রবর্তী হয়েছিলেন নিতান্তই একজন চাকরিজীবী মানুষ। সেক্ষেত্রে রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ একদিকে যেমন বিদ্বান শিক্ষাব্রতী হিসেবে প্রচুর প্রতিষ্ঠা পান, অন্যদিকে তেমন বিপুল বিত্তের অধিকারী হিসেবেও কলকাতার সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা কিছু কম ছিল না। অবস্থার পার্থক্য ঘটলে বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হয়। লোকনাথ ও ঈশানচন্দ্রের বন্ধুত্ব কিন্তু আমৃত্যু অটুট ছিল। দু'জনের অবস্থার পার্থক্য ছিল অসেতুসম্ভব। তা সত্ত্বেও সেই বন্ধুত্বের বন্ধন কখনও কিছুমাত্র শিথিল হয়নি।

ঠাকুর্দার আর-এক বন্ধু ছিলেন রায়বাহাদুর রসময় মিত্র। তিনি অবশ্য তাঁর বাল্যবন্ধু নন। ঠাকুর্দার মুখেই শুনেছি যে, রসময় মিত্রের সঙ্গে কলকাতার এক বইয়ের দোকানে তাঁর আলাপ হয়েছিল। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে দুই যুবকের খুব দেরি হয়নি। শিক্ষকতার সূত্রে রসময় মিত্রের জীবনের একটা অংশ কেটেছিল মফস্বলে। পরে তিনি কলকাতায় আসেন। প্রথমে হন হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার, পরে হিন্দু স্কুলের। ছুটির পরে গোলদিঘিতে এসে বসতেন। সন্ধের একটু বাদে সেখানে আসতেন লোকনাথ আর ঈশানচন্দ্রও। তিন বন্ধুর ওটাই ছিল গল্প করে সময় কাটাবার জায়গা।

ঠাকুর্দা ছিলেন সিমলে-পাড়ার বাসিন্দা। কলকাতায় এসে সেই যে তিনি সিমলে-পাড়ায় ঢুকেছিলেন, পরে যদিও এক-আধবার বাসা পালটেছেন, পাড়াটা আর পালটাননি। ওখানে থাকার প্রথম সুবিধে, কাজের জায়গাটা খুবই কাছে; আর দ্বিতীয় সুবিধে, হাঁটাপথে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই গোলদিঘিতে পৌঁছে যাওয়া যায়। এ ছাড়া ছিল আরও একটি আকর্ষণ, আমার ঠাকুমা যে কারণে ওই পাড়ার কথা তাঁর শেষ জীবনেও ভুলতে পারেননি। বালিকা-বধূ হয়ে ওই পাড়ায় যখন তিনি প্রথম আসেন, তখনই এক স্নেহময়ী মহিলা তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরী দেবী, নরেন্দ্রনাথ দত্তের মা। নরেন্দ্রনাথ তখনও স্বামী বিবেকানন্দ হননি। সিমলে-পাড়ার গিন্নিরা আমার ঠাকুমাকে বলতেন বাঙাল-বউ। ভুবনেশ্বরী দেবী যে সেই বারো বছরের বউটিকে খুব স্নেহ করতেন, ঠাকুমার কাছেই তা আমি শুনেছি।

বর্ষাকালের এক-একটা রাত্তিরে সে-সব দিনের গল্প শুনতুম। বৃষ্টির কামাই নেই। আকাশ থেকে সারাটা সময় একনাগাড়ে জল পড়ছে। কখনও টিপটিপ করে, কখনও মোটা ফোঁটায়। টিনের চালে তার বাজনা বেজে চলেছে, তার সঙ্গে চলছে ব্যাঙের কনসার্ট। বাইরে মিশকালো

অন্ধকার। বড়কাকিমা তাড়াতাড়ি হেঁশেলের পাট চুকিয়ে বড়ঘরে চলে এসেছেন। ঘরের এক কোণে জ্বলছে হ্যারিকেন। ঘুমোবার আগেও ওটা একেবারে নিবিয়ে দেওয়া হত না, শুধু ওর ফিতেটাকে একটু নামিয়ে রাখা হত। তো সেইভাবেই সেটাকে নামিয়ে রাখা হয়েছে। এদিকে খাটের উপরে গোল হয়ে বসে আছি ঠাকুমা, বড় কাকিমা আর আমি। ওদিকের খাটে ঠাকুর্দা। ঠাকুমার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। যে-সব দিনকে তাঁরা পিছনে ফেলে এসেছেন, কিন্তু যার স্মৃতি এখনও তাঁদের উন্মনা করে তোলে, সেইসব দিনের কথা।

ঠাকুর্দা তো একেই খুব কম কথা বলতেন, তাঁর উপরে আবার তাঁর গলাও বিশেষ উঁচুতে কখনও উঠত না। এমনভাবে কথাবার্তা বলতেন যে, অনেক সময়েই আমার মনে হত যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। আসলে ওটাই যে তাঁর পছন্দ ছিল, আমার সেজোকাকাকে বলা তাঁর একটা কথা থেকে সেটা পরে আমি বুঝতে পারি। কলকাতায় আমার সেজোকাকার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে, এক ছুটিতে তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঠাকুর্দার কথা হচ্ছিল। তা সেজোকাকার যা বক্তব্য, সেটা শুনে নিয়ে ঠাকুর্দা বলেন, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু এত উঁচু গলায় কথা বলবার দরকার কী? নাকি কী ভাবে কথা বলতে হয়, কলকাতার ইশকুল-কলেজে সেটাও আজকাল শেখানো হয় না?' আসলে আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ঘোরতর শহুরে মানুষ। ঠাকুমা কিন্তু ও-সব আর্বানিটির ধার ধারতেন না। নিজে তিনি খুবই উঁচু গলায় কথা বলতেন, তাঁর ছেলেপুলেদেরও কাউকে কখনও বিশেষ নিচু গলায় কথা বলতে শুনিনি। ঠাকুর্দা মাঝে-মাঝে এই নিয়ে একটু মৃদু রকমের আক্ষেপও করতেন। বলতেন, 'তুমি যেমনটি ছিলে, ঠিক তেমনটিই রয়ে গেলে, একটুও পালটালে না।'

তো যা বলছিলুম। বর্ষা-বাদলের রাত্তিরে কলকাতার গল্প ভারী জমে যেত। ঠাকুমা বলতেন, দুর্গাপুজো উপলক্ষে কবে কোথায় কার বাড়ি যাত্রা দেখতে গিয়ে কীভাবে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, পাড়ার গিন্নিরা কীভাবে তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন আম পুড়িয়ে শরবত বানানোর কৌশল, কিংবা বাঙাল-টানে কথা বলবার জন্যে ভাড়াটে বাড়ির অন্য সব বউ-ঝি প্রথম-প্রথম কীভাবে তাঁর পিছনে লাগত।

ঠাকুর্দা বলতেন তাঁর বন্ধুদের কথা। তাঁর গোলদিঘির আড্ডার কথা। সেই আমলের রাস্তাঘাটের কথা। হাট-বাজারের কথা। ঘোড়ায়-টানা ট্রামের কথা। তবে সব-কিছু ছাপিয়ে তাঁর দুই অকৃত্রিম বন্ধুর কথাই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠত। বলতেন, অমন বন্ধুদের সঙ্গে নিত্য যদি কিছুক্ষণ কথা বলা যায়, তা হলে আর আলাদা করে বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করবার কোনও দরকার হয় না।

বোঝা যেত, কলকাতার জীবনে তিনি সুখীই ছিলেন। সেই জীবনের মায়াপাশ ছিঁড়ে কেন যে তিনি হঠাৎ একদিন চান্দ্রার এই বনবাসে চলে এলেন, সেটাই শুধু বোঝা যেত না।

৪

আমার বাবা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক। সিটি কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানে দুই দিকপাল অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এটা নিয়ে তাঁর গৌরববোধ নেহাত কম ছিল না। দু'জনেই খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহের অবশ্য একটা বাড়তি কারণও ছিল। ঈশানচন্দ্র ঘোষের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। সেদিন থেকে বাবা ছিলেন তাঁর অনুজপ্রতিম। বাবার চর্চার প্রধান বিষয় ছিল শেক্সপিয়রের ভাষা। কলেজে শেক্সপিয়র পড়াতেন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব। তার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্যই সম্ভবত রাত্তিরে পড়তেন স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন। জনপ্রিয় এই বিলিতি পত্রিকাটি এখনও বার হয় কি না জানি না, তবে বিশ-তিরিশের দশকে নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানে নিয়মিত পাওয়া যেত। আমরা অবশ্য নিউ মার্কেট বলতুম না, বলতুম হগ সাহেবের বাজার।

নিজের যেটা চর্চার বিষয়, তার বাইরে বাবা একটু হালকা ধরনের লেখা পড়তে ভালবাসতেন। ফলে, জেরোম কে জেরোম আর ওডহাউস ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। গ্রামের বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসতুম। তখন আমার শোবার জায়গা হত বাবার পাশে। রাত একটা-দেড়টার আগে বাবা সাধারণত ঘুমোতেন না। তার অনেক আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। মাঝরাত্তিরে মাঝে-মাঝে হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। জেগে উঠে দেখতুম, ঘরে আলো জ্বলছে, আর বই পড়তে-পড়তে বাবা হো-হো করে হাসছেন। আমার বয়স তখন আর কত হবে, বছর চার-পাঁচ। ব্যাপারটা তাই ঠিক বুঝতে পারতুম না, কেমন যেন ভয়-ভয় করত। ছোটকাকাকে তাই একবার জিজ্ঞেসও করেছিলুম যে, ব্যাপার কী বলো তো, বই পড়তে পড়তে বাবা অমন হাসেন কেন? তাতে ছোটকাকাও খুব এক চোট হাসলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, ভয় পাস ন্যা, দাদা নিশ্চয়ই বার্টি উস্টার আর নয়তো মালিনারের কাণ্ডকারখানার গপ্পো পড়ছিলেন।

ব্যাপারটা তাতেও বিশেষ পরিষ্কার হল না। না-হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ দুটি যে ওডহাউসের দুই চরিত্র, আর এদের নিয়ে পরস্পরের একেবারে বিপরীত দুই গল্পমালায় যে তিনি দম-ফাটানো হাসির তুবড়ি ছেড়েছেন, তা তো আর তখন জানতুম না।

আমাদের কলকাতার যে বাসাবাড়িতে আমি প্রথম এসে উঠি, সেটি ছিল তালতলা পাড়ার দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে। উনিশ শতকে এমন দুর্গাচরণ অনেকেই জন্মেছিলেন, পরে যাঁরা স্বনামে বিখ্যাত হন। সেই কারণেই বোধহয় রাস্তাটির নামকরণের সময়ে দুর্গাচরণের সঙ্গে 'ডাক্তার' কথাটিও যোগ করবার দরকার হয়েছিল। সেকালের কলকাতার ইনি একজন নামজাদা ডাক্তার। শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকদের মধ্যে জ্যাকসন-সাহেবকে তখন ধন্বন্তরি বলে গণ্য করা হত। দুর্গাচরণ সেক্ষেত্রে

যে নেটিভ-জ্যাকসন বলে আখ্যাত হতেন, তাতে বোঝা যায়, রোগ নিরাময়ে বাঙালি ডাক্তারবাবুটির খ্যাতিও কিছু কম ছিল না। তাঁর আর-একটি পরিচয়ের কথা অবশ্য আগেই বলা উচিত ছিল। দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুজ্যের তিনি পিতৃদেব। কর্পোরেশন স্ট্রিটের নাম এখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড। তারই প্রায় পূর্বপ্রান্তে ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে সুরেন্দ্রনাথের বাবার নামে এই রাস্তা। আসতে যেতে রাস্তাটি প্রায়ই দেখতে পাই। যখনই দেখি, আমার একেবারে ছেলেবেলার সেই বাসাবাড়িটার কথা মনে পড়ে যায়।

যেমন ছিলেন ডাকসাইটে ছাত্র, তেমন আবার খেলাধুলোতেও বাবা ছিলেন দারুণ উৎসাহী। ছাত্রাবস্থার শেষের দিকেই তিনি ক্লাব ফুটবল খেলতে শুরু করেন। খেলতেন মোহনবাগানে। এ হল এই শতকের দ্বিতীয় দশকের কথা। বাঙালি ফুটবলাররা তখনও বুট পরে খেলতে বিশেষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি, নিতান্ত এক-আধজন ছাড়া বাদবাকি সকলেই খালি পায়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। বাবা কিন্তু বুট না-পরে মাঠে নামতেন না। অধ্যাপক হবার পরেও খেলাটা দু'চার বছর চালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে, দু'দিক কিছুতেই বজায় রাখা সম্ভব নয়, খেলাটাই তখন ছাড়তে হল। ময়দানের মায়াটা অবশ্য কোনওদিনই কাটাতে পারেননি। যতদিন না অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন তিনি ময়দানে যেতেনই। তবে খেলতে নয়। হয় খেলা দেখতে, আর নয়তো খেলাতে। ক্যালকাটা রেফারিজ' অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। খেলা পরিচালনা করবার জন্য নিয়মিত তাঁর ডাক পড়ত। ওই রেফারির কাজ করবার সময়েই একবার আচমকা একটা বল লেগে তাঁর বাঁ কানের পর্দা ফেটে যায়। সেই থেকে আর বাঁ কানে কিছু শুনতে পেতেন না।

বাবা যখন মোহনবাগানে খেলতেন, আমার তো প্রশ্নই উঠছে না, দিদিরও তখন জন্ম হয়নি। তবে তাঁর খেলোয়াড় জীবনের বুটজোড়াকে মা খুব যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। সে-বুট আজকালকার বুটের মতো হালকা নয়, ভীষণ ভারী। যেমন শক্ত তার চামড়া, তেমন পুরু তার সোল। অমন ওজনদার বুট বোধহয় এখনকার কনস্টেবলরাও পরতে চাইবে না। চামড়া যাতে একটু নরম হয়, আমি আর দিদি তার জন্যে মাঝে-মাঝে তাতে দুধের সর মাখিয়ে খুব ডলাই-মলাই করতুম। সেই বুটজোড়া অনেক দিন আমাদের বাড়িতে ছিল ; পরে যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে।

একটা কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার। সেটা এই যে, ক্লাবের হয়ে ময়দানে গিয়ে খেলতে নামাটা বন্ধ হয়েছিল বটে, তবে নানান উপলক্ষে তাঁর কলেজ থেকে তো প্রীতি-ম্যাচের ব্যবস্থা হত, তাতে আমার পিতৃদেব ঠিকই যোগ দিতেন। ভাগ্যিস দিতেন, নয়তো তিনি যে কেমন খেলোয়াড়, তা জানবার কোনও সুযোগই আমি পেতুম না। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত এইরকম বেশ কিছু ক্রিকেট আর ফুটবল ম্যাচে তাঁকে নামতে দেখেছি। বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, সেকালের বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী গিরিশচন্দ্র বসুর নাম তো সবাই জানেন। তাঁর বাড়ি ছিল এন্টালি পাড়ায়। তাঁর কম্পাউণ্ডের মধ্যে মূল বাড়ি আর গেটের মাঝ-বরাবর যে একফালি জমি ছিল, শীতকালে ফি-রবিবার সেখানেও ক্রিকেট খেলা হত। জায়গা কম বলে সে-খেলার নিয়মকানুনও ছিল বিচিত্র। একটা নিয়মের কথা বলি। ব্যাট করতে গিয়ে কেউ যদি কম্পাউণ্ড-ওয়ালের বাইরে বল পাঠাতেন, তো তাঁর হিসেব থেকে চার-রান কেটে নেওয়া হত। বাড়ির জানলার কাচ ভাঙলে তার জরিমানা ছিল দশ-রান।

কাচ যে ভাঙত না তাও নয়। একবারের কথা বলি। বাড়ির দোতলার ঘেরা-বারান্দার সামনের দিকটায় ছিল রং-বেরঙের কাচের জাফরি। বিকেলবেলায় বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র সেখানে পায়চারি করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে বাবার ব্যাট থেকে একটা বল ছুটে গিয়ে সেই কাচে লাগে। কাচ তো ঝনঝন

করে ভেঙে পড়ল। তার পরক্ষণেই দেখি, বৃদ্ধ মানুষটি সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বলছেন, "ব্যাপার কী বলো তো, তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে নাকি?" সে একেবারে লজ্জার একশেষ।

ও-বাড়ির খেলায় বাবাকে নিয়ে প্রতিপক্ষের কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। তাঁরা খুব ভালই জানতেন যে, প্রোফেসর চক্রবর্তীকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। তাঁকে আউট হয়তো সহজে করা যাবে না, তবে কিনা যত রানই তিনি করুন না কেন, জরিমানা হিসেবে তার একটা মস্ত অংশই তাঁরা কেটে নিতে পারবেন। তা কেটে নেওয়া হতও। বাবা একবার ব্যাট করতে নেমে পরপর চারটে ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে পঞ্চম বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যান। কিন্তু তাঁর মোট রান দাঁড়ায় মাইনাস ষোলো। চারবারই তাঁর বল কম্পাউন্ড-ওয়াল টপকে বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল।

বাবাকে আমি যখন খেলতে দেখেছি, তখন তাঁর যা বয়স, সেই বয়সে পৌঁছবার অনেক আগেই আমাদের ক্রিকেটার আর ফুটবলারদের খেলোয়াড়-জীবন শেষ হয়ে যায়। প্রীতি ম্যাচে তাঁদের কেউ-কেউ তখনও যোগ দেন বটে, কিন্তু সে যেন নেহাতই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাঠে থাকেন না। বাবা সেক্ষেত্রে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বয়সেও অক্লান্ত উদ্যমে ও-দুটো খেলা চালিয়ে গিয়েছেন। খেলতেন একেবারে আদ্যন্ত। খেলা যা দেখেছি, তাতে বলতে পারি, ব্যাট করতেন একটু ঝুঁকি নিয়ে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে; হুক আর ড্রাইভ ছিল তাঁর প্রিয় মার; ডিফেন্স তেমন আঁটো ছিল না। অন্য দিকে, লাইন আর লেংথ ঠিক বেখে, জোরের উপরে বলটা করতেন দারুণ ভাল। ফুটবলের মাঠে তাঁর বাঁধা পজিশন ছিল রাইট ব্যাক। বল-ট্র্যাপিংয়ে যে যারপরনাই দক্ষ ছিলেন, তা নয়, তবে তাঁর পা থেকে বল কাড়তে যে কেউই বিশেষ সাহস পেতেন না, এটা লক্ষ করেছি। তাঁর কিক যে খুবই জোরালো ছিল, তাও মনে পড়ে। নিজের দলের ফরওয়ার্ড-খেলোয়াড়দের কেউ বিপক্ষের সীমানায় কিছুটা ফাঁকা জায়গায় রয়েছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতেন, তারপরে প্রায় ঠিকানা লিখে দিয়ে বলটা পাঠিয়ে দিতেন তাঁর কাছে।

ইনডোর গেমসের মধ্যে দুটি খেলা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। পাশা আর ব্রিজ। দেশের বাড়িতে পাশার আসর বসত আর কলকাতার বাড়িতে ব্রিজের। কাছারি-ঘরে পাশাখেলা চলছে, ভিতর-বাড়িতে এসে পৌঁছচ্ছে তার হল্লার রেশ, আর মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে বাবার গলা: কচ্ছয় বারো। শব্দটা এখনও কানে লেগে আছে। কলকাতার বাসাবাড়িতে, মাসের মধ্যে অন্তত একটা রবিবাবে ব্রিজের আসর বসতই। কনট্রাক্ট নয়, অকশন ব্রিজ। আমরা ছোটরা ও-খেলার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারতুম না। একটু পুরনো হলেই যে-সব তাসের প্যাকেট বড়দের আসরে বাতিল হত, তার একটা পেয়ে গেলে অবশ্য ধন্য হয়ে যেতুম। সেটা দিয়ে আমি আর দিদি তখন আমাদের খেলা খেলতে বসতুম। রং-মিলতির খেলা। কেউ-কেউ বলত গাধা পেটাপিটি।

বাবা খুব সুপুরুষ ছিলেন। আমার ঠাকুর্দা যে দেখতে বিশেষ সুন্দর ছিলেন, তা নয়, তবে ঠাকুমা ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। দেখেই বোঝা যেত যে, বাবা তাঁর মায়ের চেহাবা পেয়েছেন। তবে কিনা বাবার চেহারার যে সৌন্দর্য, তাতে লালিত্যের ছাপ ততটা ছিল না, যতটা ছিল ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমত্তার ছাপ। আমি তো ছ'ফুট লম্বা মানুষ, তাতেই লোকে আমাকে ঢ্যাঙা বলে। বাবা সেক্ষেত্রে মাথায় আমার চেয়ে আরও তা প্রায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা ছিলেন। তবু যে ওই দৈর্ঘ্য আদৌ বিসদৃশ ঠেকত না, তার কারণ তাঁর প্রস্থটাও ছিল মানানসই। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে ব্যায়ামটাও ঠিকমতো চালিয়ে গিয়েছিলেন, তাই স্বাস্থ্যটাও ছিল একেবারে লোহায় পেটা। তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ বছর, তখনও তাঁকে নিয়মিত মুগুর ভাঁজতে দেখেছি। ছোটখাটো

কোনও অসুখে কখনও তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথচ, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে সেই যে তিনি শয্যা নিলেন, তার পরে আর কখনও তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরাটা পর্যন্ত করতে পারেননি। আমার দিদির তখনও বিয়ে হয়নি। তাঁর বয়স তখন চোদ্দো বছর, আমার বয়স এগারো, আমার ছোট ভাইয়ের বয়স পাঁচ আর ছোটবোনের বয়স নেহাতই এক বছর। আমাদের সংসারে তখন বাবাই তো ছিলেন একমাত্র রোজগেরে মানুষ। ফলে সংসারটা একেবারে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

পাঁচ-ছ বছর বয়স পর্যন্ত যে ছেলেবেলা, আমার ক্ষেত্রে সেটা গ্রাম আর শহরের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের ভাগটাই বেশি, শহরের ভাগ কম। অর্থাৎ গাঁয়েই থাকতুম বটে, তবে মাঝেমধ্যে যে কলকাতায় আসতুম না, তা নয়। এসে অবশ্য খুব বেশিদিন থাকা হত না, বাবা মা আর দিদির কাছে কয়েকটা দিন কাটাবার পরেই ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার জন্যে বড় অস্থির অস্থির লাগত, তখন আবার কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে গ্রামের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হত। বললুম বটে, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার জন্যে মন কেমন করত, সেটা যে মিথ্যে কথা তাও নয়, খুবই সত্যি, তবে কিনা গাঁয়ের বাড়িতে আমার যে স্বাধীনতা ছিল, কলকাতায় তো সেটা ছিল না, মন-কেমন করার সেটাও একটা মস্ত কারণ। এই ব্যাপারটা বাবা ঠিকই বুঝতে পারতেন। তাই, গাঁয়ের বাড়িতে পড়ে থাকলে যে আমি লেখাপড়া না-শিখে একেবারে গোল্লায় যাব, মা এই কথাটা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বাবা বলতেন, 'সে আর কী করা যাবে, মন যখন টিকছে না, তখন ওকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।'

আমার মায়ের কথায় যে যুক্তি ছিল না, তা-ই বা কী করে বলি। একেবারে অজ-পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়, আমাদের চান্দ্রা গ্রাম তো সত্যি তা-ই। সেখানে একটা মাইনর ইস্কুল পর্যন্ত ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল একটা পাঠশালা। সেটা আবার বেশির ভাগ সময়েই বন্ধ থাকত। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা, যে পণ্ডিতমশাইটি সেখানে তালের পাতায় অ-আ-ক-খ লিখতে আর শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ করতে শেখাতেন, তিনি ছিলেন প্রতিবন্ধী। শৈশবেই সম্ভবত পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁর পা দুটি তার ফলে শুকিয়ে যায়। হামাগুড়ি দিয়ে তিনি পাঠশালায় আসতেন। কণ্ঠস্বরও ছিল বিকৃত। সরু আর মোটা দু'রকম গলায় তিনি কথা বলতেন, কিন্তু কী যে বলতেন, সবসময়ে তা ঠিক বোঝাও যেত না। তো তাঁর কাছে যেটুকু শেখার, সেটুকু না হয় শিখে নেওয়া গেল। তারপরে কী হবে? পাঠশালার পোড়োরা সেখান থেকে কোথায় যাবে?

সকলকে নিয়ে এই প্রশ্ন অবশ্য উঠত না। সত্যি বলতে কী, অধিকাংশ পোড়োর ছাত্রজীবন এই পাঠশালাতেই খতম হয়ে যেত। যাদের হত না, তাদের যেতে হত কাইচালে কি আলগিতে। এ দুটি গ্রামের প্রথমটি আমাদের গ্রাম থেকে দু'মাইল উত্তরে, আর দ্বিতীয়টি দু'মাইল দক্ষিণে। সেখানে মাইনর ইস্কুল আছে। তা মাঠ যখন শুকনো, উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তখন নিত্য না হয় মাইল দুয়েক পথ হেঁটেই পাড়ি দেওয়া গেল। ছত্রেণ ছাত্রঃ, এই বাক্যটি তো আর মিছিমিছি তৈরি হয়নি, চোত-বোশেখের রোদ্দুর থেকে চাঁদি বাঁচাবার জন্যে ছাতা মাথায় যারা মাঠ ভাঙত, তারা যে ছাত্রই বটে, লক্ষণ দেখে সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হত না। সমস্যা দেখা দিত বর্ষাকালে। মাঠে তখন জল। যাদের নৌকো নেই, তখন তাদের নির্ভর করতে হত অন্যের নৌকোর উপরে। দিনের পর দিন যে তখন ইস্কুল কামাই করে অনেককেই বাড়িতে বসে থাকতে হত না, তাও নয়।

ঠিক এই কারণেই আমার ঠাকুমাও তখন আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে বড় ব্যস্ত

হয়ে উঠতেন। ঠাকুর্দা কিন্তু নির্বিকার। তাঁর সেই সময়কার একটা কথা আমি এখনও ভুলিনি। বর্ষাকাল। রাত হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ। বড় ঘরে খাটের উপরে বসে গল্প হচ্ছিল। এ-কথা সে-কথার পরে ঠাকুমা বললেন, "খোকাকে এবারে কলকাতায় ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হয়। তুমি আর ওকে আটকে রেখো না। এতে ওর ক্ষতি হচ্ছে।"

কথাটা ঠাকুর্দার উদ্দেশে বলা। তিনি তখন তামাক খাচ্ছিলেন। ঠাকুমার কথা শুনে মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে বললেন, "কী ক্ষতি হচ্ছে?"

"বাঃ, কী ক্ষতি হচ্ছে, তাও বুঝিয়ে বলতে হবে? এখানে তো ও কিছুই শিখতে পারছে না। কলকাতায় গেলে ওর বাপ ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে পারত। সেখানে ও কত কিছু শিখতে পারত।"

শুনে ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখো, ওর বয়স এখনও ছ'বছর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এখনই ও সাঁতার কাটতে পারে, গাছে উঠতে পারে, একটা টাকা দিয়ে হাটে পাঠালে জিনিসপত্র কিনে তারপর বাড়িতে ফিরে বাকি-পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দিতে পাবে, কখন কোন ফসলের বীজ বুনতে হয় আর কখন কোন ফসল কেটে ঘরে তুলতে হয় তাও বোধহয় ও কারও চেয়ে কিছু কম জানে না, তার উপরে আবার শুভঙ্করের আর্যা আর খনাব বচন যে মুখস্থ বলতে পারে, সে-কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। তা কলকাতার কোন ইস্কুল এই বযসে এর চেয়ে ওকে বেশি শেখাতে পারত?"

এর আব কী উত্তর হবে? ঠাকুমা একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

ঠাকুর্দার অমন মোক্ষম যুক্তিও অবশ্য শেষ পর্যন্ত টেকেনি। কী যে হল, নিজেই একদিন বলে বসলেন যে, ঠিক আছে, ও কলকাতাতে যাক, ইংরেজিটাও তো শিখতে হবে। ফলে, পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসি সেই বছরেই। এ হল ১৯৩০ সালের কথা। পুজোর ছুটিতে বাবা দেশে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আসি। পরের বছরের গোড়ায় আমাকে বঙ্গবাসী স্কুলের ক্লাস-টুতে ভর্তি করে দেওয়া হল। তখন আমার ছয় পূর্ণ হয়ে সাত চলছে।

কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি করবার চেষ্টা অবশ্য এর আগেও একবার হয়েছিল। তখন আমার বয়স বোধহয় চারের বেশি নয়। দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় এসেছিলুম, তা ছোটকাকা একদিন আমাকে খুব আদর-টাদর করে বললেন, "চ যাই, কাছের থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।" বেড়াবার নাম শুনে আমি তো একপায়ে খাড়া। তখন কি আর জানি যে, ছল করে আমাকে শেকল পরাবার ব্যবস্থা হচ্ছে! তখনও আমরা তালতলা-পাড়াতেই থাকি, তবে দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে নয়, ডাক্তার লেনে। তো সেই বাড়ি থেকে বেরোবার মিনিট পাঁচ-সাত বাদেই দেখি আর-একটা বাড়িতে এনে আমাকে ঢোকানো হল। সামনের ঘরে এক ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। ছোটকাকা তাঁকে বললেন, "এই এরই কথা বলছিলুম। এখন দেখুন একে আপনারা বাগ মানাতে পারেন কি না।"

ভদ্রমহিলা তাঁর চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে বললেন, "এসো খোকা, আমার সঙ্গে এসো।" তো যে-ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে ঢুকে তো আমি হতভম্ব। সার-সার বেঞ্চিতে বসে একগাদা মেয়ে সেখানে চেঁচিয়ে নামতা মুখস্থ করছিল। তিন এক্কে তিন, তিন দুগুণে ছয়, তিন-তিরিক্কে নয়, তিন-চারে বারো....। দেখলুম, আমার দিদিও তাদের মধ্যে রয়েছে।

পিছন ফিরে ছোটকাকাকে দেখতে পেলুম না। পঞ্চম জর্জ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিস্ট্রেসের হাতে সেই যে আমাকে সঁপে দিলেন, তার পরেই তিনি ভ্যানিশ। বেড়াতে যাবার নাম করে

যে আমাকে ইস্কুলে এনে ভর্তি করা হয়েছে, এটা বুঝবামাত্র আমি হেডমিস্ট্রেসের হাত থেকে একটা হ্যাঁচকা টানে নিজের হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে আসি। গেটে দরোয়ান বসে ছিল। সেও যে আমাকে আটকাবার চেষ্টা করেনি, তা নয়। কিন্তু পারেনি। তার হাতে একটা জব্বর রকমের কামড় বসিয়ে দিয়ে রাস্তায় পড়েই আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাই। দরোয়ানও আমার পিছন-পিছন ছুটে এসেছিল, ধরতে পারলে আমাকে নিশ্চয় আড়ং-ধোলাই দিয়ে ছাড়ত, কিন্তু পুব-বাংলার যে বাচ্চা ছেলেটা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়য়, তার সঙ্গে সে পারবে কেন, খানিকটা পথ ছুটেই সে ফিরে যায়।

আসবার সময়েই পথটা চিনে রেখেছিলুম। বাড়িতে ফিরতে তাই অসুবিধে হয়নি। দরজা খুলে আমাকে দেখে মা তো অবাক। খানিকক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ফিরে এলি যে?"

গোঁজ হয়ে বললুম, "ও ইস্কুলে আমি পড়ব না!"

"কেন?"

"ওটা মেয়েদের ইস্কুল।"

মা খুব বকেছিলেন। কিন্তু সব শুনে বাবা একটুও বকেননি। হো হো করে খুব খানিকটা হেসেছিলেন শুধু। তারপর বলেছিলেন, "আসলে ওর কলকাতায় থাকতে ভাল লাগে না। দেশের বাড়িতেই যখন থাকতে চায়, তখন সেখানেই থাক না, তাতে তোমাদের এত আপত্তি কেন? সেখানে ওর ঠাকুর্দা রয়েছেন, ঠাকুমা রয়েছেন, তার চাইতে ভাল জায়গা ও আর কোথায় পাবে?"

"কিন্তু ও তো হারিয়ে যেতে পারত।"

বাবা তাতেও হেসে বলেছিলেন, "পাগল নাকি? ও কক্ষনো হারিয়ে যাবে না।"

৫

দেশের বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এলেও যে এখানে আমার মন বসত না, খালিই ছটকে ছটকে পালাবার ফিকির খুঁজতুম, মা তাতে খুব রাগ করতেন। মাঝে-মধ্যে দু'চার ঘা যে বসিয়ে দিতেন না, তাও নয়। এই নিয়ে খুব অশান্তি হত। মাকে দোষ দিতে পারি না। তাঁর ভয় হত যে, যেখানে একটা মাইনর ইস্কুল পর্যন্ত নেই, সেখানে যদি পড়ে থাকি তো নির্ঘাত আমি আকাট একটি মুখ্যু হয়ে থাকব। প্রায়ই বলতেন, 'তোর কপালে অনেক দুখ্যু আছে, সে-দুখ্যু কেউ খণ্ডাতে পারবে না!' জলে ডুবে কি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মারা পড়ব, এমন ভয়ও তাঁর ছিল নিশ্চয়। তা ছাড়া ছিল কলেরার ভয়, সাপের ভয়। নিজে রয়েছেন কলকাতায়, অথচ ছেলে রয়েছে জংলা জায়গায়, মা তাই বড় ভয়ে-ভয়ে থাকতেন। বেয়াড়া ছেলের উপরে রাগ তো তাঁর হতেই পারে।

বাবাকে কিন্তু এই নিয়ে কখনও রাগারাগি করতে দেখিনি। তাঁর সাফ কথা, ছেলে যখন তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে থাকতে চাইছে, তখন সেখানেই থাক, এ নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট করবার কোনও মানেই হয় না। মা একটু আড়ালে যাবার পরে সেইসময়ে একদিন বাপ-ব্যাটায় যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা এইরকম:

"হ্যাঁরে, তুই বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে পারিস?"

"হ্যাঁ বাবা, শুধু বড়শি কেন, পলো আর ওচা দিয়েও পারি!"

"বাঃ, বাঃ! এও তো খুব ভাল কথা। তা তুই গাছে উঠতে পারিস তো?"

"পারি বাবা। আম গাছে উঠতে পারি, পেয়ারা গাছে উঠতে পারি। গাছে উঠে শালিখের ছানাও পেড়ে আনতে পারি।"

"বাঃ, বাঃ! তা তুই সাঁতার কাটতে পারিস তো?"

"তাও পারি বাবা। পুকুরের একদিক থেকে আর-এক দিকে চলে যেতে পারি।"

"বলিস কী রে, এ তো খুবই ভাল কথা। তবে আর ভাবনা কিসের, দু'চার দিন একটু কষ্ট করে এখানে থাক, তারপর যেই দেখব কেউ-ওদিকে যাচ্ছে, অমনি তার সঙ্গে তোকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।"

বাবা যে কেন রাগ করতেন না, বরং গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার ব্যাপারে প্রকাশ্যে না হলেও আড়ালে-আবডালে আমাকে উৎসাহই দিতেন, তখন সেটা বোঝা সম্ভব ছিল না। পরে বুঝতে পারি। আসল কথা, আমার বাবারও ছেলেবেলা গ্রামে কেটেছিল। পাঁচ বছর বয়সে সেই যে তিনি কলকাতা থেকে তাঁর মামাবাড়িতে চলে যান, তারপরে আর পুরো পনরো বছরের মধ্যে একবারও কলকাতায় আসেননি। আমার বিশ্বাস, সেই পনরোটা বছর তাঁর খুব সুখে কেটেছিল।

হয়তো সেইজন্যেই তিনি চাইতেন যে, যেমন তাঁর নিজের ছেলেবেলাটা গ্রামে কেটেছে, আমার ছেলেবেলাটাও তেমন গ্রামেই কাটুক।

বাবার এই মামাবাড়িতে মানুষ হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। সেটা বলি।

বাপের বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে আসবার পরে ঠাকুমা যে আর তাঁর পিত্রালয়ে ফিরে যাননি, আগেই সে-কথা বলা হয়েছে। ঠাকুমার বাবার তাই নিয়ে খুব দুঃখ ছিল। তাঁর তরফে অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। তিনি বকাবকি করতেন, রাগ করতেন, যৎপরোনাস্তি সাধ্য সাধনা করতেন, কিন্তু ঠাকুমার তবু সেই এক কথা: আমি যদি যাই, তো তোমার জামাইকে এখানে কে দেখবে? তো দুর্জয় রকমের জেদি মেয়েটিকে কিছুতেই যখন টলানো গেল না, ঠাকুমার বাবা তখন একটা প্যাঁচ কষে বসলেন। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তুই যখন নিতান্তই যাবি না, তখন আমার দাদাভাই জিতুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। তোর মা তো এখনও নাতি-নাতনির মুখ দেখেননি, মরবার আগে নাতির মুখটা অন্তত দেখুন।"

এ যখনকার কথা, আমার ঠাকুমা তখন দুটি সন্তানের জননী। বড়টি কন্যা, তার বয়স তখন আট বছর। ছোটটি পুত্র, তার বয়স তখন পাঁচ চলছে। ঠাকুমার বাবা নিশ্চয় ভেবেছিলেন যে, প্যাঁচটা একেবারে মোক্ষম। ছেলের টানে সকন্যা জননীও এবারে পিত্রালয়ে যেতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে জামাতা বাবাজীবনও যদি যান, তবে তো সোনায় সোহাগা। ঠাকুমা তবু যাননি। শুধু বলেছিলেন, "ঠিক আছে, জিতুকে যখন নিতে চাইছ, তখন নিয়ে যাও। কিন্তু আমি তো যাচ্ছি না, বড্ড দুরন্ত ছেলে, একটু শাসনে রাখা দরকার। খুব যদি দস্যিপনা করে তো তাড়াতাড়ি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো।"

জিতু আমার বাবার ডাক-নাম। সেই যে তিনি তুজারপুরে তাঁর মামাবাড়িতে চলে গেলেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে আর তিনি মা-বাবার কাছে ফেরেননি। বড় হয়ে এ-সব কথা আমি ঠাকুমার কাছে শুনেছি। তাঁর ছেলেবেলার দুরন্তপনার কিছু গল্প যেমন ঠাকুমার কাছে শোনা, তেমন আবার কিছু শুনেছি বাবার ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছে। তাঁদের বেশিরভাগই তাঁর মামাবাড়ি তুজারপুরের বন্ধু। কেউ-কেউ আবাব ভাঙা স্কুলে তাঁর সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন।

এই ভাঙা স্কুলে আমার বাবাকে নিয়ে একটা খুব চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। সে-কথায় আসবার আগে বরং তাঁর সম্পর্কে আর দু'একটা কথা বলে নিই। মানুষটি যে কেমন ছিলেন, সেটা বুঝতে তাতে সুবিধে হবে।

তুজারপুবের সুরেশ সেহানবিশ মশাই ছিলেন বাবার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে তিনি খুব কাছেব থেকে দেখেছেন। আমরা তাঁকে জ্যাঠামশাই বলতুম। তো বাবার সেই সময়কার দুরন্তপনার কথা তাঁর মনে আছে কি না, দুর্গাপূজার সময়ে একবার তুজারপুরে গিয়ে তাঁকে এই প্রশ্ন করতে তিনি একেবাবে অবাক হযে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলেন, "থাকবে না? খুব মনে আছে। তোর বাবা একটা ডাকাত ছিল। একেবারে আস্ত একটা ডাকাত। ওর জ্বালায় তো গাছের একটা ফল পর্যন্ত রাখা যেত না। আম বলিস, জাম বলিস, কুল বলিস আর কলা বলিস, গাছের পর গাছ একেবারে সাবাড় হয়ে যেত। ফলে কী হত জানিস, ওর সঙ্গে একটা রফা না করে কারও উপায় থাকত না। এই যেমন ধর আম-জাম যা-ই হোক, তার একটা ভাগ ওকে দিতে হবে।"

পরে এই একই কথা আরও অনেকের কাছে শুনেছি। জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ নিয়ে কেউ কিছু বলত না? তাতে একজন বললেন, "কে কী বলবে! এ তো তবু ফলের উপর দিয়ে যাচ্ছে। কিছু বলতে গেলে তো গাছটা সুদ্ধু কাটা পড়বার ভয়!"

আর-একজন বললেন, "কার কাছে বলবে? ওর মামা নকুলেশ্বর সমাদ্দারের কাছে? ওরে বাবা রে বাবা, ভাগ্নে বলতে তো তিনি অজ্ঞান! জিতু যে কোনও দোষ করতে পারে, এ তো তাঁকে বিশ্বাসই করানো যেত না।"

শেষ কথাটা অবশ্য সুরেশ-জ্যাঠামশাই-ই বলেছিলেন। "কী জানিস, লোকে যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত না, তা নয়। তবে কিনা তোর বাবাকে সবাই ভালও বাসত খুব। যে-ছেলে ফলপাকুড় সাবাড় করে দিচ্ছে, অন্যের আপদে-বিপদে সে-ই যে আবার সবচেয়ে আগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাও তো সবাই দেখতে পেত। তা হলে আর ভাল না-বেসে উপায় কী। তো এখন বল্‌ যে, তার নামে কে নালিশ করতে যাবে?"

"ছেলেবেলাতেও বাবা শুনেছি খুব শক্তিমান ছিলেন। ঠিক?"

"তা তো ছিলই। তবে কিনা শক্তির চেয়ে সাহস ছিল আরও বেশি।" সুবেশ-জ্যাঠামশাই বললেন, "অমন ডাকাবুকো ছেলে তখন দুটি দেখা যেত না। অন্যদিকে আবার ওর মনটা ছিল বড্ড নরম। একবার কী হয়েছিল জানিস?"

"কী হয়েছিল?"

"গাঁয়ের একটা বাড়িতে সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছিল। গ্রীষ্মকাল। গরমে ঘুম আসে না। বাড়ির লোকেরা জেগেই ছিল। চোর ঢুকেছে বুঝতে পেরে তারা চেঁচিয়ে ওঠে। চোরও তৎক্ষণাৎ ছুট লাগিয়ে গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। আমরা ভাবলুম, বাঁচা গেছে, ওর পিছনে ছুটে আর কী হবে। জিতু সে-কথা শুনল না, চোরকে যদি ছেড়ে দিই তো তার সাহস নাকি বেড়ে যাবে, সেও তাই দৌড়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। তো হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরেও এল খানিক বাদে। আমরা বললুম, 'কী, ধরতে পারলে না তো?' তাতে জিতু বলল, 'পাবব না কেন, পেরেছিলুম।' বলে একটা সিঁদকাটি আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'এটা ওব কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।' কে একজন তাতে বললেন,'ওটা দিয়ে কী হবে, চোরটাকে ধরে আনলি না কেন?' শুনে জিতু বলল, 'কী করে আনব, লোকটা কেঁদে ফেলল যে!' তো এই হচ্ছে ব্যাপার।"

বাবাকে সেই যে তুজারপুরে নিয়ে এলেন, তাঁর দাদামশাই তার পরে আর খুব বেশিদিন বাঁচেননি। দিদিমাও ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ফলে আমার বাবাকে মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব পড়ে নকুলেশ্বর সমাদ্দারেব উপরে। আমার ঠাকুমার তিনি একমাত্র ভাই। ভাগ্নেটিকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পাঠাননি। শুনেছি নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়েও এই ভাগ্নেটিকে তিনি অনেক বেশি ভালবাসতেন। বাবারও কলকাতায় ফিরবার ইচ্ছে ছিল না বিন্দুমাত্র। কেনই বা থাকবে। দৌরাত্ম্য করে বেড়াবার যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা তিনি তুজারপুরে পে যে গিয়েছিলেন, কলকাতায় ফিরলেই যে তা হারাতে হবে, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। ঠাকুর্দা যে অতি কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন, সে তো আমি নিজেই দেখেছি। তিনি মানুষ হয়েছেন দুঃখেব ইস্কুলে। দুঃখকষ্ট তাঁর ধাতটাকে বড় কঠিন করে তুলেছিল। বাক্যে কি ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি তিনি বরদাস্ত করতেন না। ঠাকুর্দা যখন মারা যান, বাবার বয়েস তখন চল্লিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু ওই বয়সেও তাঁকে মাথা নিচু করে ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

তো যা বলছিলুম। মামাও ছাড়লেন না, বাবাও কলকাতায় ফিরলেন না। তুজারপুরেই তিনি রয়ে গেলেন। যেমন মামা, তেমনি মামি, দুজনেরই আদর ছিল মাত্রাছাড়া। তার নিট ফল দাঁড়াল এই যে, অক্ষর-পরিচয় হয়তো হয়ে থাকবে, কিন্তু যাকে বিদ্যাভ্যাসের পর্ব বলা হয়, আমার পিতৃদেবের ক্ষেত্রে সেটা দশ বছরের আগে শুরুই হতে পারেনি। ওই বয়সে তিনি যে এসে

ভাঙ্গা স্কুলের ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হলেন, তার অবশ্য দ্বিতীয় একটা কারণ ছিল।

আমাদের ওদিকে ভাঙ্গাই হল একমাত্র গঞ্জ। সেখানে থানা আছে, মুন্সেফ-কোর্ট আছে, সাব-রেজিস্টারি আপিস আছে, বড় একটা ডাকঘর আছে, সার্কল অফিসারের বাংলো আছে, মস্ত একটা বাজার আছে, উপরন্তু আছে একটা হাইস্কুলও। তো চান্দ্রা আর তুজারপুর যদিও ভাঙার দু'দিকে পড়ে, দু'জায়গা থেকেই সেখানকার দূরত্ব অন্তত তিন-চার মাইল। ইস্কুলে যেতে হলে সেই তিন-চার মাইল পথ নিত্য পাড়ি দিতে হবে। বর্ষাকালে না হয় নৌকো করে যাওয়া গেল, অন্য সময়ে পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। তা দশ-বছরের কম যাদের বয়স, তাদের পক্ষে কি সেটা সম্ভব? সত্যি বলতে কী, একালের বাপ-মায়েরা হয়তো দশ বছরের ছেলেকেও তিন-চার মাইল পথ হাঁটিয়ে ইস্কুলে পাঠাবার প্রস্তাব শুনে তিন-চার বার বিষম খাবেন। ধান, পাট কি সর্ষের খেতের ভিতর দিয়ে টানা সেই আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে ভাঙ্গা থেকে আমিও তো দু'চার বার তুজারপুরে গিয়েছি। যেতে-যেতে ভাবতুম যে, নেহাতই দশ-বছরের একটা বাচ্চা ছেলে নিত্য এই এতখানি পথ পাড়ি দিত কী করে!

পাড়ি দিয়ে সে যে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ত, তা-ই বা ভাবতে পারছি কই। ঝিমিয়েই যদি পড়বে, তো তার দুষ্টুমির ঠেলায় গোটা ক্লাস নিশ্চয় তটস্থ হয়ে থাকত না। বাবার ইস্কুল-জীবনের দৌরাত্ম্য আর দুষ্টুমির কিছু-কিছু গল্প আমি বীরেশ্বর-কাকার কাছে শুনেছি। বীরেশ্বর মুখুজ্যে মশাই ছিলেন বাবার সহপাঠী। ভাঙ্গা স্কুলে একই ক্লাসে পড়তেন তিনি, তাঁদের বাড়িও ছিল ভাঙ্গায়। পরবর্তী জীবনে ওই একই ইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। একে তো খুবই নামজাদা শিক্ষক ছিলেন, তার উপরে তাঁর মেজাজটাও ছিল কড়া ধাঁচের। ফলে ছাত্ররা যেমন তাঁকে ভক্তি করত, তেমন ভয়ও করত খুব। বাবার সম্পর্কে যখন গল্প করতেন, তখন অবশ্য দেখতুম যে, তাঁর গাম্ভীর্যটা নেহাতই বাইরের একটা খোলস মাত্র, সেটাকে খসিয়ে ফেলে নিমেষে তিনি যেন তাঁর ছাত্র-জীবনে ফিরে যেতেন।

তাঁরই কাছে শুনেছি, বাবা যেমন তাঁদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলেন, তেমন আবার প্রতিটি বিষয়েই অন্যদের থেকে তিনি নম্বরও পেতেন অনেক বেশি। ব্যতিক্রম ঘটত শুধু ভূগোলের বেলায়। কারণটা আর কিছুই নয়, মানচিত্রটা তিনি একেবারেই আঁকতে পারতেন না। ম্যাপের জন্যে বরাদ্দ পনরোটা নম্বরও তাই পুরো কাটা যেত। এদিকে বীরেশ্বর-কাকা ভূগোলে খুব সড়গড় তো ছিলেনই, ম্যাপও আঁকতেন চমৎকার। ফলে, অন্তত ওই একটা বিষয়ে বাবা কিছুতেই তাঁর উপরে টেক্কা দিতে পারতেন না।

বীরেশ্বর-কাকার কাছে যে-সব গল্প শুনেছি, তাঁর একটা এই ভূগোল নিয়েই। "তখন আমরা ক্লাস সেভেনে পড়ি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। সেদিন ছিল ভূগোল। তোর বাবার আর আমার সিট পড়েছে পাশাপাশি। উত্তর লেখা শেষ হয়ে গেছে, ম্যাপ আঁকাও শেষ, হাতে আরও আধ ঘণ্টা সময় রয়েছে, ভাবছি এই আধ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরগুলোর উপরে আর-একবার চোখ বুলিয়ে নেব, এমন সময় তোর বাবা কী করল জানিস? ম্যাপ আঁকবার জন্যে সবাইকে তো আলাদা কাগজ দেওয়া হয়, তোর বাবাকেও দেওয়া হয়েছিল, তা হঠাৎ তার সেই কাগজখানাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সে আমার ম্যাপটা ছোঁ মেরে তুলে নিল, তারপর নিজের খাতার সঙ্গে পিন দিয়ে সেটা গেঁথে দিয়ে খাতা সাবমিট করে গটগট করে বেরিয়ে গেল পরীক্ষার ঘর থেকে।"

বললুম, "আপনি কিছু বললেন না?"

"কী আর বলব। তখন তো আর বলবার মতন সময়ও ছিল না। সাদা কাগজে সাত-তাড়াতাড়ি আবার নতুন করে ম্যাপ আঁকতে হল আমাকে। তারপর বাইরে এসে বললুম, রিভাইজটা পর্যন্ত

করতে পারলুম না জিতু, এখন কী হবে বল তো? তাতে তোর বাবা বলল, কী আর হবে, ভূগোলে অ্যাদ্দিন ফার্স্ট হয়েছিস, এবার সেকেণ্ড হবি। এর চেয়ে খারাপ কিছু হবে না।”

বাবার স্কুল-জীবন সম্পর্কে যেমন বীরেশ্বর-কাকার কাছে, তেমন আরও অনেকের কাছেই হরেক রকমের গল্প শুনেছি। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন অবিনাশ-কাকা। একে তিনি বাবার সহপাঠী, তায় তুজারপুরের মানুষ। তাঁর ছেলে নানকু আবার কলকাতার বঙ্গবাসী স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত। নানকুরা থাকত মধ্য-কলকাতার চুনাপুকুর লেনে। গলিটা বেরিয়েছে এখন আমরা যাকে রামমোহন সরণি বলি, সেই আমহার্স্ট স্ট্রিটের একেবারে দক্ষিণ-মুড়োর কাছ থেকে। নানকুদের বাড়িতে প্রায়ই অবিনাশ-কাকার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, আর দেখা হলেই তিনি শুরু করে দিতেন আমার বাবার স্কুল-জীবনের গল্প। সে-সব গল্প থেকে বাবার যে ছবিটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠত, তাতে বুঝতে পারতুম যে, একদিকে তিনি যেমন দারুণ ভাল ছাত্র ছিলেন, অন্যদিকে তেমন আবার ডানপিটেও কিছু কম ছিলেন না।

বাবা যে-বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন, সেই বছরই ঘটে যায় তাঁর স্কুল-জীবনের সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। যেমন প্রতিটি অ্যানুয়াল পরীক্ষায় হতেন, তেমন টেস্ট পরীক্ষাতেও তিনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে-পরেই ভাঙা স্কুলের হেড মাস্টারমশাই তাঁর এই সেরা ছাত্রটির বিরুদ্ধে বড় ভয়ঙ্কর রকমের একটি অভিযোগ আনেন, আর তার পরিণামে আমার পিতৃদেবকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার তখন আর মাত্র মাস খানেক বাকি। কিন্তু যাকে রাস্টিকেট করা হয়েছে, সে-ছেলে পরীক্ষায় বসবে কী করে? ব্যস, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসবার আগেই পিতৃদেবের ছাত্রজীবন শেষ করে দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর এই শাস্তির কথাটা আমি আমার ছেলেবেলাতেই ঠাকুমার কাছে প্রথম শুনি। কিন্তু আমার বয়স তো তখন পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়, ‘রাস্টিকেট’ কথাটার অর্থই তখন জানতুম না। অর্থটা যেদিন প্রথম জানতে পারি, বাবাকে সেইদিনই এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলুম। জানতে চেয়েছিলুম যে, ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছিল। কিন্তু মৃদু হেসে বাবা আমার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলেন। শুধু বললেন, “বা রে, দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে না? তুইও তো কত দোষ করিস, আর তার জন্যে তোর মায়ের কাছে কত শাস্তিও তো পাস। তো তাই নিয়ে এত ভাববার কী আছে?”

বুঝলুম, বাবা কিছু বলবেন না। কিন্তু যে-ছেলে জানতে চায়, তাকে কে ঠেকিয়ে রাখবে? কথাটা তো আর আমি ভুলে যাইনি, সমস্ত কাজের মধ্যেও সেটা মাথার মধ্যে ঠিকই ঘুরপাক খাচ্ছিল, ফরিদপুর থেকে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যাবার পথে তাই একদিন বীরেশ্বর-কাকার ভাঙ্গার বাড়িতে রাত কাটাই। তাঁকে এই নিয়ে জিজ্ঞেস করতে কিন্তু, একটুও না থেমে, গড়গড় করে তিনি আদ্যন্ত ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে দিলেন। সেদিন তাঁর আছে যে চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছিলুম, সেটা এইরকম:

ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গা ইস্কুলের নামডাক নেহাত কম ছিল না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রেজাল্ট বরাবরই ভাল হত, বৃত্তিও ওই ইস্কুলের ছাত্ররা নেহাত কম পাননি। তা নীচের ক্লাস থেকেই যে-রকম নম্বর পেয়ে বাবা উপরের ক্লাসে উঠে আসছিলেন, তাতে হেড মাস্টারমশাইয়ের ধারণা হয় যে, পড়াশুনোয় আর-একটু যদি সময় দেয় তো এ-ছেলে নির্ঘাত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করবে। বাবা তখন সদ্য ক্লাস টেন-এ উঠেছেন। তখনও তিনি তুজারপুর থেকে তিন-চার মাইল পথ ঠেঙিয়ে ইস্কুলে আসেন; ইস্কুল ছুটির পরে আবার সেই হেঁটেই তুজারপুরে ফিরে যান। হেড মাস্টারমশাই বলেন, ‘এটা চলবে না, এতে অযথা অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, এই সময়টা পড়াশুনোয়

লাগানো দরকার, সেটা লাগানো যাবে যদি তুমি হস্টেলে থাকো। পরীক্ষার তো আর মাত্র একটা বছর বাকি, রেজাল্ট যদি ভাল করতে হয় তো আমার কথায় আপত্তি কোরো না।'

আপত্তি করবার মালিক তো আর বাবা নন, নকুলেশ্বর সমাদ্দার। তা ভাগ্নের রেজাল্ট যাতে ভাল হয়, তার জন্যে তাকে হস্টেলে থাকতে বলা হচ্ছে, শুনে তিনি এককথায় রাজি। পরের দিনই বাবাকে তিনি নিজে এসে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যান। হেড মাস্টারমশাই পরদেশি মানুষ, নেহাতই কর্মসূত্রে তাঁর ভাঙ্গায় আসা, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আসেননি বলে তিনি নিজেও থাকতেন হস্টেলে। বাবার তাতে সুবিধেই হয়েছিল। লেখাপড়ার ব্যাপারে সর্বরকম সাহায্য ও পরামর্শ পাবার সুবিধে। টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন তিনি। কিন্তু তুজারপুরে ফিরে গেলেন না। হস্টেলে থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন।

তার কয়েক দিন বাদেই ঘটল এক তাজ্জব ঘটনা। হস্টেলের পাশেই নদী। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্তিরে কেউ হেড মাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকে বিছানা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে সেই নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তো প্রাণে তিনি মারা যাননি, ঘাটের কাছেই জলের মধ্যে পড়েছিলেন, হাবুডুবু খেতে-খেতেই তিনি পাড়ে এসে ওঠেন। পরের দিন গোটা গঞ্জ তোলপাড়। কী, না হেডমাস্টারমশাইকে জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। কাজটা কার, স্কুল-কর্তৃপক্ষকে তাও জানিয়ে দিলেন তিনি। আততায়ীকে তিনি চিনতে পেরেছেন। সে আর কেউ নয়, তাঁরই সেরা ছাত্র জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৬

ভাঙ্গা স্কুলের হেড মাস্টারমশাইয়ের উপরে হামলা হয়েছিল তো রাতের অন্ধকারে। ঘরেও তখন আলো জ্বলছিল না। হামলাটা কে করেছিল, তা তিনি তা হলে বুঝলেন কী করে? তার মুখ তো তিনি দেখতে পাননি। তবে? উত্তরে হেডমাস্টারমশাই বলেন, মুখ তিনি দেখতে পাননি ঠিকই, তবে গলাটা তাঁর চেনা। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁকে যে পুকুরের মধ্যে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে, এটা বুঝতে পেরেই প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তাঁর আততায়ীকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন। লোকটির বুক থেকে তাঁর হাতে তখন কিছু লোম উঠে আসে। "তা আমার ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জিতেন্দ্র ছাড়া আর কারও বুকেই লোম নেই।"

বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ-কাজ তাঁর? অনায়াসেই তিনি অভিযোগটা অস্বীকার করতে পারতেন। বলতে পারতেন, বাইরে থেকে অমন কেউ যে হস্টেলে ঢুকে এ-কাজ করেনি, তারই বা প্রমাণ কী? কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন না। বললেন, হ্যাঁ, কাজটা তাঁরই বটে। তবে কিনা মারতে নয়, হেড মাস্টারমশাইকে তিনি বাঁচাতেই চেয়েছিলেন।

বীরেশ্বর কাকা বললেন, "জিতু কিন্তু একবর্ণ মিথ্যে বলেনি। সে বাঁচাতেই চেয়েছিল। ভেবেছিল, হেড মাস্টারমশাইকে যদি নদীর মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়, তা হলে নিশ্চয় সাঁতার কেটে তিনি ও-পারে উঠে পালাতে পারবেন। কিন্তু মুশকিলটা কী হল জানিস? সাঁতার কাটার বিদ্যেটা যে তাঁর জানা নেই, এটাই জিতু জানত না।"

সবটাই যেন কেমন ধাঁধার মতো লাগছিল। বীরেশ্বর কাকাই সেটা কাটিয়ে দিলেন। বললেন, "হামলার একটা চক্রান্ত হয়েছিল ঠিকই। কারা চক্রান্ত করেছিল, সেটা আর আমাকে জিজ্ঞেস করিস না, আমি শুধু এইটুকুই বলব যে, হামলাটা কখন হবে আর কারা করবে, জিতু সেটার আঁচ পেয়ে যায়। প্রথমটায় সে বিশ্বাসই করেনি যে, এমন একটা কাণ্ড সত্যি-সত্যি হতে পারে। কিন্তু যখন দেখল যে, কথাটা মিথ্যে নয়, রাতের অন্ধকারে হস্টেলে কিছু লোক সত্যি এসে গেছে, তখন তাদের সঙ্গে জিতুও গিয়ে ঢুকে পড়ে আমাদের হেড মাস্টারমশাইয়ের ঘরের মধ্যে, তারপর অন্যেরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তাঁকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে নদীর মধ্যে ছুড়ে দেয়। তা চক্রান্তের ব্যাপারটা স্কুল কমিটি যে আঁচ করেনি, তা নয়, তবে কিনা তারা ধরে নিয়েছিল যে, সেই চক্রান্তের ভিতরে জিতুও রয়েছে। তার উপরে আবার ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও., পুলিশ সাহেব—সবাই তো ইংরেজ, প্রথম থেকেই তারা সন্দেহ করেছিল যে, এটা টেররিস্টদের কাজ। তাদের নাম জানবার জন্যে জেরায়-জেরায় তোর বাবাকে একেবারে জেরবার করে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাচারও হয়েছিল একেবারে অসহ্য রকমের। কিন্তু না, ওই যে জিতু বলেছিল যে, মারতে নয়, সে বাঁচাতেই চেয়েছিল, ব্যস, তা ছাড়া আর একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ বার করতে পারল না।"

এর পরবর্তী ঘটনার কথা আবার সেই ঠাকুমার কাছেই শুনতে পাই। ইস্কুল থেকে রাস্টিকেটেড হবার পরে বাবা আর মামাবাড়িতে ফিরে যাননি। রাত্রিটা তিনি ভাঙ্গায় এক বন্ধুব বাড়িতে কাটান। তারপর ভোর না হতেই বিশ মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে ফরিদপুর শহরে চলে আসেন। সেখান থেকে রেলগাড়িতে উঠে কলকাতায়। তাঁর গা তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ঠিকানাটা জানা ছিল, রাস্তার লোকদের কাছে পথের হদিশ জিজ্ঞেস করতে করতে যখন সিমলেপাড়ার বাসাবাড়িতে এসে পৌঁছলেন, ঠাকুমা নাকি তাঁকে চিনতেই পারেননি। কী করেই বা চিনবেন। মায়ের কোল থেকে যাকে মামাবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে ছিল পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, আর সেখান থেকে যে ফিরে এল, সে তো একেবারে আস্ত একটা মানুষ।

ঠাকুমা বলেন, "তোর ঠাকুর্দা তো আপিস থেকে সন্ধেবেলায় বাড়িতে ফিরে সমস্ত কথা ভাল করে শুনলেনও না। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু এইটুকু শুনেই তাঁর কুড়ি বছর বয়সের জোয়ান ছেলেকে ধরে আর-এক দফা পেটালেন। তারপর যখন শুনলেন যে, ছেলেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না, তখন 'কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ' বলতে-বলতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ছেলেকে অনেক কষ্টে সে-রাতে দুধসাবুটা খাওয়াতে পেরেছিলুম, ছেলের বাপ কিন্তু জলটুকু পর্যন্ত খেলেন না। রাত্তিরে এক ফোঁটা ঘুমোতে পারেননি, খালি এ-পাশ ও-পাশ করেছেন, তারপর ভাল করে আলো না-ফুটতেই বিছানা ছেড়ে, চোখে-মুখে তাড়াতাড়ি একটু জল ছিটিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।"

বন্ধুটি আর কেউই নন, ঈশানচন্দ্র। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তো নেহাতই একালের ব্যাপার, যেমন উঁচুর দিকের তাবৎ পরীক্ষা, তেমন ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষাও সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেওয়া হত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন সার আশুতোষ। তা বন্ধুর কাছে তাঁর বিপদের কথা শুনে ঈশানচন্দ্র বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে আর দেরি কোরো না, পরীক্ষার তো

আর একটা মাসও বাকি নেই, এখুনি বাড়ি গিয়ে ছেলেকে নিয়ে এসো, ওকে সঙ্গে করে আমি আশু মুখুজ্যের কাছে যাব, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে কেউ যদি ওকে বাঁচাতে পারে তো আশুতোষই পারবে।"

তো তা-ই হল। বীরেশ্বর কাকা তখন ভাঙ্গায়। কলকাতায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে, তা জানার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, বাবা যে তুজারপুরে ফিরে না-গিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন, তাও তিনি তখন জানতেন না। তবে পরে কখনও নিশ্চয় বাবার কাছে সব শুনে থাকবেন। তিনি বলেন, সার আশুতোষ সমস্ত কথা খুব মন দিয়ে শুনেছিলেন। তারপর বাবার সঙ্গে তাঁর যে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হয়েছিল তা এইরকম :

"হেড মাস্টারমশাইয়ের ঘরে কারা হামলা করতে এসেছিল, তা তুমি জানতে ?"

"জানতুম।"

"তাদের নামগুলো জানবার জন্যে তোমাকে খুব মারধর করা হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু নামগুলো আমি জানাইনি।"

"জানালেও তোমাকে রাস্টিকেট করা হত। ধরে নেওয়া হত যে, তাদের সঙ্গে তোমার যোগসাজশ রয়েছে। তবে কিনা সেক্ষেত্রে আর তোমাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা আমি করতুম না। কিন্তু তুমি নামগুলো বলে দাওনি। তাই রাস্টিকেশানের অর্ডারটা যাতে উইথড্র করা হয়, তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

ব্যবস্থা সার আশুতোষ ঠিকই করে দিয়েছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বাবা পরীক্ষা দেন। স্ট্যাণ্ড করা আর তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। তবে বৃত্তিটা ঠিকই পেয়ে যান।

বাবা যেহেতু এই ব্যাপারটা নিয়ে কারও কাছেই কখনও সমস্ত কথা খুলে বলেননি, তাই কারা যে সেদিন হেড মাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকেছিল, নিশ্চিতভাবে তা হয়তো কোনও দিনই জানা যাবে না। তবে পুলিশ-রিপোর্টে এই ঘটনার দায় টেররিস্টদের উপরেই চাপানো হয়েছিল বটে। এটা জানলুম আমার অনুজ হীরেন্দ্রনাথের কাছে। সে ইতিহাসের অধ্যাপক, ডক্টরেট করবার জন্য ষাটের দশকে অক্সফোর্ডে যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিককার বঙ্গীয় সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তার গবেষণার বিষয়বস্তু। বিদেশ থেকেই সে আমাকে জানায় যে, ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে সেই সময়কার একটি নথি পেয়ে গিয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে, ভাঙ্গা স্কুলের ওই ঘটনাটি আসলে সন্ত্রাসবাদীরাই ঘটিয়েছিল।

বাবা যে রাজনীতি করতেন না, তা নয়। সেকালের যাঁরা রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের কেউ-কেউ ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তবে সন্ত্রাসবাদে যে তাঁর বিশ্বাস ছিল, এমন আমার মনে হয় না। যাঁদের আমরা বিপ্লবী নেতা বলি, তাঁদের অনেকেই অবশ্য মাঝে-মাঝে আমাদের কলকাতার বাসাবাড়িতে আসতেন। মতাদর্শগত ঐক্যের কারণে ততটা নয়, যতটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে। মানবিক সম্পর্ক তখনও মতবাদের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে যায়নি। বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। আমাদের শেয়ালদা-পাড়ার বাসাবাড়িতে তাঁকে প্রথম দেখি। তখন আমি নেহাতই ছেলেমানুষ। কিন্তু এখনও ভুলে যাইনি যে, আমার নাম যে নীরেন্দ্রনাথ, এইটে শুনে বাবার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এ তো সেই নীরেনের কথা মনে পড়িয়ে দিল!" তখন এ-কথার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। না-পারাই স্বাভাবিক। কেননা, বুড়িবালামের যুদ্ধে যিনি আহত হয়েছিলেন আর বালেশ্বর জেলে মাত্রই উনিশ বছর বয়সে ফাঁসির মঞ্চে যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, বাঘা যতীনের কিশোর সঙ্গী সেই নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কথা তখনও আমি জানতুম না।

আমাদের বাড়ির উপরে যে পুলিশের নজর আছে, সেটা শুনতে পেতুম। মাঝে-মাঝে বাড়িতে পুলিশ এসে বিছানা-বালিশ বাক্স-প্যাঁটরা হাঁটকাত, সেটা স্বচক্ষে দেখেছি। এটা হত মাঝরাত্তিরে। ফলে ঘুমের দফা রফা হত। তবে তাই নিয়ে কাউকে বিশেষ উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন হতে দেখতুম না। ব্যাপারটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ চলে যাবার পরে বড়রা খানিক হাসাহাসি করে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন।

লাহোর জেলে যতীন দাস যখন অনশনে মৃত্যুবরণ করেন, আমার বয়স তখনও পাঁচ পূর্ণ হয়নি। তখনও আমরা শেয়ালদা-পাড়ায় উঠে আসিনি, তালতলায় থাকি। তাঁর মৃত্যুর খবর যেদিন কলকাতায় পৌঁছয়, সেই দিনটির কথা আজও মনে আছে। বাবা কলেজে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর মুখ তখন থমথম করছিল। ছোটপিসি, বড়কাকা, মা, কেউই কথা বলছিল না। দিদি আর আমিও একেবারে চুপ করে ছিলুম সারাক্ষণ। আমাদের বাড়িতে সেদিন অরন্ধন। বাসী ভাত-ডাল যা-কিছু ছিল, সব ফেলে দেওয়া হয়। বাবার হাত থেকে বইয়ের গোছা নিয়ে মা বলেছিলেন, "আজ আর রাত জেগো না, তাড়াতাড়ি শুযে পড়ো।" পরে শুনেছিলুম, কলকাতার অসংখ্য বাড়িতে সেদিন হাঁড়ি চড়েনি।

শহরে সেদিন আর মিটিং করে কাউকে হরতাল ডাকতে হয়নি। খবরটা ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। বিরাট-বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল। আমাদের বাড়ি থেকে দু'পা হাঁটলেই কর্পোরেশন স্ট্রিট। সেখান দিয়েও যাচ্ছিল একটা মস্ত মিছিল। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড়কাকা সেই মিছিলে মিশে গিয়ে খানিকটা পথ হাঁটলেন। তারপর বাড়ির পথে ফিরতে-ফিরতে বললেন, "বড় হ, তখন বুঝবি যে, এই যে তুই মিছিলের সঙ্গে এতটা পথ হেঁটে এলি, এ খুব পুণ্যের কাজ হল।"

বাবা খদ্দর পরতেন। তবে চরকা কাটতেন না। যতীন দাসের মৃত্যুর পরে-পরেই কিন্তু হঠাৎ একদিন মুটের মাথায় একগাদা চরকা চাপিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন। মনে আছে, প্রথম-প্রথম কয়েকটা দিন আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সুতো কেটেছিলুম, কিন্তু হপ্তা খানেক বাদেই তাতে ভাটা পড়ে যায়। একমাত্র বাবা ছাড়া। তবে সুতো কাটার ব্যাপারে তিনি যে খুব দক্ষ ছিলেন, তা নয়। মা একদিন তাঁর মুখের উপরেই বলে বসলেন, "সুতো যা বেরুচ্ছে, তাতে তো গোরু বাঁধার দড়ি কি জাহাজের কাছি ছাড়া আর কিছুই হবে না।" বাবা সেদিন খুব রেগে গিয়েছিলেন, তবে খদ্দর না ছাড়লেও তারপর থেকে আর তাঁকে সুতো কাটতে দেখিনি।

মানুষটি আসলে একটু খেয়ালি প্রকৃতির ছিলেন। অনেক কাজই করতেন ঝোঁকের মাথায়। তার ফল যে সর্বদাই খারাপ হত, তা কিন্তু নয়। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে যিনি জরাসন্ধ নামে পরিচিত, সেই চারুচন্দ্র চক্রবর্তী মশাইয়ের ভাইঝির সঙ্গে আমার বড়কাকার বিয়েটাও তিনি শুনেছি একেবারে ঝোঁকের মাথায় স্থির করে ফেলেছিলেন।

চারুচন্দ্র চক্রবর্তীও ফরিদপুর জেলার সদর-মহকুমার মানুষ। তাঁদের গ্রামের নাম ব্রাহ্মণডাঙা, সে-গ্রাম চান্দ্রা থেকে মাইল কযেক পশ্চিমে। বাবার আট বছর বাদে, ১৯২০ সনে, তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তবে বয়সে তিনি বাবার চেয়ে অনেক ছোট। তিনিও ছিলেন তুখোড় ছাত্র, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ডও করেছিলেন, বাংলায় শুনেছি নব্বইয়ের উপরে নম্বর পান। আমরা যখন খুব ছোট, তখন 'রংচং' বলে একটা বইও বেরিয়েছিল তাঁর। ছোটদের জন্যে লেখা সেই বইখানার মধ্যে অনেক মজার-মজার গল্প ছিল।

বাবার সঙ্গে তাঁর প্রথম-সাক্ষাৎটা ঘটেছিল খুবই আকস্মিকভাবে। চারুচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, বি.এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে তিনি তাঁদের গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন,

আর গ্রামের বাড়ি থেকে বাবা ফিরছিলেন কলকাতায়। রেল-ইস্টিশান ফরিদপুরের সদর-শহরে, সেখানে এক ভাতের হোটেলে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। চারুচন্দ্রের বয়স তখন আর কত হবে? একুশ-বাইশের বেশি নিশ্চয় নয়। পরিচয় হতে বাবা যখন বুঝলেন যে, এই সেই ছেলে, যে কিনা প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করেছিল, তখন তো তিনি দারুণ খুশি। কথায়-কথায় এটাও জানা গেল যে, চারুচন্দ্রের একটি এগারো-বারো বছর বয়সের ভ্রাতুষ্পুত্রী রয়েছে। বাস, শুধু ওইটুকুই বাবার জানার দরকার ছিল। এগারো-বারো বছরকে তখন কন্যাকে পাত্রস্থ করবার অতি উপযুক্ত বয়স বলে গণ্য করা হত। কন্যাটির জন্য যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে, এই কথা শুনেই তিনি জানিয়ে দেন যে, তাঁর মেজো ভাইটিরও বিয়ের বয়স হয়েছে, সুতরাং দু'তিন দিনের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মণডাঙায় যাচ্ছেন।

তা তিনি গিয়েছিলেনও। কলকাতায় যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু যাত্রা বাতিল করে ফরিদপুর থেকেই তিনি আবার চান্দ্রায় ফিরে যান। তারপর ভাঙ্গা থেকে একজোড়া সোনার বালা গড়িয়ে নিয়ে চলে যান ব্রাহ্মণডাঙায়। তার পরের ঘটনা আমার বড় কাকিমার মুখেই শুনুন। "ভাশুরঠাকুর তো আমাকে দেখবামাত্র কাছে টেনে নিলেন, আর তারপরেই আমার হাতে একজোড়া বালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, বাস, এই তোমার আশীর্বাদ হয়ে গেল।"

এই বিয়ের গল্প আমি চারুচন্দ্রের মুখেও শুনেছি। তিনি বলেন, "ফরিদপুরের সেই হোটেলে তোমার বাবার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তাঁর দুপুরের খাওয়া তখন শেষ। তবে হোটেলের খাওয়ায় সম্ভবত তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়নি, তাই তক্তপোশে বসে একখানা আখ খাচ্ছিলেন। পাশেও খানকয় আখ পড়ে রয়েছে দেখলুম। আমি অবশ্য আগেও চিনতুম ওঁকে; প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তুম বটে, তবে কখনও কখনও বঙ্গবাসী কলেজে গিয়ে ওঁর ক্লাসও করেছি, কিন্তু উনি আমাকে চিনতেন না। চিনবার কথাও নয়। তো আখ খেতে-খেতেই আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির খোঁজখবর নিলেন, তারপর কথায়-কথায় যখন শুনলেন যে, আমার একটি ভাইঝি আছে আর তার পাত্রের সন্ধানও চলছে, তখন আর কথা না বাড়িয়ে পাশ থেকে একখানা আখ তুলে নিয়ে আমার হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও হে চারু। আর হ্যাঁ, দাদাকে চিন্তা করতে বারণ কোরো, তাঁর আর পাত্র খোঁজার দরকার নেই, তোমার ভাইঝিটিকে আমি আমাদের বাড়িতেই নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করছি।' কী বলব, সদ্য তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সেই আলাপ যে এমন মধুরেণ সমাপ্ত হবে, তা আমার কল্পনায় ছিল না। চন্দনী আখ তো, দাঁত বসিয়েই দেখলুম যে, দারুণ মিষ্টি।"

ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে বেশ কয়েক বছরের জন্যে বড়কাকার ছাত্রজীবনে ছেদ পড়ে গিয়েছিল। রাজনীতির উত্তেজনায় তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরে আবার বাবার চাপে পড়ে কলেজে এসে ভর্তি হন। মুশকিল এই যে, যাকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলি, তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলা থাকা চাই, তো একেবারে সেটা ভেঙে গেল তো গেল, তাকে আবার নতুন করে অনেকেই গড়ে তুলতে পারেন না। বড়কাকাও পারেননি। কলেজে যেতেন বটে, কিন্তু সে নেহাতই দায়ে পড়ে যাওয়া, নিয়মের নিগড়ের মধ্যে পড়াশুনো করবার যে অভ্যাস, সেটা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই বলে যে তাঁর জীবনটা একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তাও নয়। ফুর্তিবাজ রগুড়ে মানুষ, হাসি ঠাট্টায় গল্পেগুজবে বাড়ির সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন, পায়রা পুষতেন, ঘুড়ি ওড়াতেন, মাটি ছোঁবার আগেই লাট্টুকে কীভাবে ঘুরন্ত অবস্থায় হাতের চেটোয় আনতে হয়, আমাদের সেটা যত্ন করে শেখাতেন, শুধু ওই লেখাপড়াটাই করতেন না। এদিকে আবার ইংরেজিটা জানতেন চমৎকার।

বড়কাকাকে নিয়ে ঠাকুর্দার বড় দুশ্চিন্তা ছিল। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইরকমই যদি চলতে থাকে, তো সংসারের সঙ্গে এ-ছেলের বন্ধন ধীরে-ধীরে আলগা হতে শুরু করবে। হয়তো সেইজন্যেই তার বিয়ের জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন যে, পড়াশুনোয় যখন মতি নেই, তখন বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যাক, তাতে আর-কিছু না হোক্, সংসারের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলে একটা দায়িত্ববোধ অন্তত জন্মাবে।

পরের বছর বর্ষাকালে বড়কাকার বিয়ে হয়। পূর্ববঙ্গের নাবাল এলাকায় যে সাধারণত ওই সময়েই বিয়ের ব্যাপারটা ঘটে থাকে, তার কারণ আর কিছুই নয়, মাঠঘাট তখন থাকে জলের তলায়, ফলে নৌকা করে আত্মীয়স্বজনদের একেবারে বাড়ির ঘাট পর্যন্ত আনিয়ে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না। বিয়ে উপলক্ষে যে-সব আত্মীয়কুটুম্বের সমাগম ঘটে, নাওয়ে করে আসেন বলেই তাঁদের বলা হয় নায়োরি। তাঁরা আসেন, ভিড় বাড়ান, বাইরে থেকে এসেছেন বলে একটু গা আলগা দিয়ে থাকেন, কাজেকর্মে যা সাহায্য করেন, তা ওপর-ওপর, আদর-আপ্যায়নে কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটলে বেজার হন, তারপর আবার নৌকো করে একদিন ফিরেও যান যে যার বাড়িতে। মূল অর্থ থেকে বেরিয়ে না এসেও 'নায়োরি' শব্দটা যে একটা ব্যঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনা পেয়ে গিয়েছে, সেটা এইজন্যেই। কোনও বাঙাল শাশুড়ি যদি তাঁর পুত্রবধূকে বলেন, 'ব্যাপার কী বউমা, তোমার কাজকর্মের ছিরি তো একেবারে নায়োরির মতো,' তা হলে বুঝতে হবে, বউমাটিকে তিনি তিরস্কার করছেন; তাকে বলতে চাইছেন যে, বাইরের লোকেদের মতো দায়সারাভাবে কাজ করাটা তার উচিত হচ্ছে না।

বড়কাকার বিয়ের ব্যাপারটা আমার খুব ঝাপসা-মতন মনে পড়ে। তখন আমার দুই পেরিয়ে তিন চলছে। পূর্ববঙ্গের নানা এলাকায় বিয়ের ক'দিন আগে থেকেই যে গোটা পাড়ার শাশুড়ি-বউ-ঝি'দের দিয়ে গান গাওয়াবার একটা আসর বসানো হয়, অনেকেই সেটা জানেন আশা করি। এমন-কিছু উচ্চাঙ্গের গান নয়, বিষয়বস্তুও খুবই সহজ-সরল। রাম বিয়ে করতে মিথিলায় যাবেন, কৌশল্যা তাঁকে সাজিয়ে দিচ্ছেন, অযোধ্যায় লেগেছে উৎসবের ধুম, ছড়ার আকারে বাঁধা এই কথাগুলিকেই একেবারে সাদামাটা এলিমেণ্টারি সুর সহযোগে তা প্রায় তিন-চার দিন ধরে গাওয়া হত। বাড়ির বউ-ঝি আর পাড়ার মেয়ে-বউদের সঙ্গে নায়োরিরাও তাতে যোগ দিতেন। মাঝে-মাঝেই বাটা-ভরা পান বিলি করা হত তাঁদের মধ্যে। সকলের চাপে পড়ে আমার ঠাকুমাও যে একদিন সেই বিয়ের গান গাইতে বাধ্য হয়েছিলেন, এটা ভুলে যাইনি।

তা ছাড়া টুকরো-টুকরো কয়েকটা দৃশ্য এখনও স্মৃতির মধ্যে গেঁথে আছে। যেমন, বাড়িভর্তি লোক, তাড়াতাড়ি করে কী যেন আনতে গিয়ে মোজোকাকা হঠাৎ উঠোনের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লেন, আমার জ্বর হয়েছে, বারান্দার এক কোণে আমি বসে আছি, সোনাপিসি এসে আমাকে দুধসাবু খাইয়ে দিয়ে গেলেন।

বর-বউ নিয়ে বরযাত্রীরা যেদিন ব্রাহ্মণডাঙা থেকে ফিরে এলেন, সেদিনকার মাত্র একটি দৃশ্যই মনে করতে পারি। উঠোনে কাদা, বর-বউ পাছে আছাড় খায়, তাই বড়কাকা আর কাকিমাকে পাঁজাকোলে করে উঠোন থেকে আমাদের বড়ঘরের বারান্দায় তুলে এনে আলপনা-আঁকা দু'খানা পিঁড়ির উপরে বসিয়ে দেওয়া হল। বাস, স্মৃতির খেল এইখানেই খতম। সেদিনের আর কোনও কিছুই আমি মনে করতে পারি না।

আমার ঠাকুর্দা যখন কলকাতার মায়া কাটিয়ে চান্দ্রায় চলে আসেন, সিমলেপাড়ার বাসাবাড়ির পাটও তখন তুলে দেওয়া হয়েছিল। মা'কেও তখন গ্রামে চলে আসতে হয়। বাবা তার বছর খানেক আগেই চাকরিতে ঢুকেছেন। তিনি এম. এ. দিয়েছিলেন ১৯১৮ সালে, তবে রেজাল্ট বেরোবার আগেই কলেজে পড়াবার কাজ পেয়ে যান। তাঁর ঠিকানা অতঃপর পালটে গেল, হেদো থেকে তিনি চলে এলেন শেয়ালদাপাড়ায়। তবে তখন-তখনই নতুন করে বাসা ভাড়া না করে তিনি ক্রাউন বোর্ডিংয়ে একটা ঘর নিয়ে সেখান থেকে কলেজে যাতাযাত করতে শুরু করেন। কলেজও একই পাড়ায়, ফলে হেঁটেই যাতায়াত করতেন।

ক্রাউন বোর্ডিংয়ে বাবা থাকতেন তাঁর বড় ভাগ্নেটিকে নিয়ে। আমাদের প্রজন্মে এই পিসতুতো দাদাটিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই আমরা তাঁকে বড়দা বলতুম। ইনি আমার বড়পিসির ছেলে। এই পিসি আমার বাবার চেয়ে বছর তিনের বড়। মাত্রই ষোলো বছব বয়সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে ইনি মারা যান। বাবা তখন তুজারপুরে তাঁর মামাবাড়িতে। দিদির বিয়ের সময় তিনি কলকাতায় আসতে পারেননি, তাঁর মৃত্যুর খবরও বাবাব কাছে চেপে যাওয়া হয়। বড়দা ছিলেন অতি রূপবান পুরুষ। তাঁর মা'কে তো আমরা কেউই দেখিনি, তবে শুনেছি যে, বড়পিসির মুখখানা যেন বড়দার মুখে একেবারে অবিকল বসানো ছিল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক আগে বাবা যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, বড়দা তখন আমার ঠাকুমার কাছে মানুষ হচ্ছেন। মা-মরা ভাগ্নেটিকে বাবা সেই যে তাঁর বুকে তুলে নিলেন, তারপর যতদিন না বড়দা ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে ফিরে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, ততদিন আর বাবা তাঁকে কাছছাড়া করেননি। বড়দা'র ছেলেবেলায় বাবা যে তার কোনও আবদার মেটাতেই কখনও কার্পণ্য করেননি, একটু বড় হয়ে এ-কথা আমরা ঠাকুমা'র কাছে জেনেছিলুম।

বড়দা ছিলেন মামাবাড়ির আদুরে ভাগ্নে। ডাক্তার হয়ে তিনি নিজেদের আলগির বাড়িতে নয়, আমাদের চান্দ্রার বাড়ির কাছারি-ঘরেই তাঁর ডিসপেনসারি সাজিয়ে বসে যান। রোজ সকালে চান করে, জলখাবার খেয়ে, মাইল দুই-আড়াই পথ পাড়ি দিয়ে আলগি থেকে আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। তারপর রুগি দেখে, দুপুরের খাওয়া আমাদের বাড়িতে সেরে, খানিক দিবানিদ্রা দিয়ে, ডিসপেনসারিতে তালা লাগিয়ে বিকেলবেলা আবার ফিরে যেতেন আলগিতে।

নিজেদের বাড়িতে তাঁর যে কোনও অনাদর ছিল, তা কিন্তু একেবারেই নয়। থাকবেই বা কেন। বড়পিসিমা মারা যাবার বছর কয়েক বাদে ঠাকুর্দা আমার বড়পিসেমশায়ের সঙ্গেই আমার মেজোপিসির বিয়ে দিয়ে দেন। জামাতাটিকে যেমন ঠাকুর্দা তেমন ঠাকুমাও বড্ড ভালবাসতেন। মেয়ে মরলে জামাই পর হয়ে যায়, এমন কথায় সম্ভবত তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। হয়তো বড়দা'র

কথাটাও তাঁরা ভেবে দেখেছিলেন। হয়তো তাঁদের এমনও মনে হয়েছিল যে, মাসি যদি মায়ের জায়গা নেয়, ছেলেটা তা হলে যত্নে মানুষ হবে। তা আমার মেজোপিসিকে তো আমি অনেকদিন ধরে দেখেছি। নিজের দুটি ছেলের চেয়ে বড়দা'র প্রতি তাঁর স্নেহের মাত্রাটা বেশি বই কম ছিল না।

আমার মায়ের প্রথম দুটি সন্তান মেয়ে। প্রথমটি জন্মের পরেই মারা যায়। তার বছর দুয়েক বাদে দিদির জন্ম। তারও বছর তিনেক বাদে আমার। আমরা গ্রামেই জন্মেছি। বাবা কলকাতায় থাকতেন বটে, কিন্তু আমরা গ্রামেই থাকতুম। আমার যখন বছর দুয়েক বয়স, আমার মা'র তখন ফের কলকাতায় চলে আসবার দরকার হয়। দরকারটা আর কিছুই নয়, সেজোকাকা আর ছোটকাকা তো কিছুদিন বাদেই কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হবে, বাবা তাই একটা বাসাবাড়ির খোঁজে ছিলেন। তার ভার কে নেবে ? দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, এই খবর পেয়ে তাই মা'কে কলকাতায় পাঠানো হল। সঙ্গে এল দিদি। ঠাকুর্দা আমাকে ছাড়লেন না। আমি গ্রামের বাড়িতেই রয়ে গেলুম।

বড়কাকার বিয়ে উপলক্ষে সবাই চান্দ্রার বাড়িতে এসে জমায়েত হয়েছিলেন। বিয়ের কয়েকদিন বাদেই আবার বাড়ি একদম ফাঁকা। সবাইকে নিয়ে বাবা আবার কলকাতায় ফিরে যান। সবাই মানে বাবা, মা, মেজোকাকা আর দিদি। সদ্য বিয়ে হয়েছে বলে বড়কাকা আরও কয়েকটা দিন দেশের বাড়িতে ছিলেন বটে, কিন্তু বড় কাকিমা বেশ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়িতে চলে যেতে, তিনিও কলেজ কামাই হচ্ছে বলে কলকাতায় ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমার সেই সময়ে ঘুরে-ঘুরে খুব জ্বর হচ্ছিল। শুনেছি ঠাকুর্দার আমাকে আসতে দেবার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। কিন্তু মা নাকি ঠাকুমাকে বারবার করে বলে গিয়েছিলেন যে, জ্বর যখন ছাড়ছে না, তখন ভাল কোনও ডাক্তার দিয়ে আমাকে একবার দেখানো দরকার। তা ওদিকে তেমন ভাল ডাক্তার আর কোথায় পাওয়া যাবে। ডাক্তার দেখাবার জন্যে বড় কাকার সঙ্গে আমাকেও তাই কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ব্যবস্থাটা এই ছিল যে, সেরে উঠেই আমি আবার দেশের বাড়িতে ফিরে আসব।

তা কিন্তু হল না। বাবার দুই ডাক্তার-বন্ধুর নাম ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় আর যোগেন্দ্র মৈত্র। প্রথমজন বঙ্গবাসী কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর দ্বিতীয়জন রাজনীতি করতেন। যোগেনকাকা পরে কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হন। তাঁরা দুজনেই খুব করে আমাকে পরীক্ষা করলেন, ওষুধপত্র লিখে দিলেন, তারপরে রায় দিলেন যে, চেঞ্জে যাওয়া দরকার। শুনে মা বললেন, "পুজো তো এসেই গেল, ছুটিতে তা হলে এবার আর দেশের বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না। চলো, খোকাকে নিয়ে এই ছুটিতে তা হলে চেঞ্জেই যাওয়া যাক।" তো তা-ই হল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে দেওঘরের ক্যাসটেয়ার্স টাউন এলাকায় বাড়িও পাওয়া গেল একটা। মহালয়ার দিন হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে আমরা রেলগাড়িতে উঠে পড়লুম।

এ হল বড়কাকার বিয়ের মাত্রই মাস দুই-তিন পরের কথা। অথচ, সেই বিয়ের সময়কার অনেক ঘটনারই স্মৃতি যদিও একেবারে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, দেওঘরের দিনগুলিকে কিন্তু সেই তুলনায় অনেক স্পষ্ট করে মনে করতে পারি। হাওড়া থেকে যেদিন রওনা হই, আমার তিন পূর্ণ হতে তখনও কয়েকটা দিন বাকি। কথাটা এইজন্য বলছি যে, এই বয়স নিয়েই রেলগাড়িতে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটেছিল। রেল-কোম্পানির নিয়ম তো আজকাল নিত্য পালটায়, তাই এই মুহূর্তে কী নিয়ম চলছে, তা হলফ করে বলতে পারব না, তবে তখনকার নিয়মটা এই ছিল যে, বয়স যাদের তিন বছরের কম, তাদের জন্য টিকিট কাটবার দরকার হত না।

এই নিয়েই গণ্ডগোল। চেকার যখন আমার টিকিট দেখতে চাইলেন, বাবা বললেন, ওর আবার টিকিট কিসের, ওর বয়স এখনও তিন পূর্ণ হয়নি।

চেকারবাবুটি সে-কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁকে খুব দোষ দিতে পারছি না এইজন্য যে, বয়সের তুলনায় একে তো তখনই আমি বেশ ঢ্যাঙা ছিলুম, তার উপরে আবার ছেলেবেলায় যে অসুখটা আমাকে বড্ড ভোগাত, সেই ম্যালেরিয়া তখনও তেমন করে আমার দখল নিতে পারেনি বলে স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই ছিল। তবে কিনা, আমার বয়সের কথাটা যতই অবিশ্বাস করুন, বাবাকে মিথ্যেবাদী বলাটা নিশ্চয় চেকারবাবুটির পক্ষে খুবই অবুদ্ধির কাজ হয়েছিল। সেটা তিনি তন্মুহূর্তে বুঝতে পারেননি। যখন বুঝলেন, বাবা তখন তাঁকে দু'হাতে তুলে ধরে চলন্ত গাড়ি থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলবার জন্য দরজার দিকে এগোচ্ছেন। অন্যান্য যাত্রীরা এগিয়ে এসে বাবাকে জাপটে না ধরলে সেদিন যে কী কাণ্ড হত, ভাবতে গেলে এখন শিউরে উঠি।

সে-যাত্রায় দেওঘরে গিয়েছিলুম আমরা পাঁচজন। বাবা, মা, দিদি, মেজোকাকা আর আমি। পুজোর পরে হপ্তা খানেকের জন্যে চারুচন্দ্র চক্রবর্তীও আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। ঠাকুর্দার কাছে ফেরা হয়নি বলে প্রথমটায় আমি একটু মুষড়ে পড়েছিলুম ঠিকই, তবে পাহাড় দেখে সেই মন খারাপ অনেকখানি কেটে যায়।

মধুপুব, গিরিডি, যশিডি, ঝাঁঝাঁ, দেওঘর, শিমুলতলা, কত আর নাম করব, পুজোর সময় এ-সব জায়গা যেন একেবারে রাজেন্দ্রাণীর মতো সেজে উঠত। হিল্লি-দিল্লি যাবার জন্যে সেকালে বড়-কেউ ব্যস্ত হতেন বলে মনে পড়ে না, পুজোর ছুটিতে বাঙালিবাবুবা কাছেপিঠের এইসব জায়গাতেই যেতেন দেখেছি। তাতে যেমন বাইরে থেকে কযেকটা দিনের জন্য ঘুরে আসবার গবজটাও মিটত, তেমন আবার হাওয়া-বদলের কাজটাও হত চমৎকাব। যেমন হাওয়া, তেমন জল, দুটোই ছিল স্বাস্থ্যকর। তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য ছিল নির্ভেজাল, আর কলকাতার তুলনায় তার দামও ছিল খুব শস্তা। ড্যাঞ্চিবাবুদের কথা আশা করি সবাই শুনে থাকবেন। কলকাতায় বোমা পড়তে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় ক্যালকেশিয়ান বাবুদের অনেকেই তাঁদের পৈতৃক প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে এইসব জায়গায় এসে ভিড় জমিয়েছিলেন। হাটেবাজারে গিয়ে যা-কিছুই তাঁরা কেনেন, তা-ই তাঁদের কাছে 'ড্যাম চিপ'। এই 'ড্যাম চিপ' কথাটা খুবই ঘন-ঘন তাঁরা বলতেন নিশ্চয়, ফলে তাঁদের নামই হয়ে যায় ড্যাঞ্চিবাবু।

তাঁদের কথা আলাদা। কলকাতার যে-সব সম্ভ্রান্ত পরিবার তার অনেক আগেই এইসব স্বাস্থ্যকর জায়গার প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা নেহাত কম হবে না। এই শতকের গোড়ার দিকে তো বটেই, গত শতকের শেযার্ধেও তাঁদের অনেকে এখানে বাড়ি কিনেছিলেন কিংবা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। সাঁওতাল পরগনা আর ছোটনাগপুরের ছোটখাটো অনেক শহরেই সে-সব বাড়ি আজও চোখে পড়বে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা নিয়মিত মাইনে দিয়ে লোক রাখতেন, আর বছরে অন্তত একবার হলেও সপরিবার সেখানে যেতেনও। এখন অবশ্য সে-সব বাড়ির অধিকাংশেরই অতি জরাজীর্ণ অবস্থা। বট-অশথের চারা শেকড় চালিয়ে দেওয়াল ফাটিয়েছে, জানালা-দরজাও হয় ঘুণে ধরে খসে পড়ছে, কিংবা লোপাট। বিস্তর বাড়ি যে বিক্রি হয়ে যায়নি, তাও নয়। বোঝাই যায় যে, সেকালের কর্তারা যা বড় শখ করে বানিয়েছিলেন, বর্তমান প্রজন্মের বংশধরেরা সেখানে বড়-একটা যাবার উৎসাহ পায় না। পাবেই বা কেন। এ-সব জায়গায় তো আর প্লেনে করে যাবার উপায় নেই, সেটা থাকলে হয়তো যাবার একটা গরজ থাকত।

কথার সুতো ছাড়তে-ছাড়তে অনেক দূরে চলে এসেছি, এখন আবার সুতো গুটিয়ে দেওঘরে ফেরা যাক। কিন্তু তার আগে মধুপুর আর গিরিডিকে একটু ছুঁয়ে যেতে চাই। ১৯৪৪ সালে বি.

এ. পরীক্ষা দিয়ে আমার দুই বন্ধু অসিত বসু আর রবি চক্রবর্তীর সঙ্গে মধুপুরে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে যাই গিরিডি। যেমন মধুপুর, তেমন গিরিডিও তখন ফাঁকা জায়গা। গিরিডি থেকে যে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম, সে একেবারে আদ্যন্ত শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে। যে লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, মনে আছে যে, এখানে বাঘ-টাঘ আছে কি না, রবির এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল, 'রাত্তিরে মাঝে-মাঝে বাঘের দেখা পাওয়া যায় বটে।' তাতে রবি বলে, 'রাত্তিরে তো আর তারা আকাশ থেকে পড়ে না, দিনেও তারা এই জঙ্গলের মধ্যেই আছে নিশ্চয়।' যুক্তিটা একেবারে অকাট্য। ফলে উশ্রী-দর্শনের পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে সন্ধের আগেই আমরা গিরিডিতে ফিরে আসি। তো এই জুলাই মাসেই দিন কয়েকের জন্য হঠাৎ গিরিডিতে যেতে হয়েছিল। মধুপুরের কথা বলতে পারব না, তবে গিরিডি যে আর সেই গিরিডি নেই, সে তো স্বচক্ষেই দেখে এলুম। ইতিহাসের বিখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকার মশাইকে সেবার বারগাণ্ডার পথে নিশ্চিন্ত চিত্তে বৈকালিক ভ্রমণ করতে দেখেছিলুম, আর এবারে দেখি বারগাণ্ডা বলে কথা কী, গিরিডির কোনও রাস্তা দিয়েই নিশ্চিন্ত চিত্তে হাঁটবার উপায় নেই। যে-কোনও মুহূর্তে ঘাড়ের উপরে সাইকেল কি স্কুটার এসে পড়তে পারে। শহরটা কী যে ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে, সে আর বলবার নয়। উশ্রী যাবার পথে সেই জঙ্গলটাই আর নেই। জঙ্গলের যে 'অ্যাপোলজি' রয়েছে, তাতে বাঘ কেন, বনবেড়ালও দেখা যাবে না।

দেওঘরে তো অনেক কাল যাইনি। তাই সেখানকার অবস্থাও এইরকম দাঁড়িয়েছে কি না, তা আর কী করে বলব। তবে জায়গাটা তখন সত্যি বড় সুন্দর ছিল। শহরের মধ্যেই এখানে-ওখানে ছিল ছোট-ছোট শালজঙ্গল। ক্যাসটেয়ার্স টাউন, বম্পাস টাউন ইত্যাদি সব জায়গা আসলে ছিল এক-একটা মহল্লা। এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় যেতে হলে শালজঙ্গল পেরিয়ে যাবার দরকার হত। তা রেলগাড়িতে চড়ে সেই আমার প্রথম পশ্চিমে যাওয়া। ভোরবেলায় যশিডিতে নেমে গাড়ি পালটাই। সেই প্রথম পাহাড় দেখি। শালজঙ্গল দেখি। তারপর ত্রিকূট পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ঝরনাও দেখা হল। যা দেখি, তা-ই নতুন লাগে। এর মধ্যে একদিন সবাই মিলে নন্দন পাহাড়ে গিয়ে চড়ুইভাতিও করে এসেছি।

চারুচন্দ্র আমার বড়কাকিমার কাকা, সম্পর্কে অতএব আমার মাতামহের তুল্য। তাঁকে আমি তখন দাদা-ই বলতুম। তখনও তিনি চাকরিতে ঢোকেননি, লেখক হিসেবেও জীবন শুরু করেছেন মাত্র, তবে ছোটদের কাগজে নিয়মিত বার হত তাঁর গল্প, আর তা ছাড়া মুখে-মুখেও তাঁর গল্প বলার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সবই হাসির গল্প। রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাবার পরে তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম। শুনতে-শুনতে হেসে গড়াতুম আমরা। মাঝখানে অনেক কাল গল্প লেখা বন্ধ রেখে, হঠাৎ আবার যখন 'লৌহকপাট' লিখলেন, তখন তিনি বড়দের লেখক। তাতে বড়দের লাভ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছোটদের কথা যখন ভাবি, তখন একটু দুঃখ হয়। মনে হয়, তাদের হাতেও তো তাঁর অনেক-কিছু তুলে দেবার ছিল। সেটা দেবার আগেই যে কেন শিশুসাহিত্যের আঙিনা থেকে তিনি সরে গেলেন, তা আমি জানি না।

দেওঘরে সেবারে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন কলকাতা-বেতারকেন্দ্রের গল্পদাদু। সপরিবার তিনিও গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। দুই পরিবারের খুব একটা সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সকালের দিকে গল্পদাদু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। বারান্দায় বসে বাবা আর চারুচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করতেন। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এ ছাড়া আর অন্য কিছু মনে নেই।

দুপুরবেলায় আমাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে মা নিজেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়তেন। তখন নিঃশব্দে

তাঁর পাশ থেকে আমি বারান্দায় এসে বসতুম। বাড়ির সামনে টানা বারান্দা। সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, শালজঙ্গল দেখা যায়, মাথায় ঝুড়ি নিয়ে শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যারা হাটে যাচ্ছে, তাদেরও দেখা যায়। সারা দুপুর এইসবই আমি দেখতুম। দেখে-দেখে আর আশ মিটত না। আমার মন-খারাপ একেবারেই কেটে গিয়েছিল।

এরই মধ্যে এসে গিয়েছিল, আমার জন্মদিন। মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মদিনের ঘটাপটা নেহাতই একালের ব্যাপার। অনেক বাড়িতে তো এমনভাবে জন্মদিন পালন করা হয় যে, মনে হয়, বাচ্চাটি যে অনুগ্রহ করে জন্মেছে, তাতেই কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে গোটা পরিবার। আমাদের ছেলেবেলায় এ-সব কল্পনাও করা যেত না। যার জন্মদিন, তাকে একটু পায়েস রেঁধে খাইয়ে দেওয়া হল তো খুব হল, তার বেশি কিছু করলে সেটা পড়ত আদিখ্যেতার পর্যায়ে। দেওঘরে থাকতে মা অবশ্য মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ এনে আমার মুখে সেদিন তুলে দিয়েছিলেন। প্যাড়া-প্রসাদ, খেতে খারাপ লাগেনি।

একদিন হাতির পিঠে চড়া হয়েছিল। মাহুত তার হাওদা-বসানো হাতি নিয়ে আমাদের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে বারান্দা থেকে বাবা আমাকে মাহুতের দিকে ছুড়ে দেন। মাহুত আমাকে শূন্যপথে লুফে নিয়েছিল ঠিকই। লুফতে না পারলে হাতির পায়ের তলায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা না হই, উঠোনে পড়ে গিয়ে নির্ঘাত হাড়গোড় ভাঙত। বাবার কাছ থেকে একটু দূরে-দূরে থাকাই যে নিরাপদ, সেই তিন বছর বয়সেই সে-কথা বিলক্ষণ বুঝে যাই।

দেওঘরের দিনগুলি খুব আনন্দে কেটেছিল। তবে তারই মধ্যে দু'দিন যে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম, তাও মনে আছে। একদিন রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের মধ্যে ফিতে-নামানো একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। খুবই অল্প আলো। তবু বুঝতে পারি যে, বিছানায় শুধু আমি আর দিদি শুয়ে আছি। মা আর বাবা খাটের দু'ধারে শুতেন, তাঁদের কাউকেই দেখতে না পেয়ে দিদির ঘুম ভাঙিয়ে দিই। তারপর দুজনেই একেবারে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করি। কান্না শুনে পাশের ঘর থেকে মেজোকাকা ছুটে এসে বলেন যে, বাবা আর মা দুর্গাবাড়িতে পুজো দেখতে গিয়েছেন, আর একটু বাদেই তাঁরা এসে পড়বেন। তাতে প্রবোধ মানা তো দূরের কথা, আমাদের কান্না আরও বেড়েই যায়। অগত্যা মেজোকাকা বলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কাঁদতে হবে না, চল্ তা হলে সেখানেই তোদের নিয়ে যাচ্ছি।" বাড়িতে তালা লাগিয়ে, আমাকে কাঁধে তুলে, দিদির হাত ধরে সেই মাঝরাত্তিরে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েন।

দূর থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছিল, কিন্তু পথ একেবারে নির্জন। তার উপরে অন্ধকার। কখনও সেই পথ ধরে, কখনও বা শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দুই বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে মেজোকাকা তো দুর্গাবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে হ্যাজাক তো ছিলই, তা ছাড়া জ্বলছিল অনেকগুলো মশাল। মানুষজনের ভিড়, প্রচণ্ড হট্টগোল, ওদিকে আবার সমানে ঢাক বাজছে। বাবা আর মা'কে তো প্রথমটায় তার মধ্যে খুঁজেই পাওয়া গেল না।

মেজোকাকার কাঁধ থেকে আমি আর নামিনি। সেখান থেকেই দেখছিলুম যে, চার-পা বাঁধা একটা সাদাটে রঙের মস্ত মোষকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে, আর মালকোচা-মারা জনা-দুই যণ্ডামার্কা মানুষ তার ঘাড়ের কাছে খুব ডলাই-মলাই করছে। খানিক বাদেই সেই প্রকাণ্ড জীবটাকে হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেওয়া হল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। গোটা জায়গাটা রক্তে ভেসে গেল। কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ছুটে এসে মাটি থেকে সেই রক্ত তুলে নিয়ে যে-যার কপালে মাখতে থাকল। কেউ-কেউ একেবারে পাগলের মতো নাচতে লাগল। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

ভয় পেয়ে ফের কাঁদতে শুরু করেছিলুম আমি। তারই মধ্যে ভিড়ের ভিতরে বাবা আর মা'কে

খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। মেজোকাকার কাঁধ থেকে বাবা আমাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অনেকবার তোমাকে বলেছিলুম যে, নবমীর দিনে এখানে মোষবলি হয়, তাও তুমি না এসে ছাড়লে না।" মা চুপ করে রইলেন। তারপর বাড়ির পথে ফিরতে-ফিরতে মেজোকাকাকে নিচু গলায় বকুনি দিয়ে বললেন, "তোকে তো বলেই এসেছিলুম যে, জেগে উঠলেও ওদের এখানে নিয়ে আসবি না, একটু ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখবি। তা তোকে দিয়ে যদি একটা কাজও ঠিকমতো হয়!" মেজোকাকা কিছু বললেন না। বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মা যেমন চুপ করে ছিলেন, মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে সেজোকাকাও তেমন চুপ করে রইলেন। আমি ভাবতে লাগলুম যে, এর পরে আবার মেজোকাকা আমাকে বকবেন কি না।

দুর্গাপুজোর পরে দেওঘরে আসেন চারুচন্দ্র আর প্রতুলচন্দ্র ঘোষ। প্রতুলচন্দ্রকে আমরা কাকাবাবু বলতুম। তার কারণ তিনি ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুত্র, প্রফুল্লচন্দ্রের ছোট ভাই। তিনি সপরিবার এসেছিলেন। বড় হয়ে বঙ্গবাসী কলেজে যে একটা বছর আই. এ. পড়েছি, প্রতুলচন্দ্র তখন আমাদের বাইবেল পড়াতেন। অতিশয় ভদ্র স্বভাবের মানুষ, সম্ভবত সেই কারণেই খুব নিচু গলায় কথা বলতেন, ফলে পিছনের বেঞ্চিতে যারা বসত, তাঁর একটা কথাও তারা শুনতে পেত না। যেমন ভদ্র, তেমন শৌখিন মানুষ। রুপোলি তবকে মোড়া এলাচ খেতেন। তিনি ঘরে ঢুকলেই মিষ্টি একটা সুবাসে গোটা ঘর ভরে উঠত। বাবা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

এঁরা সব এসে পড়ায় সবাই মিলে একদিন ত্রিকূট পাহাড়ে যাওয়া হয়। সেদিনও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েছিলুম আমরা। নামার সময়ে অন্যেরা যেটা চেনা রাস্তা সেইটে ধরে নামতে থাকলেও আমাকে কাঁধে নিয়ে বাবা নামতে থাকেন একেবারেই অচেনা একটা পাকদণ্ডি দিয়ে। নেহাতই আন্দাজের উপরে নির্ভর করে নামছিলেন। ফলে একটু বাদেই পথের নিশানা হারিয়ে অন্যদের কাছ থেকে আমরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হই। খানিক আগে অন্যদের সঙ্গে যখন ছিলুম, তখন একটা বোঁটকা গন্ধ পেয়ে সবাই বলাবলি করছিল যে, এ নিশ্চয় বাঘের গায়ের গন্ধ। সেই গন্ধটা এবারে আরও তীব্র হয়ে উঠল। এদিকে জায়গাটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। যাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, দূর থেকে তাঁরা চেঁচিয়ে আমাদের ডাকছেন। আমরাও ডাকছি তাঁদের। কিন্তু আমাদের ডাক তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন কি না, তা বুঝবার উপায় নেই। সবটা মিলিয়ে আমি যে খুব ভয় পেয়েছি, বাবা তা বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়। নইলে নামতে-নামতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি কাঁধ থেকে আমাকে নামিয়ে আমার মুখের দিকে অমন তীব্র চোখে তাকাতেন না। খানিক বাদেই তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটল। বললেন, "ছিঃ, ভয় পেতে নেই।"

সত্যি বলি, অনেক তো বয়স হল, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর চেয়ে সুন্দর কথা আর একটাও আমি শুনিনি।

জ্ঞান হবার পর থেকে আমার যে তিন পিসিকে আমি দেখেছি, তাঁদের মধ্যে মেজোপিসির বিয়ে যে আলগি গ্রামে হয়েছিল, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি আমার বাবার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট আর আমার মায়ের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তিন ননদের মধ্যে মা একমাত্র তাঁকেই ঠাকুরঝি বলতেন, অন্য দুজনকে ডাকতেন নাম ধরে। সেজোপিসি আমার মায়ের একেবারে সমবয়সী। আর ছোটপিসি আমার মায়ের চেয়ে তা অন্তত বছর ষোলোর ছোট। মা তাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, ফলে এই ননদটিকে তিনি নিজের মেয়ে ছাড়া আর অন্য-কিছু বলে ভাবতেই পারতেন না। পিসিদের নাম যথাক্রমে নিস্তারিণী, স্নেহলতা ও নিরুপমা। ডাকনাম নিচি, চিনি ও পুঁটি।

বড় পিসেমশাই কাজ করতেন বর্ধমান রাজ এস্টেটে। কর্মসূত্রে তাঁকে বর্ধমানেই থাকতে হত। এক ওই পুজোর ছুটিতে তিনি আলগিতে যেতেন, অন্য সময়ে যাবার উপায় ছিল না। মেজোপিসি কিন্তু গ্রামের বাড়িতেই বরাবর থেকেছেন। আলগির সেই বাড়িতে সস্ত্রীক বড়দাও যেমন থাকতেন, তেমন আবার সেখানে থেকেই ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়তো আমার মেজোপিসির বড় ছেলে। পরের ছেলেটি ছিল আমারই সমবয়সী। কিন্তু সে খুব অল্প বয়সে মারা যায়। তার কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। মেজোপিসির ছোট ছেলে আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। বড়দা বামনদাসের কথা তো আগেই বলেছি। তাঁর এই দুটি ছোট ভাইয়ের নাম গুরুদাস ও দেবদাস।

লেখালিখির ব্যাপারটাকে পরে আর আঁকড়ে ধরে থাকেনি বটে, তবে সাহিত্য রচনায় দেবদাসের যে একটা জন্মগত প্রতিভা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তার ইস্কুল-জীবনের বন্ধু ছিল পুষ্পরঞ্জন। এদের দুজনেই এককালে 'দেশ' পত্রিকায় অতি চমৎকার কিছু গল্প লিখেছে। দেবদাস উপরন্তু কবিতাও লিখত। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার যাঁরা মনোযোগী পাঠক, সে-সব কবিতার কথা তাঁরা হয়তো মনে করতে পারবেন। তা ছাড়া, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সংকলনেও রয়েছে তার একটি স্নিগ্ধ সুন্দর কবিতা। কিন্তু এও তো অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা। আমি যখনকার কথা বলছি, আমার নিজের বয়স তখন পাঁচবছর, আর আমার এই পিসতুতো ভাইটি তখনও হাঁটতে শেখেনি, স্রেফ হামা টেনে উঠোনের উপরে ঘুরে বেড়ায়।

মোটামুটি ওই বয়সেই একা-একা মাঠ পেরিয়ে আমি মেজোপিসির বাড়িতে যেতে শিখি। শীতকালে যখন যেতুম, মাঠে তখন কড়াইশুঁটি ফলেছে। কড়াইশুঁটির কচি দানা খেতে-খেতে মাইল দুয়েক পথ পাড়ি দেওয়া কোনও কষ্টের ব্যাপার ছিল না। সর্ষেফুলের নবীন হলুদ রঙে মাঠ তখন একেবারে আলো হয়ে থাকত। মাঠের শেষে বসন্তখালির খাল। তার উপরে খুব উঁচু করে তৈরি করা, যেন বা রামধনুর মতন অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকানো, মস্ত বাঁশের সাঁকো। এই সাঁকোটার একটা বৈশিষ্ট্য

ছিল। এ-সব সাঁকোয় যার উপরে পা ফেলতে হয়, সেও আসলে বাঁশই। বসন্তখালির সাঁকোয় কিন্তু চওড়া পুরু কাঠের পাটাতন পাতা। ফলে অন্য সব সাঁকোর মতন পা টিপে-টিপে সাবধানে পার হওয়ার দরকার হত না, এক ছুটে পেরিয়ে যেতুম। সাঁকো পেরোলেই পিসির বাড়ি। তাই সেখান থেকেই ডাক ছাড়তুম : পিসিমা!

আলগির এই বাড়িতেই থাকতেন মেজোপিসির চেয়েও বয়সে বড় এক বিধবা ভদ্রমহিলা। তাঁকে আমার পিসতুতো দাদারা বলতেন ভাল-মা, আমি বলতুম বড় পিসি। বাবা তাঁকে দিদি বলে ডাকতেন। আমার ঠাকুমাকে তিনি বলতেন মা। তাই অনেক দিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, আমার পিসিদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড়। পরে জানতে পারি যে, তিনি আমার বড় পিসেমশাইয়ের দাদার স্ত্রী। দাদাটি খুবই অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। তা নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ ছিল বলে মনে হয় না। আমার মেজোপিসিকে তো সংসারের কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত, পিসতুতো ভাইদের বড় করে তুলবার ভার তিনি তাই তাঁর এই বড়-জা'র হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই মহিলা কখনও তাঁর বাপের বাড়ি যেতেন না ; আসলে আমাদের চান্দ্রার বাড়িই তাঁর বাপের বাড়ি হয়ে দাঁড়ায়। গোলাপি-পিসির বেলাতেও এই একই ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। তাঁর কথা যথাসময়ে বলা যাবে। ইতিমধ্যে আমার পিসেমশাইদের সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা যাক।

তিন পিসেমশাই ছিলেন একেবারে তিন রকমের মানুষ। বড় পিসেমশাই যখন মারা যান, আমার বয়স তখন বছর ছয়েকের বেশি হবে না। সেই কারণে তাঁকে আমি খুব কমই দেখেছি। তবে যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়, আমাদের বাড়ির প্রত্যেকেরই তিনি ছিলেন খুব আপনজন। তিনি এলে বাড়িতে যেন আনন্দের বান ডাকত। তাঁর প্রথম স্ত্রী তো বাবার দিদি। পবে যদিও আমার মেজোপিসির সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়, বাবা ওই প্রথম সম্পর্কের সূত্রটাকেই বড় বলে গণ্য করতেন। ফলে বড় পিসেমশাইকে তিনি খুব মান্যি করে চলতেন, তাঁর সঙ্গে বাবাকে কখনও উঁচু গলায় কথা বলতে দেখিনি। আমি, দিদি আর ছোটপিসি যে তাঁকে খুব ভালবাসতুম, তার কারণ, বর্ধমান থেকে আসবার সময়ে আমাদের জন্যে হরেক রকমের খেলনা আর মিষ্টি তিনি নিয়ে আসতেন। সীতাভোগ আর মিহিদানার সঙ্গে আমার প্রথম-পরিচয়টা সম্ভবত তিনিই ঘটিযে দেন। এদিকে আবার বাড়িব দুই বউয়েরও তিনি ছিলেন সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তি। পুজোর ছুটিতে যখন বর্ধমান থেকে আলগিতে যেতেন, তখন দু-এক দিনের জন্য আসতেন আমাদের চান্দ্রার বাড়িতেও। ব্যস্, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে মা আর বড়কাকিমার যা-কিছু নালিশ, বড়-নন্দাইয়ের কাছে তার ফিরিস্তি পেশ করবার সেটাই ছিল সুবর্ণসুযোগ। তাঁরা দুজনেই জানতেন যে, স্রেফ অভিযোগ শুনেই এই মানুষটির কাজ ফুরোবে না, সাধ্যমতো তিনি তার বিহিত করবারও চেষ্টা করবেন। তা তিনি করতেনও। খুবই স্পষ্টভাষী ছিলেন। এমনিতে স্নেহশীল মানুষ, কিন্তু যেটা ন্যায্য কথা, কাউকেই সেটা শোনাতে তাঁর কোনও কুণ্ঠা ছিল না। আমার ঠাকুমাকে একদিন মিষ্টি করে যা বলেছিলেন, তা আমার মায়ের কাছে শুনেছি। "মা, আপনার বিচারের সত্যি তারিফ না-করে উপায় নেই। আপনি চাইছেন যে, পুজোর ক'টা দিন আপনার মেয়ে এসে আপনার কাছে থাকুক, তা এদিকে আবার আপনার মেজো-বউমাকে নাকি তখন তার মায়ের কাছে পাঠাতে চাইছেন না। এর চেয়ে ভাল বিচার আর কী হতে পারে!" মা বলেন, "তোর বাবাও তাঁর এই ভগ্নীপতিটিকে একটু সমঝে চলতেন।" একবার নাকি ওই পুজোর মুখেই এক বন্ধুকে শ'খানেক টাকা ধার দিয়ে তারপর বাড়িতে ফিরে মাইনের বাদবাকি টাকা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বাবা বলেন, "এবারে এই দিয়েই চালিয়ে নাও। ...আর হ্যাঁ, দু'দিন বাদেই তো জামাইবাবু আসছেন,

তখন যেন আবার এই নিয়ে তাঁর কাছে নালিশ-টালিশ কোরো না।" এ সব কথা শুনে বুঝতে পারি যে, সর্ব অর্থেই এই মানুষটি ছিলেন আমাদের পরিবারের প্রকৃত বন্ধু ও শুভার্থী অভিভাবক।

বড় পিসেমশাইয়ের মৃত্যুর দিনটির কথাও মনে পড়ে। বর্ধমান থেকেই অসুস্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর অসুখের বাড়াবাড়ি হওয়ায় প্রায় শেষ অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তালতলা থেকে তার মাত্র কিছুদিন আগেই আমরা শেয়ালদা-পাড়ায় উঠে এসেছি। সেই নতুন-বাসাবাড়ির একতলার চাতালে পিসিমার আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে কান্নার দৃশ্যটা এখনও চোখে ভাসছে। ঘাট-কাজের দিন আমার পিসতুতো ভাইদের মাথা কামানো সবে শেষ হয়েছে, পিসিমা হঠাৎ পরামানিকের হাত থেকে কাঁচিটা কেড়ে নিয়ে তাঁর নিজের একঢাল চুলও চোখের নিমেষে কেটে ফেলেন। সেই চুল আর কখনও তিনি বড় হতে দিলেন না। বাবার সেদিনকার চেহারাটাও ভুলে যাইনি। একতলার সিঁড়ির নীচের ধাপে সারাক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে ছিলেন। একমাত্র দেবদাসই সম্ভবত কিছু বুঝতে পারছিল না। তার বয়স তখন দু'বছর।

আমার সেজো পিসেমশাই ছিলেন একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ। তিনি ফরিদপুরের লোক, তবে কর্মসূত্রে স্ত্রী পুত্রকন্যা নিযে তিনি বহরমপুরে থাকতেন। সেখানে তাঁর বাসা ছিল গোরাবাজার এলাকায়, কৃষ্ণনাথ কলেজের খুবই কাছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পা হাঁটলেই গঙ্গা। সেজোপিসি ছিলেন মায়ের সমবয়সী, মাঝেমধ্যে কলকাতায় আসতেন, তখন সঙ্গে করে আনতেন বহরমপুরের ছানাবড়া আর গ্রীষ্মকাল হলে মুরশিদাবাদের আম। তা একবার কলকাতা থেকে ফিরে যাবার সময়ে ছানাবড়ার লোভ দেখিয়ে আমাকেও দিন কয়েকের জন্যে বহরমপুরে নিয়ে যান। গিয়ে দেখি, যে দোতলা বাড়ির উপরতলাটা নিয়ে তাঁরা থাকেন, তার একতলাতেই ছানাবড়ার দোকান। দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। সেই দিনই রাত্রিশেষে আমার চোখ দুটি যে ছানাবড়ার আকৃতি ধারণ করবে, তখনও সেটা কল্পনা করতে পারিনি। তখন ডিসেম্বর মাস। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। লেপ মুড়ি দিয়ে আমি আর আমার পিসতুতো ভাইবোনেরা অঘোরে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ একটানে সকলের লেপ কে যেন সরিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি, পিসেমশাই। বাইরে অন্ধকার, কিন্তু ঘরে আলো জ্বলছে। কী ব্যাপার ? না, এই হচ্ছে ব্রাহ্মমুহূর্ত, এক্ষুনি শয্যাত্যাগ করতে হবে।

শুধু শয্যাত্যাগ করেই রক্ষে নেই, একেবারে মিলিটারি কায়দায় মার্চ করিয়ে আমাদের তিন ভাইবোনকে তিনি বাড়ি থেকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেলেন। সত্যি কথাটা স্বীকার করাই ভাল, পিসেমশাইয়ের হুকুম দেবার ধরন দেখে প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল যে, যে-কোনও কারণেই হোক, তাঁর মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে, এবারে নির্ঘাত আমাদের তিনি গঙ্গায় ডুবিয়ে মারবেন। পরে দেখলুম তা নয়, আমাদের গঙ্গাস্নান করতে হবে। কেন ? না নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান করলে দেহমন শুদ্ধ হয়, চিত্তে কোনও কুচিন্তা প্রবেশ করতে পারে না। কাকে যে কুচিন্তা বলে, সেটা বুঝবার মতন বয়স তখনও হয়নি। তবে জলে নেমে গোটা কয়েক ডুব আমাদের দিতেই হল। তারপর গা-হাত-পা মুছে, হি-হি করে কাঁপতে কঁপতে বাড়ি ফিরে দেখি, সেজোপিসি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একপ্রস্ত গরম জামাকাপড়। তারও খানিক বাদে শুনলুম, রাস্তা দিয়ে কে যেন নামগান করতে-করতে চলেছে 'ভজো গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লহো গৌরাঙ্গের নাম রে..।' কিন্তু আমরা ততক্ষণে আবার যে-যার লেপের তলায় সেঁদিয়ে গিয়েছি।

তো এই হচ্ছেন আমার সেজো পিসেমশাই। ধর্মপ্রাণ অবশ্যই। তবে কিনা যত না ধর্মপ্রাণ, তার চতুর্গুণ আচারনিষ্ঠ। তা যদি না-ই হবেন, তো ঘোড়ার গাড়িতে করে যেদিন আমাদের

হাজার-দুয়ারি, কাটরা মসজিদ ইত্যাদি সব দেখাবার জন্য মুরশিদাবাদ নিয়ে যান, সেদিন রাত্তিরে নিশ্চয় দ্বিতীয়বার আমাদের গঙ্গাস্নান করিয়ে ছাড়তেন না। তিনি জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি সব ব্যাপার অতিমাত্রায় মানতেন, অনাত্মীয় কারও বাড়িতেই খাদ্যগ্রহণ করতেন না, এবং নিজের বাড়িতেও সকালবেলার আহ্নিক ও নিত্যপূজা শেষ না করে এক ঢোক জল পর্যন্ত খেতেন না। আমাদের পরিবারে এ-সব বাড়াবাড়ি কখনও ছিল না, তাই সেজো-পিসেমশাইয়ের জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যে সেজোপিসির পক্ষে—আমরা বলতুম সোনাপিসি—খুব শক্ত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে কিনা তিনি ছিলেন নিতান্ত নির্বিরোধ ভালমানুষ, তাই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে বৃহৎ কোনও অশান্তি কখনও দেখা দেয়নি।

বহরমপুর সম্পর্কে আর-একটা কথাও মনে পড়ে। অবস্থাটা এখন কেমন দাঁড়িয়েছে জানি না, তবে সেই সময়ে বহরমপুরে হনুমানের খুব দৌরাত্ম্য ছিল। মানুষজনকে তারা থোড়াই পবোয়া করত, দঙ্গলে-দঙ্গলে তাবৎ বাড়ির ছাত থেকে ছাতে লাফিয়ে বেড়াত, দুপুরের রোদ্দুরে বড়ি আচার কি আমসত্ত্ব শুকোতে দিয়ে গেরস্তকে সর্বদা ভয়ে-ভয়ে থাকতে হত যে, এই বুঝি সব লোপাট হয়ে যায়। আমার পিসতুতো ভাই শিবু একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালবেলার জলখাবার খাচ্ছে, হঠাৎ পাশের বাড়ির ছাত থেকে একটা গোদা-হনুমান সেখানে লাফিয়ে পড়ে শিবুকে একটা বিশাল থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে তার হাতের খাবার কেড়ে নিয়ে পরক্ষণেই আবার লম্ফ দিয়ে পালিয়ে যায়, এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

একদিকে শীতের শেষরাত্তিরে নিত্য গঙ্গাস্নানেব নির্যাতন, যার ফলে ডবল নিউমোনিয়ায় মাবা পড়া কিছু বিচিত্র ছিল না (তবে কিনা ঈশ্বরের ইচ্ছাটা নিশ্চয়ই ছিল অন্যবকম, অপাঠ্য কিছু পদ্য লিখিয়ে নেবেন বলেই বোধ হয় যে-যাত্রা তিনি আমাকে বাঁচিয়ে দেন।), অন্যদিকে হনুমানের উৎপাত। বহরমপুরের সাতটা দিন সেবারে তবু যে খুব খারাপ কাটেনি, তার কারণ পিসিমা যেমন ছিলেন যারপরনাই স্নেহময়ী, পিসতুতো ভাইবোন দুটিও ছিল তেমন মিষ্টি স্বভাবের। আর হ্যাঁ, মিষ্টির কথায় মনে পড়ে গেল যে, বাড়ির নীচে সেই ছানাবড়ার দোকানটা তো ছিলই। সোনাপিসির কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে মায়া, শিবু আর আমি মাঝে-মাঝেই নীচে চলে আসতুম। ছানাবড়ার দাম তখন এক পয়সায় একটা। সাইজও ছিল রাজভোগের মতো। কিছুদিন আগে বহরমপুরে গিয়ে দেখি, ছানাবড়ার দাম টাকা-টাকা। সাইজও রাজভোগ থেকে রসগোল্লায় নেমেছে। তার উপরে আবার দফায়-দফায় টাকার যে ডিভ্যালুয়েশন হল, তাতে তার সাইজ ইতিমধ্যে যদি রসগোল্লা থেকে রসমুণ্ডিতে নেমে গিয়ে থাকে তো অবাক হব না।

রসমুণ্ডি অনেকেই দেখেননি। কী করেই বা দেখবেন। জিনিসটা বাজার থেকে বহুকাল হল উধাও হয়ে গিয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় তো বটেই, যৌবনকালেও ওটা কিন্তু কলকাতায় পাওয়া যেত। বিশ-তিরিশের দশকে রসগোল্লার দাম ছিল এক পয়সা, আর তারই ছোট সংস্করণ এই রসমুণ্ডি বিক্রি হত পয়সায় চারটে করে। রসমুণ্ডির দোসর ছিল গুঁজিয়া। দাম আগের তুলনায় বেড়েছে অবশ্য, তবে গুঁজিয়া এখনও উধাও হয়নি। বড়-বড় দোকানে না হোক, গলির ভিতরকার ছোটখাটো প্লিবিয়ান দোকানে এখনও ও-বস্তু পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে রসমুণ্ডি যে আমাদের জীবন থেকে একেবারে সর্বৈব নির্বাসনে চলে গেল কেন, বুঝতে পারি না। নাকি রসোমালাই বলে যা চলে, তারই মধ্যে সে আত্মগোপন করে রয়েছে?

তো রসমুণ্ডি নয়, কথা হচ্ছিল আমার পিসেমশাইদের নিয়ে। দুই পিসেমশাইয়ের কথা তো বলা হল, এবারে তৃতীয় জনের কথা বলি। এঁর সঙ্গে আমার ছোটপিসির বিয়ে হয়। হবার কথা ছিল না। তার কারণ, আমার বাবা তাঁর কলেজেরই আর-এক অধ্যাপকের ভাইয়ের সঙ্গে এই

পিসির বিয়েটা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর্দা ওদিকে চাইছিলেন যে, তাঁর এই শেষ কাজটা তিনি কুলীনে করবেন। ফলে বাবার ঠিক-করা সেই সম্বন্ধটা একেবারে শেষ মুহূর্তে ভেঙে দিতে হল, ছোট পিসির বিয়ে হল উমেদপুরের মুখুজ্যে-বাড়ির ছোট ছেলের সঙ্গে। পাত্র তখন কলকাতার হস্টেলে থেকে ডাক্তারি পড়েন।

ছোট পিসির বয়স তখন আর কত হবে, মেরেকেটে বারো কি তেরো। ওই বয়সে আমার ঠাকুমা যেমন কলকাতায় এসে তাঁর স্বামীর সংসারের হাল ধরেছিলেন, তেমন আবার আমার বড়কাকিমাও আমাদের চান্দ্রার বাড়িতে এসে গোটা সংসারের দায়িত্ব তুলে নেন। কিন্তু ছোট পিসির কথা আলাদা। যেমন ঠাকুমা, তেমন আমার বাবা আর মায়ের কাছে ছোটপিসি এত বেশি আদর পেয়েছিল যে, মনের দিক থেকে কোনও পরিণতিই তখনও তার ঘটেনি। ইংরেজিতে যাকে 'টমবয়' বলে, ছোটপিসি ছিল ঠিক তা-ই। যেমন দুরন্ত, তেমন দামাল, সারাটা দিন এমন হুটোপাটি করে বেড়াত যে, সবাই বলত 'গেছো মেয়ে'। তো সেই মেয়ে যে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মী বউ হয়ে ঘোমটা টেনে ঘরের কাজকর্ম করবে, তা কেউ ভাবতেও পারত না। বিয়ের পরে বেশ-কিছুদিন উমেদপুরে তাকে পাঠানোও হয়নি। পাত্রপক্ষকে আগেই বলে রাখা হয়েছিল যে, মেয়ে আর-একটু বড় হোক, তারপরে তাকে সেখানে পাঠানো হবে।

ছোট পিসি আমার চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ওই যে রামপ্রসাদী গানে আছে '....বয়স বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই, মনটি শিশুর মতন রেখো', ছোটপিসিরও এইরকম একটা প্রার্থনা ছিল বোধহয়, ফলে বয়স বাড়লেও তার মনটা একেবারে শিশুর মতোই থেকে যায়। সে আমাদেরই দলে ভিড়ে গিয়ে, শাড়িটাকে ছেলেদের মতন মালকোঁচা মেরে পরে গাছে উঠত, হাডুডু খেলত, লাট্টু ঘোরাত, ঘুড়ি ওড়াত। একটু মারকুটেও ছিল। একবার যদি রেগে গেল তো আর জ্ঞানগম্যি থাকত না, যাকে যা বলার নয়, তা-ই বলে বসত। হাত-পা'ও চালাত সমানে। আমার কপাল থেকে একটা দাগ যে আজও মিলিয়ে যায়নি, ওটা তারই 'অবদান'। লাট্টু খেলা হচ্ছিল। লেত্তি থেকে লাট্টুটাকে ছেড়ে দিয়ে মাঝপথ থেকেই উল্টো-টানে যারা আবার সেটাকে হাতের তেলোয় ফিরিয়ে আনতে পারেনি, ফাইন হিসেবে তাদেব লাট্টুগুলোকে রাখা হয়েছে মাটির উপরে একটা বৃত্তের মধ্যে, আর আমরা দু-তিনজন আমাদের লাট্টুর আল্ দিয়ে সেগুলোকে গাঁথবার চেষ্টা করছি। তো আল্ গেঁথে গিয়ে একটা লাট্টু হঠাৎ কেটে যায়। সেটা যে ছোটপিসির লাট্টু, তা আমি বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলুম, মাটি থেকে ফাটা লাট্টুটা তুলে নিয়ে ছোটপিসি তার আল্‌টাকে তখন আমার কপালে বসিয়ে দিয়েছে।

কপাল থেকে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল। ঠাকুমা তেড়ে গেলেন ছোটপিসির দিকে, কিন্তু মা ততক্ষণে ছোটপিসিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে গেছেন। তাঁর কথা, খেলতে-খেলতে অমন এক-আধটু হয়েই থাকে, ও নিয়ে এত ভাববার কিছু নেই, একটু গাঁদাপাতা থেতো করে লাগিয়ে দিলেই হল।

বিয়ের পর বছর দুয়েক আমাদের গ্রামের বাড়িতেই ছিল ছোটপিসি, তারপর ঠাকুমা তাকে কলকাতায় আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। তার দিন কয়েক বাদে ছোট পিসেমশাইকে তাঁর হস্টেল থেকে নেমন্তন্ন করে আমাদের বাসাবাড়িতে নিয়ে আসা হল। ঠিক ছিল যে, রাত্তিরটাও তিনি আমাদের বাড়িতেই কাটিয়ে যাবেন। দোতলার একটা ঘর বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখাও হয়েছিল সেইজন্যে। তো সারা দিন ছোটপিসি খুব গজর-গজর করছিল বটে, তবে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাওয়া পর্যন্ত বিশেষ কোনও গণ্ডগোল হয়নি। সেটা হল খানিক বাদে। অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, 'তুই তো এখন বড় হয়েছিস পুঁটি, এখন কি আর তোকে ছেলেমানুষি

মানায়' এইসব বলে-টলে, মাথায় হাত বুলিয়ে মা তো অনেক কষ্টে ছোটপিসিকে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সবে বাইরে এসে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, এমন সময় বিকট এক চিৎকার, আর তার পরক্ষণেই দড়াম করে দরজা খুলে ছোটপিসি একেবারে ছিটকে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল!

ততক্ষণে আমরা সবাই বারান্দায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছি। দেখতে পেলে মা নিশ্চয় আমাদের ধমক দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিতেন, কিন্তু সেদিকে মন দেবার মতন অবস্থা তখন আব তাঁর নেই। ছোটপিসিকে আঁকড়ে ধরে আর্তগলায় মা বললেন, "কী হল বে পুঁটি?"

ছোটপিসি তখন রাগে ফুঁসছে। বলল, "দূর! দূর! এর নাম বিয়ে! রক্ষে কবো!"

বলে ছুটে এসে মায়ের খাটে দিদির পাশে শুয়ে পড়ল। পড়ল তো পড়েই রইল, অনেক সাধ্যসাধনা করেও সেখান থেকে তাকে আর নড়ানো গেল না। পরদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দিদির কাছে শুনলুম যে, ভোর না হতেই ছোট পিসেমশাই তাঁর হস্টেলে ফিবে গিয়েছেন। মা নাকি অনেক করে তাঁকে থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি থাকেননি। নাকি বলে গিয়েছেন যে, আমাদের বাড়িটা খুবই বিপজ্জনক।

পরের বছরই ছোটপিসিকে উমেদপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিযে দেওযা হয়। ভিতবে-ভিতবে সেও এর মধ্যে খানিকটা অন্তত পালটে গিয়েছিল নিশ্চয়। হযতো সেইজন্যেই সেবাবে আব ছোটপিসি কোনও হাঙ্গামা-হুজ্জুত করল না। পুজোর ছুটিতে আমাদেব গ্রামের বাড়ি থেকে নৌকো নিয়ে আমরাও সেবারে উমেদপুরে যাই। সেই আমার প্রথম পদ্মা দেখা। ভয় পাইযে দেবাব মতোই নদী বটে। একে তো এ-পাব থেকে ও-পার দেখা যায় না, তার উপব বিশাল-বিশাল ঢেউ। সেই ঢেউয়ের মধ্যে আমাদের নৌকো যেন সত্যিই একটা মোচার খোলাব মতো ভাসছিল। পিসিমাব শ্বশুরবাড়ি একেবারে পদ্মাব পাড়ে। বাড়িব বাইবেব দিকটা তখন নদীগর্ভে চলে গিযেছে। তবু নদী যেভাবে নিত্য বাড়াচ্ছে তার ঢেউয়ের থাবা, তাতে বোঝা গেল যে, বাদবাকি অংশটাকেও নিজের পেটের মধ্যে না টেনে নিয়ে সে ছাড়বে না।

মুখুজ্যেবাড়িতে এদিকে তখন দুর্গাপূজার ধুম লেগেছে। সেই উপলক্ষে ছোট পিসেমশাইও এসেছেন কলকাতা থেকে। পিসিকে দেখলুম চেনাই যায় না। আঁচলে একগোছা চাবি বেঁধে, মস্ত একটা ঘোমটা টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। পিসেমশাইকে এর আগে যা দেখেছিলুম, তাতে তাঁকে খুব রাগী বলে মনে হয়েছিল। এখন কিন্তু বেশ হাসিখুশিই দেখলুম। তাঁদের গোটা বাড়িই যে পদ্মাগর্ভে বিলীন হতে চলেছে, তা নিয়েও তাঁকে বিশেষ দুঃখ করতে দেখলুম না। বললেন, 'কী আর করা যাবে, এখান থেকে সরে গিয়ে আবার বাড়ি বানাতে হবে, এই আব কী।'

পুজোর চারটে দিন সেবারে উমেদপুরেই কাটাই। রোজ ভোরবেলায় বাবাব সঙ্গে পদ্মাব ধাবে গিয়ে দাঁড়াতুম। আর দেখতুম আগের রাত্তিরে পদ্মা আরও কতটা এগিয়ে এসেছে। নদীর মধ্যে যে বিস্তর ঘরবাড়ি আর মঠ-মন্দিরের কোমর অব্দি ডুবে রযেছে, তাও চোখে পড়ত।

আসবার দিন ছোটপিসি খুব কেঁদেছিল। মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে, অনেক আদর করে বলেছিলেন, "লক্ষ্মী হয়ে থাকিস পুঁটি, তুই তো বড় হয়েছিস, আর দুষ্টুমি করিস না।"

কিন্তু কাকে বলা, আর কেনই বা বলা। যাকে নিয়ে আমার মায়ের দুশ্চিন্তা ঠাকুমার চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, সেই ছোটপিসির দাম্পত্য জীবন তো সত্যিই শেষ পর্যন্ত সুখের হয়নি। তার ঘর তো একদিন সত্যিই ভেঙে গেল।

৯

একে চন্দ্র...দুয়ে পক্ষ...তিনে নেত্র...চারে বেদ...পাঁচে পঞ্চবাণ....ছয়ে ঋতু....সাতে সমুদ্র....আটে বসু...নয়ে নবগ্রহ...দশে দিক। তিন থেকে চার বছর বয়সের মধ্যেই এটা মুখস্থ হয়ে যায়। মুখস্থ করতে-করতেই প্রশ্ন করতুম। পৌত্র ও পিতামহের মধ্যে তখন যে প্রশ্নোত্তর চলত, তা এইরকম :

"নেত্র মানে কী ?"

"চোখ।"

"মানুষের তো দুটো চোখ। তা হলে 'তিনে নেত্র' বলছে কেন ?"

"এ তো আর মানুষের চোখ নয় রে ভাই, ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার, তাঁদের আবার দুটো চোখে কুলোয় না, তিনটের দরকার হয়।"

"পঞ্চবাণ মানে কী ?"

"সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন আর স্তম্ভন।"

"ও-সব কথার মানে কী ?"

"এখন অতসব না-জানলেও চলবে। বড় হয়ে জেনে নিস।"

তা বড় তো নেহাত কম হইনি, মেঘে-মেঘে বেলা বয়ে গিয়ে দিনাবসানের জোগাড় হল, পাঁচটা বাণের তাৎপর্য তবু যে ঠিক ধরতে পারিনি, তাতে মনে হয়, আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

আটে বসু বলতে যে অষ্টবসুর কথা বলা হচ্ছে, সেটা অবশ্য তখনই জেনেছিলুম। ভীষ্মও যে শাপগ্রস্ত অষ্টবসুর একজন, ঠাকুর্দার কাছে সেটাও তখন প্রথম শুনি। কামধেনু চুরি করবার গল্পটাও সেই সূত্রে জানা হয়ে যায়।

ওই বয়সে যা-কিছু শিখেছি, সবই শুনে-শুনে শেখা। ঠাকুর্দার মুখে গঙ্গাস্তোত্র, শিবস্তোত্র, সূর্যস্তোত্র শুনতুম। চাণক্য-শ্লোক শুনতুম। শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে যেত। ঠাকুমা শিখিয়েছিলেন কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম। "যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকীর উদরে, স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।" রোজ শেষ-রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠিয়ে এই নামাবলির আদ্যন্ত তিনি আমাকে শোনাতেন। শুনে-শুনে সবটাই তখন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখন ভুলে গিয়েছি। তবে খাপছাড়াভাবে কিছু-কিছু লাইন এখনও হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে যায়। এই যেমন "শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন, যশোদা রাখিল নাম জাদুবাছাধন।"

বেস্পতিবার সন্ধেয় যখন তিনি লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন, আমাকেও তখন কাছে না বসিয়ে ছাড়তেন না। ফলে তারও অনেকটাই মুখস্থ হয়ে যায়। যদ্দুর মনে করতে পারি, পাঁচালির শুরুটা

ছিল এইরকম : "দোল-পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ, মন্দ-মন্দ বহিতেছে মলয়-বাতাস।" এটাও মনে পড়ে যে, পাঁচালির গল্পের শাশুড়িটি তাঁর পুত্রবধূদের দুর্ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে যখন বনে গিয়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ করছেন, তখন লক্ষ্মীদেবী সেখানে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।" সুতরাং আত্মহত্যা কোরো না, বাড়ি ফিরে যাও, আর ফিরে গিয়ে "গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি বামাগণ, সকলে লক্ষ্মীর পূজা করো আয়োজন।" বাস, সংসারে আর তারপরে কোনও অশান্তি রইল না, সুখশান্তি সমৃদ্ধি একেবারে উথলে উঠতে লাগল।

ঠাকুমা গুটিকয় পদ্যও মুখস্থ করিয়েছিলেন। একটার আরম্ভ এইরকম :

রামেদের বুধিগাই প্রসব হইল,
রামশ্যাম দুই ভাই দেখিতে আইল।
রাম বলে, কী আশ্চর্য দ্যাখো শ্যামভাই,
জিভ দিয়ে বাছুরের গা চাটিছে গাই।

আর-একটাতে ছিল ছেলের সঙ্গে মায়ের খাদ্যবিষয়ক কথোপকথন। ক্ষুধার্ত ছেলেকে মা বলছেন বাসী ভাত খেতে। কিন্তু ছেলে ইস্কুলে যায়, বই পড়ে স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়ার কথা জেনেছে, পর্যুষিত অন্নগ্রহণে যে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা, এটাও তার অজানা নেই, মাকে সে তাই জানাচ্ছে যে, ও-বস্তু সে খাবে না। পদ্যে-বাঁধা সেই বাক্যালাপের গোড়াটা ছিল এইরকম :

—কী খাব মা, কী খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে।
—বাসী ভাত খাও জাদু, ওই ঢাকা রয়েছে।
—খাব না মা, বাসী ভাত আর আমি খাব না।
—রোজ খাও, আজ কেন খাবে না তা বলো না।

পদ্যটি যে কোন বইয়ে ছিল, 'বাল্যশিক্ষা'য় না 'পদ্যমালা'য়, তা আর এখন বলতে পারব না। তবে কিনা এই পদ্যের যেটা 'মর‍্যাল' সেটাকে যে আমি তখনও গ্রাহ্য করিনি, এখনও করি না, এ-কথা নিশ্চয় অসংকোচে কবুল করব। গ্রীষ্মকালের সকালবেলায় কাঁচা লঙ্কা চট্‌কে পান্তাভাত খেতে সেই বয়সেও যেমন ভালবাসতুম, এই বয়সেও তেমন বাসি। সঙ্গে দু'চারটে মৌরলা কি পুঁটিমাছ ভাজা পেলে তো কথাই নেই। না পেলে বেশ কড়া করে ভাজা একটা শুকনো লঙ্কা থাকলেও চলবে। পদ্যের ওই ছেলেটার জন্যে তখনও দুঃখ বোধ করেছি, এখনও করি। বড়-বড় সব জ্ঞানের কথা বলে মা'কে নেহাতই উত্ত্যক্ত করা ছাড়া হতভাগা আর করলটা কী, পান্তাভাতের মর্ম তো ও কিছুই বুঝল না!

শীতকালে অবশ্য পান্তা চলে না, প্রাতরাশে তখন ফেনভাত চাই। আমরা বলতুম ফেনাভাত। সঙ্গে থাকত বাড়িরই তৈরি একটু সর-জ্বালানো ঘি, সেই সঙ্গে আলুভাতে কি বেগুনভাতে। বাড়িতে হাঁস ছিল গোটাকয়েক। ছোটপিসি সেই সাত-সকালেই তাদের বাক্স হাতড়ে কিছু ডিম নিয়ে আসত। একছিটে নুন আর দু-এক ফোঁটা ঝাঁঝালো সর্ষের তেল দিয়ে ঠাকুমা কি বড় কাকিমা যে আলুভাতে, বেগুনভাতে কি ডিমসেদ্ধ মেখে দিতেন, সে ছিল অমৃতের তুল্য। তবে কিনা অতশত অনুপানের যে খুব দরকার হত, তাও নয়। ফেনাভাতের নিজস্ব আকর্ষণও ছিল অপ্রতিরোধ্য। বাড়ির ঢেঁকিতে ছাঁটা নতুন লক্ষ্মীদিঘা চালের ফেনাভাত যিনি খাননি, হাজার-ব্যাখ্যা করেও তার সৌরভ আর স্বাদের কথাটা তাঁকে বোঝানো যাবে না।

বাড়ির পুকুরে মাছ ছিল প্রচুর। তবে কিনা নাবাল এলাকা, ফি বর্ষাতেই পুকুর ভেসে যায়, মাছ তাই বড় হবার সুযোগ পেত না। কিন্তু বড় মাছই যে খেতে হবে, এমন কোনও কথা তো নেই, পুঁটি ট্যাংরা শোল কই খলসে চুঁচরো শিঙি মাগুর, নৌকো টেনে পাঁচমিশেলি মাছ যেদিন

যা পেতুম, রোজকার দরকার তাতেই মিটে যেত। নৌকো টানার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। পুকুরের এক ধারে ডোবানো থাকত আমার ছোট্ট ছিপ-নৌকো। স্নান করবার সময় বন্ধুবান্ধবরা মিলে সেটাকে টেনে ডাঙায় তুলতুম। নৌকোর উপর ডালপালা। সেগুলো সরিয়ে জলটা ছেঁচে ফেললেই দেখা যেত যে, খোলের মধ্যে বিস্তর মাছ কিলবিল করছে। সবই যে এক জাতের মাছ, তা নয়। তার মধ্যে যতটা দরকার একটা খালুইয়ে ভরে খালুইটা কারও হাত দিয়ে বড়কাকিমার কাছে পাঠিয়ে দিতুম। তারপর আবার খোলের মধ্যে ডালপালা ফেলে জলে ডুবিয়ে দিতুম আমার ছিপ-নৌকো। পরদিন সকালে আবার ওটাকে টেনে ডাঙায় তোলা হবে।

বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্ব এলে অবশ্য আলাদা কথা। তাঁদের তো আর ট্যাংরা-পুঁটি খাওয়ানো চলে না, বড় মাছ চাই। বড় মাছ মানে রুই-কাতলা। তা রুই-কাতলারও আছে রকমফের। কলকাতায় যাকে আমরা চারাপোনা বলি, পুব বাংলায় তার একটু বড় সাইজের নাম নইচা। যেগুলো আরও একটু বড়, তাকে নলা বলা হয় ওদিকে। নলার ওজন এক-সের দেড়-সেবের বেশি নয়। তো আত্মীয়-কুটুম্বের পাতে তাও অচল। চাই আরও বড় সাইজের মাছ। সে মাছ তো আর পুকুরে লভ্য নয়, তাই হাটে যেতে হত। কিন্তু মাছটা যেদিন দবকার, সেদিন যদি না ধাবেকাছে কোনও গ্রামের হাটবার হয়, তা হলে? তা হলে আর কী, বাড়ির পাশের খাল যেখানে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেখানে চলে যাও। সেখানে ভ্যাসাল রয়েছে, কপাল ভাল হলে চার-পাঁচ-সেরি রুই কি কাতলা সেখানে পেতেও পারো।

তা সেই ভ্যাসালে একবার আমার কপাল কীরকম খুলে গিযেছিল বলি। ভ্যাসালে মাছ ধরবার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও দেখেছি, সুতরাং ওটা কী বস্তু, তা আর ব্যাখ্যা কবে বলবার দরকার করে না। তবে কিনা নেহাতই যাঁরা শহুরে মানুষ, তাঁবা যাতে বুঝতে পারেন, তার জন্যে দু'একটা কথা বললে কিছু ক্ষতি নেই। ভ্যাসাল হল মস্ত মাপের তেকোনা জাল। মাথার দিকটা চওড়া আর গোড়ার দিকটা সরু। বহতা জলে নদী কি খালের মধ্যে লম্বা গোটাকয় বাঁশ পুতে তার সঙ্গে লটকে রাখা হয় জালের ওই গোড়ার দিকটা। সেখানে যে লোকটি দাঁড়িযে থাকে, বাঁশ ধরে সে যেমন উপরে উঠতে থাকে, তাব জালও তেমন ডুবে যেতে থাকে জলের মধ্যে। খানিক বাদে সে যেমন নীচে নামে, জালও তেমন জলের উপবে উঠে আসে। এই যে জাল ডোবানো আর জাল তোলা, এই গোটা কাজটাই আসলে সমাধা হচ্ছে লোকটির ওজনের সাহায্যে। এক-এক বার জাল তোলাকে বলে এক-একটা খেপ। কি খেপেই যে মাছ ওঠে, তা নয়। কোনও খেপে ওঠে, কোনও খেপে ওঠে না।

আমাদের দেশের বাড়িতে সেবারে এসেছিলেন নগরকান্দার শরৎ-পিসেমশাই। গোলাপি-পিসিকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুমাকে দেখতে এসেছিলেন তিনি। একটা দিন আমাদের ওখানে কাটিয়ে তারপর নগরকান্দায় ফিরে যাবেন। তো মেয়ে-জামাই এসেছে, তাও আবার ঠাকুমার বাপের বাড়ির মেয়ে-জামাই, ট্যাংরা-পুঁটি কি খলসে-পাবদায় অতএব চলবে না, বড় মাছ চাই। ফলে ছিপ-নৌকো নিয়ে বাড়ির কাজের লোকটিকে সঙ্গে করে আমাকে ভ্যাসালে ছুটতে হল। যে-লোকটি ভ্যাসাল বাইছিল, সে আমাদের চেনা। তার সঙ্গে চুক্তি হল যে, খেপ-পিছু তাকে এক সিকি করে দিতে হবে। তা প্রথম তিন খেপে গুটিকয় টাটকিনি আর রায়েক মাছ ছাড়া আর কিছুই উঠল না। সর্বনেশে ব্যাপার! সঙ্গে এনেছি মাত্র একটি টাকা, তার তিনটে সিকি ইতিমধ্যে খর্চা হয়ে গিয়েছে, বাদবাকি সিকিটিতেও যদি কিছু না ওঠে তো একেবারে খালি-হাতে বাড়ি ফিরতে হবে। লোকটিকে আমার বিপদের কথা বলতে সে বলল, ঠিক আছে ঠাকুরভাই, ভোরবেলাকার ধরা সের দেড়েক ওজনের দুটো নলা মাছ আমি আলাদা করে জিইয়ে রেখেছি, এই খেপেও যদি কিছু না পাই

তো তার একটা তোমাকে দিয়ে দেব, পরে এসে তুমি দাম মিটিয়ে দিয়ো।

তার আর দরকার হল না, চতুর্থ খেপে যা ঘটল, সে একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার, জাল প্রায় ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। চোখ কচলে দেখি, রুই উঠেছে গোটা পাঁচেক, তার কোনওটার ওজনই তিন-চার সেরের কম হবে না, আর তারই সঙ্গে টাটকিনি আর রায়েকও উঠেছে অজস্র।

ভ্যাসালের মাঝিকে বললুম, এত মাছের আমাদের দরকার নেই, গোটা দুই রুই আর এক খালুই টাটকিনি হলেই চলে যাবে, বাদবাকি মাছ তুমি রেখে দাও।

সে তাতে কিছুতেই রাজি হয় না। যত তাকে বোঝাই যে, দুজন মাত্র অতিথি এসেছে, তার জন্য এত মাছের দরকার হবে না, ততই সে বলে, ও মাছ যখন তোমার কপালে উঠেছে, তখন তুমিই নাও, আমি যদি ওর থেকে একটাও নিই তো চুক্তির খেলাপ হবে। "না ঠাউরভাই, ওই মাছ আমি নেব না।"

শেষকালে যখন বললুম যে ঠিক আছে, মাছগুলোকে তা হলে আমি আবাব নদীতেই ছেড়ে দেব, তখন তাকে রাজি করাতে পারি। তাও যখন চলে আসছি, তখনও দ্বিধা কাটেনি তার, সম্ভবত তার বিবেক তখনও তাকে সমানে কামড়াচ্ছে, তাই একটু নিচু গলায় লোকটি আমাকে বলেছিল, "দেইহো ঠাউরভাই, কেউ য্যান্ না জানতে পারে যে, আমি চুক্তির খ্যালাপ করছি।"

রোদ্দুর মাথায় করে মাছ আনতে গিয়েছিলুম বলে বাড়িতে ফিরে সেদিন গোলাপি-পিসিমার কাছে খুব বকুনি খাই। বড়-কাকিমা দেখলুম মুখ টিপে হাসছেন। তাঁরই কাছে শুনলুম যে, আমার আগে ঝড়টা গেছে ঠাকুমার উপর দিয়ে, গোলাপি-পিসিমা তাঁকেও খুব একচোট বকাঝকা কবেছেন। তা অবশ্য তিনি করতেই পারেন, হাসতে-হাসতে বড়কাকিমা বললেন, "ঠাকুরঝি তো আর এ-বাড়ির বউ নয়, মেয়ে, এই দুপুর-রোদে তোকে ভ্যাসালে পাঠিয়েছিলেন বলে তোর ঠাকুমাকে আর কিছু বলতে বাকি রাখেনি।"

বরাবর আমরা জেনে এসেছি যে, গোলাপি-পিসিমা আমার বাবার মামাতো বোন। সত্যিই কিন্তু তা তিনি ছিলেন না। বাবার যে একটি মামাতো বোন ছিলেন, সেটা অবশ্য মিথ্যে নয়, শরৎ-পিসেমশাইয়ের সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল নকুলেশ্বর সমাদ্দারের সেই মেয়ের, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন বাদে তিনি মারা যান। তারও কিছুদিন বাদে শরৎ-পিসেমশাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। বউ মরলে লোকে আবার বিয়ে করবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। আসলে, বড় হয়ে যা শুনে আমরা অবাক হয়ে যাই, সেটা এই যে, তাঁর নিজের উদ্যোগে নয়, প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ির উদ্যোগেই শরৎ-পিসেমশাইয়ের এই দ্বিতীয় বিয়েটা হয়েছিল। ব্যস্, গোলাপি-পিসিমাও সেই থেকে হয়ে গেলেন নকুলেশ্বর সমাদ্দারের মেয়ে। তাঁরও তো একটা বাপের বাড়ি ছিল্। কিন্তু সেই বাপের বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই আর তাঁর রইল না। তুজারপুরই তাঁর বাপের বাড়ি হয়ে দাঁড়াল।

বাবার মামাবাড়ি তুজারপুরে তো কতবারই আমি গিয়েছি। পুজোর সময়ে গেলে গোলাপি-পিসির সঙ্গে সেখানে দেখাও হয়ে যেত। তিনি যে সত্যিই ও-বাড়ির মেয়ে নন, একবারও কিন্তু এমন কথা আমাদের মনে হয়নি। আমাদের চান্দ্রার বাড়িতেও আসতেন একেবারে বাড়ির মেয়েরই মতো। বাবাকে দাদা বলতেন, আমার ঠাকুমাকে পিসিমা। বউ তো নন, মেয়ে। তাই গাঁয়ের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াতেন, মাথায় তখনও ঘোমটা টানতেন না।

গোলাপি-পিসিমাকে নিয়ে শরৎ-পিসেমশাই যে সেবারে স্রেফ বেড়াতেই এসেছিলেন, তা অবশ্য নয়। আসলে, ঠান্ডা লেগে কয়েক দিন ধরেই ঠাকুমার একটু সর্দিজ্বর চলছিল। বড়দা ওষুধ দিয়েছিলেন, তাতে জ্বর ছাড়েনি, তাই শরৎ-পিসেমশাইকে খবর পাঠানো হয়। তিনি নামজাদা

ডাক্তার। খবর যখন পেয়েছেন, তখন আসবেন, এটা ধরেই রেখেছিলুম, কিন্তু তাই বলে যে মাইল ছয়েক দূর থেকে একেবারে তক্ষুনি-তক্ষুনি এসে পড়বেন, তাও আবার গোলাপি-পিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে, এতটা আমরা ভাবিনি।

অল্প-জ্বরে বাড়ির গিন্নিদের শুয়ে থাকলে চলে না, তা তাঁরা থাকেনও না। তার উপরে আবার বাড়িতে এসেছে ভাইঝি-জামাই। তাঁরা যে তাঁরই অসুখের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছেন, সে-সব ভুলে গিয়ে ঠাকুমা তাই ফের হেঁশেলে ছুটবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু শরৎ-পিসেমশাই এমনিতে যদিও খুব হাসিখুশি মানুষ, ডাক্তার হিসেবে দারুণ কড়া, জোর করে ঠাকুমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তিনি তাঁর জ্বর নিলেন, তারপর কাঠের বাক্স থেকে হরেক রকমের ওষুধ বার করে সেগুলো মিলিয়ে-মিশিয়ে মিকশ্চার বানিয়ে তক্ষুনি তক্ষুনি ঠাকুমাকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে বললেন, "আজকের দিনটা স্রেফ শুয়ে থাকুন, বিছানা থেকে নামা চলবে না।"

ঠাকুমা বললেন, "না-নামলে সংসার চলবে কী করে?"

গোলাপি-পিসিমা তাতে ধমক দিয়ে বললেন, " কেন, আমি আমার সংসার ফেলে এখানে চলে আসিনি? খবর্দার, তুমি বিছানা থেকে নামবে না।"

পরদিন সকালে থার্মোমিটার দেখে শরৎ-পিসেমশাই বললেন, "বাঃ, টেম্পারেচার তো ছিয়ানব্বুইয়ে নেমে গেছে দেখছি।"

ঠাকুমা হেসে বললেন, "না নেমে পারে? এসে অব্দি গোলাপি যা ধমকাচ্ছে!"

আশু মুখুজ্যে মশাইয়ের ছবিতে যেমন দেখা যায়, শরৎ-পিসেমশাইয়ের গোঁফজোড়া ছিল ঠিক সেইরকম। তেমনই মোটা আর তেমনই ঝুলো। চা তাঁকে বড় একটা খেতে দেখিনি, তবে দুধ খেতেন খুব। গেলাসে চুমুক দিয়ে দুধ খাবার পরে যতক্ষণ না একটা তোয়ালে কিংবা গামছা দিয়ে মুখ মুছে নিচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর গোঁফের তলার দিকটা যে সাদা হয়ে থাকত, এটাও মনে পড়ে। শরৎ-পিসেমশাই আমাদের বাড়িতে এলেই ঠাকুমা বলতেন, "ও বউমা, শরৎ এসেছে, জাম-বাটিতে করে দুধ নিয়ে এসো।"

পুব-বাংলায় দুধ তখন খুব সস্তা ছিল। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত শীতকালে সেখানে দু'পয়সা সের-দরে দুধ বিক্রি হতে দেখেছি। বর্ষাকালে সেটা চার পয়সায় উঠত। হাটের একধারে মাটির কালো কালো পাত্রে দুধ নিয়ে বসে থাকত ব্যাপারীরা। পাত্রগুলো সাধারণত হত এক-সেরি থেকে চার-সেরি পর্যন্ত। তবে, যতই শস্তা হোক, খদ্দের যে খুব একটা জুটত, তা নয়। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পুজোপার্বণ ইত্যাদির সময় হলে অবশ্য আলাদা কথা। সের পিছু দাম তখন এক-আধ পয়সা বাড়ত। তাও একটা কথা মনে রাখতে হবে, পুব-বাংলায় তখন আমরা ষোলো-ছটাকে নয়, আঠারো-ছটাকে সের ধরতুম। কখনও-কখনও সেটা আবার কুড়ি-ছটাকে উঠত। চাহিদা যেখানে কম অথচ সরবরাহ অঢেল, খদ্দের সেখানে শুধু লক্ষ্মী নয়, একেবারে মহালক্ষ্মী, তাঁকে তুষ্ট করাই সেখানে দোকানির ধ্যানজ্ঞান। বাজার সেখানে 'সেলার্স' মার্কেট নয়, 'বায়ার্স' মার্কেট। দাম সেখানে দোকানির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, খদ্দেরই সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থনীতির এই এ বি সি ডি কারও না-জানবার কথা নয়।

নয়তো দেখুন, এক কুড়ি মানে ক'টা, এ কি একটা প্রশ্ন হল? এক কুড়ি মানে এক কুড়ি। উনিশও নয়, একুশও নয়। কিন্তু 'বায়ার্স' মার্কেটে ও-সব কথা খাটে না। এক কুড়ি মানে সেখানে চব্বিশও হতে পারে, ছাব্বিশও হতে পারে। আমাদের ওদিকে ছিল বত্রিশটায় কুড়ি। হাটে গিয়ে দু'তিন আনা পয়সা দিয়ে যখন বড় সাইজের এককুড়ি কই মাছ কিনতুম, তখন আলাদা করে কিছু বলতেও হত না, মাছের ব্যাপারী গুনে-গুনে বত্রিশটা কই মাছই আমাদের খালুইতে তুলে

দিত। তার উপরেও এক-আধটা ফাউ যে কখনও আদায় করে ছাড়িনি, এমন কথাও হলফ করে বলতে পারব না।

'হালি' কথাটার অর্থ সম্ভবত এদিককার মানুষরা বুঝতে পারবেন না। ফরিদপুরের যে গ্রামাঞ্চল থেকে আমি এসেছি, সেখানে 'হালি' বলতে চারটে বোঝায়। এক হালি কম্ফা মানে চারটে পেঁপে, এক হালি জম্বুরা মানে চারটে বাতাবি নেবু। এমনিতে ও-সব ফল বাড়িতেই ফলত, ওর জন্যে আর হাটে যাবার কোনও দরকার আমাদের হত না। তবে পুজো-পার্বণের সময়ে তো বাড়তি কিছু ফল-পাকুড়ের দরকার হয়ই, তার জন্যে আর হাটে না গিয়ে উপায় কী, তখন হালিপিছু সব কিছুরই হিসাব হত অন্তত পাঁচটা করে। 'ফানা' মানে ছড়া। কাঁটালি কলার ফানা পাঁচ হালি চাই। তাতে পাবার কথা কুড়ি ছড়া, কিন্তু জানতুম যে, পঁচিশ ছড়া পাওয়া যাবে।

দুধ, মাছ, ফল, সবজি, সবই একেবারে জলের দরে পাওয়া যেত। তাও যে কেনবার মতন খদ্দের যথেষ্ট ছিল না, তার অর্থও তো কারও না-বুঝবার কথা নয়, মানুষের হাতে পয়সা ছিল বড্ড কম। ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ি, দেশলাই, লবণ, বিড়ি, কেরাসিন, খাতা, পেনসিল ইত্যাদি যে ক'টা জিনিস পুকুরে, জমিতে, গাছে কিংবা মাচায় ফলে না, অধিকাংশ মানুষ পয়সা খরচ করত শুধু তারই জন্য। এটা যে শুধু আমাদের এলাকা সম্পর্কেই সত্য, তা নয়, সত্য সেকালের প্রায় প্রতিটি দূর-গ্রামাঞ্চল সম্পর্কেই। দূর-গ্রামাঞ্চল বলতে আমি সেইসব অজ-পাড়াগাঁর কথাই বোঝাচ্ছি, শহরের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই যাদের ছিল না, এবং রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপের মতন এক ধরনের আদিম জীবন-ব্যবস্থার মধ্যেই যাদের মগ্ন হয়ে থাকতে হত।

১০

বড়দা যতদিন পর্যন্ত তাঁর ডিসপেনসারি খুলে বসেননি, ততদিন যেমন আশপাশের আর-সব গ্রামে, তেমন আমাদের গ্রামেও রাজিন্দির-ডাক্তারের প্র্যাকটিস ছিল একচেটিয়া। বড়দা আসায় তাঁর যে বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল, তাও নয়। তার কারণ, একে তো লোকে চট করে ডাক্তার-বদ্যি পালটাতে চায় না, তার উপরে আবার বড়দা একটু খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, খুব জরুরি কেস না হলে বড়-একটা তিনি জল-কাদা ভেঙে রুগি দেখতে বেরুতেন না, তাঁকে কল দেবার জন্যে যে-লোকটিকে পাঠানো হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ রোগের লক্ষণ শুনে তারই হাতে ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন। রাজিন্দির-ডাক্তার সেদিক থেকে ছিলেন পুরো প্রফেশনাল মানুষ। কেসটা সর্দি-জ্বরেরই হোক আর পেট-কামড়ানিরই হোক, ও-সব তিনি বাছবিচার করতেন না, কল্ পেলেই হল,তক্ষুনি তিনি ঘোড়ায় চেপে রুগি দেখতে বেরিয়ে পড়তেন।

আমাদের ওদিকে গৃহপালিত তাবৎ জন্তুই হত একটু ছোট মাপের। রাজিন্দির-ডাক্তার যার

সওয়ার হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, সেটিও এত ক্ষুদ্রকায় ছিল যে, বস্তুত সেটি ঘোড়া না ছাগল, কাছে না আসা পর্যন্ত সেটা ঠিক বোঝা যেত না। পিঠের উপরে একটা চটের বস্তা, রেকাব নেই। রেকাবের দরকারও ছিল না। বস্তায় যিনি সমাসীন, সেই অশ্বারোহীর পা একেবারে মাটিতে ঠেকে যাবার উপক্রম হত।

রাজিন্দির-ডাক্তার থাকতেন পাশের গ্রামে। তাঁর নামটা আসলে রাজেন্দ্রনাথ দাশ। বড়দের কাছে শুনেছি যে, তিনি লাইসেন্সধারী ডাক্তার নন, কম্পাউন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করা মানুষ। কিন্তু তা হোক, একে তো নিষ্পাদপ ভূখণ্ডে এরণ্ড অবশ্যই দ্রুমের সম্মান পেতে পারে, তা ছাড়া তাঁর অভিজ্ঞতা যে অনেক পাশ-করা ডাক্তারের তুলনায় বেশিই ছিল, সেটাও অস্বীকার করবার জো নেই। সম্ভবত সেই অভিজ্ঞতার জোরেই দাশমশাই তাঁর প্র্যাকটিসটা চালাতেন দাপটের সঙ্গে। উপরন্তু মিষ্টভাষী ছিলেন বলে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল যৎপরোনাস্তি। ঘোড়ায় চড়ে তিনি যখন এসে হাজির হতেন, গ্রামে যে তখন একটা হইচই পড়ে যেত, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁকে ঘিরে বেশ একটা ভিড় জমে যেত।

ওষুধের বাক্স ঘাড়ে নিয়ে যে লোকটি তাঁর ঘোড়ার পিছনে-পিছনে আসত, তার যে আদৌ হাঁফ ধরে যেত না, তার কারণ আর কিছুই নয়, ঘোড়াটা চলত দেখতুম গাধার চেয়েও মন্থর গতিতে। তার উপরে আবার মাঝে-মাঝেই একেবারে থেমে গিয়ে সেটা আলপথের দু'দিকে মুখ বাড়িয়ে জমির ফসল খেতে শুরু করত। তবে কিনা ডাক্তারের ঘোড়া, তাই বড় একটা তাকে কেউ মারধর করত না। একবার অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখেছিলুম। আমাদেরই বাড়িতে রাজিন্দির-ডাক্তার সেবার রুগি দেখতে এসেছিলেন। তা ঘরের মধ্যে ঢুকে যখন তিনি রুগি দেখছেন, তার ঘোড়া সেই সময়ে আমাদের বাইরের উঠোনে শুকোতে দেওয়া এক থালা ডালের বড়ি ও সেই সঙ্গে একটা ইজের খেয়ে সাফ করে দেয়। ইজের আমাদের কাজের লোক উজাগির সিংয়ের ছেলে শান্তির। উজাগির তখন উঠোনেরই আর-এক দিকে একটা গাছের গুঁড়ি কেটে চ্যালাকাঠ করছিল। প্রথমটায় সে কিছু দেখতে পায়নি। পরে যখন দেখতে পেল, তখন ওটা যে ডাক্তারের ঘোড়া সে-কথা ভুলে গিয়ে একটা চ্যালাকাঠ দিয়ে উজাগির তাকে এমন বেধড়ক পেটায় যে, যে-ঘোড়াকে কোনও দিনই কেউ দৌড়তে দেখেনি, চার পা তুলে একেবারে তৎক্ষণাৎ সে আমাদের বাড়ি থেকে মাঠের মধ্যে গিয়ে নামে, আর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে চোখের আড়ালে চলে যায়। ডাক্তারবাবুকে সেদিন হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

ডাক্তারবাবুর একটা কথা এখনও মনে পড়ে যায়। "ভাল করে দুধ-ঘি খাও বাবারা, নইলে অসুখ-বিসুখের সঙ্গে লড়বে কী করে?" দুধের কথা তো আগেই বলেছি, ঘি'ও ছিল অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা। তিরিশের দশকে ওদিককার গ্রামাঞ্চলে এক টাকা সের দরে খাঁটি গব্যঘৃত পাওয়া যেত। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে সেটা পাঁচ-সিকেয় উঠে যাওয়ায় আমার সেজোকাকা—আমরা তাঁকে কাকুন বলতুম—খুব বেজার হয়ে বলেছিলেন, "নাঃ, লক্ষ্মীপুজোয় যে লুচি-মোহনভোগের ব্যবস্থা হয়, সেটা এবারে তুলে দিতে হবে দেখছি।"

শুনে বড় মুষড়ে পড়েছিলুম। কেননা, একমাত্র ওই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোই ছিল মস্ত ব্যতিক্রম, বাড়িতে সেদিন লুচি-মোহনভোগের ঢালাও ব্যবস্থা হত। অন্য সময়ে আটা-ময়দা চলত না। বড়রা দু'বেলা ভাত খেতেন, ছোটরা চারবেলা। সকালে ভাত, দুপুরে ভাত, বিকেলে ভাত, আবার রাত্তিরেও ভাত। কখনও-কখনও সেটা তিন বেলায় নেমে আসত। শীতের দিনে মাঝেমধ্যেই প্রাতরাশ সারতে হত মুড়ির সঙ্গে খেজুর-পাটালি কিংবা নলেন গুড় দিয়ে। উঠোনে সার-সার উনুন পেতে খেজুর-রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো হচ্ছে, বাটিতে মুড়ি নিয়ে তখন উনুনের পাশে

গিয়ে দাঁড়ালেই হল, বিশাল কড়াই থেকে সদ্য-ফুট-ধরা এক-হাতা তপ্ত রস ঢেলে দেওয়া হত আমাদের বাটিতে। গ্রীষ্মকালে তেমন পালটে যেত বৈকালিক আহার। তখন আম-কাঁঠালের সময়। ফলে ভাতের বদলে চিঁড়ে দুধ আর আম দিয়ে মাঝে-মাঝে বিকেলের আহার-পর্ব সমাধা হত। সেই সঙ্গে বাড়ির গাছ থেকে নামানো সবরি-কলার কাঁদিতে যদি পাক ধরে যেত তো কথাই নেই।

আমাদের বাড়ি নতুন-বাড়ি। তাই ফলন্ত আমগাছ আমাদের বাড়িতে তেমন ছিল না। তবে হাটে গিয়ে আম কেনা হত প্রচুর। এটা কেনা হত শয়ের হিসেবে। কলকাতাতেও গোড়ায়-গোড়ায় ওজন করে কাউকে আম বেচতে কিংবা কিনতে দেখিনি। হিমসাগর নামে যে আমের এখন খুব কদর, তার বয়স খুব বেশি হবে না, অন্তত আমাদের ছেলেবেলায় যে এ-আম ছিল না, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। ল্যাংড়া ছিল, বোম্বাই ছিল, কিযেনভোগ ছিল, গোলাপখাস ছিল, বেগুনফুলি ছিল, আর হ্যাঁ, আমের মরশুম শেষ হবার মুখে দক্ষিণ-ভারত থেকে যে সোনার বর্ণ আম এসে দিন-কয়েকের জন্য কলকাতার বাজারে আসর জাঁকিয়ে বসত, সেই নীলাম্বরীও ছিল বই কী। কিন্তু না, হিমসাগর বলে কোনও আম তখন ছিল না।

ছুটিছাটায় বাবা আর মা যখন দেশের বাড়িতে যেতেন, তখন অন্যান্য সব জিনিস ছাড়াও এমন কয়েক ঝুড়ি সবজি ও ফল সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, যা ওদিকে একান্ত দুর্লভ ছিল। পুজোর ছুটিতে নিয়ে যেতেন ফুলকপি, গ্রীষ্মের ছুটিতে আম। পাশাপাশি তিনটি বাড়িব লোকেরা সে-সব ভাগাভাগি করে খাওয়া হত। মধ্যের বাড়ির বাদল আমার আশৈশব বন্ধু। প্রথম যেদিন সে ল্যাংড়া আম খায়, সেদিন সে মন্তব্য করেছিল যে, আমে যে আঁশ একেবারেই না থাকতে পারে, 'সোনাকাকার আনা এই আম না খাইলে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না।'

পুব-বাংলার মাটিতে সোনা ফলে, কিন্তু আম যা ফলে, তা খুব সুবিধেব নয়। তার উপরে আবার এ যখনকার কথা বলছি, কলমের আমগাছ লাগাবার রেওয়াজটা তখনও বিশেষ ছিল না। গোটা গ্রামে একমাত্র আমাদের বাড়িতেই কাকুন একটা কলমের আমের চারা লাগিয়েছিলেন, তাতে প্রচুর আম না ফললেও যে ক'টি ফলত, তার স্বাদ গ্রহণ কবেই বুঝতে পারতুম যে, এ অতি উৎকৃষ্ট জাতের আম। গ্রামের অন্যান্য বাড়ির প্রায় সবই ছিল আঁটির আমগাছ। তাতে আম যা হত, একে তো তা আঁটিসার, তার উপরে আবার যেমন তাতে আঁশ থাকত, তেমন থাকত পোকা। গুবরে-পোকার মতো দেখতে এই পোকাগুলো অতি ক্ষুদ্রকায়, খোসা ছাড়াবার পরে তাদের কোনও-কোনওটা আবার উড়ে পালাত। এ-সব আমের স্বাদও বিশেষ ভাল নয়, তবে গোলা-আম বলে আমসত্ত্ব নেহাত খারাপ হত না। ঠাকুমা আর বড়কাকিমা ঝিনুক হাতে বসে গিয়ে রাজ্যের আমের পোকা ছাড়াচ্ছেন, এই দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। কুলো আর ডালায় আমের রস মাখিয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া হয়েছে সারা বছরের আমসত্ত্বের জন্যে, আর বৃষ্টি নামামাত্র দৌড়ে এসে উঠোন থেকে সেগুলো আবার তুলে আনা হচ্ছে, এই দৃশ্যটাও ভুলে যাইনি।

কারও কম, কারও বেশি, কিন্তু সকলেরই কিছু-না-কিছু জমি-জিরেত ছিল। তাতে ধান হত, পাট হত, ছোলা হত, মটর হত। বাড়িতে গাছ ছিল। তাতে আম হত, জাম হত, কলা হত, নারকেল হত। বাড়িতে সকলের নিজস্ব পুকুর না থাক, সকলের বাড়ির কাছাকাছি খাল ছিল, বিল ছিল, নদী ছিল। তাতে মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। কিন্তু ওই যে বলেছি, সকলের হাতেই কাঁচা পয়সা ছিল বড্ড কম। এই অবস্থায় বিনিময়-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে বাধা। পাশের গ্রামের তেহারদ্দি-কাকার কথাই ধরা যাক। তার যে জমি ছিল না, তা নয়, তবে যেটুকু ছিল তাতে

সম্বৎসরের খোরাকির ব্যবস্থা হত না। ফলে সে আমাদের গ্রামে আনাজপাতি বিক্রি করতে আসত। তার কাছ থেকে আমরা মাঝে-মাঝে আলু-বেগুন কিনতুমও। কিন্তু সর্বদাই যে পয়সা দিয়ে তার দাম মেটাতে হত, তা নয়। ঠাকুমা প্রায়ই ধান-চাল চিঁড়ে-মুড়ি কি সর্ষের তেল দিয়ে তার দাম মেটাতেন। বাড়িতে যারা কাজ করত, ধান ভানত, কি খেজুর-রস জ্বাল দিত, কি গাছ কেটে জ্বালানির চ্যালাকাঠ করত, তাদের পরিশ্রমের দামও এইভাবেই মেটাতে দেখেছি।

জ্বালানির কথায় বলি, রান্নাবান্নার কাজ চলত প্রধানত কাঠ আর নাড়া দিয়ে। 'নাড়া'র উল্লেখ জীবনানন্দের কবিতায় অনেকেই দেখে থাকবেন, তবে ওটা যে কী বস্তু, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। নাড়া হল ধানগাছের গোড়ার দিকটা। পুব বাংলায় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ধানগাছ। নৌকোয় করে সেখানে ধান কাটতে হয়। তা ধান তো কাটা হল, মাঠের জলও শুকিয়ে এল ক্রমে-ক্রমে। তখন দেখা গেল যে, গোটা মাঠ নাড়ায় ভরে আছে। মাঠ থেকে তুলে এনে সেটা শুকিয়ে নিতে হয়। জ্বালানির কাজ তাতে দিব্য চলে যায়।

নাড়ার মধ্যে বিশাল-বিশাল সাইজের কচ্ছপও পাওয়া যেত প্রচুর। বর্ষাকালে জল যখন কূল ছাপিয়ে যায়, তখন নদীর মাছের সঙ্গে কচ্ছপও ভেসে আসে বই কী। কিন্তু মাঠ থেকে সেই জল যখন আবার নদীতে ফিরে যাচ্ছে, তখন যদি না জলের সঙ্গে-সঙ্গে আবার নদীতে ফিরতে পারল, কচ্ছপের তা হলে আর ফেরাই হল না, মাঠের মধ্যেই নাড়ার তলায় সে তা হলে আটকা পড়ে রইল। জল শুকিয়ে যাবার পরে মাঠে গিয়ে আমরা কচ্ছপ ধরতুম। যদি দেখা যেত যে, সমতল মাঠের সবটাই কিছু সমতল নয়, কোথাও-কোথাও একটু ঢেউ-খেলানো, তা হলে বুঝতুম যে, নাড়া সরালেই সেখানে কচ্ছপ পাওয়া যাবে। পেতুমও। উল্টে ফেলে, পায়ে দড়ি বেঁধে সেগুলোকে বাড়িতে নিয়ে আসা হত। হগসাহেবের বাজারের কথা বলতে পাবব না, তবে কলকাতার আর-পাঁচটা সাধাবণ বাজারে আমার ছেলেবেলায় কখনও কচ্ছপের মাংস বিক্রি হতে দেখিনি। তাতে মনে হয়, এদিককার মানুযরা কচ্ছপের মাংসের বিশেয ভক্ত ছিলেন না। পবে অবশ্য বিস্তর বাজাবে কচ্ছপ বিক্রি হতে দেখেছি। যাঁরা কেনেন, তাঁদের সবাই যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত, এমন কথাও ভাবা শক্ত। ভক্তি হয়তো কালক্রমে এদিকেও খানিক-পরিমাণে দেখা দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকার হিন্দুসমাজে কিন্তু কচ্ছপের মাংস খাওয়ার চল ছিল বরাবরই। আমাদের বাড়িতে আর-কেউ খান আর না-ই খান, যেমন ঠাকুর্দার তেমন আমারও কচ্ছপে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

জ্বালানির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যেমন কাঠ আর নাড়া, তেমন পাটকাটিও জ্বালানির কাজে লাগত। মাঠ থেকে পাট কেটে এনে গোছা-গোছা পাট ডুবিয়ে রাখা হত জলের মধ্যে। একে বলত পাট জাক দেওয়া। তারপরে তার আঁশ ছাড়িয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হত। একইসঙ্গে শুকোতে দেওয়া হত পাটকাটি। তাতে যেমন জ্বালানি হিসাবে রান্নাবান্নার কাজ চলত, তেমন আবার এমন সব বেড়াও তাই দিয়ে বাঁধা হত, যা একটু পল্‌কা হলেও ক্ষতি নেই। হাট কিংবা গঞ্জ থেকে যে আমরা দেশলাই কিনে আনতুম না, তা নয়, তবে পাটকাটিকে টুকরো-টুকরো করে কেটে ঠাকুমা তার মাথায় যে গন্ধক লাগিয়ে রাখতেন, দেশলাইয়ের কাজ তাতেও চলত। মালসা-ভরা তুষের আগুন তো যেমন রান্নাঘরে তেমন কাচারি-ঘরেও সারাক্ষণ জ্বলতই। ফুঁ দিয়ে তার উপরকার ছাই খানিকটা সরিয়ে দিয়ে তাতে গন্ধক-লাগানো পাটকাটি ছুঁইয়ে দিলেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠত।

বর্ষাকালে আসত কয়লার নৌকা। সম্বৎসরে ওই একবারই আসত। গাছ কাটায় ঠাকুর্দার ঘোর আপত্তি ছিল বলে মাস কয়েকের মতো কয়লা সেই নৌকো থেকে আমরা নামিয়ে নিতুম। আমাদের

গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে কয়লার চল ছিল না। যেমন ছিল না চায়ের চলও। গোটা গ্রামে একমাত্র আমাদের বাড়িতেই দু'বেলা চা খাওয়া হত। চায়ের নেশা। ছিল, তবে বিলাস ছিল না। ঠাকুমা চা খেতেন পাথরের বাটিতে, বাদবাকি আমরা সবাই কাঁসার গেলাসে চা খেতুম। কাঁসার গেলাস তেতে উঠত বলে তার তলাটা গামছা দিয়ে ধরতে হত। ঠাকুর্দার অবশ্য ধবধবে কাপ্-প্লেট ছাড়া চলত না। প্লেটে সামান্য এক ফোঁটা চা লেগে থাকলেও কুঁচকে যেত তাঁর ভুরু। উজাগির একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে তাঁর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। চা খাওয়া শেষ হলে কাপ-প্লেট উজাগিরের হাতে তুলে দিয়ে তিনি সেই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফের বই পড়তে শুরু করতেন।

গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে চায়ের পাট ছিল না বটে, তবে কারও সামান্য জ্বরজারি হলে কি গা-ম্যাজম্যাজ করলে সে আমাদের বাড়িতে এসে চা খেয়ে যেত। সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে এই কথাটা তখন আমাদের ওদিকে অনেককেই বলতে শুনেছি যে, অল্প-জ্বরে চা খেলে তাতে ওষুধের কাজ হয়।

গাঁয়ে চায়ের চল না-থাকলেও চালাবার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি ছিল না। চা-পান যে বিষপানের তুল্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মোটামুটি ওই সময় থেকেই এ-কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু চায়ের ব্যবসা তখন সাহেবদের হাতে, শুধু কিছু শহুরে মানুষকে চা খাওয়ালে তাদের চলবে কেন, গ্রামের মানুষদের মধ্যেও নেশাটা তারা চারিয়ে দিতে চায়, তাই হাটে-হাটে তাদের লোকেরা গিয়ে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে বিনি পয়সায় চা খাওয়াত। তাও বেশির ভাগ মানুষই খেতে চাইত না। যে দু-একজন মানুষ লোভে পড়ে কিংবা কৌতূহলের তাড়নায় খেত, তারাও জানত না যে, ও-জিনিস এক-চুমুকে খাবার জন্যে তৈরি হয়নি, ওটা আস্তেসুস্থে খেতে হয়। ফলে, তাড়াহুড়ো করে ওই তপ্ত পানীয় খেতে গিয়ে তারা ঠোঁট পুড়িয়ে বাড়ি ফিরত।

কলকাতা থেকে বাবা মাঝে-মাঝে চা পাঠিয়ে দিতেন। তিনি নিজে কিন্তু চা খেতেন না। চিনিটা কিনতুম গঞ্জ থেকে। সে-চিনি সাদা দানাদার চিনি নয়, হলদে বাটা চিনি। আমরা বলতুম কাশীর চিনি। গঞ্জে যে রসগোল্লা পাওয়া যেত, তাও হলদেটে। সেও ওই হলদে চিনির জন্যই। তবে রং যেমনই হোক, তার স্বাদের কোনও তুলনা হয় না।

গাঁয়ে যে আটা-ময়দার চল ছিল না, সে-কথা বলেছি। শনি-সত্যনারায়ণের পুজোয় অবশ্য সিন্নির জন্য আটার দরকার হত। দুধ, বাতাসা, মধু, নারকেল-কোরা, বাদাম, কিসমিস ইত্যাদির সঙ্গে গুঁড়ো-চাল আর তৎসহ কিঞ্চিৎ আটা মিশিয়ে যে সিন্নি তৈরি হত, কেউ-কেউ তার পনেরো-কুড়ি গেলাশ অক্লেশে উড়িয়ে দিতেন। এতে সংকোচের কিছু ছিল না, বরং 'খাইয়ে' হিসাবে গ্রামে তাঁরা আলাদা রকমের খাতির পেতেন। আর কিছু নয়, স্রেফ অতিভোজনের কারণেই তাঁরা নেমন্তন্ন-বাড়িতেও খুব সম্মানিত অতিথি হিসাবে গণ্য হতেন এবং সাধারণত কোনও পঙ্‌ক্তির শেষ আসনে বসিয়ে তাঁদের খাওয়ানো হত। এটা করা হত পরিবেশনের সুবিধার জন্য, তবে কিনা কোণে বসে খেতেন বলেই আমরা ছোটরা আড়ালে তাঁদের বলতুম 'কোণের খেড়ু'। অর্থাৎ কোণের খেলোয়াড়।

চিঠিতে যা-ই বলা হোক, সপরিবার নিমন্ত্রণরক্ষার অনুরোধটাকে নিতান্ত নিকটাত্মীয় ছাড়া আজকাল আর কেউ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন না। সেকালে কিন্তু করা হত। ধরা যাক, রামের বাড়িতে শ্যামের সপরিবার নেমন্তন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে শ্যামের বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছে দু-পাঁচজন আত্মীয়কুটুম্ব। এক্ষেত্রে হঠাৎ-এসে-পড়া সেই আত্মীয়কুটুম্বদের সঙ্গে নিয়েই শ্যাম সপরিবার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবে। এটাই প্রথা। এতে দোষের কিছু নেই, এর ব্যত্যয় ঘটলে সেটাই বরং দোষাবহ বলে গণ্য হত। শ্যামের নামে নিন্দা রটত যে, তার বড্ড পায়াভারী হয়েছে,

সপরিবার নেমন্তন্ন ছিল, তবু কিনা সে তার আত্মীয়কুটুম্বদের সঙ্গে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যায়নি।

শহরাঞ্চলে নৈশভোজের নেমন্তন্ন হয়। গ্রামাঞ্চলে মধ্যাহ্নভোজের। দুয়ের মধ্যে শুধু সময়ের পার্থক্য নেই, গুণগত পার্থক্যও বিস্তর রয়েছে। শহরের নেমন্তন্নে প্রেশার-কুকার, থার্মোফ্লাস্ক, টেবিল-ল্যাম্প কি নিদেন একখানা বই উপহার দিয়ে-যে পোলাও-কালিয়া সাঁটিয়ে বাড়ি ফিরি, তার পরিণামে বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের চোঁয়া ঢেকুর তুলতে হয়। গ্রামাঞ্চলে ও-সব উপহার-টুপহার দেবার বালাই নেই, অন্তত আমাদের ছেলেবেলায় অত-শত উপহারের বহর দেখিনি, দু'টি-চারটি কাঁচা টাকা দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। বাড়িতে রোজ যা খাই, নেমন্তন্ন-বাড়ির মধ্যাহ্নভোজের সঙ্গে তার পার্থক্যও খুব-একটা ঘটত না; শেষ পাতে পরমান্নের সঙ্গে যে দই-মিষ্টি পরিবেশন করা হত, একমাত্র সেটাই ছিল বাড়তি-পদ।

এদিকে যেমন মোল্লার চক, ওদিকে তেমন মহারাজপুরের দই ছিল বিখ্যাত। আগে থাকতে ফরমাশ দিলে মহারাজপুরের দইওয়ালারা একেবারে নির্দিষ্ট দিনে দইয়ের বাঁক ঘাড়ে নিয়ে এসে পৌঁছে যেত। তবে যাঁরা খেতে বসেছেন, বিনাবাক্যে তাঁদের দই পরিবেশন করা হত, তা নয়। তিতার ডাইল, ভাজা, ছ্যাঁচড়া, ব্যঞ্জন, মাছ, চুকার ডাইল ইত্যাদি সহযোগে অন্নগ্রহণের প্রথম পর্ব যে শেষ হয়েছে, এটা ঘোষিত হবার পরে ডাক পড়ত দইওয়ালার। সে এসে সর্বসমক্ষে তার দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করে দেখিয়ে দিত যে, দই সত্যি যারপরনাই জমাট বেঁধেছে। ওটা না-দেখানো পর্যন্ত দই পরিবেশনের জো ছিল না।

তিতার ডাইল আর চুকার ডাইলের অর্থ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। ও হল তেতোর ডাল আর টকের ডাল। রান্নাবান্না যা হত, তা সাধারণত বাড়ির মেয়েরাই করতেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে যেহেতু ব্রাহ্মণরাও থাকতেন, তাই ডাক পড়ত ব্রাহ্মণবাড়ির শাশুড়ি-বউদের। কারও-কারও এ ব্যাপারে খুব সুনাম ছিল। বিশেষ করে সুখ্যাতি হত তাঁদের, উনুন থেকে সুবিশাল সাইজের ভাতের হাঁড়ি যাঁরা অক্লেশে নামিয়ে নিতে পারতেন। ভাতের হাঁড়ি থেকে পরিষ্কার চাটাইয়ের উপরে ভাত ঢেলে দেওয়া হত। চাটাইয়ের ফাঁক দিয়ে যাতে ফেন গলে বেরিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে ভাত হত খুবই ঝুরঝুরে, তাতে একটুও ফেন জড়িয়ে থাকত না

চার বছর বয়স পর্যন্ত আমি বড়-একটা ঠাকুমা কিংবা বড়কাকিমার কাছছাড়া হতুম না। আসলে, মা আর বাবার কাছ থেকে দূরে রয়েছি বলে তাঁরাই আমাকে যতটা সম্ভব আগলে-আগলে রাখতেন। নেমন্তন্ন-বাড়ির হেঁশেলেও আমাকে তাঁদেরই কাছে বসে থাকতে হত। উনুন থেকে এক ঝটকায় মস্ত-মস্ত হাঁড়ি নামাবার ব্যাপারে আমার ঠাকুমার দক্ষতা তখন দেখেছি। এই ব্যাপারে গোটা গ্রামে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। যাঁরা তাঁর প্রশংসা করতেন, এই সূত্রে 'একালের বউ'দের তাঁরা নিন্দে করতে ছাড়তেন না। কোনও বাড়ির বউ হয়তো ভাতের ফেন গালতে গিয়ে হাত কিংবা পা পুড়িয়ে ফেলেছে, কোথায় তার জন্যে একটু সহানুভূতি প্রকাশ করা হবে, তা নয়, সবাই একেবারে একবাক্যে বলত, "আর কইয়ো না, যা সব বউ এহোন দেহি, কোনও কম্মের না, শুধু ফেশন করবার পারে।"

বিয়ে বউভাত কি অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে নেমন্তন্ন হত, তাতে আমিষ বলতে মাছই প্রধানত চলত, মাংস হত কালেভদ্রে। ব্রাহ্মণদের আলাদা বসিয়ে খাওয়ানো হত। অব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে তাঁরা আহার্য গ্রহণ করতেন না। গ্রামাঞ্চলে আমার ছেলেবেলায় দেখতুম যে, এটাই ছিল সর্বজনের গ্রাহ্য প্রথা। এ নিয়ে কোনও টেনশন ছিল না। পরে, খুব স্বাভাবিক কারণেই, বর্ণভেদের সূত্র ধরে একটা টেনশন দেখা দেয় ও ধীরে-ধীরে সেটা প্রবল হয়ে ওঠে। সে-কথায় আসার আগে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলব।

১১

কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি হবার পর বছর কয়েক বাদে প্রমথকে আমার বন্ধু হিসেবে পাই। সেও ফরিদপুরের ছেলে, আলগি থেকে মাইল কয়েক দূরে আসফরদি গ্রামে তাদের বাড়ি। বউবাজার স্ট্রিট যেখানে সার্কুলার রোডে মিশেছে, তার খুব কাছে তখন সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসপত্রের একটা বাজার ছিল। অনেককাল ওদিকে যাইনি, তাই বাজারটা এখনও আছে কি না তা বলতে পারব না, থাকলেও নিশ্চয় সেই অবস্থায় নেই। সেখানে যে শুধুই সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসপত্র বিক্রি হত, তা অবশ্য নয়, আনকোরা নতুন মালের দোকানও কিছু কিছু ছিল। বাজারটার চলতি নাম ছিল চোরাবাজার। পুরনো শার্ট-প্যান্টালুন আর হ্যাট-কোট থেকে শুরু করে চেয়ার-টেবিল খাট-আলমারি পর্যন্ত বিস্তর জিনিস সেখানে বেশ শস্তায় পাওয়া যেত। এই চোরাবাজারেই প্রমথদের ছিল ফার্নিচারের দোকান। পারিবারিক ব্যবসা, সকলকেই কিছু-না-কিছু সময় দিতে হয়, ইস্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে বিকেলের দিকে হয়তো সেই কারণেই প্রমথকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য দোকানে গিয়ে বসতে হত। মাঝে-মাঝে তখন আমিও তাকে সঙ্গ দিতুম।

গরমের ছুটিতে যখন দেশের বাড়িতে যাব, তখন অন্তত তিনটে দিন যে প্রমথদের গ্রাম আসফরদিতে গিয়ে কাটিয়ে আসব, এটা ওই দোকানে বসেই একদিন ঠিক হয়ে যায়। এই যে প্ল্যান, এর পিছনে যে আমার স্বার্থচিন্তা একেবারেই কাজ করেনি, তা অবশ্য বলা যাবে না। যে একটি বিষয়ে আমার ঘোরতর অরুচি, সেই অঙ্কটা প্রমথ দারুণ ভাল জানত। তাকে দিয়ে তাই কবুল করিয়ে নিই যে, আসফরদিতে গিয়ে আমি তিনটে দিন থাকব ঠিকই, কিন্তু সেই তিনদিনের মধ্যে আমাদের ছুটির হোম টাস্কের একশোটা অঙ্ক তাকে কষে দিতে হবে।

বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে যে বিপদে পড়ব, তখনও সেটা ভাবতে পারিনি। গরমের ছুটিতে কয়েকটা দিন চান্দ্রায় কাটিয়ে তারপর আলগিতে আমার পিসির বাড়িতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে আমার পিসতুতো ভাই দেবদাসকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বিকেলবেলায় আসফরদিতে পৌঁছনো গেল। প্রমথ তো আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। তার আত্মীয়স্বজনরাও দারুণ খুশি। বিকেলের জলখাবার খেয়ে গ্রামের মধ্যে একটা চক্কর দিয়েও আসা হল। বাড়িতে ফিরে গল্প করলুম কিছুক্ষণ। তারপর প্রমথকে বললুম, "নে, এবার তুই আমার হোম টাস্ক করতে বসে যা।" তাতে প্রমথ বলল, "রাত্তিরে খাওয়ার জন্যে একটু বাদে পাশের বাড়ি থেকে তোদের ডাকতে আসবে, সেই সময়ে আমি বরং তোর অঙ্ক কষতে বসব।"

আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। বললুম, "পাশের বাড়ি থেকে ডাকতে আসবে কেন? আমি তো তোদের বাড়িতে এসেছি।"

"বা রে," প্রমথ বলল, "রাত্তিরে তুই ভাত খাবি না?"

" তা তো খাব। কিন্তু পাশের বাড়িতে কেন?"

"পাশের বাড়ি বামুন-বাড়ি, তাই ওখানে তোদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা তো আর বামুন নই যে, আমাদের রান্না-করা ভাত তোদের খেতে বলব।"

পিত্তি জ্বলে গেল। বললুম, "দ্যাখ, প্রমথ, ভাল চাস তো তোর মা'কে বলে এই বাড়িতেই আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর। খেতে হলে তোদের বাড়িতেই খাব। আর তা যদি তোরা খেতে না দিস তো রাত্তিরটা স্রেফ উপোস করে কাটিয়ে কাল সকালেই আমরা আলগিতে ফিরে যাচ্ছি। তোকে আর হোম টাস্ক করে দিতে হবে না।"

প্রমথ যখন বুঝল যে, আমার কথার নড়চড় হবে না, তখন সে তার মা'কে ডেকে নিয়ে এল। মায়ের সঙ্গে প্রমথর বউদিও এলেন। দু'জনে মিলে অনেক করে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, কায়স্থ-বাড়ির রান্না-করা অন্নব্যঞ্জন বামুনদের খেতে নেই। শুধু খেলেই যে পাপ তা নয়, খেতে দিলেও পাপ, সুতরাং আমরা খেতে চাইলেও তাঁরা খাওয়াতে পারবেন না।

এদিকে আমিও গোঁ ধরে বসে আছি যে, এক বাড়িতে বেড়াতে এসে আর-এক বাড়ির ভাত আমরা কিছুতেই খাব না।

তা হলে উপায়?

বউদি বললেন, "ঠিক আছে, একটা রাত্তির যদি উপোস দাও, তাতে কোনও ক্ষতি হবে না, তবে কিনা তারও দরকার নেই, বিকেলের মতো রাত্তিরটাও বরং চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে কাটাও।"

"তারপর ঘুম থেকে উঠেই আমরা বাড়ি চলে যাব, কেমন?"

"ওরে বাপ রে, তা-ই কখনও হয়?" বউদি যেন আঁতকে উঠলেন। "বাড়িতে একটা তোলা উনুন রয়েছে। সেটা ধরিয়ে আমি তোমাদের এখানে নিয়ে আসব। চাল-ডাল এনে দেব। মাছ কুটে নুন-হলুদ মাখিয়ে দেব। তুমি স্রেফ রান্না করে নেবে। কী ভাই, পারবে না?"

এবারে আমারই 'ওরে বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে ওঠার পালা। দেবদাসের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, তাকে কিছু বলা বৃথা। দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে এমন করুণ ভঙ্গিতে সে বসে আছে যে, কিছু বলতে আমারই মায়া হল। তবু বললুম, "কী রে, পারবি?"

কোথায় গেল তার সেই করুণ ভঙ্গি, একেবারে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতন সটান দাঁড়িয়ে উঠে দেবদাস বলল, "তুমি থাকো, আমি একাই পথ চিনে ঠিক আলগিতে ফিরে যেতে পারব।"

হাতে ধরে তাকে ফের বসিয়ে দিয়ে বউদি বললেন, "কী কাণ্ড, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো থাকব তোমাদের সঙ্গে। কিচ্ছু ভেবো না, কী কী করতে হবে, সব তোমাদের বলে দেব। দেখে নিয়ো, রান্না করা এমন-কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।"

শুনে যে খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছিলুম, তা বলতে পারব না, তবে কিনা অন্য কোনও উপায়ও তো নেই, অগত্যা ঢোক গিলে তাতেই আমরা রাজি হয়ে যাই। রাত্তিরটা দুধ, কলা, চিঁড়ে, মুড়ি আর নারকোলের নাড়ু খেয়ে কাটাতে হল। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে মুড়ির সঙ্গে তাল-পাটালি আর সন্দেশ। তারপর দশটা নাগাদ দেখি, এক-হাতে কিছু বাসনপত্র আর অন্য হাতে জ্বলন্ত একটা তোলা উনুন নিয়ে বউদি আমাদের ঘরে এসে ঢুকছেন। হাঁড়িতে জল ঢেলে উনুনে চাপিয়ে বাসনপত্রগুলি তিনি গুছিয়ে রাখলেন। মাছ, আনাজ ইত্যাদিও ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। আমরা তো ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে আছি, কিন্তু বউদি সেদিক ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। শুধু প্রমথকে বললেন, "ঠাকুরপো, তুমি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকো, মা পাশের ঘরে রয়েছেন, এদিকে আসবেন বলে মনে হয় না। তবু যদি এসে পড়েন তো সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবে।"

তারপরে যা ঘটতে থাকল, তা শুধু হাসির নাটকেই দেখা যায়। বউদি নিজেই রান্না করতে

বসে গেলেন, আর মাঝে-মাঝেই কথা বলতে লাগলেন বেশ জোর-গলায়। নিজেই ভাতের ফেন গালতে-গালতে বললেন, "আরে ও কী হচ্ছে, ওইভাবে কি হাঁড়ি উপুড় করতে হয় নাকি....হ্যাঁ, এইবারে হয়েছে।" নিজেই মাছ ভাজতে ভাজতে বললেন, "নাও, একদিকটা ভাজা হয়ে গেছে, এবারে খুন্তি দিয়ে মাছগুলোকে উলটে দাও।"

সারাক্ষণ এইভাবে কথা বলে গেলেন। সবটাই যে পাশের ঘরে তাঁর শাশুড়িকে অর্থাৎ প্রমথর মা'কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, সেটা বুঝতে পেরে আমরা হাসি চাপতে পারছিলুম না।

প্রমথদের বাড়িতে সেদিন তিন দিন নয়, চার দিন ছিলুম। দুপুরে আর রাত্তিরে রান্নার নামে ওই যে একটা অভিনয় চলত, আমাদের মজাটা তাতে আরও বেড়েছিল বই কমেনি। হোম টাস্কের অঙ্কগুলো যে প্রমথকে দিয়ে করিয়ে নিতে পেরেছিলুম, সেটা উপরিলাভ। প্রমথর এই একটা মস্ত গুণ ছিল যে, কক্ষনো সে কথার খেলাপ করত না।

কিন্তু কথাটা তা নয়। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ক'টা দিন কী মজায় কেটেছিল, সেটা বলবার জন্যে এই কাহিনীর অবতারণা করিনি। আসলে যেটা বলতে চাইছি, তা এই যে, বর্ণভেদ নিয়ে আমাদের ছেলেবেলায় সত্যি বড় কড়াক্কড় ছিল। প্রতিটি বর্ণেরই সীমানা ছিল একেবারে নির্দিষ্ট, তার বাইরে পা বাড়াবার চেষ্টা করলে সেটা ঘোর বিপজ্জনক ব্যাপার বলে গণ্য হত। তেমন কোনও চেষ্টাও কখনও কাউকে করতে দেখিনি। আমি এখানে শহরের কথা বলছি না, বলছি গ্রামের কথা। তবে শহরাঞ্চলেও অধিকাংশ মানুষ যে আপনাপন বর্ণের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতেই পছন্দ করতেন, এ তো সেকালের কলকাতাতেও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। গ্রামাঞ্চলের কূপমণ্ডূকবৃত্তি ছিল আরও ভয়াবহ, পান থেকে চুন খসলেও সেখানে ছিল জাতিচ্যুত হবার ভয়, জাতপাতের বেড়া ডিঙোবার কোনও উপায়ই সেখানে ছিল না।

এমনিতেই যে নানান বর্ণের মানুষদের মধ্যে সম্প্রীতির কোনও অভাব ছিল তা নয়, তবে কিনা ওই যে গণ্ডির কথা বলেছি, ওটা ছিল একেবারে অলঙ্ঘ্য। প্রায়ই শুনতুম, এরা জলচল আর ওরা জলচল নয়। এদের বাড়িতে জল খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভাত খাওয়া যাবে না; ওদের বাড়িতে সেক্ষেত্রে ভাতের কথা তো উঠছেই না, জল খাওয়াও নিষেধ।

ঠাকুর্দা এসব একেবারেই মানতেন না। বলতেন, 'গণ্ডিটাকে কোথায় বড় করে তুলব, তা নয়, ক্রমেই সেটাকে আমরা আরও ছোট করে ফেলছি। ছোট করতে-করতে আমরা নিজেরাই যে ঘোর ছোটলোক হয়ে যাচ্ছি, সেটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধিও আমাদের নেই।' ঠাকুর্দা আরও বলতেন, 'এই নিয়ে কোনও ঝগড়া এখনও বাধেনি ঠিকই, কিন্তু একদিন-না-একদিন বাধবেই। ওরে মুখ্খুরা, যারা এসে মাটি খুঁড়ে টিউবওয়েল বসিয়ে জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল, তাদের হাতে তোরা জল খাবি না, তাও কি হয় নাকি?'

তা এ-সব কথা কাকে বলা, আর শুনবেই বা কে? ব্রাহ্মণই হোক আর কায়স্থই হোক, কিংবা হোক না অন্য বর্ণের লোক, ঠাকুর্দার কথায় কেউই বিশেষ কান দিত না। এক-আধজন যদি-বা দিত, খানিক শুনেই ঘাবড়ে গিয়ে বলত, 'ঠাকুরমশাই, আপনি কি তা হলে বলতে চান যে, জাতজন্ম বলে কিছু নেই?'

এর উপরে আর কথা কী? সত্যি বলতে কী, প্রমথর সেই বউদিটিকেও যে এ-ব্যাপারে একজন ব্যতিক্রম বলে গণ্য করব, তারও কোনও উপায় দেখছি না। কায়স্থবাড়ির বউ হয়েও দুই ব্রাহ্মণবালককে ওই যে তিনি নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিলেন, তার জন্যে তো তাঁকেও কিছু কম অস্বস্তিতে ভুগতে দেখিনি। চলে আসবার দিন তিনি সেই অস্বস্তির কথাটা ব্যক্তও করেছিলেন। খুবই কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন, "কাজটা ভাল করিনি ভাই। এই যে তোমাদের রান্না করে খাওয়ালুম,

এতে তোমাদেরও পাপ হল, আমারও পাপ হল।"

জিজ্ঞেস করেছিলুম, "পাপটা তা হলে করলেন কেন?"

"কী করব ভাই, নইলে যে তোমরা রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলতে।"

পাপপুণ্যের এই যে হিসেব, এখন আর এটা চলতে দেখি না, তবে তখন খুবই চালু ছিল। পাড়াগাঁয় চালু ছিল একটু বেশি মাত্রায়। হিসেবের কোনও গণ্ডগোল পাছে ঘটে যায়, আর সেটা পাছে কারও নজরে পড়ে, তাই সবাই একটু ভয়ে-ভয়ে থাকত। ভয়টা একঘরে হবার। মানুষে-মানুষে যেটা একেবারে স্বাভাবিক সম্পর্ক, অন্য বর্ণের সঙ্গে সেটা রক্ষা করবার ব্যাপারেই যেখানে এত রকমের কড়াকড়ি আর বাধানিষেধ, অন্য ধর্মের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার ব্যাপারে যে সেখানে ভয়ের ছায়াটা আরও বড় হয়ে পড়বে, সে আর বিচিত্র কী।

এর ফল কখনও ভাল হয় না। ঠাকুর্দা বলতেন, এই নিয়ে একদিন ঝগড়া একটা বাধবেই। তিনি মিথ্যে বলেননি। ঝগড়া একদিন সত্যি-সত্যি বেধে গেল। বামুন-কায়েতের ঝগড়া। কী নিয়ে? না কেউ মারা গেলে কায়স্থরা কতদিন কালাশৌচ পালন করবেন, তাই নিয়ে। আমাদের গ্রামে ব্রাহ্মণ-বাড়ি মাত্র তিনটি, বাদবাকি প্রায় সবই কায়স্থ-পরিবার। তাঁরা তাঁদের কালাশৌচের মেয়াদ কমিয়ে ফেলতেই ব্রাহ্মণরা রেগে টং হয়ে বলে দিলেন যে, এরপর থেকে আর কায়স্থদের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক রইল না। তাঁরা না করবেন কায়স্থ-বাড়ির পুজো-আচ্চা, না যোগ দেবেন তাঁদের অন্য কোনও ক্রিয়াকর্মে। কায়স্থ-বাড়িতে জলগ্রহণও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

তাতে আমাদের ছোটদের ভারী বয়েই গেল। বড়দের ঝগড়াটা যদিও ধুন্ধুমার চেহারা ধারণ করেছিল, আমরা ও-সবের ধার ধারতুম না। যারা আমাদের বন্ধুবান্ধব, নিত্য যাদের সঙ্গে খেলাধুলো করি, তাদের বেশির ভাগই তো কায়স্থ-বাড়ির ছেলে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হলে বাঁচব কী করে? বড়দের ফতোয়াকে তাই গেরাহ্যি করিনি। তাঁরা যখন ঝগড়া করে মরছেন, আমরা তখন আগের মতোই কায়স্থ-বাড়ির মাসি-পিসি-দিদিদের কাছ থেকে জল তো জল, নাড়ু আর মোয়া সমানে খেয়ে যাচ্ছি, বিধান-দেনেওয়ালারা টেরও পাচ্ছেন না। পেলে নিশ্চয় নিজের ঘরের ছেলেপুলেদেরও তাঁরা একঘরে করে ছাড়তেন।

বর্ণভেদের ব্যাপারটা আদৌ থাকবে কেন, এই প্রশ্নটা কি তখনই আমার মনের মধ্যে জেগেছিল? না, তা জাগেনি। তবে সবটাই যে একটা ধাঁধার মতো লাগল, এটা ঠিক। নেমন্তন্ন-বাড়িতে গিয়ে যেখানে খুশি বসতে পারি না, পঙ্‌ক্তি-ভোজের সময়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সরিয়ে এনে আমাকে বামুনদের সারিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধবাড়ি হলে খাওয়ার পরে বাড়ির কর্তা এসে আমার হাতে একটা সিকি কি আধুলি গুঁজে দেন। ওটাকে শুনি ভোজনদক্ষিণা বলে। আমার আগেই যাদের পৈতে হয়ে গেছে, সেই বন্ধুদের একজন ঠাট্টা করে বলে, 'তোর তো এখনও পৈতে হয়নি, তাই আধুলি পেলি, নইলে আমার মতো তোকেও পুরো একটা টাকা দিত।' এসব কাজ আর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'নিয়েছিস বেশ করেছিস, না নিলে অভদ্রতা হত। তবে আমরা তো পুজুরি-বামুন নই, আমাদের কিছু নিতে নেই, বাড়িতে যখন কেউ ভিক্ষে করতে আসবে, তখন ওই আধুলিটা তাকে দিয়ে দিস।'

এ-কথা শোনার পরে কি কখনও নেমন্তন্ন খেতে যাইনি? গিয়েছি বই কী। ঠাকুর্দা তো তাঁর ঘর ছেড়ে নড়তেন না, তাই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতে হত। কিন্তু দক্ষিণার পয়সাটা যদিও সব সময়েই আর কাউকে দিয়ে দিয়েছি, তবু সেটা নেবার সময়ে যে নিজেকে তারপর থেকেই ভারী ছোট মনে হত, তাও ঠিক। ঠাকুর্দা বলতেন, কাজ করে যা পাওয়া যায়,

সেটা সম্মানের পয়সা। কাজ না করে কিছু নিতে নেই। নিলে অধর্ম হয়। তা হলে এই যে অন্যের বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে পয়সা নিচ্ছি, এতে তো আমার অধর্ম হচ্ছে। এই কথাটা যতই ভাবতুম, ভিতরে-ভিতরে ততই যেন কুঁকড়ে যেতুম।

আমার ছেলেবেলার অনেকখানিই যে গ্রামে কেটেছিল, তাতে আমার লাভ হয়েছিল অনেকখানিই। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ কীভাবে প্রাণ ধারণ করে, আবার সেই প্রাণ ধারণেরই তাগিদে কীভাবে আপোস করে নেয় প্রকৃতির সঙ্গে, পুব বাংলার ওই নাবাল অঞ্চলে ছিলুম বলেই সেটা দেখেছি। জানতে পেরেছি, যারা নেহাতই সাধারণ মানুষ, বিপর্যয়ের সময়ে তাদেরও অনেকে হঠাৎ কী অসাধারণ চেহারা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। ছেলেবেলাটা যদি না ফরিদপুরের ওই গ্রামে কাটত, তা হলে এ-সব দেখাও হত না, জানাও হত না।

কিন্তু একই সঙ্গে বলি, গোটাকয়েক খারাপ অভ্যাসও হয়েছিল ওই গ্রামে থাকার ফলেই। তারই একটার জন্যে বাবার কাছে একদিন মার খাই। তার আগে যে আর-কেউ আমার গায়ে কখনও হাত তোলেনি তা নয়, ছোটকাকা আর মায়ের কাছে তো প্রায়ই চড়-চাপড় খেতুম, কিন্তু যদ্দুর মনে করতে পারি, বাবার কাছে সেই আমার প্রথম মার খাওয়া। কলকাতায় এসে সদ্য তখন বঙ্গবাসী স্কুলের ক্লাস টু'তে ভর্তি হয়েছি। কলেজ আর ইস্কুল তখনও আলাদা হয়নি। ইস্কুল পরে নেবুতলার সেন্ট জেমস স্কোয়ারের উত্তরে মুচিপাড়া থানার পাশে নতুন বাড়িতে উঠে যায়। কিন্তু এ যখনকার কথা বলছি, তখন বৈঠকখানা বাজারের কাছে স্কট লেনের পুরনো বাড়িতে যেমন কলেজ তেমন ইস্কুলেরও ক্লাস নেওয়া হত। বাবা ছিলেন ইস্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্ট। সম্ভবত এই কারণেই ইস্কুলের কোনও ব্যাপার নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের শেয়ালদা-পাড়াব বাড়িতে সেদিন বঙ্গবাসী ইস্কুলের একজন মাস্টারমশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথাবার্তা হয়ে যাবার পরে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন, তখন বাবা তাঁকে একটুক্ষণের জন্যে বসতে বলে আমাকে ডেকে পাঠান।

আমি এসে ঘরে ঢুকতে বাবা বলেন, "এঁকে চেনো?"

আমি তার মাত্র দিন দুই-তিন আগে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। ক্লাসও খুব একটা হয়নি বলে এক-আধজনকে দেখেছি মাত্র, বাদবাকি মাস্টারমশাইদের প্রায় কাউকেই আমি চিনি না। দু'দিকে মাথা নেড়ে তাই বললুম, "না তো।"

বাবা তাতে হেসে বললেন, "না চিনবারই কথা। ইনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, তোমাদের ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারমশাই।"

শুনে দু'হাত তুলে আমি নমস্কার করলুম।

তখন কিছু হল না। যা হবার, তা হল এর মিনিট খানেক বাদে। মাস্টারমশাইকে একতলার সদর-দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তারপর দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকেই বাবা আমাকে একটি থাপ্পড় কষালেন।

আমি তো হতভম্ব। কেন যে বাবা আমাকে থাপ্পড়টা কষালেন, কিছুই বুঝতে পারলুম না। মা ইতিমধ্যে ছুটে এসেছিলেন। গালে হাত দিয়ে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি। বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কী হয়েছে, ওকে মারলে কেন?"

বাবা বললেন, "কী আর হবে, আমার নাম ডুবিয়ে ছেড়েছে! আমার ছেলে হয়ে ও কিনা ওর মাস্টারমশাইকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না!"

শুনে মা বললেন, "সে কী, সতীশবাবুকে তুই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস্‌নি?"

বললুম, "তা কী করে করব? উনি তো বসু। তার মানে তো উনি কায়স্থ।"

কপালে হাত দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "তা হলেই বোঝো! শিক্ষকেরও ও কিনা জাত বিচার করে! কী লজ্জা, কী লজ্জা! এ তো আমি ভাবতেও পারি না।"

এর পরে আর কিছু বলবার দরকার হয়নি, ওই একটি থাপ্পড়েই আমার বুদ্ধির ঝুলকালি—অন্তত এই একটা ব্যাপারে—বিলকুল সাফ হয়ে যায়। এ-কাজটা ঠাকুর্দার দ্বারাও হতে পারত, কেননা, তাঁর কথা শুনে যদ্দুর যা বুঝতে পারতুম, তিনিও ছিলেন বর্ণভেদের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি তো বাইরে বেরুতেন না, ঘরের মধ্যেই বসে থাকতেন, তাই আমি যে ইতিমধ্যে আর-পাঁচজনের দেখাদেখি বামুন বেছে-বেছে প্রণাম করতে শুরু করেছি, তা হয়তো তিনি জানতেনই না।

গ্রামজীবনের অনেক ভালর মধ্যে এই একটা মন্দ ব্যাপাব। শহরেই কি আর জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ি এ-সব নেই? আছে বই কী। কিন্তু গ্রামে আছে আরও অনেক বেশি পরিমাণে। অন্তত তখন ছিল। তাই বুঝতে পারিনি যে, কোন মানুষটি প্রণাম পাবার যোগ্য, আর কোন মানুষটি নয়, সেটা তার বর্ণের উপরে নির্ভর কবে না।

বাবাব কথা শুনে সেটা বুঝলুম। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষকের বর্ণবিচার করতে নেই। তিনি আরও বলেছিলেন, "এখন তো ইস্কুলে পড়ছিস, এর পবে কলেজে পড়বি। কিন্তু যাঁরা ইস্কুল-কলেজে পড়ান, শুধু তাঁরাই যে তোর শিক্ষক, তা কিন্তু ভাবিস না। ইস্কুল-কলেজেব বাইবেও তো কত জনের কাছে আমবা এমন কত কিছু শিখি, যা না-শিখলে আমবা মনের দিক থেকে অনেক গরিব রযে যেতুম। মনে বাখবি যে, তাঁরা সবাই আমাদেব শিক্ষক।"

এর চেযে ভাল কথাই বা আজ পর্যন্ত ক'টা শুনেছি?

১২

কলকাতার ইস্কুল-কলেজে মহালয়ার দিন থেকেই পুজোর ছুটি শুরু হযে যেত। কিন্তু সেই দিনই যে বাবা কলকাতা ছাড়তেন, তা নয়। কলেজ ছাড়াও হরেক রকমেব কাজকর্ম থাকত, সে-সব না-মিটিয়ে তিনি দেশে যেতে পারতেন না। পুজোর সময়ে আমাদের ওদিকে যেতে হলে খানিকটা পথ রেলগাড়িতে গিয়ে তারপর বাকিটা জলপথে যেতে হয়। তাও আবার দু'দিক দিয়ে যাওয়া চলে। হয় শেয়ালদা থেকে বরিশাল এক্সপ্রেসে খুলনা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ইস্টিমারে করে সিন্দিয়াঘাটে গিয়ে নামো, তারপর সেখান থেকে নৌকো কেরায়া করে বাদবাকি রাস্তা পাড়ি দাও; আর নয়তো শেয়ালদা থেকে চিটাগং এক্সপ্রেস কি ঢাকা মেলে উঠে রাজবাড়িতে গিয়ে ট্রেন পালটে চলে যাও গোবিন্দপুর ইস্টিশানে, তারপর বাদবাকি পথ পাড়ি দেবার জন্যে সেখান থেকে নৌকো কেরায়া করো।

আমরা এই দুটো পথেই দেশের বাড়িতে গিয়েছি। তবে একটা কথা ঠিক। সেটা এই যে, যাঁরা গোপালগঞ্জ কি মাদারিপুর মহকুমার মানুষ, খুলনা হয়ে যাওয়াই তাঁদের পক্ষে ছিল সুবিধেজনক, আর আমাদের অর্থাৎ গোয়ালন্দ আর সদর-মহকুমার মানুষদের সেক্ষেত্রে ফরিদপুরের পথে গেলেই সুবিধে হত। এই যে দুটো পথ, এর বর্ণনা পরে দেওয়া যাবে।

বাবা সাধারণত দেবীপক্ষের তৃতীয়ার দিনে কলকাতা ছাড়তেন। চিটাগং এক্সপ্রেস তখন শেয়ালদা থেকে ছাড়ত একেবারে ভোরবেলায়। ফলে আমরা ধরেই নিয়েছিলুম যে, আমাদের বাসাবাড়ি থেকে ইস্টিশান যতই কাছে হোক না কেন, সবকিছু গোছগাছ করে বাড়িতে তালা লাগিয়ে মা আর দিদিকে সঙ্গে নিয়ে বাবার পক্ষে অত ভোরবেলায় কিছুতেই শেয়ালদা এসে ট্রেন ধরা সম্ভব হবে না। তিনি রাত্তিরের গাড়ি ঢাকা মেল ধরবেন, তারপর সকালবেলায় গোবিন্দপুর ইস্টিশানে পৌঁছে নৌকো কেরায়া করে বাড়ির পথে রওনা হবেন।

গোবিন্দপুর আসলে ফরিদপুরেরই প্রায় লাগোয়া ইস্টিশান। সেখান থেকে আমাদের গ্রামের দূরত্ব পাক্কা চব্বিশ মাইল, জলপথে সম্ভবত আরও কয়েক মাইল বেশি। একে তো নৌকো করে এই গোটা পথটা পাড়ি দেওয়া মোটেই চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, তার উপরে আবার নৌকো কেরায়া করেই যে একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হওয়া যাবে, তারও নিশ্চয়তা নেই। প্রায় ক্ষেত্রেই যেত না। দুপুরবেলায় নৌকোর মধ্যেই রান্না করে খেতে হবে, তাই নৌকো ছাড়ার আগে বাজার থেকে চাল, ডাল, সবজি, মাছ, মায় জলখাবারের চিঁড়ে মুড়ি রসগোল্লা ইত্যাদি তাবৎ দ্রব্য জোগাড় করে আনা চাই। সেই সঙ্গে, যেখান থেকে হোক জুটিয়ে আনা চাই খান তিনেক ইঁট, যা দিয়ে নৌকোর পাটাতনের উপরে একটা কাজ-চালানো-গোছের উনুন সাজিয়ে নেওয়া চলে। উপরন্তু মাটির একটা হাঁড়ি আর গুটিকয় সরা-খুরিও কিনে আনতে হত। পথের মধ্যে যে-কোনও একটা জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে দরকার-মতো কলাপাতা কেটে নেওয়া যেত বলে সেটা নিয়ে কোনও ভাবনা ছিল না।

এত সব কাজ মিটিয়ে ক'টার মধ্যে বাবা গোবিন্দপুব থেকে রওনা হতে পারবেন, চতুর্থীর দিন সকাল থেকেই গ্রামের বাড়িতে বসে ঠাকুর্দা আর আমি তাই নিয়ে সারাক্ষণ হিসেব কষে যেতুম। ঠাকুর্দা বলতেন, "ধর দশটার মধ্যে রওনা হল, তা হলে কখন এসে পৌছবে ?"

"অন্তত দশ ঘণ্টা তো লাগবেই।"

"তার মানে রাত আটটায় এসে পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি কী, ওর সঙ্গে আরও দু'ঘণ্টা যোগ করে দে।"

"কেন কেন, আরও দু'ঘণ্টা যোগ করব কেন ?"

ঠাকুর্দা বলতেন, "নদীতে কচুরিপানা থাকতে পারে। ঠাস-জমাট কচুরিপানার গাঁটের মধ্য দিয়ে নৌকো চালানো কি সোজা ব্যাপার ? অবশ্য কচুরিপানা যে থাকবেই, তা কিন্তু আমি বলছি না। তবে কিনা থাকতেও তো পারে।"

"থাকলে কী হবে ?"

"থাকলে ওরা রাত-দশটার আগে এসে পৌঁছচ্ছে না।"

শুনে যে কী মন খারাপ হয়ে যেত, সে আর বলবার নয়। ঠাকুর্দা সেটা বুঝতে পেরে বলতেন, "আরে আমি কি তা-ই বললুম নাকি ? নদী যদি কচুরিপানায় ঠাসবোঝাই হয়ে থাকত, তা হলে কি আর কেউ সে-কথা আমাকে জানাত না ? কই, তেমন কথা শুনিনি তো।"

নৌকো অবশ্য আমাদের ঘাটে এসে ভিড়তে দশটা তো দশটা, অনেক সময় রাত বারোটাও বেজে যেত। তার একটা কারণ যেমন কচুরিপানার গাঁট, আর-একটা কারণ তেমন আবার রাত্তিরের

অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলা। কাছাকাছি এলাকার কোনও মাঝির নৌকো পেলে অবশ্য পথ হারাবার ভয় থাকত না, কিন্তু সব সময়ে কি আর তেমন মাঝি পাওয়া যায়? অন্য এলাকার মাঝি হলে প্রায়ই পথ হারিয়ে ফেলত।

তা ছাড়া ছিল নৌকোয় ডাকাত পড়বার ভয়। পুজোর সময়ে যারা প্রবাস থেকে ফেরে, তাদের সঙ্গে সাধারণত মালপত্র কিছু-না-কিছু থাকেই। ডাকাতির সংখ্যাও তাই পুজোর সময়ে আরও বেড়েই যেত। প্রায়ই শুনতুম, অমুক গ্রামের অমুক লোক কলকাতা থেকে ফিরছিল, পথের মধ্যে তাদের নৌকোয় ডাকাত পড়ে সর্বস্ব লুঠে নিয়েছে। খুন-জখমও প্রায়ই হত। ঠাকুমা তাই সারাটা দিন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন। তারপর সন্ধে লাগতেই সেই যে তিনি একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আমাদের পুকুরপাড়ের পেয়ারাতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন, তারপর যতক্ষণ না বাবার তিনমাল্লাই নৌকো এসে ঘাটে লাগছে, ততক্ষণ আর সেখান থেকে তাঁকে নড়ানো যেত না।

লণ্ঠন হাতে ঠাকুমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এইটে দেখে ঠাকুর্দা বলতেন, "আরে, এখুনি কোথায় চললে, জিতুর নৌকো তো এখনও তা অন্তত আট-দশ মাইল দূরে রয়েছে, সেখান থেকেই তোমার ওই লণ্ঠনের আলো দেখে সে পথ চিনতে পারবে নাকি? তোমার সমস্যাটা কী বলো তো?"

ঠাকুমা বলতেন, "সে তুমি মা হলে বুঝতে। বাবা হলে এ-সব কথা বোঝা যায় না।"

এর উত্তরে আর কী বলবেন। ঠাকুর্দা চুপ করে যেতেন। ঠাকুমা'র সঙ্গে আমিও গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরপাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতুম। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হত না, তবে বাড়ির কাছাকাছি এসেই চিৎকার করে বাবা সবাইকে ডাকতে শুরু করতেন তো, সেই চেঁচামেচি শুনেই আমরা বুঝতে পারতুম যে, নৌকো এবারে সত্যি-সত্যি এসে পড়েছে। বুঝবামাত্র চেঁচাতে শুরু করতুম আমিও। শুনে আমাদের বাড়ির সবাই তো বটেই, পাশের বাড়ির লোকেরাও ঘাটের কাছে ছুটে আসত। সে এক হুলুস্থুলু ব্যাপার।

সে-রাত্তিরে আর কারও বিশেষ ঘুম হত না। বাবা এসেছেন বলে উজাগির সিং জ্বালিয়ে দিত হ্যাজাক-লণ্ঠন। ফলে অন্ধকার বিলকুল কেটে গিয়ে রাত একেবারে দিন হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়ার পরে বসত গল্পের আসর। কলকাতা থেকে কার জন্যে কী আনা হয়েছে, তোরঙ্গ খুলে এক-এক করে মা সব বার করে দেখাতেন। জিনিসপত্র যে শুধু আমাদের বাড়ির লোকেদের জন্য, তা নয়, যাদের সঙ্গে কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, তাদেরও অনেকের হাতে কিছু-না-কিছু উপহার এই উপলক্ষে তুলে দেওয়া হত। গ্রামের কয়েকটা বাড়ির বউ আর বাচ্চাদের মা খুব স্নেহ করতেন। কাকারা তাদের ঠাট্টা করে বলতেন 'বউদির পুষ্যি'। তা করুন, তাদের জন্যে শাড়ি, শেমিজ, ইজের, শার্ট, ফ্রক ইত্যাদি নিয়ে যেতে মায়ের কখনও ভুল হত না। তবে ধুতিই যেত সবচেয়ে বেশি। গাঁট-বাঁধা ধুতির প্রত্যেকটির উপরে সাদা কাগজের লেবেল এঁটে নাম লিখে রাখা হত, যাতে তার কোনটা আমাদের পরামানিক রসিকদা পাবে, আর কোনটা পাবে যে আমাদের জামাকাপড় কেচে দেয় সেই সুধন্যদা, তাতে ভুল না হয়। ঠাকুর্দার জন্য ধুতি, চাদর, বিদ্যাসাগরী চটিজুতো ইত্যাদি ছাড়াও যেত দার্জিলিংয়ের ভাল চা আর অম্বুরি তামাক।

পঞ্চমীর দিন সবাইকে এক-জায়গায় ডেকে ঠাকুর্দা সে-সব তাদের হাতে-হাতে তুলে দিতেন। সেদিন বিকেল থেকেই ফের শুরু হয়ে যেত তুজারপুরে যাওয়ার তোড়জোড়। বাবা যে তিনমাল্লাই নৌকো করে এসেছেন, সেটিকে ছেড়ে না দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের 'সিধা' অর্থাৎ খোরাকির চাল, ডাল, আনাজপাতি, তেল, নুন সব দিয়ে এসেছি, নৌকোর মধ্যে কুপি জ্বেলে তারা নিজেরাই সে-সব রান্নাবান্না করে খাচ্ছে। তাদের যে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, তার কারণ,

ওই নৌকোয় করেই কাল তুজারপুরে যাওয়া হবে।

পুজোর সময়ে সবাই মিলে তুজারপুরে যাবার একটা কারণ ছিল। আমাদের গ্রামে অন্য সব পুজো হলেও দুর্গাপুজো হত না। অত ব্যয়বহুল একটা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার মতো আর্থিক সামর্থ্যই ছিল না কারও। ফলে যে একটা ফাঁকা শূন্যতার সৃষ্টি হত এই সময়ে, তার বেদনা একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁদের গ্রামে দুর্গাপুজো বলতে কিছু নেই। আমাদের মতো অল্পবয়সীদের বুকেই এই বেদনা সবচেয়ে বেশি করে বাজত। আসলে দুর্গাপুজো বলতে তো শুধু তিন-চার দিনের অনুষ্ঠান বোঝায় না, তার প্রস্তুতি-পর্বের যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা, সেটা অনেক আগে থাকতেই শুরু হয়ে যায়। পুজো-পুজো সেই ভাবটাও তো পুজোর আনন্দেরই অঙ্গীভূত। শরৎ এলেই আকাশে-বাতাসে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামে থাকতুম বলে এটা যেন একেবারে হাড়ে-মজ্জায় বুঝতে পারতুম। বৃষ্টির তেজ আর সেই আগের মতো নেই, এই যদি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল তো পরক্ষণেই আকাশে আবার ছড়িয়ে পড়ল রোদ্দুর। নারকোল গাছের মাথা থেকে ডানা ছড়িয়ে শূন্যে ঝাঁপ খেয়ে ছুরির মতন ধারালো চিৎকারে বাতাসের বুক দু'ফালা করে চিরে দিয়ে দেখতে-না-দেখতে সাদা মেঘের বারান্দার কাছে উঠে গেল বাদামি রঙের মস্ত একটা কোরা। শিউলি গাছের তলাটা ফুলে-ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে। মাঠের জলে টান ধরেছে। সেখানে ফুটে আছে সাদা আর লাল রঙের অজস্র শাপলা। ধানখেতের উপরে রোদ্দুর সারাক্ষণ ছায়াকে তাড়া করে ফিরছে। এইসব দেখতুম, আর মন খারাপ হয়ে যেত। মন আরও বেশি খারাপ হত রাত্তিরবেলায়, দূরের কোনও গ্রাম থেকে যখন জলের উপর দিয়ে ভেসে আসত ঢাকের শব্দ। ঠাকুমা বুঝতে পারতেন যে, আমি ঘুমোইনি। কাছে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "কী রে, ঘুম আসছে না বুঝি?" কী করে আসবে? যে গ্রামে পুজো নেই, তার শিশুদের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে দূর-থেকে-ভেসে-আসা ওই ঢাকের বাজনার মতো মারাত্মক আর কিছুই হতে পারে না।

ছোটদের তো মন খারাপ হতই। সেই সঙ্গে সন্দেহ কবি, বয়সে যাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়, তাঁরাও যেহেতু এই সময়ে একটু ছেলেমানুষ হয়ে পড়তেন, তাই একটু-আধটু মন খারাপ হত তাঁদেরও। সেই জন্যেই তুজারপুরে যাওয়া। সেখানে বাবার মামাবাড়িতে খুব জাঁকজমক করে পুজো হত। বাবার মামাতো ভাইদের মধ্যে কেউ-না-কেউ আগেই এসে বলে যেতেন যে, পুজোর ক'টা দিন আমাদের সবাইকে সেখানে গিয়ে কাটাতে হবে।

সবাই অবশ্য যেতেন না। ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা চান্দ্রাতেই থেকে যেতেন। বাবাও ষষ্ঠীর দিনে বাড়ি ছেড়ে নড়তে চাইতেন না; বলতেন, "বাদবাকি সবাই রওনা হয়ে যাক, খোকাকে নিয়ে আমি বরং বাড়ির নৌকোয় করে সপ্তমীর সকালে রওনা হব।" তাতে আমি একটুও আপত্তি করতুম না। তার কারণ, অন্যেরা চলে গেলেও বাবাকে তো পাচ্ছি, আর বাবাকে যদি পুরো একটা দিনের জন্য একা আমি দখল করতে পারি, তা হলে যে অনেক গল্প শোনা যাবে, সে আমি খুব ভালই জানতুম।

দেশের বাড়িতে থাকতে দুর্গাষষ্ঠীর রাতটায় বাবাকে খুব পাওয়া যেত। তখন যে তাঁর কাছে কত গল্প শুনেছি। একতলায় ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা'র কাছে বসে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হত। তারপর ঠাকুমা'ই এক সময় বলতেন, "আর রাত্তির জাগিসনে। পরশু তো আর রেলগাড়িতে ঘুমোতে পারিসনি, কালও এসে পৌঁছতে অনেক রাত হল, এবারে উপরে গিয়ে শুয়ে পড়।" তখন আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বাঁ হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ঝুলিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাবা দোতলায় উঠে আসতেন। তখন শুরু হত গল্প। প্যান্ডোরার গল্প, পার্সিউসের গল্প, হারকিউলিসের গল্প,

গানের সুরে ভুলিয়ে যে কিনা জাহাজের লোকদের কাছে টেনে আনত, সেই সাইরেনের গল্প—সবই সেই সময়ে বাবার কোছে শোনা। গল্প শুনতে-শুনতেই ঘুমিয়ে পড়তুম এক সময়।

বাবার ঘুম ভাঙত বেশ দেরিতে। আমি তার অনেক আগেই নীচে নেমে এসে ঠাকুর্দার খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম। ঠাকুর্দা বলতেন, "কী দাদা, কাল রাত্তিরে নিশ্চয়ই ভয়-টয় পাওনি ?"

শুনে একটু লজ্জা-লজ্জা করত। তবে একটা কথা ঠিক। বাবার কাছে শুয়ে যেদিন ঘুমোতুম, সত্যি সেদিন একটুও ভয় পেতুম না। অন্য সময়ে কিন্তু সারাটা দিন হই-হল্লোড়ে কাটলেও রাত্তির এলেই কেমন যেন গা-ছমছম করত। হয় হেঁশেলে গিয়ে বড় কাকিমার কাছে চুপটি করে বসে থাকতুম, আর নয়তো ঠাকুমা'র আঁচল কিছুতেই ছাড়তে চাইতুম না। ভয়ে যেন সিঁটিয়ে থাকতুম তখন। উঠোন-জোড়া জ্যোৎস্নার উপরে মেঘের ছায়া পড়ল, তাতে ভয়। টিনের চালে আমগাছের একটা ডাল এসে পড়ায় তার ঘষ্টানি লেগে শব্দ হচ্ছে, তাতে ভয়। ঘরের চালের বাতার উপর দিয়ে খুরখুর শব্দ করে দৌড়ে গেল একটা ইঁদুর, তাতে ভয়। অনেক দূরে কে যেন কাকে চেঁচিয়ে ডাকছে, তাতে ভয়। যা কিনা নেহাতই সাধারণ ব্যাপার, তাতেও এই যে ভয় পাওয়া, চম্‌কে-চম্‌কে ওঠা, পাঁচ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত এটা আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে মেরেছে। ঠাকুমা একদিন বলেই বসলেন, "হ্যাঁ রে, তোর ব্যাপার কী বল্‌ তো ? সূর্য ডুবলেই তুই দেখছি ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যাস। কেন রে, রাত্তিরকে তোর এত ভয় কিসের ?"

উত্তরটা আর আমাকে দিতে হয়নি, যা বলবার ঠাকুর্দাই বলেছিলেন। হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "দ্যাখো দাদা, তোমার ঠাকুমা যা-খুশি বলুন, আমার তো মনে হয়, রাত্তির হলেই এই যে আমরা ভয় পাই, এটা খারাপ নয়।"

ঠাকুমা বললেন, "যেমন ঠাকুর্দা, তার তেমন নাতি ! কেন, রাত্তিরকে ভয় করতে হবে কেন ?"

"এর উত্তর তো অতি সহজ," একগাল হেসে ঠাকুর্দা বললেন, "আরে বাবা, রাত্তিরকে যদি না একটু ভয় করতুম, তা হলে দিনটাকে এত ভালবাসতে পারতুম না। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো ফুটল, একে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে ভাবতে পারতুম না।"

ঠাকুর্দার অনেক কথার মধ্যে এই কথাটা যেন স্মৃতির মধ্যে একেবারে গেঁথে রয়েছে। ভাল করে আলো ফুটবার আগেই যখন বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে বাইরে ছুটে আসতুম, আর পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম সাত-তালতলার ওদিকে যেখানে আকাশটা একেবারে মাটিতে এসে মিশেছে, সেখানে দিগন্তরেখার উপরে লেগেছে হাল্‌কা লালের ছোপ, সত্যি তখন মনে হত যে, ওই যে সূর্য উঠছে, ও তো আমাদের সমস্ত ভয় কাটিয়ে দেবার জন্যেই।

বাবা যখন দেশের বাড়িতে আসতেন, তখন কিন্তু রাত্তিরকে তেমন ভয় পেতুম না। মনে হত, চোর ডাকাত ভূত পেত্নি রাক্ষস খোক্কস, যে-ই আসুক না কেন, বাবার কাছে ঠিক জব্দ হয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে আজ তুজারপুরে যাচ্ছি; সেখানেও যে সারাক্ষণ তাঁকে কাছে পাওয়া যাবে, রাত্তিরে ঘুমোনোও যাবে তাঁর পাশে শুয়ে, এইটে ভেবে খুব ভাল লাগছিল।

দোতলা থেকে বাবা যখন নীচে নামলেন, তখন বেশ বেলা হয়েছে। তার অনেক আগেই ঠাকুর্দার এক প্রস্ত চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, এখন বাবার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে দ্বিতীয়বার চা খাবেন। বাবা চা খান না। শরৎ-পিসেমশাইয়ের মতো তিনিও দুধের ভক্ত। ঠাকুর্দা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি এবারে চান-টান করে তৈরি হয়ে নাও দাদা, একটু বাদেই তো তোমরা রওনা হবে, আমি বরং ততক্ষণ তোমার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলি।"

বাড়িতে আজ মা'ও নেই, বড়কাকিমাও নেই, তাই ঠাকুমাকেই গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে। আজ সপ্তমী। ফেনাভাত, আলুসেদ্ধ আর মাছভাজা খেয়ে বাবার হাত ধরে আমি নৌকোয় গিয়ে

উঠলুম। হাতঘড়ি দেখে বাবা বললেন, "ইশ, ন'টা বেজে গেল! পৌঁছতে-পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে যাবে।" পাশের গ্রামের জগদীশ মণ্ডল আমাদের বাড়িতে কাঠ কাটে আর দরকারমতো নৌকো বায়। আমরা তাকে জগাইদা বলি। জগাইদা নৌকো ছেড়ে দিল।

আজ পর্যন্ত যত রকমের যানবাহনে উঠেছি, তার মধ্যে নৌকোই যে সবচেয়ে আরামপ্রদ, তাতে সন্দেহ নেই। বাড়ির নৌকো, ছইয়ের নীচে শতরঞ্চির উপরে চাদর বিছিয়ে পাতলা করে বিছানা পাতা, পাশাপাশি দুটো বালিশ, ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, মৃদুমন্দ দুলুনি আছে, কিন্তু ঝাঁকুনি নেই, চিৎকার-চেঁচামেচি ভিড়ভাট্টা নেই, রাস্তায় ট্রাফিক-জ্যাম নেই, এয়ারপোর্টে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা নরকযন্ত্রণা ভোগ করা নেই, ধানখেতের মধ্যেকার দারা ধরে নৌকা চলছে, আকাশ একেবারে ঝকঝকে নীল, রোদ্দুরও উঠেছে চড়া রকমের, এত রোদ্দুরে যদি চোখ ধাঁধিয়ে যায় তো বাইরে বসে থেকে কাজ নেই, ভিতরে ঢুকে একটু গড়িয়ে নাও। যত ভাবি, তত মনে হয় যে, নৌকোর চেয়ে ভাল বাহন আর কিছুই হতে পারে না।

মাঝি এখন লগি ঠেলছে। খানিক বাদেই ছুলনার গাঙে পড়ব। জগাইদা তখন তার হাতের লগিটাকে ছইয়ের পাশে ঠেলে দিয়ে বইঠা ধরবে। তারও খানিক বাদে নৌকোর গায়ে বড়-বড় ঢেউ লেগে যখন ছলাত-ছলাত শব্দ হবে, আর নৌকোর মুখও সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় হঠাৎ ঘুরে যাবে খানিকটা, তখন বুঝতে হবে যে, আমরা বড়-গাঙে এসে পড়েছি। বড় গাঙ মানে কুমার নদী। তখন আর বিছানায় শুয়ে গড়াতে নেই। ছইয়ের তলা থেকে তখন বেরিয়ে আসতে হয়। বেরিয়ে এসে দেখতে হয় যে, হরেক রঙের বাদাম খাটিয়ে ছোট-বড় সব নৌকো কীভাবে গঞ্জের দিকে চলেছে। দেখতে হয়, এ-দিকে ও-দিকে হঠাৎ-হঠাৎ শুশুকের পিঠ কীভাবে জলের উপরে ভেসে উঠে ফের পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে।

ছুলনার গাঙ যেখানে কুমারে এসে মিশেছে, নদীর পাড়ে ডালপালা-ছড়ানো মস্ত একটা অশথগাছের তলায় সেখানে শীতল মণ্ডলের কাঠের থল। সেখানে কাঠ চেরাই হচ্ছে। লম্বা একটা করাতের দুই মাথায় দুটো কাঠের হাতল। একজন উপর থেকে সেই হাতল ধরে আছে, একজন নীচের থেকে। গুঁড়ি চেরাই করে বানানো হচ্ছে তক্তা। করাত ওঠানামার সঙ্গে-সঙ্গে একটানা শব্দ হচ্ছে ঘ্যাশ ঘ্যাশ ঘ্যাশ! ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে কাঠের গুঁড়ো। আবহমানকাল বলতে যা বুঝি, এই দৃশ্য যেন তারই একটি চিত্ররূপ।

কুমার নদীর ধারে ভাঙ্গা। আমাদের ওদিককার সবচেয়ে বড় গঞ্জ। ভাঙ্গার সামনে থেকেই কুমারের একটা শাখা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে, আর নদীর যেটা মূল ধারা সেটা পুব দিকে আরও অনেকটা পথ গিয়ে আড়িয়ল খাঁতে পড়েছে। এই মূল ধারার উত্তর পাড়ে হাইস্কুল আর মুন্সেফ আদালত; দক্ষিণ পাড়ে বড়-ডাকঘর আর বাজার। এখন ব্রিজ হয়েছে শুনেছি, স্বচ্ছন্দে নদী পেরিয়ে যে-দিকে খুশি যাওয়া যায়। কিন্তু এ তো হাল-আমলের ব্যাপার। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন ব্রিজ ছিল না, খেয়ানৌকোয় নদী-পারাপার করতে হত।

উত্তর পাড়ে আমাদের নৌকো ভেড়ানো হল। বাবা এখানে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবেন, টুকিটাকি কিছু কেনাকাটাও রয়েছে। সে-সব মিটিয়ে লুচু ঠাকুরের দোকানে যাওয়া হল। সেখানে বিশাল দু'হাঁড়ি রসগোল্লা কেনার পরে কী যেন ভেবে ছোট এক হাঁড়ি পানতুয়াও কিনে ফেললেন বাবা। তারপর নৌকোয় উঠে বললেন, "দ্যাখ্, এখন আমি ঘণ্টাখানেক ঘুমোব, তার মধ্যে আমাকে একটুও বিরক্ত করবি না। আর হ্যাঁ, তুই সাঁতার জানিস ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আবার জলের দিকে অত ঝুঁকিস না যেন; নদীতে কামঠ আছে, পড়ে গেলেই কিন্তু ঠ্যাং কামড়ে জলের নীচে টেনে নেবে।"

বললুম, "বাঃ, তুমি যে নেপোলিয়নের গল্প বলবে বলেছিলে?"

হাই তুলে বাবা বললেন, "সে তো বলবই। শুধু নেপোলিয়ন কেন, শিবাজি আর রানা প্রতাপের গল্পও বলব। তবে এখন নয়, রাত্তিরে। এখন অন্তত একটা ঘণ্টা আমাকে ঘুমোতে দে।"

"তা হলে এখন আমি কী করব?"

"তুই এখন পানতুয়া খাবি।" হেসে ফেলে বাবা বললেন, "ওই যে পানতুয়া কিনলুম, ও তো তোরই জন্যে। যতক্ষণ পারিস খেয়ে যা। একা খাস না, জগদীশকেও দিস।"

ভাঙ্গা থেকে মাইল কয়েক পুবে গিয়ে তারপর বাঁ দিকে একটা সরু খাল। নাম বৈঠাখালির খাল। দারুণ স্রোত। এই খাল ধরে এগোতে হয় উত্তর দিকে। খানিক এগোলেই তুজারপুর। বাবার মামাবাড়ি। বাবার ঘুম ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছিল। ছই থেকে বেরিয়ে তিনি বাইরের পাটাতনে এসে বসেছেন। খালের দু'পাশে ঘরবাড়ি। সেখানে সবাই দেখলুম বাবাকে চেনেন। পাটাতনে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে লাগলেন। কাউকে তিনি নাম ধরে ডাকছিলেন, আবার কাউকে বলছিলেন 'মামা' কি 'দাদা'। কে কেমন আছে, সব জিজ্ঞেস করছিলেন। আমার খুব অবাক লাগছিল। বাবার ছেলেবেলা আর গোটা ইস্কুল-জীবন যে এই তল্লাটেই কেটেছিল, তা কি আর আমি জানি না? খুব জানি। কিন্তু এতদিন বাদেও যে সব্বাইকে তিনি মনে রেখেছেন, কাউকেই ভুলে যাননি, সেটা আমি জানতুম না।

একে তো ভাঙ্গাতেই অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল, তার উপরে আবার খালের জলে ভীষণ স্রোত। সেই স্রোত ঠেলে এগোতে হচ্ছিল বলে তুজারপুর পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাবার মামাবাড়ি একেবারে খালের পাশেই। সেখানে নৌকো ভেড়াতে না ভেড়াতেই সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়ান। এখানে আমার যে আর-এক প্রস্ত বড়কাকা, মেজোকাকা, সেজোকাকা, রাঙাকাকা ইত্যাদিরা রয়েছেন, এঁরা হচ্ছেন বাবার মামাতো ভাই। এঁদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠ, সেই ইন্দ্রকাকা আমার চেয়ে সামান্য বড়। নৌকো থেকে নামতেই সে আমাকে সঙ্গে করে এক দৌড়ে গিয়ে পুজো-মণ্ডপে হাজির হল। সেখানে তখন আরতির উদ্যোগ চলছে। মা, দিদি, বড়কাকিমা, গোলাপি-পিসি, ছোটপিসি, সবাইকেই সেখানে দেখতে পেলুম।

ইন্দ্রকাকা আমার হাতে এক বাণ্ডিল কাঠি-পটকা আর এক বাক্স ফুলঝুরি ধরিয়ে দিয়েছিল। সে-সব ফাটিয়ে আর জ্বালিয়ে শেষ করতে-না-করতেই চড়বড় করে ঢাক বেজে উঠল। ধুনুচি-হাতে পুরুত ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। শুরু হয়ে গেল আরতি। সে-রাতে যে কখন ঘুমিয়েছিলুম, কোথায় ঘুমিয়েছিলুম, কার পাশে শুয়েছিলুম, কিচ্ছুই মনে নেই।

পরদিন সকালের দুটো কথা কিন্তু ভুলে যাইনি। প্রথমত, বাবার মামাবাড়িটা যে ঠিক আমাদের দোতলা কাঠের বাড়ির মতো, এটা দেখে অবাক হয়ে যাই। বাবাকে সে-কথা বলতে তিনি বলেন, "তা তো হবেই। তোর ঠাকুমা'র ইচ্ছে ছিল, একেবারে এই বাড়িটার মতন করে আমাদের চান্দ্রার বাড়িটা বানাতে হবে। তো তা-ই হয়েছে।"

দ্বিতীয় যে কথাটা মনে আছে, তা এই যে, অষ্টমীর দিন দুপুরবেলায় পুজো-মণ্ডপের সামনে যখন আমরা চাবি-পটকা ফাটাচ্ছি, তখন হঠাৎ পিছন থেকে একটা ষাঁড় এসে আমাকে গুঁতিয়ে দেয়। আচমকা ধাক্কা খেয়ে হাত দশেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ি। সেই রাত্তিরেই আমার কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ধুম জ্বর। পরে যে আরও অনেক ষাঁড়ের গুঁতো আমাকে খেতে হবে, সেটা তখনও জানতুম না।

১৩

বাবার মামাবাড়ির কথা তো বলেছি, এবারে আমার নিজের মামাবাড়ি সম্পর্কে দু-একটা কথা না-বললেই নয়। দাদামশাইরা যে বেশ সচ্ছল মানুষ, তা তাঁদের ঘরবাড়ি, কথাবার্তা আব চালচলন থেকেই দিব্যি বোঝা যেত। এ যখনকার কথা বলছি, তখন অবশ্য তাঁদেব অবস্থা অনেকটাই পড়ে এসেছে, তবে নেই-নেই করেও যেটুকু ছিল, তাও নিতান্ত কম হবে না। নগদ টাকায় টান ধরলেও বিশাল দুটো ফলের বাগান আর মস্ত একটা দিঘি তো ছিলই, সেই সঙ্গে চাষেব জমিও ছিল বিস্তর। দাদামশাই কোচবিহার রাজ এস্টেটে চাকরি করতেন। মা আব বড়মামির কাছে শুনেছি যে, সেটা বেশ বড় মাপের চাকরি। তখন তাঁর একটা হাতিও ছিল। অবসব নেবাব সময়ে সেই হাতিটা তিনি বিক্রি কবে দেন, তাবপর বাদবাকি জীবন তাঁব ভবানীপুব গ্রামেব পৈতৃক বাড়িতে এসে কাটান। হাতিতে চড়ে কীভাবে তিনি মহাল পরিদর্শন করতে যেতেন, প্রজাবা কী ভাবে তাঁর হাতির সামনে এসে গড় হয় প্রণাম ঠুকত, জমিয়ে সেইসব গল্প করা আব নিজেরই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে খুবই তুচ্ছ কিছু বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়া ছাড়া তখন আর তাঁব অন্য কোনও কাজ ছিল না।

দাদামশাইয়ের কথা ভাবতে গেলে অবশ্য তাঁর দাড়ির কথাটাই সর্বাগ্রে আমাব মনে পড়ে। অমন লম্বা, অমন ঘন আর অমন দুধের মতন ধবধবে সাদা দাড়ি আমি আর দেখিনি। তার আগেও না, তার পরেও না। আঙুল দিয়ে সেই দাড়িতে বিলি কাটতে কাটতে তিনি তাঁর কর্মজীবনেব গল্প শোনাতেন। বড়-একটা বাইবে বেরুতেন না। তবে যখন বেরুতেন, তখন পোশাকটা কবতেন জবরদস্ত। চকচকে কালো পাম্পশুর সঙ্গে জরিপাড় ফিনফিনে ধুতির উপরে পাটভাঙা সাদা চায়না সিল্কের গলাবন্ধ কোট। দাড়ির শেষাংশ যে তখন কোটের তলাকাব ডানদিকের পকেটে গুঁজে রাখতেন, এটাও মনে পড়ে। অন্যের করা বাজার পছন্দ হত না বলে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন নিজের হাতে বাজার করতেন। সঙ্গে যে ভৃত্যটি থাকত, তার এক কাঁধে আমি, অন্য কাঁধে বিশাল একটা ধামা। একই সঙ্গে দুই কাঁধের দায়িত্ব সামলাতে সে হিমসিম খেত।

দাদামশাই যখন মারা যান, আমার বয়স তখন খুবই কম। তার উপরে আবার মামাবাড়িতে খুব-একটা যাওয়া হত না বলে সব মিলিয়ে মাত্রই তিন-চার বার তাঁকে দেখেছি। তবে যেটুকু দেখেছি, তারই উপরে নির্ভর করে বলতে পারি যে, আমার পিতামহ ও মাতামহ ছিলেন একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির দুটি মানুষ। দুজনের মধ্যে লেশমাত্র মিল ছিল না। না তাঁদের চালচলনে, না তাঁদের মেজাজ-মর্জিতে। একমাত্র চা-পানের ব্যাপারে ঠাকুর্দা একটু খুঁতখুঁতে ছিলেন। সেরা দার্জিলিং-চা ছাড়া তাঁর চলত না। কিন্তু অন্য আর কোনও ব্যাপারেই আমার পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তীর কিছুমাত্র বিলাস কিংবা শৌখিনতা কখনও আমার চোখে পড়েনি। তাঁর আহার যেমন ছিল অতি

পরিমিত, তেমন পরিচ্ছদও ছিল অতি সাধারণ। অন্য সময়ে ধুতি আর ফতুয়া পরতেন, শুধু শীত পড়লে তাঁর গায়ে একটা বালাপোষ উঠত। মাতামহ রাসবিহারী চক্রবর্তী সেক্ষেত্রে অতি-মাত্রায় ভোজনবিলাসী ছিলেন। মধ্যাহ্নভোজের সময়ে সেই বৃদ্ধ বয়সেও নিত্য একটি বৃহদাকার রোহিত মৎস্যের মুড়ো এবং শেষপাতে একবাটি ক্ষীর ছাড়া তাঁর চলত না। পোশাক-পরিচ্ছদেও ছিলেন খুবই শৌখিন। গলায় ঝোলানো কালো রেশমি ফিতের মাথায় যে সোনার ঘড়িটা বাঁধা থাকত, বাইরে বেরুবার সময় সেটা তিনি তাঁর কোটের বুক পকেটে গুঁজে রাখতেন। তিনি যে বেশ ভোগী মানুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

রাসবিহারী চক্রবর্তীর দুই বিয়ে। একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দিয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যান। পুত্র ও কন্যার মধ্যে বয়সের পার্থক্য অন্তত দশ বছরের। কন্যাটি আমার মা। দিদিমা যখন মারা যান, মায়ের বয়স তখন এক বছরও পূর্ণ হয়নি। দাদামশাই তখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, এবং দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও প্রথম পক্ষের পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহারে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যান। যাবার আগে আমার মা'কে তিনি ভবানীপুরের কাছে বেনেবউ গ্রামে রেখে এসেছিলেন। সেখানে আমার মায়ের পিসির বাড়ি। সেই পিসির কাছেই মা অতঃপর বড় হতে থাকেন।

দশ বছর বয়সে আমার মায়ের বিয়ে হয়। বাবার বয়স তখন কুড়ি। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি তখন কলেজে ঢুকেছেন। বিয়ের পরে সেই যে মা কলকাতায় চলে এলেন, তারপরে আর দীর্ঘকাল তিনি পিত্রালয়ে যাননি। বাবা ছিলেন গৌরবর্ণ পুরুষ। এদিকে একে তো আমার মা কালো, তার উপরে আবার আঠারো আর কুড়ি বছর বয়সে তাঁর প্রথম যে দুটি সন্তান হয়, সেই দুটিই মেয়ে। শুনেছি, ঠাকুমার তাই নিয়ে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মায়ের প্রথম সন্তানটি বাঁচেনি। দ্বিতীয় সন্তানের তিন বছর বাদে আমার জন্ম। আমিও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু শত হলেও ছেলে তো, তাই আমার জন্ম হতেই নাকি মায়ের বিরুদ্ধে ঠাকুমার তাবৎ আপত্তি একেবারে এক মুহূর্তে কেটে যায়। এটাও শুনেছি যে, ঠাকুমারই ইচ্ছায় আমার অন্নপ্রাশন খুব ধুমধাম করে হয়েছিল। সম্ভবত তিনি আশা করেছিলেন যে, বংশের মুখ একেবারে যৎপরোনাস্তি উজ্জ্বল না-করে আমি ছাড়ব না। তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মানুষ তো কত রকম আশাই করে। তার সবই কি আর পূর্ণ হয়?

মায়ের দাদার কথা বলেছি। যথাসময়ে, অর্থাৎ এ-কালের হিসাবে যা যথাসময় তার অনেক আগেই, তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নাবালক দুটি পুত্রকে রেখে খুবই অল্প বয়সে তিনি মারা যান। এটা আমার জন্মের বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমার অন্নপ্রাশনে যিনি চান্দ্রায় এসেছিলেন, তিনি আমার দাদামশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম ছেলে। তাঁর চেয়ে বড় একজন মামা যে ছিলেন, সেটা জানতুম না বলে তাঁকেই আমরা বড়মামা বলে ডাকতুম। ভবানীপুরের মামাবাড়িতে গিয়ে যাঁকে দিদিমা বলে ডাকতুম, তিনি যে আমার মায়ের সৎমা, ছেলেবেলায় অবশ্য সেটাও আমরা জানতুম না।

ভবানীপুর জায়গাটাকে ইতিপূর্বে গ্রাম বলে উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা ঠিক হয়নি। ওটাকে বস্তুত রাজবাড়ির একটা শহরতলি বললেই ঠিক হয়। ই. বি. আর. অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের যে মেন লাইনটা গোয়ালন্দঘাট পর্যন্ত গিয়ে শেষ করত তার প্রথম দৌড়, রাজবাড়িই ছিল সেই লাইনের শেষ বড় ইস্টিশান। জংশন ইস্টিশান। ফরিদপুরের যাত্রীদের জন্য ঢাকা মেল আর চিটাগং এক্সপ্রেসে যে আলাদা ডিব্বা থাকত, ওখান থেকেই কেটে নিয়ে সেটা জুড়ে দেওয়া হত ব্রাঞ্চ লাইনের রেলগাড়ির সঙ্গে। সেটা ছিল প্যাসেঞ্জার গাড়ি। এমন টিকুস

টিকুস করে চলত যে, মনে হত পথ বুঝি আর ফুরোবে না। পাঁচুরিয়া, বসন্তপুর, খানখানাপুর, শিবরামপুর, ব্রাঞ্চ লাইনের এইসব ইস্টিশানের নাম এখনও স্মৃতির মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে। কিন্তু সে কথা থাক। আমি যখনকার কথা বলছি, মেল আর এক্সপ্রেসে তখনও আলাদা ডিব্বার ব্যবস্থা হয়নি। রাজবাড়ি ইস্টিশানে নেমে লাইন পেরিয়ে তখন ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে গিয়ে উঠতে হত। ঢাকা মেলে গেলে রাজবাড়িতে পৌঁছতুম শেষ-রাত্তিরে। কাচ্চা-বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে, কুলি ডেকে, বাক্স-প্যাঁটরা বোঁচকা-বেডিং নামিয়ে গাড়ি-পালটাপালটির পর্বটা তাই কম হুজ্জুতের ব্যাপার ছিল না।

কিন্তু সেই শেষ-রাত্তিরেও দেখতুম যে, আমার দুই মামাতো দাদার কেউ-না-কেউ ঠিকই ইস্টিশানে এসে হাজির হয়েছেন। মায়ের যে দাদা খুবই অল্পবয়সে মারা যান, এরা তাঁরই দুই ছেলে। গৌরাঙ্গসুন্দর আর দেবেন্দ্রবিজয়। ডাক নাম গৌর আর নিতাই। পিতৃকুলের প্রতি আনুগত্যের কারণে যেমন বড়পিসির ছেলেকে আমরা বড়দা বলতুম, মাতৃকুলের প্রতি আনুগত্যেও তেমন ত্রুটি ঘটবার উপায় ছিল না। ফলে শিশুকালেই আমাদের শেখানো হয়েছিল যে, এঁদেরও বড়দা আর মেজদা বলে ডাকতে হবে। তাঁরা যে কী করে আমাদের আসবার খবর পেতেন, তখন সেটা বুঝতে পারতুম না। এখন বুঝতে পারি, কবে কোন গাড়িতে আমরা কলকাতা ছাড়ছি, আগেভাগে মা'ই সে-সব কথা চিঠি লিখে তাঁদের জানিয়ে রাখতেন। তাঁরা খুব ঝুলোঝুলি করতেন, অন্তত দুটো দিন যেন তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে কাটিয়ে যাই। মামাবাড়িতে যেতে আমাদেরও ইচ্ছে হত খুব। কিন্তু মা'কে সে-কথা বললে তিনি বলতেন, "আমাকে বলে কী হবে, তোদের বাড়িতে কি আর আমার ইচ্ছেয় কিছু হয়, যেতে চাস তো তোদের বাবাকে বল্।"

বাবাকে কি আর বলতুম না? প্রতিবারই বলতুম। কিন্তু আমাদের কথার উত্তর না দিয়ে বাবা সরাসরি মায়ের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "কী ব্যাপার, ফরিদপুরের গাড়ি ছাড়বার আর দেরি নেই, এখন আবার বাপের বাড়ি যেতে চাইছ কেন?"

মা বলতেন, "চাওয়াটা কি অন্যায়? অনেক দিন বাবাকে দেখিনি।"

"আর ওদিকে আমার বাবা যে আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন, সেটা ভুলে গেলে?"

বাবাকে কিছুতেই রাজি করানো যেত না। ফলে, রাজবাড়ি থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত গোটা পথটা গাড়ির মধ্যে মা একেবারে গুম মেরে বসে থাকতেন।

সেই যে আমার তিন বছর বয়সে পুজোর ছুটিতে দেওঘরে যাওয়া হয়েছিল সেইবারই বড়দিনের ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাবার পথে কয়েকটা দিন মামাবাড়িতে কাটাই। মামাবাড়িতে সেই আমার প্রথম যাওয়া। কিন্তু দুটো মোটামুটি একই সময়ের ব্যাপার হলে কী হয়, দেওঘরের তুলনায় সেবারকার মামাবাড়ির স্মৃতি খুবই ক্ষীণ। ছোটমামা আমার চেয়ে সামান্য বড়। তার সঙ্গে যে খুব ঘুরে বেড়াতুম, সেটা মনে পড়ে। ষষ্ঠীমাসি যে আমাকে একটা মাটির পুতুল দিয়েছিল, সেটা মনে পড়ে। বড়দা হুইলের ছিপ দিয়ে মাছ ধরত, সেটা মনে পড়ে। খেলিয়ে-খেলিয়ে যখন জল থেকে ডাঙায় তুলছে, হঠাৎ তখন বিরাট লাফ মেরে চিতল মাছটা যে বড়দার পাশে দাঁড়ানো সেজোমামার একেবারে বুকের উপরে এসে আছড়ে পড়েছিল, সেটা মনে পড়ে। ছোট দাদামশাইদের বাড়ির বাগানে যে একদিন সাপ আর নেউলের লড়াই দেখেছিলুম, সেটা মনে পড়ে।

আর মনে পড়ে সেই দুটো লোকের কথা, দাদামশাইয়ের অনুমতি নিয়ে মামাবাড়ির বিশাল দিঘির দক্ষিণ পাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে যারা একটা শেয়াল মেরেছিল। সবই টুকরো টুকরো স্মৃতি, যার কোনও পূর্বাপর সম্পর্ক কিংবা পারম্পর্যের সঙ্গতি নেই। শুধু ওই শেয়াল মারার ঘটনাটা একেবারে আদ্যন্ত মনে আছে। এখনও ভুলে যাইনি যে, লোক দুটোর পরনে যেমন ছিল হলদে

রঙের লুঙ্গি আর হাঁটু অব্দি ঝুলে পড়া হলদে রঙের জামা, তেমন আবার তাদের মাথায় ছিল হলদে রঙের পাগড়ি। সঙ্গে দুটো ভীষণ তাগড়া কুকুরও ছিল। দিঘির পাড়ের ঢাল যেখানে শেষ, সেইখান থেকে শুরু হয়েছে ধানখেতের সীমানা। কুকুর দুটোকে একজন লোক পাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখে, আর অন্যজন সেই হল্‌দে রঙের পাগড়িটা দিয়ে মাথা আর মুখ ঢেকে নিয়ে ধানখেতের পাশে উবু হয়ে বসে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে শেয়ালের ডাক। তার মিনিট কয়েক বাদেই দেখি, দূরের একটা ঝোপের আড়াল থেকে গোটাকয় শেয়াল বেরিয়ে এসেছে। বাস, যে লোকটা দিঘির পাড়ের আড়ালে এতক্ষণ বসে ছিল, তৎক্ষণাৎ সে কুকুর দুটোকে ছেড়ে দেয়, আর ছাড়া পাবামাত্র বিদ্যুৎ-বেগে তারা ছুটে চলে যায় সেই শেয়ালগুলোর দিকে। তারপর আর বেশিক্ষণ আমাদের বসে থাকতে হয়নি। নেতিয়ে পড়া যে শেয়ালটাকে কামড়ে ধরে কুকুর দুটো ফিরে এল, তার মাথাটা এমনভাবে ঝুলছিল যে, তাতেই বোঝা গেল সেটা বেঁচে নেই। ছোট দাদামশাইয়ের ছেলে খ্যাপামামা বলল, "ঘাড় মটকে দিয়েছে।"

বাড়ি ফিরে দাদামশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, শেয়ালটাকে ওরা মারল কেন? ওরা কি শেয়ালের মাংস খায়? তাতে তিনি বলেছিলেন, "মাংস খাবার জন্যে তো মারেনি, শেয়ালের চামড়াটা ওরা বিক্রি করবে।"

"শেয়ালের চামড়া দিয়ে কী হয়?"

"মেমসাহেবদের জামা হয়। সে-সব জামার অনেক দাম।"

সাহেবরা যে চান করে না, এই রকমের একটা কথা শুনেছিলুম বটে, তবে মেমসাহেবদের সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। এখন শেয়ালের চামড়ার জামা পরে শুনে মনে হল যে, তারাও খুবই জংলি আর অসভ্য লোক।

পরের বছরই আবার গিয়েছিলুম মামাবাড়িতে। যাওয়ার ব্যাপারটা সেবারে সম্ভবত একেবারে শেষ মুহূর্তে স্থির হয়েছিল, তাই আগেভাগে চিঠি লিখে মা কিছু জানিয়ে রাখতে পারেননি। স্টেশনেও তাই মামাতো ভাইদের কেউ হাজির ছিলেন না। সেবারকার অনেক কথার মধ্যে এটাও মনে আছে যে, রেলগাড়ির একই কামরায় সেবারে সকলের জায়গা না-হওয়ায় মা, দিদি আর আমাকে মেয়েদের কামরায় তুলে দিয়ে বাবা উঠেছিলেন ভিন্ন কামরায়। তবে বড়-বড় সব ইস্টিশানে যেমন-যেমন গাড়ি থামছিল, তেমন-তেমন তিনি এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মা বলেছিলেন, "আমাদের জন্যে এত ভাবছ কেন? এইটুকু তো পথ, জায়গা যখন পেয়ে গেছি তখন ঠিকই পৌঁছে যাব। তুমি এত দৌড়ঝাঁপ কোরো না।" বাবা সে-কথা শোনেননি।

শেষ-রাত্তিরে রাজবাড়ি ইস্টিশানে নেমে সেবারে খুব বিপদে পড়ে যাই। এখন তো টিকিট-কালেকশনের ব্যাপারটা বলতে গেলে উঠেই গেছে, যাত্রীদের কাছে টিকিট চাইবেন, এমন বুকের পাটা কালেকটর-বাবুদের কারও-কারও আছে নিশ্চয়, কিন্তু বেশির ভাগেরই নেই। প্ল্যাটফর্মের গেটে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন ঠিকই, কিন্তু বিনা-টিকিটের যাত্রীরা তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে যায়। তাঁরা তাঁদের আটকাবার চেষ্টাও খুব-একটা করেন না। তার জন্যে তাঁদের দোষ দেবারও উপায় নেই, কেননা তাঁরা খুব ভালই জানেন যে, আটকাতে গেলেই হাঙ্গামা বাধবে, চাই কী সেটা রেলের কামরায় আগুন লাগানো কি লাইন অবরোধ অব্দিও গড়াতে পারে। সেকালে কিন্তু এর বিপরীত চিত্রটাই দেখেছি। প্ল্যাটফর্মের গেটে দাঁড়িয়ে যাঁরা যিকিট কালেকশন করতেন, তাঁদের ফাঁকি দিয়ে মাছিটি গলবারও উপায় ছিল না।

রাজবাড়ি ইস্টিশানে সেবারে এই টিকিট নিয়েই আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই। ঢাকা মেল থেকে ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, বাবা এসে মালপত্র নামিয়ে কুলি ডেকে তাদের মাথায় সেগুলো

তুলে দিয়েছেন, এবারে আমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ছইওয়ালা গোরুর গাড়িতে উঠব, ঠিক এই মুহূর্তেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে টিকিট বার করতে গিয়ে বাবা বললেন, "সর্বনাশ!"

মা বললেন, "কী হল?"

"টিকিটগুলো পাচ্ছি না।"

"পকেটগুলো সব ভাল করে দেখেছ?"

বাবা ইতিমধ্যে তাঁর সব ক'টা পকেটের সমস্ত কাগজপত্র বার করে ফেলেছিলেন। মা'ও সেগুলো ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, "নাঃ, এর মধ্যে তো দেখছি না।"

বাবা বললেন, "নিশ্চয় কোথাও পড়ে গেছে।"

মা বললেন, "পড়তেই পারে। সারাটা পথ তো খালি ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছ। তখনই কোথাও পড়ে গিয়ে থাকবে।"

কুলি তাড়া দিচ্ছিল। বাবা বললেন, "এখন উপায়? টিকিট তো আবার নতুন করে কাটতেই পারি, কিন্তু সেইসঙ্গে ফাইনও তো আদায় না করে ছাড়বে না। সে একেবারে লজ্জার একশেষ!"

ঢাকা মেল থেকে যারা নেমেছিল, ইতিমধ্যে তারা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। শেষ-রাতের দু'চার জন যাত্রীকে তুলে নিয়ে ট্রেনও রাজবাড়ি থেকে একটু আগেই চলে গিয়েছে গোয়ালন্দঘাটের দিকে। প্ল্যাটফর্মে এখন শুধু আমরাই পড়ে আছি। এদিকে টিকিট-কালেকটর বাবুটি যে-রকম আড়চোখে আমাদের দেখছেন, সেটা খুবই অস্বস্তিজনক। মা'ও সেটা লক্ষ করে থাকবেন। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। কুলিকে নিয়ে তোমরা আমার পিছন-পিছন এসো।"

সব জায়গায় দেখেছি বাবা-ই আগে-ভাগে যান, মায়ের সঙ্গে আমরা দুই ছানাপোনা তাঁর পিছন-পিছন যাই। এই প্রথম মা'কেই এগিয়ে যেতে দেখলুম। রাজবাড়ি তাঁর বাপের বাড়ির দেশ, সম্ভবত সেই কারণেই রাজবাড়ি ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে নামামাত্র তিনি তাঁর ঘোমটা ফেলে দিয়েছিলেন। সরাসরি টিকিট কালেকটর বাবুটির কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "প্রফুল্লবাবু এখন ইস্টিশানে আছেন?"

"আপনি কি স্টেশনমাস্টার প্রফুল্লবাবুর কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। তিনি আছেন?"

কালেকটরবাবুটির চেহারা যেন এক মুহূর্তে পালটে গেল। দূর থেকে এতক্ষণ যাঁর হাঁকডাক শুনছিলুম আর ভাবছিলুম যে, আমাদের সঙ্গে তো টিকিট নেই, সেটা বুঝতে পারলেই উনি ক্যাঁক করে আমাদের গলা টিপে ধরবেন, এবারে গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে তিনি বললেন, "তা আছেন বই কী, ঢাকা মেল পাস করবার সময় তাঁর স্টেশনে না থাকলে চলে? কেন, আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?"

মা বললেন, "তাঁকে গিয়ে বলুন যে, ভবানীপুরের রাসবিহারী চক্রবর্তীর বড় মেয়ে বুড়ি এসেছে। ব্যস, আর কিছু বলতে হবে না।"

তা বলতেও হল না। খবর পেয়েই স্টেশনমাস্টার ছুটে এসে আমাদের তাঁর অফিস-ঘরে নিয়ে বসিয়ে মা'কে বললেন, "কী ব্যাপার রে বুড়ি, কলকাতা থেকে এলি বুঝি?"

বাবার সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে মা সব কথা খুলে বললেন। প্রফুল্লবাবু তাতে হো-হো করে হাসলেন খানিকক্ষণ, তারপর হাসি থামিয়ে মা'কে বললেন, "কী কাণ্ড! বোস বোস, রাত জেগে এসেছিস, চা আনাই, চা খেয়ে তারপর যাবি।"

বাবা চা খান না। মা কিন্তু ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চা খান। চা খাওয়া হল। বাবা আবার টিকিটের

কথা তুলতে প্রফুল্লবাবু বললেন, "একবার তো কেটেইছিলেন, তা হলে ফের টিকিটের দাম দিতে হবে কেন?"

বাবা অনেক জেদাজেদি করা সত্ত্বেও কিছুতেই তিনি টিকিটের দাম নিলেন না। মা বললেন, "তা হলে, চলি প্রফুল্লদা। তোমাদের জামাই কালই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে, তবে আমি তো এখন দিন-পনেরো থাকব। এর মধ্যে একদিন যাব তোমাদের বাড়িতে। বউদিকে আমার কথা বোলো।"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা গোরুর গাড়িতে এসে উঠলুম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা ধরে মাইল খানেক এগোলেই আমার মামাবাড়ি। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, তখন বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "ভদ্রলোক কে বলো তো? কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

মা বললেন, "বাঃ, প্রফুল্লদাকে চিনলে না? উনি সজ্জনকান্দার লোক, দূর-সম্পর্কে আমাদের আত্মীয়ও হন।" তারপর একটু থেমে বললেন, "তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এসেছিল। বাবা রাজি হননি। কেন, তুমি সে-কথা জানতে না?"

বাবা কোনও উত্তর দিলেন না। গোরুর গাড়ি গিয়ে মামাবাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত একেবারে চুপ করে বসে রইলেন। আমার ধারণা, টিকিট নিয়ে সেদিন যে ঝামেলা দেখা দেয়, একে তো মা'র সাহায্যে তা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে অবধি বাবা একটু অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছিলেন, তার উপরে যখন আবার ওই সম্বন্ধের কথাটা শুনলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব তখন একেবারেই চুপসে গিয়েছিল।

পুব-বাংলায় এই রকমের একটা কথা আছে যে, বাপের বাড়ির 'কাউয়াডাও ভাল'। আমার মায়ের চোখে অন্তত তাঁর বাপের বাড়ির কোনও কিছুই খারাপ ঠেকত না। লোকজন, ঘরবাড়ি, গাছপালা, রাস্তাঘাট, কথাবার্তা—সব ভাল। বিয়ে হবার পরে অনেক বছর ভবানীপুরে যাননি, তাই পরের দিকে যখন যাবার সুযোগ এল, তখন যা-কিছু দেখেন, যা-কিছু শোনেন, তা-ই তাঁর চোখে সুন্দর লাগে, তা-ই তাঁর কানে মধুবর্ষণ করে। তার উপরে আবার পরের দিনই বাবা সেবারে কলকাতায় ফিরে যাওয়ায় মায়ের আর সেই বাধো-বাধো ভাবটাও ছিল না, একেবারে মস্ত রকমের একটা মুক্তি তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, দ্বিতীয়বার বিয়ে করা সত্ত্বেও রাসবিহারী চক্রবর্তী যে তাঁর এই জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে বড় ভালবাসতেন, সেটাও মিথ্যে নয়। মাঝে-মাঝেই আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, "হ্যাঁ রে, তোদের মা কোথায় গেল? তাকে যে দেখছি না।"

মা হয়তো পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাড়িতে ফিরবামাত্র দাদামশাই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। কাছে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতেন তাঁর মুখের দিকে। তারপর খুব মৃদু গলায় বলতেন, "হ্যাঁ রে, এত যে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে বেড়াস, এই বুড়ো বাপটার কথা কি তোর একবারও মনে পড়ে না? হ্যাঁ রে, আমি কি তোর কেউ নই?"

১৪

চার বছর বয়সে সেই যে মামাবাড়ি যাই, তার মাস কয়েক বাদেই আবার সেখানে ছুটতে হয়। গ্রীষ্মের ছুটি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কী সব কাজ ছিল বলে বাবা সেবারে দেশের বাড়িতে যেতে পারেননি, তাই ভুজারপুরের এক কাকা কলকাতায় আসবেন শুনে তাঁরই সঙ্গে ঠাকুর্দা আমাকে চান্দ্রা থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। ঠিক ছিল যে, ছুটিটা কলকাতায় কাটিয়ে তারপর আবার তাঁর সঙ্গে আমি দেশের বাড়িতে ফিরব। কিন্তু তা আর হল না। ছুটি ফুরোবার দিন কযেক আগে রাজবাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল : ফাদার সিরিয়াসলি ইল, কাম শার্প।

মধ্যবিত্ত মানুষদের সংসারে টেলিগ্রাম তখনও জলভাতের ব্যাপার হয়ে যায়নি। এখন তো জন্মদিনে আর বিবাহবার্ষিকীতেও এ ওকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শুভেচ্ছা আর আহ্লাদ জানায়, তখন কিন্তু টেলিগ্রাম আসত কালেভদ্রে। তাও সেটা সাধারণত কোনও ভাল খবর নিয়ে আসত না। পোস্ট অফিসের লোক এসে সদর-দরজার কড়া নেড়ে 'টেলিগ্রাম' বলে হাঁক পাড়তেই সকলের বুক কেঁপে উঠত। সই করে টেলিগ্রামটা নিয়ে খুলে দেখবারও দরকার হত না, তার আগেই বোঝা যেত যে, যা এসেছে সে একেবারে ঘোর দুঃসংবাদ।

বাবার মুখে খবর শুনে মা তো কাঁদতে শুরু করে দিলেন। বাবা তাঁকে যতই বলেন, 'কাঁদছ কেন, শ্বশুরমশাই বুড়ো মানুষ, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ভাল হয়ে যাবেন নিশ্চয়,' ততই তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন আর বলেন, 'এক্ষুনি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো।' কিন্তু এক্ষুনি নিয়ে চলো বললেই তো আর নিয়ে যাওয়া যায় না। টেলিগ্রাম যখন আমাদের তালতলার বাড়িতে এসে পৌঁছয়, তার আগেই ঢাকা মেল শেয়ালদা ছেড়ে চলে গেছে, তাই ঠিক হল যে, পরদিন ভোরবেলায় চাটগাঁ এক্সপ্রেসে আমাদের তুলে দেওয়া হবে। আমাদের মানে মা'কে, দিদিকে আর আমাকে। বাবার কাল একটা জরুরি মিটিং আছে, তাই চাটগাঁ এক্সপ্রেসে তিনি যেতে পারবেন না। মিটিং সেরে তিনি রাতের গাড়ি ঢাকা মেলে রওনা হবেন।

তা-ই হল। সে-রাত্তিরে মা আর ঘুমোলেন না। আমি আর দিদি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। শেষ রাত্তিরে মা আমাদের ডেকে তুললেন। বাবা ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ধরে এনেছিলেন। আমার আর দিদির একটু খিদে-খিদে পাচ্ছিল, কিন্তু মা'কে সে কথা বলতে তিনি এক ধমকে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন,"তোদের দাদামশাই ওদিকে বেঁচে আছেন কি না তার ঠিক নেই, আর তোরা এদিকে খিদে-খিদে করছিস? ওরে, তোদের কি লজ্জাও করে না?" বলেই আবার কেঁদে ফেললেন।

এরপরে আর খিদের কথা বলিনি। ছ্যাকড়া গাড়িতে করে যখন শেয়ালদায় পৌঁছই, ট্রেন ছাড়তে তখনও মিনিট দশেক বাকি। ভোরবেলাকার ট্রেন বলে চাটগাঁ এক্সপ্রেসে বিশেষ ভিড় হত না।

টিকিট কেটে বাবা আমাদের মোটামুটি ফাঁকা একটা কামরায় তুলে দিলেন। তারপর ঘন্টা পড়বার একটু আগে কামরা থেকে নেমে গিয়ে জানলার ধারে প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে মা'কে বললেন, "দ্যাখো, এত ভেঙে পড়তে নেই। গিয়ে নিশ্চয় দেখবে যে, উনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।...আর হ্যাঁ, বাচ্চা দুটো তখন খিদের কথা বলছিল। নৈহাটি স্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াবে, তখন ওদের কিছু খাইয়ে নিয়ো। ওখানে খুব ভাল কাঁচাগোল্লা পাওয়া যায়।"

ঘন্টা পড়ল, গার্ডসাহেব সবুজ পতাকা দোলাতে-দোলাতে হুইস্‌ল্‌ বাজালেন, আড়ামোড়া ভেঙে গাড়ি আস্তে-আস্তে চলতে শুরু করল। জানলার ধারে জায়গা পেয়েছিলুম। দেখলুম, বাবা ঠায় প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজবাড়িতে পৌঁছলুম দুপুরবেলায়। বড়দা আর মেজদা ইস্টিশানে এসেছিলেন। মালপত্র নামিয়ে আমার আর দিদির হাত ধরে মা'কে বললেন, "চলো পিসিমা।"

মা সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, "বাবা কেমন আছেন, সেইটে আগে বল্‌।"

বড়দা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, মেজদা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল।"

আমি বললুম, "দেখলে তো, বাবার কথা কখনও মিথ্যে হয় না।"

কপালে হাত ঠেকিয়ে মা বললেন, "ভগবান রক্ষা করেছেন। তাড়াতাড়ি এখন সুস্থ হয়ে উঠলে বাঁচি। উঃ, গত দু'মাসে না হোক তো খান দশেক চিঠি আমাকে লিখেছেন। কি চিঠিতে লেখেন, বুড়ি, একবার এসে আমাকে দেখে যা। এই বাঁদরগুলোর জ্বালায় তাও কি আমার আসা হয়? এবারে যদি...ওরে বাবা রে বাবা, তা হলে আর আক্ষেপের শেষ থাকত না, সারাটা জীবন একেবারে জ্বলেপুড়ে মরতে হত।....তা হ্যাঁ রে গৌর, ডাক্তার কী বলছেন?"

বড়দা এবারেও উত্তর দেবার সুযোগ পেলেন না। মেজদা বললেন, "ডাক্তার এখন আর খারাপ কিছু বলছেন না। কাল ওই যে তোমাকে টেলিগ্রাম করা হল, তার খানিক বাদেই তিনি এসেছিলেন। দাদুকে পরীক্ষা করে বললেন, আর কোনও ভয় নেই, জ্বর এখনও আড়াই রয়েছে বটে, কিন্তু কাল সকালের মধ্যেই ফুল রেমিশন হয়ে যাবে।"

"তা সেটা হয়েছে তো?"

উত্তর দেবার আর কোনও দরকারই হল না। গোরুর গাড়ি যে ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা থেকে বাড়ির হাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সম্ভবত দারুণ উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন বলেই মা সেটা খেয়াল করেননি। এদিকে আমি ততক্ষণে দেখতে পেয়েছি যে, যাঁকে নিয়ে মা'র এত উদ্বেগ, সামনের বারান্দার ইজিচেয়ারে তিনি বসে আছেন। আমাদের দেখবামাত্র বারান্দা থেকে নেমে এসে আমাকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। তারপর মা'কে বললেন,"যাক, তা হলে বুড়ো বাপকে দেখতে এলি!"

মা তো একেবারে হতভম্ব। বুড়ো বাপের দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কিছুই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছেন না। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এ কী, তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলে কেন? তোমার তো শুয়ে থাকবার কথা।"

দাদামশাই বললেন, "কেন কেন, শুয়ে থাকব কেন? আমার জ্বর কি এখনও আছে নাকি? তোকে দেখেই তো টেম্পারেচার একেবারে হু-হু করে ছিয়ানব্বুইয়ে নেমে এল।... নে, এবারে ক'দিন রান্না করে আমাকে খাওয়া তো। অনেক দিন তোর হাতের রান্না খাইনি।"

এতক্ষণে মা বুঝতে পারলেন যে, মিথ্যে খবর দিয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। মায়ের সেই বিধবা বউদি আর মামারা সবাই ইতিমধ্যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন।

বড়দা আর মেজদা তো ছিলেনই। সবাই দেখলুম মুখ টিপে হাসছেন। মা তাতে আরও রেগে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "ছি ছি, এইরকম খবর কাউকে দিতে হয়? কাল সারা রাত্তির আমার ঘুম হয়নি, তা জানো? তার উপরে আবার তোমাদের জামাইও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। সে তো কাল সকালেই এসে পড়বে। এসেই যে কী রেগে যাবে, সে তো ভাবতেই আমার ভয় করছে।"

দাদামশাই বললেন, "রাগলেই হল! আমার মেয়ে আমাকে দেখতে এসেছে, তাতে তার রাগ করবার কী আছে?" তারপর একটু ভেবে বললেন, "দাঁড়া, তারও ব্যবস্থা করছি। ...ওরে গৌর, এক্ষুনি আবার রাজবাড়িতে গিয়ে তোর পিসেমশাইকে একটা টেলিগ্রাম করে দে তো। লিখে দিবি যে, 'গ্রান্ডফাদার অল রাইট, ইউ নিড নট কাম।' ওরে বাবা, ইংরিজিটা শুধু জামাইবাবাজিই জানে ভাবিস না, আমরাও একটু-আধটু জানি।"

বড়দা তক্ষুনি সাইকেলে চেপে রাজবাড়িতে গিয়ে টেলিগ্রাম করে দিয়ে এলেন। কলকাতায় সেটা ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল, তাই পরদিন সকালে বাবা আর আসেননি। দিন তিনেক বাদে তাঁর চিঠি এল। দাদামশাইকে লেখা সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, সবই তিনি বুঝতে পেরেছেন, তবে কিনা দিন-সাতেক বাদেই তো ইস্কুল কলেজ খুলবে, তার মধ্যে যদি না আমরা কলকাতায় পৌঁছই, তা হলে লতুর (অর্থাৎ আমার দিদিব) ইস্কুল কামাই হবে, তাই কাউকে সঙ্গে দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি যেন আমাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। বাবা এমনিতে বাগ-টাগ বিশেষ করেন না, তবে কিনা ন'মাসে ছ'মাসে যখন একবার বেগে যান, তখন বড্ড বেশি রেগে যান। মায়ের ভয় ছিল যে, এই ব্যাপারটা নিয়েও বাবা বড্ড বেশি রেগে যাবেন। শ্বশুবমশাইকে লেখা চিঠি পড়ে বোঝা গেল যে, সব বুঝতে পেরেও বাবা রেগে যাননি। মা যেন তাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

দাদামশাই যে সেবারে অমন ফন্দি এঁটে মা'কে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে শুধু মায়ের হাতের রান্না খেতে নয়। আসল কথা, তখন গ্রীষ্মকাল, আম পেকেছে, জাম পেকেছে, কাঁঠালেরও ছড়াছড়ি। মা'কে সে-সব না-খাইয়ে তাঁর শান্তি হচ্ছিল না। রাত্তিরে খেতে বসে মা'কে সে-কথা বলেও ফেললেন। "দ্যাখ্ বুড়ি, গাছভর্তি শুধু আম আর কাঁঠাল। সবাই কত আনন্দ কবে খাচ্ছে। দেখে তো আমারও আনন্দ হবার কথা। কিন্তু কই, তা তো হচ্ছে না। যত দেখি, তত তোর কথা মনে পড়ে। যত তোর কথা মনে পড়ে, তত ভাবি যে, আহা, এই সময়ে আমার বড় মেয়েটা যদি কাছে থাকত।"

মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ধরা-গলায় বললেন, "তুমি অমন করে বোলো না তো, শুনলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

দাদামশাই বললেন, "ঠিক আছে, আর বলব না। তা হ্যাঁ রে বুড়ি, তুই তো কাঁঠাল খেতে খুব ভালবাসিস, কলকাতায় কাঁঠাল পাওয়া যায়?"

মা এবারে হেসে ফেলে বললেন, "কলকাতায় পাওয়া যায় না, এমন কোনও জিনিস আছে নাকি?"

"জামাই কাঁঠাল খেতে ভালবাসে?"

"একদম না। কী যে জামাই করেছ বাবা, কাঁঠালের নাম শুনলেই খেপে যায়। বলে, দূর দূর, ওটা আবার ফল নাকি? তবে হ্যাঁ, আমের খুব ভক্ত।"

দাদামশাই বললেন, "ঠিক আছে। কলকাতায় যখন ফিরবি, তখন গৌর তো তোদের সঙ্গে থাকবে, জামাইয়ের জন্যে দু'ঝুড়ি আম নিয়ে যাস।"

এরই মধ্যে একটা কান্ড ঘটে গেল। বাবা লিখেছিলেন, দিন সাতেকের মধ্যে কাউকে সঙ্গে দিয়ে যেন আমাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দিন চার-পাঁচ বাদে তিনি নিজেই এসে গেলেন। ঢাকা মেলে এসেছিলেন। তাই সাত-সকালেই রাজবাড়ি থেকে মাইল খানেক পথ হেঁটে ভবানীপুরে পৌঁছে যান।

বাড়ির ছেলেরা তখন সদ্য সকালবেলার জলখাবার খেতে বসেছে। শোবার ঘরের চওড়া বারান্দায় সার-সার পিঁড়ি পাতা। তাতে আমার দুই দাদা আর তিন মামার সঙ্গে আমিও একটা পিঁড়ির দখল নিয়ে জোড়াসন হয়ে বসে পড়েছি। প্রত্যেকের সামনে একখানা করে পাথরের থালা। তাতে একটা করে মাঝারি সাইজের কাঁঠাল। আমি যেহেতু সবচেয়ে ছোট, তাই আমার কাঁঠালটা সাইজে সবচেয়ে ছোট। থালার পাশে একটা করে ছোট বাটি, মেজোমামি তাতে দু'চামচে করে সর্ষের তেল দিয়ে গিয়েছেন। কাঁঠাল ভেঙে কোয়া বার করবার সময়ে হাতে যদি আঠা জড়িয়ে যায়, তা হলে ওই দিয়ে সেই আঠা ছাড়াতে হবে।

একে তো আস্ত একটা কাঁঠাল খাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার, তার উপরে আবার প্রাতরাশের পর্ব যে এতেই শেষ হবে, তাও নয়। এরপরে আসবে লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা, আর নয়তো আসবে চিঁড়ে, দুধ আর আম। সেক্ষেত্রেও অবশ্য একটা মিষ্টি থাকবে। কাঁঠাল দিয়ে আসলে তার সূচনা মাত্র। বড়মামাকে প্রথম দিনই এই নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বলেছিলেন, "আরে বোকা, সাহেবরা যে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে সবার আগে এক গেলাস ফলের রস খেয়ে নেয়, তাও জানিস না? তা আমরা আর ফলের রস কোথায় পাব? জষ্টিমাসে তাই কাঁঠাল দিয়ে ব্রেকফাস্ট শুরু করি।"

তাতে অবশ্য আমার আপত্তি করবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ববং বড়দের মতো আমাকেও যে আস্ত একটা কাঁঠাল খাবার যোগ্য মনে করা হয়েছে, তাতেই আমি খুব গৌবব বোধ করেছিলুম। তা রোজকার মতন সেদিনও সদ্য কাঁঠালটাকে ভেঙে কোয়া বার করতে শুরু করেছি, ঠিক এমন সময়ে বাবা এসে হাজির।

বাবা যে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছেন, এটা আরও অনেকের চোখে পড়েছিল। ভিতর থেকে তক্ষুনি সবাই ছুটে এলেন। আমরাও যে যার আসন ছেড়ে উঠে পড়লুম। সবাই খুব খুশি। দাদামশাই নিজে এসে হাত ধবে বাবাকে ঘরে নিয়ে বসালেন। পুকুরে জাল ফেলবার জন্য মেজদাকে পাঠানো হল জেলেদের বাড়িতে। তারপর উত্তেজনা একটু থিতিয়ে আসবার পর দাদামশাই বললেন, "তা বাবাজীবন, তুমি নিজেই যখন এসেছ, তখন তো খুব ভালই হল। দুটো দিন থাকো, তারপর তোমার সঙ্গেই ওরা কলকাতায় ফিরে যাবে।"

মেজোমামি এসে বাবাকে ইতিমধ্যে হাওয়া করতে শুরু করেছিলেন। তাঁব হাত থেকে হাতপাখাটা বাবা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তারপর সেটা ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, "তা কী করে হবে, আমি তো আজ রাত্তিরের গাড়িতেই কলকাতায় ফিরছি।"

দাদামশাই বললেন, "তাও কি হয় নাকি? অ্যাদ্দিন বাদে এলে,আর দুটো দিন থাকবে না?"

বড়মামি বললেন, "না না, অ কিছুতেই হবে না।"

মেজদা ইতিমধ্যে জেলেদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছিলেন। তাঁর কাছে জানা গেল, জেলেরা আজ অন্য দিঘিতে মাছ ধরতে গেছে। কালকে সকালে এসে তারা এখানে জাল ফেলতে পারে, আজ পারবে না।

দাদামশাই বললেন, "তা হলেই বোঝো। কাল জেলেরা আসুক, জাল ফেলুক, বাড়িতে জামাই এসেছে, সেই উপলক্ষে দু'চারজন আত্মীয়বন্ধুকে নেমন্তন্ন করি, একটু আমোদ-আহ্লাদ হোক,

তা নয়, তুমি আজই চলে যেতে চাইছ। না বাবাজি, তা হয় না। আজকের দিনটা অন্তত থাকো। নইলে সবাই বড় কষ্ট পাবে।"

বাবা বললেন, "অসম্ভব। কাজ ফেলে এসেছি, আজই না ফিরে আমার উপায় নেই। চান তো আপনার মেয়েকে রেখে দিন, আমি আপনার নাতি আর নাতনিটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি, মেয়েকে বরং পরে কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন।"

বোঝা গেল, বাবাকে ধরে রাখা যাবে না। ঘরের মধ্যে মা'ও রয়েছেন। দাদামশাইয়ের সামনে বাবার সঙ্গে তাঁকে কখনও কথা বলতে দেখিনি, বড়মামির সঙ্গে নিচু গলায় তিনি কথা বলছিলেন। বড়মামি তাঁর কথা শুনে দাদামশাইকে বললেন, "বুড়ি বলছে, ও না-গেলে বাচ্চা দুটোর খুব অসুবিধে হবে।"

দাদামশাই বললেন, "তা হলে আর কী করা যাবে, বুড়িও তা হলে তোমার সঙ্গে যাক। ...তা তুমি আমার উপরে রাগ করোনি তো বাবাজীবন?"

বাবা হেসে বললেন, "রাগ করব কেন? আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এ তো খুবই আনন্দের কথা।"

সেইদিনই রাত্তিরের গাড়িতে করে আমরা সবাই রাজবাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরে আসি।

যাবার সময় সারাটা পথ মা যেমন কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিলেন, ফেরার সময়েও তেমন সারাটা পথ তিনি কাঁদতে কাঁদতেই ফিরলেন। ইস্কুল-কলেজের গরমের ছুটি ফুরোতে তখন আর মাত্র দিন দুই-তিন বাকি, গাড়িতে তাই প্রচন্ড ভিড়। সারা রাত্তির তাই ঘুমোতে পারিনি। বসে-বসে শুধু ঢুলছিলুম আর দেখছিলুম যে, বাবা একেবারে পাথরেব মতো স্থির হয়ে বসে আছেন আর মা শুধু কেঁদেই চলেছেন।

যাবার সময়ে কান্নাকাটি করলেও ভবানীপুরে পৌঁছবার পরে দাদামশাইকে সুস্থ দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটেছিল। এবারে কিন্তু কলকাতায় পৌঁছেও মায়ের মুখে হাসি ফুটল না। রাত্তিবে ঘুম হয়নি বলে শেয়ালদা থেকে তালতলার বাড়িতে পৌঁছেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। মা এক সময় ঘুম থেকে তুলে আমাকে খাইয়ে দিলেন। তারপর আবার ঘুম। বাবা সেদিন আর বাড়ি থেকে বেরোননি বোধ হয়। বিকেলে যখন আমার ঘুম ভাঙল, তখন দেখি, খাটের পাশের টেবিলে বসে তিনি পরীক্ষার খাতা দেখছেন। মা একবার ঘরে এলেন, কিন্তু বাবার সঙ্গে কোনও কথা বললেন না, শুধু বিছানা থেকে আমাকে তুলে কলঘরে নিয়ে মুখ-হাত ধুইয়ে তারপর স্নান করিয়ে দিলেন। তখনও দেখলুম তাঁর কান্না থামেনি। চোখ দুটো একেবারে ডগডগে লাল হয়ে আছে। ঘরের কাজকর্ম সবই করছেন বটে, কিন্তু একটাও কথা বলছেন না। ভবানীপুরে গিয়ে একটা রাতও যে কাটালেন না, যেদিন গেলেন সেইদিনই বাবা সেখান থেকে আমাদের নিয়ে চলে এলেন, মা যে এতে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

রাত্তিরে সেই কষ্টটাই রূপান্তরিত হয়েছিল দুর্জয় ক্রোধে। কলকাতায় এলে আমি বাবার খাটে শুই। দিদিকে নিয়ে মা ঘুমোন অন্য খাটে। রাত্তিরে আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। বাবা বই পড়েন, খাতা দেখেন, লেখালিখির কাজ করেন। তারপর কখন যে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়েন, তা বুঝতেও পারি না। সেদিন রাত্তিরেও তেমনই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ মাঝরাত্তিরে মায়ের গলার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, ঘরে আলো নেই, শুধু বাবার টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে। সেই মৃদু আলোতেও অবশ্য সবকিছু ঠাহর করা যায়। বাবা একমনে একটা বই পড়ছেন, আর খাটে বসে চাপা-গলায় মা বলছেন, "কেন, কেন, কেন?"

বই থেকে মুখ না তুলেই বাবা বললেন, "কিসের কেন?"

"কেন তুমি একটা রাতও আমার বাপের বাড়িতে থাকলে না? বাবা তোমাকে অত করে বললেন, সবাই অত অনুরোধ করল, তবু তুমি থাকলে না কেন? ছি ছি, একি একটা মানুষের মতন কাজ? বুড়ো মানুষটার কথা অমান্যি করতে একটুও বাধল না তোমার? কেন? তোমার এত অহঙ্কার কিসের?"

বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বাবা বললেন, "আমার আবার অহঙ্কার কী দেখলে? কলকাতায় কাজ ছিল, তাই চলে এসেছি।"

"বাজে কথা রাখো," মা একেবারে ফুঁসে উঠলেন, "একটা রাত থাকলেই তোমাব সমস্ত কাজ পন্ড হয়ে যেত? ও-সব কথা অন্যদের বুঝিযো, আমাকে বোঝাবাব চেষ্টা কবো না। আসলে তুমি খুব অহঙ্কারী, খুব দাম্ভিক। একজন বুড়ো মানুষকে অপমান করতে তোমার একটুও বাধে না।"

"এর মধ্যে আবার অহঙ্কার, দম্ভ, এ-সব কথা উঠছে কেন?" বাবা বললেন, "শ্বশুরমশাইকে আমি অপমানটাই বা করলুম কোথায়? তাঁকে তো আমি খুবই শ্রদ্ধা করি।"

"না, করো না।" মা আবাব গর্জে উঠলেন, "তা যদি করতে, তা হলে তাঁর কথাটা তুমি অমনভাবে ফেলতে পারতে না। তোমার ধারণা, আমার বাপের বাড়িতে কেউই তোমার সঙ্গে কথা বলবার যুগ্যি নয়।"

"ছিঃ, এসব কী বলছ?"

"তা হলে চলে এলে কেন? ...কী, চুপ কবে রইলে যে? ...বলো, সত্যি কথাটা তোমাকে বলতেই হবে। কেন তুমি একটা বাতও থাকলে না? কেন, কেন, কেন?"

হঠাৎ তাঁর হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাবা। তারপর টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বললেন, "ঠিক আছে, না-শুনে যখন ছাড়বেই না, তখন সত্যি কথাটাই শুনে নাও। চলে এলুম আমার ওই ছেলেটার কথা ভেবে।"

বাবাকে রেগে উঠতে দেখে মা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আমি তো ওখানে দিব্যি ফুর্তিতে ছিলুম, তাই বাবা যে কেন আমার কথা ভেবে চলে এলেন, সেটা বোধহয় তিনি বুঝতেও পারছিলেন না। অবাক হয়ে বললেন, "কেন, খোকার তো ওখানে কোনও অযত্ন হচ্ছিল না, তা হলে ওর কথা ভেবে চলে এলে কেন?"

"তাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে?" বাবা এবারে গর্জন কবে উঠলেন, "আব একটা দিনও যদি তোমাব বাপের বাড়িতে থাকত, ওই দুধের বাচ্চা তা হলে আস্ত একটি রাক্ষসে পরিণত হত। ছি ছি, পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, সে কিনা আস্ত একটা কাঁঠাল দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছিল!"

এরপরে মা আর একটিও কথা বলেননি।

১৫

রাজবাড়ি বেশ জমজমাট জায়গা ছিল। একে তো গোয়ালন্দ মহকুমার সেটাই সদর-শহর, তার উপরে আবার মেন লাইনের মস্ত বড় ইস্টিশান। জেলা-শহর ফরিদপুর যখন ব্রাঞ্চ লাইনের সেই শেষ সীমানায় পড়ে ঝিমুচ্ছে, রাজবাড়ি তখন পঞ্চান্ন রকমের কাজকর্মের ব্যস্ততায় যেন সকাল থেকে সন্ধে অব্দি একেবারে টগবগ করে ফুটত। ব্যবসা-বাণিজ্য আর হরেক রকমের সরকারি দফতর তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল ওদিককার খুব নামজাদা দুটো হাইস্কুল। গোয়ালন্দ হাইস্কুল আর রাজা সূর্যকুমার ইন্স্টিটিউশন। ঝকঝকে একটা রেল-কলোনিও ছিল। সেখানে কটা চামড়ার লোকজন দেখা যেত বিস্তর। সত্যি বলতে কী, সেটাও ছিল দেখবার মতো ব্যাপার।

এখন যাকে সিনেমা কিংবা ফিল্ম বলে, আমাদের ছেলেবেলায় তাকে বায়োস্কোপ বলা হত। বায়োস্কোপের তখনও খুব চল হয়নি। কলকাতার বাইরে সিনেমা-হল বলে কিছু ছিল না, শুধু শীতকালে যেমন এখানে-ওখানে সার্কাসের তাঁবু পড়ে, মফস্বলের গঞ্জ-এলাকায় মাঝে-মাঝে তেমন তাঁবু খাটিয়ে বায়োস্কোপ দেখানো হত। টকি তখনও আসেনি, কখনও যে আসবে তাও আমরা ভাবতে পারতুম না, তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ওই যে একটা লোক তারস্বরে চেঁচাচ্ছে 'ছবির মানুষ হাঁটে, চলে, দৌড়ায়' তাতেই আমরা যৎপরোনাস্তি রোমাঞ্চিত হতুম। রাজবাড়ি ইস্টিশান থেকে ভবানীপুরে যাবার যে রাস্তা, তার ডাইনে ছিল একটা মস্ত মাঠ। শুনেছিলুম যে, প্রায়ই ওখানে তাঁবু খাটিয়ে বায়োস্কোপ দেখানো হয়। মামাবাড়ির মহিমা তাতেও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।

তবে কিনা রাজবাড়ির যেটা আসল প্রাণরস, সেটার জোগান দিত রেলপথ আর বাণিজ্য। ওই তল্লাট থেকে যা-কিছু মালপত্র কলকাতায় আসত, তার সবই আসত রাজবাড়ি হয়ে। তখন তো আর এত সড়ক-পথ ছিল না, মাল পাঠাবার একমাত্র উপায় রেলগাড়ি। মালপত্রের কথায় বলি, এক পদ্মার ইলিশই ঝুড়ি-ঝুড়ি আসত। কলকাতার আর-পাঁচটা বাজারের তুলনায় বৈঠকখানা বাজারে যে মাছের দাম সব সময়েই একটু নীচের দিকে থাকত, তার কারণ আর কিছুই নয়, শেয়ালদা ইস্টিশানের নৈকট্য। রাজবাড়ি থেকে যেদিন একটু বেশি পরিমাণে পদ্মার ইলিশের বুকিং হত, তার পরদিন সকালে বৈঠকখানা বাজারে ইলিশের সের নেমে যেত তিন আনা থেকে দু'আনায়। আমাদের অর্থাৎ বাঙালদের সেদিন আহ্লাদের সীমা থাকত না। বর্ষার মরশুমে এই বাজার থেকে কখনও-কখনও ছ'পয়সা সের দরেও আমরা ইলিশ মাছ কিনেছি।

কলকাতায় তখন ইলিশ এত শস্তা, অথচ সে-কথা জানা সত্ত্বেও, রাজবাড়ি থেকে দাদামশাই তাঁর মেয়ের জন্যে হাঁড়ি-হাঁড়ি ইলিশ মাছ না-পাঠিয়ে ছাড়তেন না। সে-মাছ কেটেকুটে নুন মাখিয়ে পাঠানো, যাতে বাপের বাড়ির জিনিস অনেক দিন ধরে মা খেতে পারেন। বাবা অবশ্য যেমন কাঁঠাল তেমন ইলিশ মাছও দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। দু'একদিন খাওয়ার পরে আমাদেরও

অরুচি এসে যেত। পাড়াপড়শি আর আত্মীয়স্বজনরাও হঠাৎ-হঠাৎ আমার মায়ের কাছ থেকে ইলিশের উপঢৌকন পেয়ে একটু ঘাবড়েই যেত বোধহয়। কিন্তু ওই যে বলেছি 'বাপের বাড়ির কাউয়াডাও ভাল', হয়তো সেই কারণেই রাজবাড়ি থেকে পাঠানো সেই নোনা ইলিশে আমার মায়ের কখনও অরুচি আসতে দেখিনি।

শ্বশুরবাড়িতে সেবারে একটা রাতও কাটাননি বলে বাবাকে মা যা বলেছিলেন, সেটা নেহাতই রাগের কথা, সেটাকে সত্যি বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না। কুড়ি বছর বয়সে যেখান থেকে দশ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করে তিনি কলকাতায় ফিরেছিলেন, সেই বাড়ি সম্পর্কে তাঁর একেবারেই কোনও মায়া-মমতা থাকবে না, তাও কি হয় নাকি? মায়া-মমতা যথেষ্টই ছিল। বয়সে তাঁর চেয়ে যাঁরা অনেক ছোট, তাঁদের স্নেহও কিছু কম করতেন না। সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন আমার মায়ের সেই স্বর্গত দাদার পুত্র দুটিকে। স্নেহের সঙ্গে একটু প্রশ্রয় আর কৌতুকও যে মেশানো থাকত না, তা নয়। একটা কথা অবশ্য ঠিক। সেটা এই যে, আমার মামাবাড়িতে, অন্তত সেই সময়ে, লেখাপড়ার চর্চা বিশেষ ছিল না। ফলে, শ্বশুরবাড়ির লোকেদেব সঙ্গে সাংসারিক ব্যাপারে দু'চার কথা বলবার পরেই আলাপচারিতে ভাটা পড়ে যেত, বাবা একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করতেন।

তবে কিনা সমস্ত ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু ব্যতিক্রম থাকে। এক্ষেত্রেও যে ছিল না, তা নয়। মস্ত ব্যতিক্রম ছিলেন বসন্তবিহারী চক্রবর্তী। আমার মায়ের আপন দাদা না-হলেও খুবই নিকট-সম্পর্কের জ্ঞাতি-দাদা। মামাবাড়ি থেকে দু'পা হাঁটলেই রাস্তার উল্টোদিকে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া যেত। একতলা সেই বাড়িটি ছিল দেখবার মতো। সামনে মস্ত ঝাউগাছ। বাড়ির বাগানটাও ছিল ভারী সুন্দর। বাগানের ধারে চমৎকারভাবে বাঁধানো একটা ইঁদারাও ছিল। মায়ের সঙ্গে যখনই বসন্তমামার বাড়িতে যেতুম, মনে হত যেন এক নিমেষে একেবারে অন্য একটা জগতে পৌঁছে গেছি।

বসন্তবিহারী যে খুবই বিদ্যোৎসাহী মানুষ ছিলেন, এ-কথা আমার বাবার কাছে শুনেছি। ছেলেবেলায় তো আর অতশত বুঝতুম না, শুধু দেখতুম যে, তাঁর বাড়ি একেবারে বই দিয়ে ঠাসবোঝাই। সে-কালের এম. এ.,বি. এল., প্রথম জীবনে কাটিহারে না মোতিহারিতে ওকালতি করতেন, পরে পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তবে আইনের চেয়ে সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল অনেক বেশি। মাঝে-মাঝে কলকাতায় এসে আমাদের শেয়ালদা-পাড়ার বাড়িতে দু'চার দিন কাটিয়ে যেতেন। বাবার সঙ্গে তখন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর আলোচনা হত। সে-সব আলোচনার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝতে পারতুম না ; শুধু এইটুকু বুঝতুম যে, দুজনেই দুজনকে কাছে পেয়ে খুব আনন্দে আছেন। রাজবাড়িতে গেলে প্রথমেই বাবা খোঁজ নিতেন যে, বসন্তমামা তাঁর বাড়িতে আছেন কি না।

মামাবাড়িতে গিয়ে যাঁদের দেখতুম, তাঁদের কথা যখন ভাবি, তখন বুঝতে পারি যে, বসন্তমামা সত্যিই একটু আলাদা ধাঁচের মানুষ ছিলেন। তবে, লেখাপড়ার চর্চা বিশেষ করুন আর না-ই করুন, অন্যাদেরও চরিত্র আদৌ নিষ্প্রভ ছিল না। মানুষজনকে আকর্ষণ করবার যে ক্ষমতা, সেটা তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল যৎপরোনাস্তি। প্রত্যেকেই ছিলেন ফুর্তিবাজ ও রসিক মানুষ, যেমন অন্যদের তেমন নিজেদেরও নানা ছোটখাটো দুর্গতির কথা বেশ মজাদার করে বলতে পারতেন, সেই সঙ্গে অতিরঞ্জনের ঝোঁকটাও ছিল তাঁদের প্রত্যেকেরই একেবারে মজ্জাগত। যা কিনা নেহাতই সামান্য ব্যাপার, তাও একটু রং না চড়িয়ে তাঁরা বলতে পারতেন না। এটা যেমন আমার তিন মামার মধ্যে, তেমন আমার দুই মামাতো দাদার মধ্যেও লক্ষ করেছি। মানুষ হিসেবে এঁরা সবাই

একটু খেয়ালিও ছিলেন।

আসলে যিনি রাসবিহারী চক্রবর্তীর মেজো ছেলে, কিন্তু বড়মামাকে কখনও দেখিনি বলে যাঁকে আমরা বড়মামা বলতুম, সেই নৃপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর কথাই ধরা যাক। আজকাল যাঁদের মেল-শভিনিস্ট বলা হয়, ইনি ছিলেন অনেকটা সেই গোত্রের মানুষ। নিজে খুবই আমুদে ছিলেন, কিন্তু 'যারা স্ত্রীলোক, অর্থাৎ মায়ের জাত, তারা হাসবে কেন', তা তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না। ফলে, জলের দরে ফেভার লিউবা কোম্পানির একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড হাতঘড়ি কিনিয়ে দেবার অছিলায় লালদিঘির কাছাকাছি কোন্ গলির মধ্যে সিড়িঙ্গে টাইপের একটা লোক কীভাবে তাঁর কাছ থেকে পাঁচ সিকে পয়সা হাতিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সেই গল্পটা যখন রসিয়ে-রসিয়ে বলতেন, আমরা তখন হো-হো করে হাসতুম বটে, কিন্তু দিদিকে একেবারে পাঁচন-খাওয়া মুখ করে বসে থাকতে হত। মেয়েদের হাসতে নেই, বড়মামার এই নিয়মটা অবশ্য আমার মায়ের ক্ষেত্রে খাটত না। আর-কাউকে বিশেষ পাত্তা না-দিলেও তাঁর এই মেজাজি বড়দিটিকে তিনি একটু সমঝে চলতেন।

বড়মামা বাস-ট্রাম-ট্যাক্সিতে চড়তেন না। কলকাতায় এসে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে একবার আছাড় খান। সেই থেকে, একমাত্র রেলগাড়ি ছাড়া, যন্ত্রচালিত তাবৎ যানবাহন সম্পর্কে তাঁর ঘোর অবিশ্বাস জন্মে যায়। রিকশা ছাড়া অন্য কিছুতে উঠতেন না। সঙ্গী হিসেবে আমাকে নিয়ে শেয়ালদা-পাড়া থেকে একবার কালীঘাটে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। পথে যে আমাদের তিনবার রিকশা পালটাতে হয়েছিল, সেটা ভুলিনি।

দাদামশাইয়ের স্নেহচ্ছায়ায় আমার মামাতো দুই দাদা যেভাবে মানুষ হচ্ছিলেন, অর্থাৎ আদৌ মানুষ হচ্ছিলেন না, তাতে আমার মায়ের ধারণা হয় যে, এইভাবেই যদি হেসেখেলে এদের দিন কাটতে থাকে, তা হলে আর দেখতে হবে না, নির্ঘাত তাঁর ভাইপো দুটি গোল্লায় যাবে। তৎক্ষণাৎ তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বড়দা আর মেজদাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে আসবেন। এখানে এনে যদি পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে আর চিন্তার কিছু নেই, দুটো-তিনটে পাস করে ফেলা এদের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

মেজদার কথা পরে বলব, আগে বড়দার কথা বলি।

নিতান্ত নির্বিরোধ মানুষ, পিসিমার কথা শুনে বড়দা প্রথমটায় একটু গাঁইগুঁই করলেও পরে রাজি হয়ে যান। কলকাতার ইস্কুলে তাঁকে ভর্তিও করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দু'চার দিন বাদেই বোঝা গেল যে, ঘুড়ি আর পায়রা ওড়ানোয় তাঁর যত উৎসাহ, নেসফিল্ডের গ্রামারে আর যাদব চক্রবর্তীর পাটিগণিতে তার কণামাত্র নেই। ঘুড়ি আর পায়রা আমার বড়কাকাও এককালে বিস্তর উড়িয়েছেন, কিন্তু যাকে 'ব্যোম' বলা হয়, মানে বাঁশের মাথার দিকটা চৌফালা করে আর সেখানে একটা চৌকোনা জাল খাটিয়ে ওই যে করে দেওয়া হয় উড়ন্ত লক্কা আর গিরেবাজগুলোর দু'দণ্ড বসে জিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা, বাবার কথা ভেবে বড়কাকাও কখনও ছাতের উপরে অমন কোনও 'ব্যোম' খাটাবার সাহস পাননি। বড়দা অত সব ভাবনাচিন্তার ধার ধারতেন না। যেই তাঁর মাথায় খেয়াল চাপল যে, পায়রা পুষতে হলে 'ব্যোম' খাটানো চাই, অমনি বাঁশ আর জাল কিনে এনে ছুতোর ডেকে সেটা খাটিয়ে ফেললেন।

তার ফল মোটেই ভাল হল না। বাবা রেগে গেলেন। বড়দাকে ডেকে মা বললেন, "তোকে যে আমি কলকাতায় নিয়ে এলুম, সে কি পড়াশুনো করতে না পায়রা ওড়াতে?" বড়দা দেখলেন গতিক মোটেই সুবিধের নয়, পিসির বাড়িতে থাকতে হলে গ্রামার আর পাটিগণিতের ফাঁদে পড়তে হবে। পায়রাগুলোকে ইয়ারদোস্তদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে নিঃশব্দে তিনি একদিন

তাই কলকাতা থেকে সরে পড়লেন। শুধু তাঁর স্মৃতি হিসেবে ওই 'ব্যোম'টা আমাদের ছাতের মাথায় শোভা পেতে লাগল।

বড়দা ফিরে যাবার পরে আসেন মেজদা। তাঁকে আনবার জন্যে কোনও চেষ্টাচরিত্র করতে হয়নি। তিনিও খেয়ালি মানুষ, তবে কিনা বড়দার মতো গোবেচারা নন, তাই এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পিসির মন যদি জয় করতে হয় তো যতই না কেন খারাপ লাগুক, লেখাপড়া নামক ব্যাপারটার সঙ্গে অন্তত ক্ষীণ একটা যোগ-সম্পর্ক তাঁকে রাখতেই হবে। সেটা তিনি রেখেওছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরও পড়াশুনো শুরু হয়েছিল একটু বেশি বয়সে, তাই ইশকুল-জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছতে-পৌঁছতেই তাঁর পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ গজিয়ে যায়। বড়দা আর মেজদা, দুজনেই বেশ সুপুরুষ ছিলেন। স্বভাবেও ছিলেন মজলিশি। জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। ফলে নানা রকমের বন্ধুবান্ধব জুটে যেতে তাঁদের একজনেরও দেরি হয়নি। মেজদার তো একটি মেয়ে-বন্ধুও জুটে যায়। ছাতে দাঁড়িয়ে দুজনের মধ্যে ইঙ্গিতে-ইশারায় বার্তা-বিনিময় হত। ঢিলের সঙ্গে বেঁধে চিঠি-চালাচালিও হত মাঝে-মধ্যে। পাড়ার সেই মেয়েটি যে তাঁকে বিয়ে করার জন্যে একেবারে খেপে উঠেছিল, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি।

এর কোনওটাই যে কিছু অস্বাভাবিক, তা নয়। কিন্তু মুশকিল এই যে, এত সব ব্যাপারে জড়িয়ে গেলে আর পড়াশুনোটা বিশেষ মন দিয়ে করা যায় না। ফলে মেজদারও আর ম্যাট্রিকের বেড়াটা টপকানো হল না। তখন 'ধুত্তোর' বলে মা-সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তিনি মা-লক্ষ্মীকে আঁকড়ে ধরলেন। নেমে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে।

প্রথম থেকেই মেজদার এই একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, টালিগঞ্জে তাঁর ভাগ্যোদয় হবে। মূলধন তাঁর চেহারা। সেটা সেকালের রোমান্টিক ফিল্মের নায়কের মতোই ছিল বটে। মেজদা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, ফিনলের ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি আর গ্রিসিয়ান কাটের জুতো পরে যদি ওই একখানা চেহারা নিয়ে তিনি দিন কয়েক ওখানে ঘোরাঘুরি করেন, তা হলে আর দেখতে হবে না, তাঁকে হিরো করে ছবি তুলবার জন্য স্টুডিয়ো-পাড়ার ডিরেক্টরদের মধ্যে একেবারে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, বাবা এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। মা প্রথমটায় রাজি হননি, কিন্তু পরে যখন বুঝলেন যে, লেখাপড়ায় এরও বিশেষ মতি নেই, তখন ভাবলেন, কিছু-একটা করে-কম্মে তো খেতে হবে, তা এটার হিল্লে যদি সিনেমাতেই হয় তো তা-ই হোক। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী, ম্যাট্রিকটাও যে পাস করেনি, কেউ তো আর তাকে সেধে চাকরি দিতে আসছে না। মেজদা যে ফিল্মের হিরো হতে চলেছে, এইটে জেনে আমরা ছোটরা অবশ্য খুবই খুশি হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম যে, যাক, অ্যাদ্দিনে আমাদের বিনি-পয়সায় সিনেমা দেখবার একটা ব্যবস্থা হল। দাদা যখন হিরো, তখন আর ভাবনা কী, চুটিয়ে ছবি দেখা যাবে।

দিন কয়েক বাদে মেজদা একদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরলেন ফিটফাট এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। রাস্তার ধারে আমাদের একফালি একটা ঘর ছিল। তাকে ড্রয়িং রুম বললে কথাটার খুবই অমর্যাদা হয়। বস্তুত, সেখানে খান কয়েক টিনের চেয়ার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ধুতির কোঁচা দিয়ে তারই একটাকে ঝেড়েঝুড়ে মেজদা সেই ভদ্রলোকটিকে তাতে বসিয়ে ভিতরে এসে মা'কে বললেন, উনিই আমাদের ডিরেক্টর, ওঁকে একটু যত্ন-আত্তি না করলে তো মান থাকে না।

মায়ের কথায় ছুটে গিয়ে পাড়ার দোকান থেকে তক্ষুনি এক ভাঁড় রসগোল্লা আর এক চাঙাড়ি সন্দেশ নিয়ে আসি। ভদ্রলোক তার সবই এমন চেটেপুটে খেলেন যে, মনে হল, তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। মা বললেন, "আমার ভাইপোটিকে একটু দেখবেন।" তাতে তিনি বললেন, "সে আর আপনাকে বলতে হবে না। তবে হ্যাঁ, হিরো হচ্ছে বিলেত-ফেরত, তার তো ধুতি-পাঞ্জাবি

পরলে চলবে না, স্যুট চাই। চটপট আপনি সুপ্রভাতকে একটা স্যুট করিয়ে দিন।"

আমরা তো অবাক। মেজদার ভাল নাম তো দেবেন্দ্রবিজয়। সে আবার সুপ্রভাত হল কবে? ভদ্রলোক বিদায় নেবার পরে মেজদাকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "আরে, ও-সব দেবেন্দ্রবিজয়-ফিজয় ফিল্মে চলে না, সুপ্রভাত আমার ফিল্মের নাম।"

মায়ের কাছে সেইদিনই মেজদা স্যুট করাবার টাকা পেয়ে যান। গৌরবর্ণ পুরুষ, ফিগারটিও ছিল চমৎকার, স্যুটে-বুটে দিব্যি দেখাত। যে-বইয়ে নেমেছিলেন, অন্তত নেমেছিলেন বলেই আমরা জানতুম, সেটা নিয়ে আমাদের পরিবারে অবশ্য একটু মতভেদ আছে। আমার ধারণা, বইটা আদৌ মুক্তিলাভ করেনি। কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই দেবদাস বলে, মুক্তি পেয়েছিল। তবে মেজদার অংশটা এডিটিংয়ের সময় বাদ পড়ে। সেটা সত্যি হলে অবশ্য প্রশ্ন ওঠে যে, মেজদা কি তা হলে তাতে হিরোর ভূমিকায় ছিলেন না? প্রশ্নটা এই জন্য উঠছে যে, হিরোই বাদ পড়ে গেল, এমন এডিটিংয়ের কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। যাই হোক, মেজদাও তার পরে আর খুব বেশি দিন কলকাতায় থাকেননি। কিছুদিন বাদে তিনিও ফিরে যান রাজবাড়িতে। তারও কিছুদিন বাদে সেই যে ভদ্রলোককে তিনি ডিরেক্টর বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, পাশের পাড়ার, এক দর্জির দোকানে আমার বড়কাকা তাঁর সন্ধান পান। ভদ্রলোক সেখানে তখন আর-একজনের স্যুটের মাপ নিচ্ছিলেন।

বড়কাকার চোখ ছিল একেবারে শার্লক হোমসের চোখ। এ যখনকার কথা, তখন তিনি হাওড়ার এক স্বদেশি সাবানের কারখানায় চাকরি করেন। ভোর-ভোর একটা সাইকেলে চেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন, ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে যেত। কিন্তু এই একটা ব্যাপার দেখতুম যে, বাড়িতে কে কী করছে না-করছে, তার কোনও-কিছুই তাঁর অজানা থাকত না। যেদিন সেই ভদ্রলোকটিকে মেজদা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন, বড়কাকা সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। ভদ্রলোকটির সঙ্গে বড়কাকার সেদিন একটাও কথা হয়নি। শুধু এক পলক তাঁকে দেখেছিলেন মাত্র। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, লোকটা কে রে?

আমি বললুম, "মেজদা তো ফিল্মে নামছে, উনি তার ডিরেক্টর।"

শুনে মুচকি হেসে বড়কাকা বললেন, "দূর দূর, যত্ত সব জোচ্চোরের কারবার!"

মেজদা যে একটু রং চড়িয়ে কথা বলেন, তা আমরা জানতুম। তাঁর সব কথাই যে সত্যি, তা আমরা ভাবতুম না। কিন্তু মানুষটিকে যে ভালবাসতুম, সেটাও মিথ্যে নয়। মানুষকে কাছে টানবার জন্যে যে একটা মোহিনী শক্তি থাকাই চাই, মেজদার সেটা ছিল। প্রথম দিকে সামান্য তোতলা ছিলেন, পরে সেটাও শুধরে যায়। ফুটবলটাও ভালই খেলতেন। কিন্তু পড়াশুনোয় মন ছিল না বলে, আর দুম করে হঠাৎ ফিল্মে নামার খেয়াল মাথায় চাপল বলে, শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

কিন্তু অমন তুখোড় মানুষের কপালটাকে আর কে কতদিন পাথর দিয়ে চেপে রাখবে। সেই যে মেজদা রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন, তার পরে আর একদিনের জন্যেও কলকাতায় আসেননি। দেশ ভাগ হবার অনেক আগেই তিনি বিয়ে করেন। পাকিস্তান হল, মামারা ওদিক থেকে এদিকে চলে এলেন, রেলের চাকরি নিয়ে বড়দা চলে গেলেন অসমে। শুধু মেজদাই এলেন না। ততদিনে তিনি কনট্রাকটরি ব্যবসায় নেমে পড়েছেন, সরাসরি যোগাযোগ না-থাকলেও খবর পেতুম যে, ব্যবসায় তাঁর লাভ হচ্ছে প্রচুর। পরে শুনেছি রাজনীতিতে নেমে রাজবাড়ি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও নাকি হয়েছিলেন। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ফরিদপুর শহর থেকে মোটর-বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন, পথের মধ্যে অ্যাকসিডেন্ট। সবটাই অন্যের মুখে শোনা।

যা শুনি, তাতে বুঝতে পারি যে, তাঁর পাথর-চাপা কপাল সত্যিই খুলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হাউইয়ের মতো উর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়ে ফের হাউইয়ের মতোই তিনি ঝরে পড়লেন।

এই ঘটনার অনেক আগেই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু মা তখনও বেঁচে। মেজদার মৃত্যুর খবরটা তাঁকে আমি দিইনি। তবে অন্য কারও কাছ থেকে তিনি জেনে যান। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। তার কারণ, শৈশবে-পিতৃহীন অতিচঞ্চল ও অস্থিরমতি এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে তিনি আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ভালবাসতেন না।

মামাবাড়ির কথা বলতে বসলে আর ফুরোতে চায় না। তাও খুবই উল্লেখযোগ্য একটি মানুষের কথা এখনও বলা হয়নি। তিনি আমার ছোট দাদামশাই লালবিহারী চক্রবর্তী। দাদা রাসবিহারী চক্রবর্তীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় যৌবনেই তিনি পৃথক হয়ে যান। তাঁর বাড়িটি ছিল একেবারে বিলিতি ক্যালেণ্ডারের ছবির মতো। শৌখিন মানুষ, তাই বাড়িটিকে খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখতেন। পিছন-দিকের গেট পেরোলে ত্যাড়চা করে বাঁধানো ইটের পথ, তার দু'দিকে হরেক রকমের ফলের বাগান। রাস্তার ধারের বারান্দার সামনেও একটা বাগান ছিল। তাতে নানা রকমের ফুল ফোটাতেন। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি রাখতেন। পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট ছাড়া অন্য পোশাক পরতেন না। সন্ধের পরে থেকেই শুরু হত তাঁর মদ্যপান। মাত্রা একটু চড়ে গেলেই তাঁর অগ্রজের উদ্দেশে ইংরিজি ভাষায় এমন সব চোস্ত গালিগালাজের তুবড়ি ছোটাতেন যে, কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া রাসবিহারী চক্রবর্তীব কোনও উপায় থাকত না। তাঁর বাড়িতে মাঝে-মাঝে দু'চারজন সাহেবসুবোকেও আসতে দেখেছি। তাঁরা আসতেন লালবিহারী চক্রবর্তীকে দিয়ে ফোটো তোলাবার জন্য।

বাঙালি ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে যাঁদের পথিকৃৎ বলা যায়, বস্তুত আমার এই ছোট দাদামশাই যে ছিলেন তাঁদেরই একজন, পবে এ-কথা পরিমল গোস্বামী মশাইয়ের কাছে শুনেছি। তিনিও ওই এলাকার মানুষ, উপরন্তু ফোটোগ্রাফিতে তাঁরও উৎসাহ কিছু কম ছিল না, সুতরাং ধরেই নিতে পারি যে, কথাটা একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। কিন্তু আমি তো তাঁকে নেহাতই আমার ছেলেবেলায় দেখেছি। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, বড়ভাইয়ের উপরে যতই রাগ থাক, তাঁর সন্তানদের প্রতি সেই রাগটা কখনও সঞ্চারিত হয়নি। বিশেষ করে মা'কে তো তিনি খুবই স্নেহ করতেন। নিজে কখনও দাদার বাড়ির ত্রিসীমানায় যেতেন না, কিন্তু অন্যদের দিয়ে প্রায়ই খবর পাঠাতেন যে, পরদিন দুপুরে মা'কে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্নগ্রহণ করতে হবে। মায়ের আঁচল ধরে আমরাও যেতুম। নিজের মাথা কালো কাপড়ে ঢেকে, তিন-ঠ্যাং-ওয়ালা একটা ক্যামেরা দিয়ে আমাদের একটা ছবিও তখন তুলেন। বাড়িতে একটা ছোট্ট মতন অন্ধকার ঘর ছিল। শুনেছিলুম, যে ছবি তোলা হল, তা ওই ঘরের মধ্যে ফোটানো হবে। কথাটার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি।।

লালবিহারী চক্রবর্তী শুধুই যে ফোটো তুলতেন, তা নয়, ছবিও আঁকতেন। তা ছাড়া, সূর্যাস্তের পরে যতই আবোল-তাবোল বকুন, দিনের বেলায় কথা বলতেন চমৎকার। রঙ্গ-রসিকতাও ছিল একটু সূক্ষ্ম ধরনের। তাঁর কথাবার্তা, রঙ্গ-রসিকতা, চাল-চলন, সব কিছুর মধ্যেই এমন একটা ব্যাপার ছিল, যাকে এখন 'আর্ব্যানিটি' বলে শনাক্ত করতে পারি। এই যে নাগবিকতা, শুধু লালবিহারী চক্রবর্তী বলে কথা নেই, ওই এলাকার অনেকের মধ্যেই এটা তখন দেখা যেত।

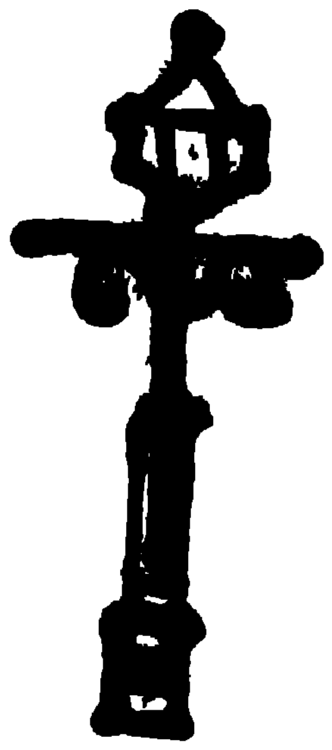

১৬

ছেলেবেলায় খুব-একটা মায়ের কোলে উঠেছি বলে মনে পড়ে না। তার একটা কারণ এই যে, শৈশবের একটা মস্ত অংশই আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে কাটিয়েছি। ছুটিছাটায় যখন বাবার সঙ্গে সেখানে যেতেন, তখনও যে অন্য-কারও সামনে মা আমকে কোলে তুলতেন না, তার অবশ্য ভিন্ন কারণ। নিজের ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি তাদের যত্ন-আত্তির ব্যাপারে অত্যধিক মনোযোগী হওয়া সেকালের যৌথ পরিবারে খুবই স্বার্থপর আচরণ বলে গণ্য হত। বউয়ের তাতে নিন্দে রটত; বলা হত, 'দেখে নিয়ো, এই বউই শেষ পর্যন্ত ঘর ভাঙবে।' ফলে, এই রকমের একটা অলিখিত নিয়ম বা কনভেনশন সেকালে চালু ছিল বলে মনে হয় যে, ননদ কিংবা জায়েদের ছেলেমেয়েকে যত খুশি কোলে নাও, কিন্তু খর্বদার, নিজের ছেলেমেয়েকে কোলে নেওয়া চলবে না। কেউ তা বড়-একটা নিতেনও না। আমাদের পরিবারের কথা বলতে পারি, আমাকে ভাত খাইয়ে দেবার কি ঘুম পাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব ছিল বড়কাকিমার হাতে। মা হয়তো তখন আমার কোনও পিসতুতো ভাই কিংবা বোনকে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন কি ঝিনুকে করে তাকে দুধ খাওয়াতে বসেছেন।

কলকাতায় যখন আসতুম, তখন আবার দেখতুম যে, আমাকে কোলে নেবার কি স্নান করিয়ে দেবার কি গল্প বলতে-বলতে ভাত খাইয়ে দেবার সময়ই তাঁর নেই। একা-হাতে গোটা-সংসারের সমস্ত কাজ সামলাতেন, তাই সকাল হতে-না-হতেই শুরু হয়ে যেত তাঁর দৌড়ঝাঁপ। তালতলা পাড়া ছেড়ে আসার আগে পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে সারাক্ষণের কাজের লোক বলতে একমাত্র হুজুরকেই দেখেছি; দেওঘর থেকে তাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের বাড়ির তিনতলার ছাত থেকে আমাদের একটা বাচ্চা-স্প্যানিয়েলকে নেহাতই খেলাচ্ছলে একতলার উঠোনে ছুড়ে দিয়ে সে মেরে ফেলেছিল বলে মা এতই ভয় পেয়ে যান যে, তার পরে আর সারাক্ষণের লোক রাখতে তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত রাজি করানো যায়নি। থাকবার মধ্যে ছিল একজন ঠিকে-ঝি, কিন্তু ভোরবেলায় এসে এঁটো বাসনপত্তর মেজে দিয়ে আর কয়লার উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে সেই যে সে অন্য-বাড়ির কাজ সারতে চলে যেত, তার পরে আর বেলা-বারোটার আগে আমাদের বাড়িতে আসত না। ফলে, সাত-সকালেই বাসী ঘর ঝাঁটপাট দিয়ে, স্নান সেরে নিয়ে, মা'কে গিয়ে হেঁশেলে ঢুকতে হত। দিদি, বাবা আর দুই কাকাকে যতক্ষণ না খাইয়ে-দাইয়ে ইস্কুল-কলেজে পাঠাতে পারছেন, ততক্ষণ আর তাঁর অন্য দিকে মন দেবার কোনও উপায়ই থাকত না।

বারোটা নাগাদ ঠিকে-ঝি আসত ঘর মুছতে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মা তখন পর্যবেক্ষণ করতেন যে, কাজটা ঠিকমত হচ্ছে কি না। এক রবিবারের দুপুরে এইটে দেখে দিদি বলেছিল, "আচ্ছা

মা, ও যখন কাজ করে, তখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকো কেন?" তাতে মা বলেছিলেন, "দাঁড়িয়ে থাকি বলেই সব ক'টা ঘরের খাটের তলাটাও মোছা হয়, নইলে হত না।" ঠিকে-ঝির কাজ শেষ হবার পর তাকে খেতে দিয়ে মা নিজেও খেতে বসতেন। খাওয়ার পরেও যে খুব একটা ফুরসত পেতেন, তা নয়। তার পরেও টুকিটাকি দু'একটা কাজ বাকি থাকত। সেগুলি সেরে নিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে রেলিং থেকে নীচের দিকে একটা শাড়ি কি ধুতি ঝুলিয়ে দিয়ে বলতেন, "সাবি, পানটা বেঁধে দে। কাল জর্দা বড় কম দিয়েছিলি, আজ যেন কম না হয়।" এটা রোজই বলতেন।

নীচের রোয়াকে ছিল সাবির পানের দোকান। দোকানে কাঠি-লজেন্স আর তিলকুটও পাওয়া যেত। আমরা ছোটরাও ওইভাবে শাড়ি ঝুলিয়ে ইচ্ছেমত লজেন্স আর তিলকুট নিতান্ত কম আনাতুম না। মায়ের কাছে ধরা পড়বার পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে সাবি শুধুই দিনে দু'চারবার করে জর্দাপান পাঠাত। পানের খিলি মুখে দিয়ে বিছানায় শুয়ে মা আমাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে-করতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু তাও মাত্র ঘণ্টা খানেকের জন্যে।

ঠিক তিনটের সময় কলে জল আসত তখন। প্রায় একই সঙ্গে আসত রাস্তা ধোলাই করবার লোকেরা। তাদের হোসপাইপ থেকে জল পড়বার শব্দ শোনামাত্র বিছানা ছেড়ে, চোখেমুখে জল দিয়ে, হেঁশেলে গিয়ে মা আবার আটা-ময়দা মাখতে বসে যেতেন। একটু বাদেই ইস্কুল থেকে দিদি আর কলেজ থেকে কাকারা এসে পড়বেন। তার আগেই জলখাবার বানিয়ে রাখা চাই। বাবা এত তাড়াতাড়ি ফিরতেন না। কলেজ থেকে মিটিংয়ে কিংবা ময়দানে চলে যেতেন। বাড়ি ফিরতে রাত হত।

বিকেলবেলার জলখাবারের পাট চুকতে-চুকতে সন্ধে লেগে যেত। মায়েব ততক্ষণে বিছানার চাদর, লেপের ওয়াড়, শায়া, সেমিজ, রোজকার পরবার আটপৌরে শাড়ি ইত্যাদি তাবৎ ময়লা জিনিস জোগাড় করা হয়ে গেছে। এগুলি কাল সকালবেলায় কাচতে দেওয়া হবে। এখনও আছে কি না বলতে পারব না, তবে কলকাতায় তখন সাঁজোবাসী বলে কাপড় কাচাবার একটা দৈনন্দিন ব্যবস্থা ছিল। একজন লোক সকালবেলায় এসে বান্ডিল বেঁধে ময়লা কাপড় নিয়ে যেত, তারপর সেগুলো কেচেকুচে ফেরত দিয়ে যেত সন্ধেবেলায়। তাতে অবশ্য মাড়-টাড়ের বালাই থাকত না, ক্ষারে কেচে ওই একটু ইস্তিরি বুলিয়ে দেবার ব্যাপার মাত্র। তবে সবই তো আটপৌরে নিত্যব্যবহার্য জিনিস, তাই সেগুলো যত্ন করে কাচা হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল না কারও। ময়লাটা যে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটাই যথেষ্ট।

সাঁজোবাসী একেবারে ঘড়ি ধবে সন্ধে সাতটায় চলে আসত। মা তার কাছ থেকে কাচানো জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে বারান্দার একপাশে ডাঁই করে রাখা ময়লা ওয়াড়-চাদর ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, "ওগুলো কাল সকালবেলা এসে নিয়ে যেয়ো।" সাজোঁবাসীকে রোজকার পয়সা রোজ মিটিয়ে দিতে হত। পয়সা নিয়ে সে চলে গেলেই মা আবার সেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতেন। মাঝে-মাঝেই বলতেন, "ওরে বাবা রে বাবা, এ কোন বাড়িতে এসে ঢুকেছি রে, এ যে দম ফেলারও সময় নেই।"

তা হলে আর আমাকে কোলেই বা নেবেন কী করে, আর গল্প বলতে-বলতে খাইয়েই বা দেবেন কখন!

সকালবেলায় সবাইকে জলখাবার খাইয়ে 'টাইমের ভাত' রাঁধতে-রাঁধতেই মা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তারপর একটা ভাজা-মাছের কাঁটা বেশ ভাল করে বেছে দিয়ে ডাল আর ভাতের সঙ্গে সেটাকেও চটকে মেখে দিয়ে আমাকে বলতেন, "এখন এই কাকের ডিম আর বকের

ডিমগুলো চটপট খেয়ে নে তো, তারপর দুপুরে আবার আমার সঙ্গে খাবি।" তখনও নিজের হাতে ভাল করে খেতে শিখিনি, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব পড়ে যায়, তাই মাখা-ভাতের ছোট-ছোট কয়েকটা গোল্লা পাকিয়ে দিতেন। সেইগুলিই ছিল কাকের ডিম আর বকের ডিম।

দেশের বাড়িতে আমাকে ভাত খাওয়ানোর সময় হয় ঠাকুমাকে গল্প বলতে হত, নয় বড়কাকিমাকে। তার থেকেই তখন হয়তো এই রকমের একটা ধারণা আমার জন্মে গিয়ে থাকবে যে, গল্প শুনতে শুনতে ভাত খেতে হয়। কিন্তু গল্পের বায়না তুলে প্রথম দিনেই মায়ের কাছে যে ধমক খাই, তাতে আর কখনও তাঁকে গল্প বলতে বলার সাহস হয়নি। সেই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথাটা বলি।

সামনে কাঁসার ছোট্ট থালা। তাতে কাকের ডিম আর বকের ডিম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে খেতে বসিয়ে মা আবার রান্নায় মন দিয়েছেন। থালার সামনে পিঁড়ের উপরে আমি জোড়াসন হয়ে বসে আছি। তখনও খেতে শুরু করিনি। কী করে খাব? গল্প শুরু হয়নি যে!

আমি যে স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছি, একটা ডিমও মুখে তুলিনি, রান্না করতে-করতেই মা সেটা আঁচ করেছিলেন। বললেন, "কী রে, খাচ্ছিস না?"

"তুমি গল্প বলবে, তবে তো খাব।"

কড়ায় খুন্তি নাড়তে-নাড়তে মুখ না ফিরিয়েই মা বললেন, "অ্যাঁ, কিসের গল্প?"

"ঠাকুমা যে হরিকের গল্প বলে, সেই রকমের একটা গল্প বলো।"

"হরিকটা আবার কে?"

"সে একটা খুব চালাক ছেলে, সব্বাইকে সে হারিযে দেয, কেউ তাব সঙ্গে পাবে না। রাজামশাইকেও সে একদিন খুব বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। তুমি তার গল্প জানো না?"

"আমি কোনও গল্পই জানি না। ছেলেবেলায় যে যা খেতে দিত, চুপচাপ খেয়ে নিতুম। তুইও তেমন লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে নে তো।"

"গল্প না বললে আমি খাব না।"

এতক্ষণ সব মোটামুটি ঠিকই চলছিল। কিন্তু যেই বলেছি 'খাব না', মা অমনি উনুন থেকে কড়াইটাকে ঠক্ করে মেঝেতে নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, "দ্যাখ্, ভাল চাস তো লক্ষ্মী ছেলের মতন সব খেয়ে নে। নয়তো এই যে খুন্তি দেখছিস, এইটে কিন্তু তোর পিঠে ভাঙব।"

মায়ের কাছে সেই যে প্রথম বকুনি খাই, তা নয়। বকুনি তার আগেও বিস্তর খেয়েছি। কিন্তু এত কড়া ধমক সেই প্রথম। অভিমানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারপরে যে আর ঝামেলা করিনি, কান্না চেপে রেখে থালার ভাত খেয়ে নিয়েছিলুম, তাও ঠিক।

সেদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে ঠিকই বুঝতে পারি যে, 'গল্প না বললে ভাত খাব না' বলায় মা সেদিন হঠাৎ অত রেগে গিয়েছিলেন কেন। সময়ের অভাবই যে গল্প না-বলার কারণ, তা তো নয়। ওই যে তিনি বলেছিলেন, 'আমি কোনও গল্পই জানি না', ওটাই তো সবচেয়ে মর্মান্তিক সত্য কথা। না, ছেলে-ভোলানো কোনও গল্পই তিনি জানতেন না। কী করেই বা জানবেন? গল্প জানতে হলে গল্প শুনতে হয়। কিন্তু কে তাঁকে গল্প শোনাবে। তাঁর না ছিল ঠাকুমা, না ছিল মা। এক বছর বয়স থেকে মানুষ হয়েছিলেন পিসির কাছে। খুব একটা আদর-যত্নে যে মানুষ হয়েছিলেন, এমন কথাও ভাবা শক্ত। কে জানে, নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য একটি মাতৃহীন শিশুর দায়িত্ব হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়ায় সেই পিসির শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা হয়তো বিশেষ খুশিও হননি। হয়তো সেই শিশুটিকে সেখানে একটা গলগ্রহ বলেই গণ্য করা হত। যখন একটু

বড় হন, মা হয়তো তখন সেটা বুঝতেও পারতেন। দু'বেলা তাঁকে খেতে কি আর দেওয়া হত না? তা নিশ্চয় হত। কিন্তু, আর-পাঁচটা শিশুর মতন কেউ কি তাঁকে আদর করে, গল্প শুনিয়ে কখনও কিছু খাইয়ে দিয়েছে? তাদের সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা কি তিনি বুঝতে পারতেন না? তা নিয়ে কোনও চাপা-কষ্ট কি তাঁর ছিল না? এমন কোনও চাপা-অভিমান, বছর-চারেক বয়সের একটি শিশুর ভিতরটাকে যা কুরে-কুরে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়? কিছুই আমি জানি না। শুধু মায়ের সেই ছেলেবেলার কথা যখন ভাবি, উশকো-খুশকো চুলের একটু-পিতু কিন্তু ভীষণ-অভিমানী একটি শিশুর ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

মায়ের কাছে গল্প না শুনলেও বাবার কাছে শোনা যেত। প্রায়ই অবশ্য তিনি একটু রাত করে বাড়ি ফিরতেন, তার অনেক আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। তবে যেদিন একটু তাড়াতাড়ি ফিরতেন, সেদিন তাঁর কাছে একটা-দুটো গল্প না-শুনে ছাড়তুম না। তার বেশির ভাগই অবশ্য গ্রিক পুরাণের গল্প। আর নয়তো আমাদের ইতিহাসের গল্প। মাঝে-মাঝে খেলার মাঠের গল্পও বলতেন। ছড়াও শোনাতেন খুব। হঠাৎ একদিন বিকেল-বিকেল বাড়িতে ফিরে আমার হাতে একখানা বই তুলে দেন। লাল মলাটের মস্ত সাইজের বাঁধানো বই, নাম 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী'। একেবারে নিজের বলতে সেই আমার জীবনের প্রথম বই। বইখানা হাতে দিয়ে বাবা আমাকে বলেন, "এখনও তোর হাতে খড়ি হয়নি, কিন্তু দিব্যি তো পড়তে পারিস, পড়ে দ্যাখ, যেমন গল্প তেমন ছড়া, খুব মজা পাবি।"

বাবা ঠিকই বলেছিলেন। কী যে মজা পেয়েছিলুম, সে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। সে-বইয়ে গল্প ছিল, ছড়া ছিল, সেইসঙ্গে অনেক ধাঁধাও ছিল। তার উপরে পাতায় পাতায় ছিল ছবি। বাবা তার আগে যে-সব ছড়া আমাকে শুনিয়েছিলেন, তারও অনেকগুলি দেখলুম এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে। দিনরাত্তির সেই বইয়ের মধ্যে তখন এমন ডুবে থাকতুম যে, অনুযোগ করে মা একদিন বাবাকে বলেছিলেন, "কী যে বই ওকে এনে দিয়েছ, ওর তো নাওয়া খাওয়া ঘুম সবই ঘুচে গেল দেখছি!"

তা ঘুচবে না? সেই যে একটা তক্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে বাচ্চা ছেলে আর বলছে "আমরা যেমন বীর শিশু/তেমন আর কে?/ভয় ভাবনা কাকে বলে/কিছুই জানিনে', আর তারপরেই সেই তক্তার তলায় হাঁ-করা একটা সারস দেখে তাদের আর্তনাদ "ও বাবা গো, ওটা কী গো?/জন্মে কভু দেখিনি কো/এত বড় হাঁ!/আজকে বুঝি ফেললে গিলে/মা গো মা!' কিংবা সেই যে ছেলেটা, যে কিনা 'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনি-পাতা দই' আর 'দুটো পাকা বেল, সরিষার তেল, ডিম-ভরা কই' আনতে গিয়ে দোকানে পৌঁছে বলেছিল 'দাদখানি বেল, মুসুরির তেল, সরিষার কই' আর 'চিনি-পাতা চাল, দুটো পাকা ডাল, ডিম-ভরা দই', নাওয়া-খাওয়া তারা তো ভুলিয়েই দিতে পারে। আর সেই আজব দেশ, যেখানে 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো', সেই দেশ তো সত্যিই তখন আমার রাত্তিরের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

আমার ছেলের শৈশবে সেই বই অনেক খুঁজেও পাইনি। তখন মনে হয়েছিল, ওর ছেলেবেলার চেয়ে আমার ছেলেবেলা ছিল অনেক ভাল। ওই একখানা বই-ই যে-কোনও কল্পনাপ্রবণ শিশুর চোখের সামনে এমন এক আশ্চর্য জগতের দরজা খুলে দিতে পারে, রাজপুত্র রাজকন্যা পক্ষিরাজ আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির জগতের চেয়ে যা কিনা কিছুমাত্র কম রঙিন নয়।

বইখানা আমার সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। একদণ্ডের জন্যেও সেটিকে কাছছাড়া করতুম না। রাত্তিরে ঘুমোতুমও সেটিকে সঙ্গে নিয়ে। একই ছড়া একই গল্প বারবার পড়তুম। একটুও

ক্লান্তি আসত না। তার থেকে আমার এই একটা ধারণা হয়েছে যে, সদ্য যাদের অক্ষর-পরিচয় হয়েছে, একই সঙ্গে একগাদা বই তাদের দিতে নেই। যদি মাত্র একখানা বই দেওয়া হয়, তা হলে সেটিকেই তারা একেবারে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখবে। সেক্ষেত্রে একগাদা বই দিলে বইয়ের কদরই তারা বুঝবে না। নিজের কথা বলতে পারি। নিতান্ত একখানা বই পেয়েছিলুম বলেই বোধহয় বই-জিনিসটাকে ভালবাসতে শিখেছিলুম, সেই ভালবাসাই পরে অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে যায়। চার-বছর বয়সেই যদি গাদাগুচ্ছের বই পেতুম, তা হলে হয়তো এটা হত না।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে আজকাল দেখতে পাই যে, একইসঙ্গে বিস্তর বই তারা পেয়ে যাচ্ছে। দেখে আমার ভয় হয়। প্রশ্ন জাগে, এই যে এতগুলো বই পেল, এগুলো এরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়বে তো ? নাকি নেহাতই অনাদরে আর অবহেলায় এ-সব বই এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকবে, আর তারপর পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে এগুলোও বিক্রি হয়ে যাবে একদিন ?

যেমন বই, তেমন খেলনাও বোধহয় বাচ্চাদের হাতে বেশি না দেওয়াই ভাল। বইয়ের মতন খেলনাও আসলে শিশুর কল্পনাকে দীপিত করে, তাকে মুক্তি দেয়। খুব-বেশি বই আর খুব-বেশি খেলনা কিন্তু সেই মুক্তিলাভের ব্যাপারটাকে আদৌ সাহায্য করে না, বরং সেই মুক্তির পথে একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে পরে আবার আসা যাবে, এখন আবার আমার সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে যাই।

তিন থেকে ছ'বছর বয়স পর্যন্ত যে কলকাতাকে দেখেছি, সে হল বিশের দশকের শেষ দিককার কলকাতা। তার স্মৃতির সবটুকুই যে খুব উজ্জ্বল, তা নয়। খানিকটা যেমন স্পষ্ট, খানিকটা তেমন ঝাপসা। খুব স্পষ্ট হয়ে কানে বাজে কয়েকটা শব্দ আর ডাক; সেই সঙ্গে খুব স্পষ্ট হয়ে চোখে ভাসে কয়েকটা ছবি।

শেষ রাত্তিরে, আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে, জাঁতা ঘোরাবার মতো যে শব্দটা শুনতে পেতুম, সেটা আসলে ট্রামের চাকার ঘড়ঘড় শব্দ। দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের বাড়িটা ছিল ট্রাম-রাস্তা থেকে একটু ভিতর-দিকে। শব্দটা তাই খানিকটা দূর থেকে ভেসে আসত। শুনে বুঝতে পারতুম, কলকাতা এবারে আড়ামোড়া ভেঙে আস্তে-আস্তে জেগে উঠেছে। তার খানিক বাদে ফট্-ফট্ করে একেবারে ভিন্ন রকমের যে আওয়াজ উঠত, সেটা হল হোসপাইপের শব্দ। তার মানে পাইপ দিয়ে তোড়ে জল ঢেলে রাস্তা ধোলাই করা হচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাট তখন দিনে দু'বার ওইভাবে সাফ করা হত। একবার শেষ-রাত্তিরে আর একবার বিকেল তিনটে নাগাদ। বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণ করতেন না। ওই হোসপাইপের শব্দ শুনলেই দিবানিদ্রা ভেঙে যেত তাঁদের। ঘুম থেকে উঠে তাঁরা তখন জলখাবার বানাতে বসে যেতেন। তারপর গা ধুয়ে, পরিপাটি করে চুল বেঁধে একটু ফিটফাট হয়ে নিতেন। কেননা, কর্তারা আর খানিক বাদেই আপিস থেকে বাড়ি ফিরবেন।

কেল্লার তোপ পড়ত দুপুর একটায়। কলকাতা তখনও উত্তর, দক্ষিণ আর পুবদিকে এত বিশালভাবে হাত-পা ছড়ায়নি। এখনকার তুলনায় শহরের চৌহদ্দি ছিল অনেক ছোট। তাই শহরের তাবৎ এলাকা থেকেই তোপের শব্দটা স্পষ্ট শোনা যেত। ওই শব্দটা শুনে অনেকে ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন। মায়ের চোখে ঘুম এসে যেত। আমার চোখে আসত না। বিছানা থেকে নিঃশব্দে নেমে আমি রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতুম। সেখান থেকে শুনতুম ফিরিওয়ালার ডাক।

কত রকমের ফিরিওয়ালা ছিল তখন, আর তাদের ডাকও ছিল কত রকমের। পাড়ায়-পাড়ায়

তারা তাদের জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়াত। ভাল করে সকাল না হতেই শুনতে পেতুম 'মাক্খন-গোলি'। গামছা দিয়ে ঢাকা ঝাঁকা মাথায় করে যে-লোকটি আমাদের গলিতে ঢুকে ওই হাঁক ছাড়ত, সে বিক্রি করত গোল্লা-পাকানো সাদা মাখন। গোল্লাগুলোর উপরে ছড়ানো থাকত মোটা দানার চিনি। পাড়ার স্বাস্থ্যকামী বাবুদের কেউ-কেউ তাকে ডেকে, অন্য কোনও খাবার মুখে তুলবার আগেই, একটা-দুটো গোল্লা খেয়ে নিতেন।

তারপর যে আসত, সে মেয়েলি গলায়, একটু কেটে-কেটে বলত, 'মু-ড়ির চাক, চিঁ-ড়ের চাক।' পরের লোকটি আসত কালো রঙের একটা টিনের তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে। তোরঙ্গে থাকত কেক আর বিস্কুট। কলে বানানো জিনিস নয়, হাতে-গড়া। পণ্য দুটির প্রথমটির নামকে দ্বিখণ্ডিত করে সে একটু টেনে উচ্চারণ করত সম্ভবত এইজন্য যে, দ্বিতীয়টির নামের সঙ্গে নইলে ভারসাম্য থাকে না। দূর থেকেই তার ডাক শুনতুম 'কে—ইক্, বিস্কুট'।

বিস্কুটের সঙ্গে আগেই পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু 'কে—ইক্, বস্তুটি যে কী, তখনও সেটা জানতুম না। লোকটাকে ডেকে 'কে—ইক্' খেতে খুব ইচ্ছে করত, কিন্তু মা যেহেতু বলে দিয়েছিলেন, ও-সব সাহেবি খাবার খেতে হবে না, তাই কখনও তাকে ডাকিনি। তবে, বিস্কুটকে রেহাই দিয়ে শুধু কেককে কেন 'সাহেবি খাবার' বলা হচ্ছে, এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই তোলা যেত।

দুপুরে প্রথমেই যে ডাক শুনতুম, সেটা হল 'ভে-টকি মাছের কাঁ-টা চাই'। ঝাকার মধ্যে থাকত মুড়োসমেত স্রেফ মাছের কঙ্কালটা। পরে শুনেছি, মাছের সারাংশ ছাড়িয়ে নিয়ে হোটেল থেকে ওগুলো জলের দরে ফিরিওয়ালাদের দিয়ে দেওয়া হত। ওই কাঁটারও অবশ্য খদ্দেরের অভাব হত না। যাঁরা কিনতেন, মুড়ো আর কাঁটাকে তাঁরা চচ্চড়িতে লাগিয়ে দিতেন।

মাছওয়ালার পরে আসত মাটিওয়ালি বুড়ি। মাটিও যে বিক্রি হয়, কলকাতায় না এলে আরও অনেক-কিছুর মতো এটাও অজ্ঞাত থেকে যেত। গলির মোড় থেকেই সুরেলা গলায় বুড়িটি হাঁকত 'মিটি লিবে গো'! তোলা-উনুনের মেরামতির জন্য আর বারান্দায় কি ছাতে ফুলগাছের টব বসিয়ে বাগান করবার জন্য মাটির দরকার হত।

তারও খানিক বাদে আসত বাসনওয়ালা। মুটের মাথায় বাসনের ঝাঁকা চাপিয়ে দিয়ে থালা বাজাতে-বাজাতে সে এগিয়ে আসত আর বলত, 'বি-ষ্টুপুরী খা-গড়াই বা-সন চাই!'

কখনও কখনও চার-চাকাওয়ালা একটা বাক্সগাড়ির মতন জিনিস নিয়ে যে লোকটা আমাদের গলিতে এসে ঢুকত, কোনও একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ ধরে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে সে লোক জোগাড় করত, তারপর ছড়ার মতন করে বলতে শুরু করত: "দেখো দেখো দেখো দেখো/দিল্লীকা মিনার দেখো/আগ্রাকা তাজমহল দেখো/কালীঘাটকা মন্দিল দেখো/শের দেখো ভাল্ দেখো/হাঁথি দেখো বান্দল্ দেখো/অওর হল্‌মানজিকো দেখা/দেখো দেখো দেখো দেখো।" বাক্সের গায়ে গোল-গোল গর্ত, তাতে লাল নীল কাঁচ বসানো; তাতে চোখ রাখলে ভিতরের ছবি দেখা যায়। লোকটা যেমন-যেমন একটা হাতল ঘোরায়, তেমন-তেমন পালটে যায় ছবি। সে-সব দেখতে পয়সা লাগে একটা মাত্র।

বাক্সের কাচে আমিও চোখ রেখেছিলুম একদিন। কুতুব মিনার, তাজমহল ইত্যাদির সঙ্গে বিবস্ত্রা কিছু নারীর ছবিও দেখতে পাই। অমন ছবিও যে দেখা যাবে, তা অবশ্য ছড়ায় বলা হয়নি। অস্যার্থ এই যে, পণ্যের প্রকৃত পরিচয় গোপন করবার চেষ্টা সেকালেও অল্পবিস্তর চলত। দোষ শুধু একালের নয়।

১৭

মস্ত একটা তারের আংটায় বিশাল সাইজের একগাদা চাবি ঝুলিয়ে আর হাতের ঝাঁকুনি মেরে সেই চাবিগুলোকে ঝমাঝম করে বাজাতে-বাজাতে যে লোকটা আমাদের গলিতে এসে ঢুকত, সেও আসত ভরদুপুরে। মুখে তাকে কিছু বলতে হত না, স্রেফ ওই ঝমাঝম শব্দ শুনেই পাড়ার গিন্নিরা টের পেতেন যে, চাবিওয়ালা এসেছে। মা প্রায়ই তাঁর চাবির গোছা হারিয়ে ফেলতেন। ফলে, যে আলমারি কি তোরঙ্গ তক্ষুনি-তক্ষুনি না খুললেই নয়, চাবিওয়ালাকে ডেকে আবার নতুন করে তার চাবি করিয়ে নিতে হত। নষ্ট জং-ধরা বাতিল তালা মেরামত করতেও তার জুড়ি ছিল না। এখনও মনে পড়ে যে, আমাদের দুটো ঢাউস মাপের আলিগড়ি তালা সে মেরামত করে দিয়েছিল।

'দাঁতের পোকা বার করি' বলে ওই দুপুরবেলাতেই আসত মিশমিশে কালো রঙের সিড়িঙ্গে চেহারার এক বুড়ি। মা বলতেন, "দূর দূর, ও-সব পোকা-টোকা ওরা বার করে না। ওদের ঝোলার মধ্যে থাকে পোকায়-ভর্তি শিশি। তারই দু-একটা বার করে এনে বলে, এই দ্যাখো, তোমার ছেলের দাঁতের পোকা বার করে দিলুম। সবই আসলে ওদের হাত-সাফাইয়ের ব্যাপার।" কথাটা ঠিক কিনা জানি না, তবে বুড়িকে যে ভয় পেতুম সেটা ঠিক। গলিতে তাকে ঢুকতে দেখলে আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে বিশেষ ভরসা হত না, দৌড়ে ঘরে ঢুকে মায়ের পিঠে মুখ গুঁজে মটকা মেরে পড়ে থাকতুম।

যে সময়ের কথা বলছি, তার অনেক আগেই কলকাতার গেরস্তবাড়িতে কলের জল এসে গেছে, কিন্তু শহরের গ্রামীণ চেহারাটা তাতেই যে একেবারে মুছে গিয়েছিল, তা নয়। শহরের বেশ-কিছু বাড়িতে তখনও ছিল কুয়ো আর ইঁদারা। তা নইলে আর 'ঘটি বালতি তোলাবে গো' বলে ওই দুপুরের দিকেই একটা লোক মাঝে-মাঝে আমাদের গলিতে এসে ডাক ছাড়ত কেন! তার সঙ্গে থাকত মাথায়-লোহার-কাঁটা-বাঁধা একটা দড়ি। হাত ফশকে কি পচে-যাওয়া দড়ি ছিঁড়ে কুয়োর মধ্যে ঘটি-বালতি কিছু কম পড়ত না। কাঁটাওয়ালা দড়ি ঝুলিয়ে সেগুলি সে তুলে আনত। চাবির গোছা কি ওইরকমের ছোটখাটো আর-কিছু জলে পড়ে গেলে অবশ্য দড়িতে কুলোত না, লোকটা নিজেই নেমে যেত কুয়োর মধ্যে।

গ্রামের সঙ্গে শহরের আত্মিক যোগটা যে তখনও নষ্ট হয়নি, তারও প্রমাণ কিছু-না-কিছু পাওয়া যেত। হিন্দু-মহল্লার প্রতিটি বাড়িতে, তুলসী-মঞ্চ না থাক, টবের মধ্যে তুলসী-চারা একটা থাকতই। সন্ধে লাগতে শাঁখও বাজত ঘরে-ঘরে। একটা প্রদীপ জ্বেলে তুলসী-চারার কাছ থেকে সেটা ঘুরিয়ে আনা হত। বেস্পতিবারের সন্ধেয় লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে হবে, এই যে নিয়ম, এরও ব্যতিক্রম হবার জো ছিল না। টিনের সুটকেস ভর্তি ব্রতকথা আর পাঁচালি নিয়ে দুপুরবেলায় যে লোকটা ফিরি করতে আসত, তার তাই কদর ছিল খুব। আমাদের দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের বাড়ির একতলায় যাঁরা থাকতেন, তাঁদের তো যেমন মাঘমণ্ডল, তেমন পুন্যিপুকুর ব্রত করতেও দেখেছি। এই শেষের ব্রতটা করানো হত একতলার অপুদিকে দিয়ে। অপুদির বয়স তখন বছর ছয়-সাতের বেশি হবে না। তার ছোট ভাই নিমু ছিল আমার বন্ধু। কাঁইবিচি দিয়ে তার সঙ্গে আমি এক্কা-দোক্কা খেলতুম।

ফিরিওয়ালাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বিকেল চারটের পর থেকে একে-একে যে-সব ফিরিওয়ালা আমাদের গলিতে আসত, তাদের বেশির ভাগই আসত খাবার বিক্রি করতে। মোটামুটি চারটে থেকে সওয়া চারটের মধ্যে আসত 'বুড়ির মাথায় পাকা চুল'ওয়ালা। ওটা আর কিছুই নয়,

ইংলিশ-মিডিয়াম ইস্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা যাকে ক্যাণ্ডি-ফ্লস বলে, সেই বস্তু। চাকাওয়ালা গাড়ির গায়ে হাতল লাগানো। হাতলটা ঘোরালে বাক্সের উপরে বসানো মস্ত একটা বাটির মধ্যে ক্রমে-ক্রমে সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতো একটা বল গড়ে উঠতে থাকে। সাদা আর গোলাপি, দুই রঙেই সেটা পাওয়া যেত। দাম ছিল এক পয়সা। আধ পয়সা দিয়েও যে 'বুড়ির মাথার পাকা চুল' পাওয়া যেত না, তা নয়। তবে বলটার আকার সেক্ষেত্রে অনেক ছোট হত।

ক্যাণ্ডি-ফ্লসের গাড়ি চলে যাবার পরে আসত 'মুড়ির চাক, চিঁড়ের চাক'ওয়ালা। তার পরে যে আসত, তার মাথায় থাকত রঙিন কাগজের টুপি আর পায়ে মল। জামাও ছিল বহুবর্ণ। গলিতে ঢুকেই তালুতে জিভ্ ঠেকিয়ে সে হুর্র্র্র্ করে একটা আওয়াজ বার করত, আর তার পরেই ছড়া কাটতে-কাটতে শুরু করত তার নাচ। একে তো ওই হুর্র্র্র্ আওয়াজ, তারপরে আবার মল-পরা পায়ের ঝমর্-ঝমর্ শব্দ, বাচ্চাদের ভিড় জমতে অতএব দেরি হত না। লোকটা আসলে পাকানো কাগজের ঠোঙায় ভরে 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' বিক্রি করত, তবে ডালমুট, চিনাবাদাম ইত্যাদির সহযোগে তৈরি ওই পণ্যের তুলনায় তার ছড়া আর নাচের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি।

আসত নকুলদানা, তিলেখাজা আর গুলাবি রেউড়িওয়ালারাও। কিছু-কিছু খেলনাওয়ালাও আসত। বেশির ভাগই মাটি, কাঠ কিংবা ন্যাকড়ার পুতুল। ঝুড়ির মধ্যে শোলা আর পাতলা টিনের খেলনাও দু'চার রকমের থাকত। তার মধ্যে টিনের ব্যাঙের কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে। সেটার পেট টিপলে কটকট করে আওয়াজ বার হত। শোলার খেলনা বলতে ছিল দাঁড়ের কাকাতুয়া। ঘরের দেওয়ালে পেরেক পুঁতে অনেকে সেটা ঝুলিয়েও রাখতেন। খেলনার মধ্যে মাটির বেহালারও বেশ চাহিদা ছিল। তবে বেহালাওয়ালা আসত দুপুরবেলায়। মাথায় ছোট-ছোট বেহালা ভর্তি মস্ত ঝাঁকা, হাতেও একটা বেহালা। ধনুকের মতন বাঁকানো ছড় দিয়ে সেই বেহালা বাজাতে বাজাতে নিত্যি দুপুরে সে আমাদের গলি দিয়ে চলে যেত।

রাস্তা দিয়ে এত যে খাবারওয়ালা যেত, বাড়িতে যে তাদের ডাকব, তার উপায় ছিল না। দুপুরের ঘুম থেকে উঠে মা ওই যে চোখেমুখে জল দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে আটা-ময়দা ঠাসতে বসতেন, তার আগে আমাকে বলে যেতেন, "খবর্দার, একজনও খাবারওয়ালাকে যদি ডেকেছিস তো নির্ঘাত মার খাবি।"

প্রথমবার যখন সাবধান করে দেন, ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "কেন, বুড়ির মাথার পাকা চুল খেলে কী হয় ?"

মা বললেন, "কলেরা হয়।"

বললুম, "নিমু তো রোজই খায়। কই, ওর তো কলেরা হয় না।"

তাতে মা বললেন, "ফের কথার উপরে কথা ? কলেরা না হোক, গতবছর যে ওর টাইফয়েড হয়েছিল, তা জানিস ?"

এরপরে আর মুখ খুলবার সাহস হয়নি। তাই বলে যে ও-সব 'অখাদ্য' থেকে নিজেকে একেবারে বঞ্চিত রেখেছিলুম, তাও নয়। লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতুম। তাতে কলেরাও হয়নি, টাইফয়েডও হয়নি। বুড়ির মাথার পাকা চুল খেতে অবশ্য খুবই খারাপ লেগেছিল। দেশের বাড়িতে যে পাটালি গুড় খেতুম, তার স্বাদ ওই চিনির সুতোর চেয়ে অনেক ভাল।

বিকেলের জলখাবার বলতে ছিল হাতে-গড়া রুটি আর আলুর ছেঁচকি। সেইসঙ্গে এক-চামচে দানাদার ঝোলাগুড়। মাঝেমধ্যে রুটির বদলে পরোটা হত। কিন্তু আটা-ময়দার খাদ্য আমার মুখে বিশেষ রুচত না। ফলে বিকেলেও আমার জন্যে ভাতের ব্যবস্থা করতে হয়। সেটা অবশ্য খুব সহজে হয়নি। রুটি-পরোটার বদলে দু'চার দিন লুচি খাইয়েও মা যখন আমার মুখে হাসি ফোটাতে

পারলেন না, তখন 'ধুর্, এই রাক্ষসটাকে দেখছি কিছুতেই মানুষ করা গেল না,' বলে গুম্‌গুম্ করে আমার পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে বিকেলেও আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা হয়ে গেল। অন্নই যে ব্রহ্ম, দেশের বাড়িতে যখন চারবেলা ভাত খেতুম, তখন সেটা বুঝিনি। কলকাতায় এসে চোখের জল ঝরিয়ে সেটা বুঝতে পারলুম।

কলকাতার জলখাবার ছিল বিচিত্র রকমের। বলেছি বটে, আটা-ময়দার আমি ভক্ত নই, কিন্তু পাড়ার ময়রার দোকানে হালুয়ার সঙ্গে গুটকে কচুরি খেয়ে বুঝতে পারি যে, সে অতি উত্তম জিনিস। তার সঙ্গে গরম-গরম খান চারেক জিলিপি পেলে তো কথাই নেই। যুদ্ধের সময় সুজি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আটার হালুয়া চালাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেটা চলেনি। প্রাতরাশের পক্ষে মুড়ি-মুড়কিও নেহাত খারাপ ছিল না। আধ পয়সার টাটকা মুড়ির সঙ্গে আধ পয়সার মুড়কি কিনলেই দিব্য চলে যেত। মুড়কিতে একটু কর্পূরের গন্ধ মেশানো থাকত, তার আকর্ষণ তাতে বাড়ত বই কমত না।

কেউ-কেউ পাউরুটি আর মাখন খেতেন। ফার্পোর কোয়ার্টার পাউণ্ড মিল্ক ব্রেডের দাম ছিল দু'পয়সা। অমন সুস্বাদু রুটি বিদেশেও খুব কমই খেয়েছি। ফার্পো কোম্পানি অবশ্য শুধু ধবধবে সাদা মিল্ক ব্রেড কেন, রেইজন ব্রেড আর ব্রাউন ব্রেডও বানাত। সেও ছিল খুব সুস্বাদু রুটি। একমাত্র পলসন ছাড়া এ-দেশের অন্য কোনও কোম্পানি তখন কৌটোর মাখন বিক্রি করত বলে মনে পড়ে না। তবে বিদেশ থেকে স্ট্যাফাড, পাইনঅ্যাপল ইত্যাদি নামের বিস্তর কৌটোব মাখন আসত। আমদানি-করা সেসব মহার্ঘ মাখন খেত বড়লোকরা। আর পাড়ার দোকানে যে ক্যানেস্তারা ভর্তি আলিগড়ি মাখন মিলত, সেটাই ছিল আমাদের ভরসা। কাঠের হাতা দিয়ে ক্যানেস্তারা থেকে সেই মাখন তুলে কলাপাতায় মুড়ে বিক্রি করা হত। দাম এক পয়সা। তারও স্বাদ মোটেই খারাপ ছিল না। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে যখন পড়ি, তখন আমার মায়ের হঠাৎ খেয়াল হয় যে, আমাদের মেধাবৃদ্ধির একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ফলে অ্যানুয়াল পরীক্ষার হপ্তাখানেক আগে থেকে আমাদের জন্য এক কৌটো করে পলসনস বাটার বরাদ্দ হয়ে যায়।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। খুব ছেলেবেলায় ওই যে এক-আধ দিন পাউরুটি খেয়েছি, তাতে আমরা আলিগড়ি মাখনই মাখিয়ে নিতুম। দোকানের খাবারে যাঁদের আপত্তি ছিল না, তাঁদের বিকেলবেলার জলখাবারে আরও বৈচিত্র্যের স্পর্শ ঘটত। পাড়ায় একটি তেলেভাজার দোকান ছিল। জনৈক ওড়িশাবাসীর সেই দোকানে বেগুনি, ফুলুরি, ঝালবড়া, পলতাপাতার বড়া, পেঁয়াজি আর আলুর চপ যা তৈরি হত, তার গন্ধে গোটা গলি দেখা যেত সন্ধ্যালগ্নেই একেবারে মাতোয়ারা হয়ে আছে। দোকানে টাটকা মুড়ি আর সর্ষের-তেলে-নাড়াচাড়া-করা ছোলাসেদ্ধও মিলত। তার সঙ্গে মুড়ি আর তেলেভাজার যোগাযোগটা হত একেবারে মণিকাঞ্চনের মতো। একই দোকানে তৈরি হত ডালপুরিও। ভাজা নয়, চাটুতে সেঁকা ডালপুরি। ছিঁড়ে খেতে গেলে তার ভিতর থেকে ডালের গুঁড়ো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ত। নেহাত আনাড়ি ছাড়া ওভাবে কেউ খেতেনও না। গোটা একটা ডালপুরি দিয়ে আস্ত একটা আলুর দম জড়িয়ে নিয়ে একসঙ্গে তাঁরা মুখের মধ্যে পুরে দিতেন। সেঁকা ডালপুরি খাওয়ার ওটাই হচ্ছে নিয়ম। আলুর দমের সঙ্গে ডালপুরি তখন এক পয়সায় দুটো পাওয়া যেত, আর ওই একই দামে বেগুনি কি ফুলুরি পাওয়া যেত চারটে।

ময়রার দোকানে বিকেলবেলায় ভাজা হত হিংয়ের কচুরি, নিমকি আর শিঙাড়া। হিংয়ের কচুরির সঙ্গে খোসা-না ছাড়ানো আলুর তরকারি পাওয়া যেত। শিঙাড়ার কথায় বলি, টোমাটো কেচাপ আর নয়তো চাটনি মাখিয়ে আজকাল যে বিশাল সাইজের পশ্চিমা শিঙাড়া খাওয়ার চল হয়েছে, তাকে শিঙাড়া না-বলে 'সামোসা' বলাই ভাল। বাঙালি শিঙাড়া অন্য জাতের জিনিস। তার সাইজ

ছোট, গায়ের ছাল-চামড়াও পুরু নয়, পাতলা, আর তার ভিতরে কোনও চটকানো জিনিস ঠেসে না দিয়ে স্রেফ লুডোর ছক্কার মতন ডুমো-ডুমো করে কোটা গুটিকয় আলু আর দুটি-চারটি ফুলকপির টুকরো দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে থাকে চিনাবাদামের গুটি দুয়েক দানা, এক-আধ কুচি নারকোল আর একটি কিসমিস। তাতেই তার যে স্বাদ এসে যায়, তাতে সামোসা তার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। বাঙালির দোকানেও সে-বস্তু ইদানীং দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আক্ষেপের কথা, তাতে আর সন্দেহ কী।

গোরুর দুধ পাওয়া যেত টাকায় দু'সের করে। মায়ের ধনুর্ভঙ্গ পণ, বাড়িতে গোরু নিয়ে এসে দুইয়ে দিলে তবেই তিনি দুধ নেবেন, নইলে নেবেন না, ফলে আমরা টাকায় সাত পো করে দুধ পেতুম। খাটাল থেকে গোরু নিয়ে এসে গোয়ালা তাকে আমাদের বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে দুধ দুইতে বসত। তার আগে অবশ্য বালতিটাকে উপুড় করে ধরে মাকে সে দেখিয়ে দিত যে, বালতির মধ্যে জল নেই। মায়ের তবুও শান্তি হত না। আমাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। গোয়ালা তাতে যতই গজর-গজর করুক, আমার এক পা'ও নড়বার উপায় নেই, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

গোয়ালা আসত বিকেলবেলায়। দুধ নিয়ে আমি উপরে আসবার পরে মা চা তৈরি করতে বসতেন। আমাদের, অর্থাৎ আমার আর দিদির, চা খাওয়ার অনুমতি ছিল না। তবে চায়ের সঙ্গে বড়রা যে বিস্কুট খেতেন, আমরা তার একটা ভাগ পেতুম। ব্রিটানিয়া তখনও সম্ভবত বাজারে আসেনি, কিংবা এসে থাকলেও খুব-একটা জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। বিলিতি বিস্কুটের মধ্যে সবচেয়ে খানদানি ছিল হান্ট্‌লি পামার। কিন্তু যেমন বিলিতি মাখন, তেমন বিলিতি বিস্কুটও প্রধানত বড়লোকরাই খেত। আমরা তুষ্ট ছিলুম দেশি বিস্কুটেই। হাতে-গড়া সেই সুজির বিস্কুট আমাদেরই পাড়ার এক মুসলমান ভদ্রলোকের দোকান থেকে রোজ কিনে আনা হত। সেখানে সারি-সারি কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে আলাদা-আলাদা করে সাজানো থাকত হরেক রকমের বিস্কুট আর পাউরুটি। তার কোনওটাই বৃহৎ কারখানায় উৎপন্ন নয়, সবই কুটিরশিল্পের জিনিস। বাড়িতে বসানো ছোটখাটো কলে তৈরি, কিংবা একেবারেই হাতে-গড়া। নানান নকশার বিস্কুট সেখানে পাওয়া যেত। কোনওটা চতুষ্কোণ, কোনওটা ত্রিভুজাকৃতি, আবার কোনওটা গোল বটে, কিন্তু ধারগুলো সব পদ্মকাটা। তার উপরে থাকত হালকা লাল টিপের ছাপ।

আমার পছন্দ ছিল কুড়মুড়ে লেড়ো বিস্কুট। তবে বড়রা সাধারণত চায়ের সঙ্গে স্কুল-বিস্কুট খেতেন। তার স্বাদ অনেকটা এখনকার থিন-অ্যারারুটের মতো।

দেশের বাড়িতে থাকতে যখন যা-কিছু খেয়েছি, সবই ঘরে তৈরি। বাইরের খাবারের প্রতি আসক্তি জন্মায় কলকাতায় এসে। এটা সম্ভবত নাগরিক জীবনেরই একটা বৈশিষ্ট্য। আপিস-ফেরতা বাবুদের কাণ্ড দেখে সেই ছেলেবেলায় অন্তত সেইরকমই মনে হত। বাড়িতে ফিরে পোশাক পালটে, হাতমুখ ধুয়ে তাঁরা ঘরের তৈরি জলখাবার খেয়ে নিতেন ঠিকই, কিন্তু তাতে পেট ভরলেও সম্ভবত তাঁদের মন ভরত না। নয়তো বিকেলবেলায় যে-সব খাবারওয়ালা আমাদের গলিতে এসে ঢুকত, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পাড়ার বাবুরা এত উৎসাহী হবেন কেন। রোয়াকে বসে গল্প করতে-করতেই তাদের তাঁরা ডাকতেন, ঝুড়ির ঢাকনা খুলিয়ে পরীক্ষা করতেন যে, কে কোন মুখরোচক খাদ্য এনেছে। কিছু-না-কিছু কিনতেনও। যে-সব খাদ্য সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ মোটামুটি বাল্যবয়সেই শেষ হয়ে যায়, সেই ডালমুট, ঝালচানা আর আলুকাবলির প্রতি আমাদের পাড়ার মধ্যবয়সী বাবুদেরও কিছু কম আগ্রহ দেখিনি। আলুকাবলি দেওয়া হত শালপাতায়। ঝাঁটার কাঠি বিঁধিয়ে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর পাতিলেবুর রস মেশানো সেই খাদ্যসামগ্রীর প্রতিটি দানা তাঁরা

পরম তৃপ্তি সহকারে খেতেন, তারপর শালপাতাটাকে পানের খিলির মতো ভাঁজ করে নিয়ে বলতেন, 'খাট্টা দাও।' খাট্টা আর কিছুই নয়, তেতুল-গোলা জল। শালপাতার খিলির মধ্যে তাও দু'চার বার ঢালতে হত। বাবুদের খাট্টা খাওয়া যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাম মেটানো হত না। আলুকাবলিওয়ালাকেও তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

'আলু-নারকোলের ঘুগনি' ডাকটা উঠত সন্ধে লাগবার খানিক বাদে। গলায় সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম বেঁধে যারা রেলের কামরায় গান গায়, ঘুগনিওয়ালার গলায় একেবারে তাদেরই কায়দায় একটা টিনের বাক্স ঝোলানো থাকত। লোকটির গলা ছিল ভারী সুরেলা।

তারও অনেক পরে, আমাদের রাত্তিরের খাওয়ার পাট যখন শেষ হয়ে গেছে, গলির মোড় থেকে তখন যে ডাকটা ভেসে আসত, সেটা কিন্তু যেমন ভরাট, তেমন গাম্ভীর্যময়। 'মালাই বরৌফ'। মাথার উপরে লাল কাপড়ে জড়ানো মস্ত হাঁড়ি, ধীর পদক্ষেপে লোকটি এগিয়ে আসত। হাঁড়ির ভিতরে সাজানো থাকত টিনের খোলে ভরা কুলপি মালাই। এক-একটা খোল বার করে, যেভাবে আমরা সুতো পাকাই সেইভাবে, দুই হাতের তালুর মধ্যে সেটাকে বারকয়েক পাক মেরে সে শালপাতার উপরে তার থেকে যা খুব আলতো হাতে নামিয়ে দিত, তার এলাচি গন্ধে চতুর্দিক একেবারে আমোদিত হয়ে উঠত। রাস্তার অন্য সব খাবার সম্পর্কে আমার মায়ের যতই আপত্তি থাক, এই মালাই বরফ সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা আমরা সবাই জানতুম। মুখে যা-ই বলুন, কুলপিওয়ালাকে ডেকে পাঠালে মনে-মনে যে তিনি খুশিই হতেন, তা বুঝতে কোনও অসুবিধে ছিল না।

খাদ্যের কথায় বলতে পারি, ওই মালাই বরফই ছিল নৈশ কলকাতার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

১৮

বিশের দশকের শেষের দিকে কলকাতার গলিতে-গলিতে যে সব পণ্য ফিরি করা হত, তার সবই যে এখন অচল, এমন কথা ভাববার কোনও হেতু নেই। এমনও নয় যে, যে সব ফিরিওয়ালা তখন নিত্য আমাদের চোখে পড়ত, তাদের কাউকেই ইদানীং আর দেখা যায় না, কিংবা এই শহর থেকে একেবারে সর্বৈব মিলিয়ে গিয়েছে তাদের ডাক। না, তা নিশ্চয় নয়। তবে ফিরিওয়ালাদের সেই ডাকের বৈচিত্র্য যে সেকালের তুলনায় একালে অনেক হ্রাস পেয়েছে, সেটা মানতে হবে। একে তো তখনকার ফিবিওয়ালাদের অনেক পণ্যই একালের গেরস্তদের কোনও কাজে লাগে না, তার উপরে আবার জিনিস গছাবার কায়দা-কৌশলও কালক্রমে অনেক পালটে গেছে। হরিদাসের বুলবুলভাজা না থাক, তাব কোনও রকমফের কি আর নেই? তা নিশ্চয় আছে। তবে তফাতটা এই যে, একালে আর পায়ে ঘুঙুব বেঁধে সে-বস্তু কেউ বিক্রি কবতে আসে না।

তা ছাড়া, ফুটপাথ জুড়ে এখন দোকানপাট বসে গেছে, উপবন্ত মোড়ে-মোড়ে বোল আর কাবাবের দোকান, গিন্নিরাও আগের তুলনায় অনেক সচল। ঘর থেকে দু'পা বেরোলেই যখন মনের মতন ছিটকাপড় আর পছন্দসই খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারা যাচ্ছে, তখন ভরদুপুরে বাড়ির মধ্যে একটা উটকো লোককে ডেকে আনবার দরকারই বা কী, বিশেষ করে একালে যখন সেটাকে খুব নিরাপদ ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় না। ফলে ফিরিওয়ালাদেব এককালে যে ব্যবসা ছিল, তার চোদ্দো আনা যদি 'ফুটের দোকান'-এর দখলে চলে গিয়ে থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

না, আমি অবাক হই না। ববং ভাবি যে, এটাই তো স্বাভাবিক, এইবকমই তো হবার কথা ছিল। আমার চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে কুড়ি-একুশ বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ কিনা সেই মান্ধাতার আমলে, এই শহরটাকে যেমন দেখেছিলুম, আজও ঠিক তেমনটাই তাকে দেখতে পাব, তাও কি হয় নাকি? প্রথম মহাযুদ্ধ একে তেমনভাবে ধাক্কা না মারুক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তর ধকল একে সইতে হয়েছে। দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, বেধেছে দাঙ্গা। হাজার-হাজার নিরন্ন মানুষ চতুর্দিকের গাঁ-গঞ্জ থেকে ছুটে এসে হামলে পড়েছে এর ঝকঝকে সব ফুটপাথের উপর, তারপর মরে গিয়েছে পোকা-মাকড়ের মতো। তার পরেও ছিল দেশ বিভাগের ধাক্কা। এক দিকে যখন স্বাধীনতার সূর্য উঠছে, অন্যদিকে তখন ঘনিয়ে উঠেছে অমাবস্যার অন্ধকার। সর্বস্ব খুইয়ে, বর্ডার পেরিয়ে মিছিলের পর মিছিল এই শহবের উপরে এসে আছড়ে পড়ছে তো পড়ছেই।

এই যে এত সব ধকল আর ধাক্কা, তার পরিণামে মানুষজনও কি আর সেই আগের মতোই আছে নাকি? তাও নেই। তাদের ধরন-ধারণ, চলন-ফেরন, অনেক কিছুই পালটে গেছে। সেই সঙ্গে পালটেছে এই শহরটাও। এতই পালটেছে যে, এককালে যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'সেকেণ্ড

সিটি' বলা হত, অর্থাৎ মর্যাদার বিচারে লণ্ডনের পরেই ছিল যার স্থান, পুরনো আমলের কোনও মানুষ যদি আজ আবার অনেক দিন বাদে এখানে ফিরে আসে, তো এই শহরকে সে হয়তো আর সেই শহর বলে চিনে উঠতে পারবে না।

অন্যদিকে, যারা একালের মানুষ, অর্থাৎ আবর্জনার এই সুবিশাল কুণ্ডের মধ্যেই যারা জন্ম নিয়েছে ও বেড়ে উঠেছে, তাদের বিশ্বাস করানো শক্ত হবে যে, কলকাতা এককালে সত্যিই বড় সুন্দর শহর ছিল। এর জীবনযাত্রায় তখন উড়নচণ্ডে ঝড়ের ঝাপট লাগেনি, এর চলাফেরা, এর সাধ-আহ্লাদ, এর সুখদুঃখ, সবকিছুরই ছন্দ তখন ছিল মন্দাক্রান্তা। সবচেয়ে বড় কথা, এর চেহারায় এমন একটা মায়া তখন জড়ানো ছিল, মানুষকে যা সত্যি বড় কাছে টানত।

কলকাতার রাস্তায় এখন বিজলি-বাতি জ্বলে। তখন জ্বলত না। তার বদলে ছিল গ্যাসের বাতি। বিকেলের আলো আকাশ থেকে মুছে যাবার খানিক আগে মই ঘাড়ে করে কর্পোরেশনের লোকেরা এসে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, তারপর ল্যাম্পপোস্টে মই লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিত নীলচে আভার আলোটিকে। রাত ফুরোবার আগেই আবার বাতি নেভাতে আসত তারা। কখনও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিনি। যেমন, শেষ রাতে আর বিকেলবেলায় ওই যে হোসপাইপ থেকে তোড়ে জল ঢেলে রাস্তা ধোলাই করা হত, তারও কখনও কোনও ব্যতিক্রম ঘটতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। গ্যাসের বাতি নিভে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে আমাদের গোটা গলির ঘুম ভেঙে যেত, তা অবশ্য নয়। রাত ফুরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই কি আর গলির মধ্যে দিনের আলো ঢুকতে পারে? তা পারে না। বড়-রাস্তার উঁচু-উঁচু সব বাড়ি টপকে আসতে হবে তো, কুচোকাঁচা গলির মধ্যে রোদ্দুর আসতে তাই একটু দেরি হয়।

ঠিকে-ঝিয়েরা অবশ্য তার খানিক আগেই বাড়িতে-বাড়িতে এসে কড়া নাড়তে থাকে, রোদ্দুর ওঠার অপেক্ষায় বসে থাকলে তাদের চলে না। ঘুম-চোখে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে গিন্নিমা দরজা খুলে দেন, তারপর ঘরে ফিরে বাবুদের আর ছেলেপুলেদের এক-এক করে ঘুম ভাঙাতে থাকেন। তারও খানিক পরে থলে হাতে নিয়ে বাবুরা সব বাজার করতে বেরিয়ে পড়েন। ওই যে রিফ্রিজারেটর বলে একটা যন্ত্র আজকাল ঘরে-ঘরে দেখতে পাই, আমার এক বন্ধু বলেন যে, ওটা হচ্ছে 'টাটকা জিনিসকে বাসী করে খাবার কল'। কথাটা একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। সেকালে বরফ-চাপা মাছ কিনে বাড়ি ফিরলে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হত। একালে বাজার থেকে টাটকা মাছ কিনে এনে তারপর তিনদিন ধরে খাব বলে সেই মাছ ওই কলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি। সেও আসলে বরফ দিয়ে চেপে রাখারই ব্যাপার। কিন্তু তা নিয়ে কেউ আর বকাঝকা করে না। বাবুরাও খুশি। কিনা এতে সময় বাঁচে।

সেকালে এত সময় বাঁচাবার তাগিদ ছিল না। বাবুরা নিত্য বাজার করতেন। যা কিনবার, তা বাজারে গিয়ে বিস্তর দরদস্তুর করে কিনতেন। তাতে সময় খানিকটা যেত ঠিকই, কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎটাও হয়ে যেত। শহরের হাল-হকিকত বোঝা যেত। পাঁচটা লোকের কথা থেকে টের পাওয়া যেত যে, মানুষের মেজাজ-মরজি কীরকম। বাজার হল শহরের নাড়ির মতো। নিত্য তার উপরে হাত রেখে তার স্পন্দনটা বুঝে নিতে হয়। তা নইলে চলে?

তালতলা-পাড়ায় থাকতে আমরা যেতুম এণ্টালি মার্কেটে। বাজারটা এখন আয়তনে একটু বেড়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বড্ড নোংরা হয়ে গেছে। দিন কয়েক আগে আমাদের ছেলেবেলার এই বাজারে একবার ঢুকতে হয়েছিল। ঢুকে মন খারাপ হয়ে গেল। বাজারের সামনের রাস্তায় যেমন জঞ্জালের পাহাড়, ভেতরটা তেমন ঘিঞ্জি। অথচ এককালে এই এণ্টালি মার্কেট ছিল ঝকঝকে-তকতকে। বড়কাকার সঙ্গে এক-আধবার তো তখন হগসাহেবের বাজারেও গিয়েছি।

সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে, সাহেবপাড়ার ওই অতি-উন্নাসিক বাজারের চেয়ে আমাদের এন্টালি মার্কেটের কাঁচা-বাজার কিছু কম পরিচ্ছন্ন ছিল না।

নিত্যকার বাজার মোটামুটি আটটার মধ্যেই এসে যেত। সরকারি আপিস-আদালত আর হৌসের বাবুরা খবরের কাগজের হেডলাইনে চোখ বুলিয়ে, চান করে, ভাত খেয়ে মোটামুটি ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে বাড়ি থেকে যে যার কর্মস্থলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তেন। পোশাকের ব্যাপারে বলি, পাতলুন তখনও বাবুদের মধ্যে এত চালু হয়নি, তবে শার্ট অনেকেই পরতেন। শার্টের নীচের দিকটা অবশ্য অনেককেই সেকালে ধুতির মধ্যে গুঁজে নিতে দেখা যেত। শীতকালে তার উপরে কেউ বা পরতেন গলাবন্ধ কোট, কেউ বা ওপ্‌ন-ব্রেস্ট জ্যাকেট। ধুতির সঙ্গে শু পরাটা মোটেই বেখাপ্পা ব্যাপার বলে গণ্য হত না। আমাদের গলি থেকে যাঁরা আপিসে বেরুতেন, এসপ্ল্যানেড কি ডালহৌসি পাড়ায় তাঁদের বেশির ভাগই যেতেন পদব্রজে। প্রত্যেকের হাতেই ছাতা থাকত। এক হাতে ছাতা, আর-এক হাতে চুন-লাগানো পানের বোঁটা, আপিস-যাত্রীর এই চিত্রটা আমার মনশ্চক্ষে এখনও ঝাপসা হয়ে যায়নি।

আপিসের বাবুদের অধিকাংশই কাজ করতেন পুরুষানুক্রমে। সরকারি আপিসই হোক আর মার্চেন্ট আপিসই হোক, মুরুব্বিদের নেকনজরে থাকবার দরকার হত। মুরুব্বি মানে সাহেব। তা সাহেবদের নেকনজেরে কী করে থাকতে হয়, এ-সব আপিসের বাবুরা সে-সব ভালই জানতেন। ফলে, যিনি যে-আপিসে চাকরি করেন, মুরুব্বির জোরে পুত্র কিংবা ভাইপো-ভাগ্নেকে সেখানে ঢোকাতে তাঁর খুব অসুবিধে হত না। ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরেই আত্মীয়স্বজনরা জিজ্ঞেস করত, এবারে কি বেরুবে, না কি আবও পড়বে? 'বেরুবে' কথাটার অর্থ এখানে 'চাকরিতে ঢুকবে'। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'উনি এখন কোথায় বেরুচ্ছেন', তো বুঝতে হবে 'উনি এখন কোন্ আপিসে চাকরি করেন', প্রশ্নকর্তার সেটাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য।

সেকালের এই 'আপিসের বাবুরা' যে মানুষ হিসেবে খারাপ ছিলেন, তা নয়, তবে এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন একটু ভিতু প্রকৃতির। আপিস, সংসার, বাজার আর পাড়া, এর বাইরের কোনও ব্যাপার নিয়ে এঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতেন না বললে কমই বলা হয়, আসলে মাথা ঘামাতে ভয় পেতেন। সাহেবদের এঁরা দেবতা বলে গণ্য করতেন। দেবতাদের সম্পর্কে যেমন একটা ভয়মিশ্রিত ভক্তি থাকে, সাহেবদেরও তেমন এঁরা একদিকে যেমন ভয় করতেন, অন্যদিকে তেমন আবার ভক্তিও করতেন খুব। তারা যে কখনও এদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিংবা চলে যেতে বাধ্য হতে পারে, এমন কথা এঁরা ভাবতেও পারতেন না।

আমাদের তালতলা-পাড়ার অনেক বাবুই ছিলেন এই রকমের 'আপিসের বাবু'। জঙ্গল কেটে বসত না-ই করুন, বেশ কয়েক পুরুষ ধরেই এঁরা কলকাতার বাসিন্দা, এবং 'খাঁটি কলকাত্তাইয়া' অভিধাটি যে একমাত্র এঁদেরই প্রাপ্য, পশ্চিমবঙ্গের আর-পাঁচটা এলাকার বাগ্‌ধারা ও উচ্চারণের সঙ্গে এঁদের বাগ্‌ধারা ও উচ্চারণের পার্থক্য থেকেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যেত। চল্লিশকে কেউ যে চাল্লিশ বলছেন, মাস্টারকে বলছেন ম্যাস্টার, কিংবা এঁদের ও ওঁদেরকে বলছেন এঁয়াদের ও ওঁয়াদের, স্রেফ এর থেকেই ধরে নেওয়া যেত যে, ইনিও একজন 'কলকাত্তাইয়া বাবু' না হয়ে যান না।

পারিবারিক ব্যাপারে এঁদের কেউ-কেউ যে একটু-আধটু ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসতেন, সেটা আর-একটু বড় হয়ে বুঝতে পারি। সেদিক থেকে আর-পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে, বাইরের ব্যাপারে এঁদের সবাই ছিলেন 'ঝামেলি' এড়িয়ে চলবার পক্ষপাতী। আমরা বাঙালরা যে এঁদের 'কিপ্টে' বলতুম, তার কারণ নিশ্চয় অমূলক। আসল কথাটা এই যে, এঁরা আয় বুঝে

ব্যয় করতেন, এবং অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে কোনও বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়, তবে এটাই ছিল এঁদের সাধারণ চরিত্রলক্ষণ। তা এটাকে যদি দোষ বলে গণ্য করি, তো বেহিসাবি উড়নচণ্ডেপনাকে একটা সদ্‌গুণ বলে ধরতে হবে।

যৌথ পরিবার তো একালে ভেঙেই গেছে, তবে পাড়া-পড়শিদের দেখে আমাদের সেই ছেলেবেলায় যদ্দুর যা বুঝতে পারতুম, তাতে মনে হয়, এই প্রথাটায় সেকালেও এঁরা বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। একই বাড়িতে একই ছাতের তলায় চার ভাইয়ের সংসার, অথচ প্রত্যেকেই পৃথগন্ন, এইটে দেখে মা খুব অবাক মানতেন। তবে, মা যা-ই ভাবুন, নিছক আত্মকেন্দ্রিকতাই যে এর কারণ, এমন না-ও হতে নারে। ভাইয়ে ভাইয়ে যতই সদ্‌ভাব থাক, একান্নবর্তিতার সূত্র ধরেই পরে নানান অশান্তি ঘটাও তো কিছু বিচিত্র নয়, হয়তো সেই কথা ভেবেই হাঁড়িটা এঁরা প্রথম সুযোগেই আলাদা করে ফেলতেন। বাঙালদের কথা হচ্ছে, ঝগড়া করব, মাথা-ফাটাফাটি করব, কিন্তু খাব তবু একসঙ্গে। এঁরা অমন একান্নবর্তিতায় বিশ্বাসী নন। কেন নন, সে তো আগেই বলেছি। এঁরা নির্বিরোধ নিরীহ মানুষ। এঁরা 'ঝামেলি' পছন্দ করেন না।

এঁদের কর্মজীবন যেমন সুশৃঙ্খল ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন সাংসারিক জীবনেও শৃঙ্খলাহীনতা বিশেষ প্রশ্রয় পেত না। ঘড়ি ধরে এঁরা আপিসে যেতেন, আবার ফিরতেনও একেবারে ঠিক সময়ে। এঁদের গিন্নিরা কুরুশ-কাঁটার কাজ ভাল জানতেন। সে-সব কাজ ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে দেওয়ালে শোভা পেত। আস্ত একটা ইলিশ মাছ মুখে বেড়ালের ছবি, এটা বিস্তর বাড়িতে দেখেছি। যেমন দেখেছি ওঁ-এর মধ্যে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে। 'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে/একা আমি পড়ে রব কর্তব্য সাধিতে' অথবা 'নিরাশার অন্ধকারে তুমিই আশার জ্যোতি', সাদা কাপড়ের উপরে রঙিন সুতো দিয়ে তোলা এই সব মূল্যবান কথাও ফ্রেমের মধ্যে বন্দি হয়ে এঁদের দেওয়ালের সৌন্দর্য বর্ধন করত। মায়ের সঙ্গে কখনও-কখনও দুপুরের দিকে এঁদেব বাড়িতে গিয়েছি। গিয়ে যে-জিনিসটা দেখে সেই বয়সেই আমার তাক লেগে যেত, সে হল এঁদেব বিছানা। বাঙাল-বাড়ির ছেলেপুলেরা বড় দুরন্ত হয়। যতই নিষেধ করা হোক, নিতান্ত ছাতে কিংবা বারান্দায় দৌড়ঝাঁপ করে তাদের আশ মেটে না, বিছানায় উঠে তারা হুটোপাটি করবেই। এঁদের বাড়ির বিছানা কিন্তু যেমন নিভাঁজ, তেমন পরিপাটি। ধবধবে সাদা চাদর একেবারে টান-টান করে পাতা। ধুলো-ময়লা তো দূরের কথা, চাদরটা যে কোথাও একটু কুঁচকে আছে, এটা পর্যন্ত চোখে পড়ত না।

কলকাতার গিন্নিরা প্রসাধনেও ছিলেন যত্নশীল। বেলা গড়িয়ে এলে তাঁরা গা ধুয়ে, চুল-আঁচড়ে, পাতা কেটে, আঁট করে খোঁপা বাঁধতেন। তারপর ফর্সা একখানি শাড়ি পরে প্রতীক্ষায় থাকতেন তাঁদের কর্তাদের। পাড়ার বাঙাল-বউদের কাছে এটা ঠাট্টার বিষয় ছিল ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যে যে ঠাট্টার কী আছে, আমি তো সেটা ভেবে পাই না। কর্তারা যদি আপিসের খাটুনি খেটে বাড়ি ফিরে দেখতেন যে, তাঁদের গিন্নিরা উশকো-খুশকো চুলে, রান্নাঘরের তেল-হলুদের ছোপ লাগা ময়লা একখানা শাড়ি পরে তাঁদের অভ্যর্থনা করছেন, তবে সেটাই কি খুব প্রশংসার কথা হত ?

বাড়িতে ফিরে আসার ঘণ্টাখানেক বাদে কর্তারা এসে রোয়াকে বসতেন। পাড়ায় যাঁরা তাঁদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁদের কাউকেই যে কখনও তাঁরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন, এমন মনে পড়ে না। আড্ডা যা হবার, তা রোয়াকে বসেই হত। জরুরি কোনও কথাবার্তা কি আলোচনার দরকার ঘটলে, তাও সমাধা হত ওই রোয়াকে বসেই। তারপর গুটিগুটি আবার সবাই রোয়াক থেকে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়তেন। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে তাঁরা শুয়ে পড়তেন তাড়াতাড়ি। খাস কলকাতার এইসব বাবুর বাড়িতে রাত ন'টা সাড়ে ন'টার পরে বড়-একটা আলো জ্বলতে দেখা যেত না।

অর্থাৎ একেবারে ছকে-বাঁধা জীবন। সবটাই একেবারে মাপ-জোক করা। কোথাও এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নেই। ছকটা নড়ে যাওয়া মানেই গন্ডির বাইরে পা বাড়ানো। তার মানেই ঝুঁকি। তার মানেই বিপদের আশঙ্কা। সাধ করে যারা বিপদের পথে পা বাড়ায়, বুঝতে হবে যে, সুখে থাকতে তাদের ভূতে কিলোচ্ছে। বাজার আর বাড়ি, আপিস আর পাড়া, নিতান্ত এইটুকুর মধ্যে যে অনেকে আটকে থাকতে চায় না. এমন কী ভূতের কিল খেতে চায় বলেই যে অনেকে লক্ষ্মণের এই গন্ডির বাইরে ছুটে বেরোয়, এটা যে এঁরা আদৌ জানতেন না, তা নয়। জানতেন ঠিকই। এটাও জানতেন যে, চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত এই 'লক্ষ্মীছাড়াদের' দৌরাত্ম্য দিনে-দিনে বাড়ছেই। কিন্তু এ-সব ব্যাপার যে এঁদের চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করত, এমন মনে হয় না।

গান্ধীজির আন্দোলনও এঁদের নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রায় কোনও ব্যাঘাত ঘটায়নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার যখন লুণ্ঠিত হয়, আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। লবণ-সত্যাগ্রহও মোটামুটি ওই একই সময়ে হয়েছিল। বাড়িতে তাই নিয়ে প্রায় সারাক্ষণই উত্তেজিত কথাবার্তা চলত। আমাদের বাড়ির উপরে পুলিশের নজরদারির মাত্রাও এই সময়ে হঠাৎ বেড়ে যায়। বড়দের কথা শুনে মনে হত, বাবা যে-কোনও দিন গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু পুবের সন্ত্রাস আর পশ্চিমের সত্যাগ্রহ, এ দুয়ের কোনওটাই যে আপিসের বাবুদের কিছুমাত্র বিচলিত করেনি, ওই বয়সে সেটাও ঠিকই বুঝতে পারতুম। তাঁরা সেই যথাপূর্ব নির্বিকার। রকের আড্ডায় বসে ঠোঁট বেঁকিয়ে তাঁরা মন্তব্য করতেন, "আরে মোহাই, এই করে কি ওঁয়াদের তাড়ানো যাবে?" ওঁয়ারা মানে যে সাহেবরা, সেটা আর ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার নেই।

এরই মধ্যে বাবাকে একদিন কলেজ থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি বাড়ি ফিরলেন অনেক রাতে। আমরা ছোটরাও সেদিন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়িনি, আমাকে আর দিদিকে মা কয়েকবারই শুয়ে পড়তে বলেছিলেন বটে, কিন্তু কিছু-একটা ব্যাপার যে হয়েছে, সেটা টের পেতে আমাদেরও অসুবিধে হয়নি বলে বড়দের সঙ্গে আমরাও ঠায় জেগে বসে ছিলুম।

খেতে বসে বাবা বললেন, "ফিরতে এত রাত হল কেন, জিজ্ঞেস করলে না যে?"

মা বললেন, "জিজ্ঞেস করব কেন, তোমাকে যে লালবাজারে নিয়ে গিয়েছে, কলেজ থেকে ফিরে নরেনই তা জানিয়ে দিয়েছিল।" নরেন্দ্রনাথ আমার বড়কাকার নাম।

বাবা বললেন, "লালবাজার থেকে কলেজে ফিরেছিলুম। সেখান থেকে জনাকয় বন্ধুর বাড়িতে যাই। যা বুঝতে পারছি, আমাকে হয়তো বাইরে থাকতে দেবে না। তা-ই যদি হয় তো কলকাতার পাট তুলে দিতে হবে। নরেন, জ্ঞান, এরা সব মেসে থেকে পড়াশুনো করবে। লতু আর খোকাকে নিয়ে তুমি দেশের বাড়িতে বাবার কাছে চলে যেয়ো।"

মৃদু গলায় মা বললেন, "তা-ই হবে।"

লতু অর্থাৎ লতিকা আমার দিদির নাম। জ্ঞান আমার বাবার মামাতো ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। ভাল নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ। আমরা বলতুম জ্ঞানাকাকা। তিনিও তখন কলেজের ছাত্র। জ্ঞানাকাকা দেখতে যেমন সুন্দর ছিলেন, তেমন আবার তাঁর গায়েও ছিল হাতির বল। রোজ শেষ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে কল-বেরুনো এক বাটি ছোলা খেয়ে ছাতের উপরে উঠে ডন-বৈঠক দিতেন আর মুগুর ভাঁজতেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ছিল একেবারে পেটানো। সেই সঙ্গে সাহসও বড় কম ছিল না।

এই জ্ঞানাকাকা একদিন হঠাৎ একটা কান্ড বাধিয়ে বসলেন। বাবাকে ওই যে লালবাজারে নিয়ে ঘণ্টা কয়েক আটকে রাখা হয়েছিল, জ্ঞানাকাকা তাতে যে ভীষণ চটে গিয়েছিলেন, সেটা তখন বোঝা যায়নি, কেননা তিনি একটু চাপা-স্বভাবের মানুষ ছিলেন, খুব জরুরি দরকার ছাড়া

কারও সঙ্গে বড়-একটা কথাই বলতেন না। কিন্তু এরই দিন কয়েক বাদে হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ধর্মতলায় একজন কন্‌স্টেবলকে ধরে তিনি এমন পেটান যে, মার খেয়ে সে রাস্তার উপরেই অজ্ঞান হয়ে যায়। কলেজ থেকে সেদিনও তিনি যথাসময়ে বাড়ি ফিরেছিলেন এবং যথারীতি কাউকে কিছু বলেননি। পরের দিনও যথাসময়ে কলেজ গেলেন, ক্লাসও নাকি করেছিলেন, কিন্তু সেদিন আর বাড়ি ফিরলেন না। সারা রাত দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে কাটিয়ে সকালবেলা থেকেই আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে বাবা লোক পাঠাতে শুরু করলেন। কিন্তু না, জ্ঞানাকাকা সে-সব বাড়িতে যাননি। হাসপাতালে-হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া হতে থাকল। কিন্তু না, ওই নামের কোনও লোক যে সেখানে ভর্তি হয়েছে, এমন খবর কোনও হাসপাতাল থেকে পাওয়া গেল না।

খবর পাওয়া গেল দিন-তিনেক বাদে। জ্ঞানাকাকা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে পুলিশ-পেটানোর, তখনও পর্যন্ত তা আমরা জানি না। যদি না তিনি গ্রেপ্তার হতেন, তা হলে হয়তো অদ্যাবধি সেটা অজ্ঞাতই থেকে যেত। ওই যে বলেছি, বড্ড চাপা-স্বভাবের মানুষ ছিলেন আমাদের এই কাকাটি। তবে, পুলিশ ঠেঙিয়ে জেলে যাবার ফলে রাতারাতি যে তিনি আমার হিরো হয়ে যান, সেটাও ঠিক।

অন্যদিকে, আমাদের বাড়ির লোকজনদের সম্পর্কে পাড়ার অন্তত কিছু মানুষের সন্দেহ যে এই ঘটনার পরিণামে আরও বেড়ে যায়, সেটাও মিথ্যে নয়। বিশেষ করে যাঁরা আপিসের বাবু, পুলিশ পেটানোর এই ব্যাপারটাকে তাঁরা মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। রোয়াকের সান্ধ্য আড্ডায় যে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছি, সেটা তখনই বোঝা যেত, যখন দেখতুম যে, আমাদের বাড়ির কেউ কাছাকাছি এলেই আড্ডাধারীদের কথাবার্তা অমনি বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে আমাদেরও মাত্র একটা-তলায় আর কুলোচ্ছিল না। খোঁজখবর করে তাই একটা পুরো-বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওখান থেকে আমরা চলে আসি। এই নতুন বাসাবাড়িও তালতলা-পাড়াতেই। রাস্তার নাম ডক্টর লেন।

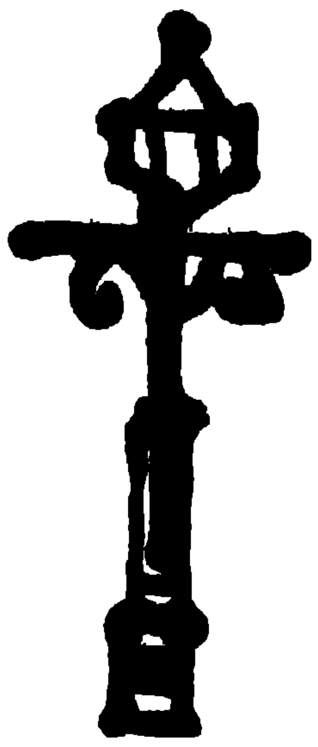

১৭

ডক্টর লেনের এই বাড়ির খোঁজ কে দিয়েছিলেন, জানি না, তবে বাড়িটা দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। ঘর যেমন একতলায় দু'খানা, তেমন দোতলাতেও দু'খানা, সেই সঙ্গে পুরো ছাত আর একটা চিলেকোঠা। তা ছাড়া একতলায় আর দোতলায় লাল শানের চওড়া দু'দুটো বারান্দাও ছিল। এই রাস্তাটাও বেরিয়েছে কর্পোরেশন স্ট্রিট থেকে। কাছেই তালতলা অ্যাভিনিউ, সেটা ধরে দু'পা হাঁটলে ধর্মতলা স্ট্রিটে পৌঁছনো যায়। ততদিনে আমাদের বাড়ির লোকসংখ্যাও কিছু বেড়েছে, দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় এসে গিয়েছেন কাকুন আর ছোটকাকা। কাকুন আই. এ. আর ছোটকাকা আই. এসসি. ক্লাসে ভর্তিও হয়েছেন, ফলে বাড়ি একেবারে জমজমাট। আসলে এই সব কারণেই দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের বাড়িতে আমাদের কুলোচ্ছিল না, জায়গা নিয়ে বড্ড টানাটানি হচ্ছিল। নতুন বাড়িতে এসে জায়গার সেই সমস্যা অনেকখানি মিটে যায়। ছাতটা ন্যাড়া বলে আমার সেখানে একা-একা যাবার অনুমতি ছিল না, তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝেমধ্যে যেতুম ঠিকই। তার পরিণাম খুব শুভ হয়নি। দু'দুবার ধরা পড়ে গিয়েছিলুম। প্রথমবার মায়ের হাতে ঠ্যাঙানি খাই, দ্বিতীয়বার ধরা পড়বার পরে ছাতের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তালার চাবি থাকত ছোটকাকার কাছে। ডক্টর লেনের বাড়িতে ঢুকেই চিলেকোঠার ঘরখানা তিনি দখল করে নিয়েছিলেন।

ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে নাম লিখিয়েছিলেন বলে ছোটকাকার পক্ষে ফোর্ট উইলিয়ামে ঢোকার অনুমতি জোগাড় করা কঠিন ছিল না। দুপুর একটার তোপ কোথায় পড়ে সেটা দেখবার জন্য বায়না ধরেছিলুম, তাই ফোর্টের ভিতর থেকে আমাকে একবার ঘুরিয়েও এনেছিলেন। কেল্লার ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে যাই। পরিখা আর প্রাকারের আড়ালে যে বলতে গেলে আস্ত একটা শহরই গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তা কল্পনাও করিনি। যা-কিছু দেখি, তাতেই চমক লাগে। তা প্রায় ঘণ্টা তিনেক সেদিন কেল্লার মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলুম।

ওই ডক্টর লেনে থাকতেই একদিন খুব একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। পাড়ায় কী একটা উপলক্ষে স্টেজ বেঁধে থিয়েটার হয়। তাতে পাড়ারই একটি অল্পবয়সী ছেলে ফিমেল-পার্ট করে খুব হাততালি পায়। সে যে ছেলে, অনেকে তা নাকি বুঝতেই পারেনি। বাড়িতে বিকেলের চায়ের আসরে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। মা বললেন, "শো শেষ হবার পরে বলল যে, ও আমাদের বাড়ির সামনের ওই মুদিখানার গোবিন্দ। শুনে তো আমি অবাক। শুধু তো গলাটা পালটায়নি, হাঁটাচলা, ধরনধারণ, সবই পালটে ফেলেছিল। কে বলবে যে, ও মেয়ে নয়।"

বড়কাকা বললেন, "এতে এত অবাক হবার কী আছে, ও আমিও পারি।"

তাতে মা বললেন, "বাজে বকিস না! তোদের যতসব বারফট্টাই। পারিস তো ওইরকম মেয়ে

সেজে হেঁটে-চলে দেখা তো।"

মেঝেয় বসে চা খাওয়া হচ্ছিল। ঠকাস করে চায়ের পেয়ালা-পিরিচ মেঝের উপরে নামিয়ে রেখে বড়কাকা তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "রাজি।" তারপর মায়ের কাছ থেকে এক প্রস্ত শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তাঁর পরনে তখন মেয়েদের পোশাক। মাথায় ঘোমটা টানা। তাই মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

মা, ছোটপিসি, দিদি আর আমি তো হেসে কুটিপাটি। হাসির দমক থামবার পরে মা বললেন, "এই পোশাকে তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবি?"

ঘোমটার আড়াল থেকে মিহি গলায় বড়কাকা বললেন, "পারলে কী হবে?"

"রাত্তিরে লুচি-মাংস খাওয়াব।"

বড়কাকা তাতে রাজি নন। বললেন, "সে তো সবাই খাবে, তাতে আমার লাভ কী। আলাদা করে আমাকে পাঁচটা টাকা দাও তো এক্ষুনি ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে ঘুরে আসব।"

মা তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। তবে বড়কাকা সত্যিই ওই পর্যন্ত যাবেন কি না, সে বিষয়ে বোধ করি তাঁর কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল, তাই বললেন, "খোকাকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

পোশাক পালটানো যত সহজ, গলার স্বর পালটানো যে তত সহজ নয়, বড়কাকা সেটা বিলক্ষণ জানতেন। এই কারণে তাঁর নিশ্চয় ভয় ছিল যে, রাস্তায় বেরিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তিনি ধরা পড়ে যাবেন। কিন্তু মুখে তো আর তা স্বীকার করা যায় না। তাই রাস্তায় নেমেই নিচু গলায় আমাকে বললেন, "দ্যাখ, একটা কথা মনে রাখবি, ভদ্রঘরের মেয়ে-বউরা কখনও বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলে না। যা বলবার তা তুই-ই বলবি। তবে কী বলবি, তা তোকে আমি শিখিয়ে দেব।"

মা বলেছিলেন, রুপোর তবকে মোড়া জর্দা-পান কিনে আনতে হবে। ও বস্তু গলির দোকানে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা যে বড়রাস্তা অব্দি গিয়েছিলুম, ওইটেই হবে তার প্রমাণ।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমার বুক দুরদুর করতে শুরু করেছিল। খালি ভাবছিলুম যে, বড়কাকা নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবেন। কলকাতায় তখন ছেলেধরার খুব হুজুগ চলছিল। মিথ্যা সন্দেহে মারও খাচ্ছিল অনেকে। তাই ভয় হচ্ছিল যে, ছেলেধরা হিসেবে মার খাওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। আমি অবশ্য বলব যে, না, উনি ছেলেধবা নন, আমার কাকা, মজা করবার জন্যে মেয়ে সেজে রাস্তায় বেরিয়েছেন, কিন্তু তা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? যদি আমাকেও সবাই ছেলেধরার শাকরেদ ভেবে নেয়? সে-সব অবশ্য কিছুই হল না। কেউ একবার আমাদের দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকাল না। হাঁটতে হাঁটতে কর্পোরেশন স্ট্রিটে পৌঁছে তারপর তালতলা অ্যাভিনিউ ধরে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যন্ত চলে গেলুম। মোড়ের মাথায় অ্যাডভান্স অফিসের কাছাকাছি এক হিন্দুস্থানী পানওয়ালার দোকান থেকে, বড় কাকার শেখানো কথামতো, রুপোর তবকে মোড়া মঘাই পানও কিনলুম এক দোনা।

কিন্তু তাতেই হল মুশকিল। সবকিছু এত সহজে হয়ে যাওয়াতেই বোধহয় বড়কাকার একটু 'ফিলিং' এসে গিয়ে থাকবে। পান কেনা হয়ে গিয়েছে, মানে-মানে এবারে বাড়ির পথ ধরলেই হয়। তা তিনি ধরলেন না। বললেন, "চল্, আর-একটু ঘুরে আসি।" আর-একটু ঘোরা মানে যে কখনও ট্রামে আর কখনও বাসে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হরেক তল্লাটে ঘুরে বেড়ানো, তখন তো আর তা জানতুম না, জানলে নিশ্চয় ঘাবড়ে যেতুম। বিকেল চারটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, ফিরতে-ফিতে সাড়ে-সাতটা। ফিরে দেখি, মা ছোটপিসি আর দিদি একেবারে শুকনো মুখে বসে আছেন। আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তাঁরা।

মায়ের হাতে পানের দোনা ধরিয়ে দিয়ে বড়কাকা বললেন, "কই বউদি, বাজির টাকাটা দাও।"

মা বললেন, "তা দিচ্ছি, কিন্তু তোর কি কখনও আক্কেল হবে না? কোথায় গিয়েছিলি বল তো?"

"সে তোমার ছেলেকেই জিজ্ঞেস করো।"

আমি বললুম "ট্রামে উঠেছি, বাসে উঠেছি, বড়কাকা একটা দোকানে ঢুকে চা খেয়েছে, আমি বিস্কুট খেয়েছি, তারপর একটা নদী পার হয়েছি, রেলগাড়ি দেখেছি..."

দিদি বলল, "উরেব্বাবা!"

মা বললেন, "রেলগাড়ি দেখেছিস মানে শেয়ালদা অব্দি গিয়েছিলি, কেমন?"

বড়কাকা বললেন, "তা হলে আর নদী পার হতে হবে কেন? আমরা হাওড়া ইস্টিশানে গিয়েছিলুম। সঙ্গে যদি পয়সা-কড়ি থাকত, তা হলে তো লেডিজ কম্পার্টমেন্টে উঠে এই পোশাকে বর্ধমান থেকেও ঘুরে আসা যেত।"

এরপরে মা আর একটা কথাও বলেননি। ওই যাকে 'বাক্যি হরে যাওয়া' বলে, বড়কাকার কথা শুনে মায়ের সম্ভবত সেটাই হয়ে থাকবে।

গঙ্গা যে এই প্রথম পেরিয়েছিলুম, তা অবশ্য নয়। এর আগেই তো হাওড়া থেকে রেলগাড়িতে উঠে দেওঘরে আর পুরীতে যাই। তার মানে এর আগেও দু'দুবার গঙ্গা পেরোবার দরকার হয়েছিল। এখন যার নাম রবীন্দ্র-সেতু, গঙ্গার উপরে সেই ক্লিভল্যান্ড ব্রিজ তখনও তৈরি হয়নি। মোটামুটি ওইখানেই জলের উপবে ভাসমান গুচ্ছের গাদাবোট জোড়া দিয়ে দিয়ে বানানো একটা পন্টুন ব্রিজ ছিল। গাড়ি ঘোড়া মানুষজন ইত্যাদি সবই তার উপর দিয়ে নদী পারাপার করত। নৌকো লঞ্চ ইস্টিমার ইত্যাদি যাতে জলের উপর দিয়ে উত্তরে-দক্ষিণে যাতায়াত করতে পারে, তার জন্যে পন্টুন ব্রিজের মাঝ-বরাবর দু-একটা গাদাবোট মাঝে-মাঝে সরিয়ে নেওয়া হত, বাস্, জলপথও অমনি মুক্ত হয়ে গেল, ব্রিজের বাধাটা আর রইল না। তবে হ্যাঁ, হাওড়া থেকে নিত্য যাঁরা কলকাতার হরেক আপিসে কাজ করতে আসতেন, কিংবা কলকাতা থেকে কর্মসূত্রে নিত্য যাঁদের যেতে হত হাওড়ায়, যেমন তাঁদের, তেমন আবার নদী পেরিয়ে হাওড়া ইস্টিশন থেকে যারা রেলগাড়িতে চাপবেন, সকালবেলায় খবরের কাগজ খুলে তাঁদেরও দেখে নিতে হত যে, পন্টুন ব্রিজ কখন খোলা থাকবে আর কখন বন্ধ হবে। দিন-পঞ্জি, আবহ-বার্তা, সোনারুপোর দর ইত্যাদির মতন পন্টুন ব্রিজ খোলা-বন্ধের সময়ও তখন কাগজে নিত্য ছাপা হত।

যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি অক্টারলোনি মনুমেন্ট, তেমন ক্লিভল্যান্ড ব্রিজও আজকাল কলকাতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই ব্রিজটা আরও কয়েক বছর পরের ব্যাপার। উপর দিয়ে ট্রাম-বাস চলছে আর নীচ দিয়ে চলছে জাহাজ, বিশের দশকের শেষের দিকে তো বটেই, তিরিশের দশকের গোড়ার দিকেও এমন কথা ভাবা যেত না। তারপর যখন দেখা গেল, নদীর মধ্যে পিলার না-গেঁথেই বানানো হয়েছে এই ঝুলন্ত সেতু, তখন আবার অনেকের মনে এই ভয় ঢুকল যে, গাড়িঘোড়া আর মানুষজনের চাপে ব্রিজটা না হঠাৎ হুড়মুড় করে মাঝগঙ্গায় ভেঙে পড়ে। এটাও মনে পড়ে যে, এই নিয়ে তখন কিছু-কিছু পদ্যও লেখা হয়েছিল। তার সবই যে হুজুগে লোকদের লেখা, সে-কথা না-বললেও চলে।

কলকাতায় এখন আমরা যে-আকারের ট্যাক্সি দেখি, এটা মোটামুটি বছর-চল্লিশেক আগে চালু হয়। সূচনায় একে বেবি-ট্যাক্সি বলা হত। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বিশ তিরিশ আর চল্লিশের দশকে কলকাতায় যে ট্যাক্সি চলত, আকারে-আয়তনে তা এর থেকে অনেক বড় ছিল। সত্যি বলতে কী, তার কোনওটাই এ-কালের কনটেসা কি স্ট্যান্ডার্ড টু থাউজেন্ডের চেয়ে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে

কিছু ছোট ছিল না। সবই বিদেশি গাড়ি। প্লাইমাথ, ডজ, পন্টিয়াক, শেভ্রোলে। মধ্যবিত্ত মানুষরা ট্যাক্সিতে বিশেষ চড়তেন না। ভাড়ায় খুব যে ইতর-বিশেষ হত, তা নয়, তবু সপরিবার কোথাও যেতে হলে ঘোড়ার গাড়িতেই তাঁরা স্বস্তিবোধ করতেন।

ঘোড়ার গাড়ির জগতেও অবশ্য একটা কাস্ট-সিস্টেম বা বর্ণভেদ প্রথা চালু ছিল। ব্রুহাম, ল্যান্ডো আর ভিক্টোরিয়া ছিল বড়লোকদের নিজস্ব ঘোড়া-গাড়ি। আর ভাড়ার গাড়ি বলতে ছিল ফিটন আর ছ্যাকড়া। ফিটন হচ্ছে নেহাতই হাওয়া খাওয়ার গাড়ি। রিকশার ছাউনির মতো ফিটনেরও একটা ছাউনি থাকত। সেটাকে পিছন থেকে তুলেও আনা যেত মাথার উপরে। তবে কিনা পাকাপোক্ত ছাত নেই বলে তাতে মালপত্র বিশেষ নেওয়া চলত না। মালপত্র নেবার সুবিধে ছিল ছ্যাকড়া গাড়িতে। দেখতে অনেকটা যেন চার-চাকার উপরে বসানো পালকির মতো। কেউ-কেউ যে পালকি-গাড়ি বলতেন না, তাও নয়। ভিতরে মুখোমুখি দু-সারি বসবার জায়গা, এক-এক দিকে দু'জন করে বসা যায়। জানলা খোলা-বন্ধ করা যায় দরকার-মতো। মাথার উপরে মোটামুটি সমতল কাঠের ছাত। তার উপরে যত খুশি বাক্স-বেডিং চাপিয়ে দাও, তারপর চলো শেয়ালদা কিংবা হাওড়া ইস্টিশানে।

কোথাও যেতে হলে সাধারণত এই পালকি-গাড়িই আমরা ভাড়া করতুম। সবাই মিলে যখন কোথাও যাওয়া হত, তখন একটা গাড়িতে অনেক সময় কুলোত না, দুটো ছ্যাকড়ার দরকার হত। ছাতের সামনের যে জায়গাটায় হপ্‌টি হাতে কোচোয়ান বসে, তার পাশের জায়গাটাতে বসবার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যেতুম। সেই বয়সে মনে হত যে, এর চেয়ে বড় সম্মান কিংবা গৌরবের ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

ঘোড়ার গাড়ির পিছনে একটা পা-দানি থাকত। বড়লোকদের গাড়ি হলে সেই পা-দানিতে দাঁড়িয়ে থাকত তাদের উর্দি-পরা পাইক কিংবা বরকন্দাজ। উর্দির উপরে চওড়া যে পট্টিটা বাঁ-কাঁধ থেকে কোমরের ডান দিক অব্দি পৈতের মতন নেমে আসত, তাতে লাগানো থাকত ঝকঝকে পেতলের চাকতি। ল্যান্ডো কি ব্রুহামের পিছনের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে তারা চেঁচাতে থাকত: হট্ যাও, হট্ যাও। উনিশ শতকের খোয়ারি ভাঙার পর্ব তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

ছ্যাকড়াগাড়ির পিছনের ওই জায়গাটাতে সাধারণত দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত ঘোড়ার খাদ্য ঘাস-বিচালির বস্তা। পাড়ায় কোনও ছ্যাকড়া গাড়ি এসে ঢুকলেই বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা অনেক সময় চুপিসাড়ে ওখানে গিয়ে বসে পড়ত। ওই বয়সের পক্ষে এটাই ছিল একটা দুঃসাহসের কাজ, তার কারণ কোচোয়ান যদি টের পেত যে, গাড়ির পিছনে বসে কেউ 'ফ্রি রাইড' নিচ্ছে, তা হলে সে নিজের জায়গা ছেড়ে নিঃশব্দে ছাতের উপরে উঠে এসে গাড়ির পিছনে হপ্‌টি চালাতে কসুর করত না।

বড়লোকরা যে মোটরগাড়ি চড়তেন না, তা নয়। মরিস, অস্টিন, স্ট্যান্ডার্ড, ওল্ড্‌সমোবাইল, ফোর্ড, হিলম্যান ইত্যাদি হরেক রকমের প্রাইভেট কারে তাঁরা চড়তেন। প্রায় সব গাড়িরই ছোট-বড়-মাঝারি ইত্যাদি নানা রকমফেরও তখন দেখেছি। মরিস কোম্পানির যেমন ছিল একটু ছোট মাপের মরিস টিউডর, কি তার চেয়েও ছোট মরিস মাইনর, অস্টিনেরও তেমন ছিল খুদে সংস্করণ বেবি অস্টিন। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়বার পরে তাঁর যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটা ফ্যামিলি অস্টিন কেনা হয়। সে ছিল ঢাউস মাপের গাড়ি। ড্রাইভারের সিটের পিছনে তাতে বাড়তি এক-থাক আসন ছিল। সব মিলিয়ে তিন-থাক আসনের ব্যবস্থা। তেল খেত রাক্ষসের মতো। যুদ্ধের বাজারে তেল ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। চালু হল তেলের কুপন সিস্টেম। কুপনে যে তেল পাওয়া যেত, আমাদের জাহাজ-মার্কা গাড়ি তাতে হপ্তায় দু'দিনের বেশি চালানো যেত

না। অগত্যা সেটা বেচে দিতে হয়। তাই নিয়ে আমরা দুঃখ করিনি। বরং মনে হয়েছিল, গলায় বাঁধা পাথরটা যেন নামিয়ে রাখা গেল। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম।

যাঁরা বনেদি বড়লোক, মোটরগাড়ি তাঁরা বিশেষ পছন্দও করতেন না। ল্যান্ডো, ব্রুহাম ইত্যাদি সব অশ্ববাহিত যানই ছিল তাঁদের পছন্দ। যেন ওসব গাড়ির গায়ে একটা আলাদা রকমের আভিজাত্যের লেবেল আঁটা রয়েছে। এটা যে একেবারেই মন-গড়া একটা ব্যাপার, তাও হয়তো নয়।

বড়রাস্তার ধারে ফুটপাতের উপরে, বসানো থাকত জল-ভর্তি লোহার ট্রফ। ঘোড়ারও জলতেষ্টা পায়। তাই এই চৌবাচ্চার ব্যবস্থা। এখনও এই শহরে হঠাৎ-হঠাৎ এক-আধটা ছ্যাকড়া গাড়ি দেখতে পাই। বিশেষ করে ছট্‌ পুজোর সময় মাঝে-মাঝে দেখি যে, ছ্যাকড়া গাড়িতে গাদাগাদি করে বসে পশ্চিমা তীর্থযাত্রীরা গান গাইতে গাইতে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলেছে। কিন্তু একমাত্র রাজাবাজার ছাড়া রাস্তার ধারের সেই লোহার চৌবাচ্চাগুলো আর চোখে পড়ে না। পুরসভার কর্তারা সম্ভবত সেগুলো কালোয়ারদের কাছ বেচে দিয়েছেন। লোপাট হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

আমার ছোট ভাই হীরেন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয়, তখনও আমরা তালতলা-পাড়া থেকে উঠে আসিনি। হীরেন্দ্রর ডাকনাম মণ্টু। তার জন্ম চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। বাড়ির বাইরে অর্থাৎ হাসপাতালে কি নার্সিংহোমে জন্মলাভের ঘটনা আমাদের পরিবারে সেই প্রথম ঘটল। যেমন আমার দুই দিদি, তেমন আমিও ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম আমাদের গাঁয়ের বাড়ির আঁতুড়ঘরে। ডাক্তার ডাকা হয়নি, ডাকবার দরকার আছে বলেও সেকালে কেউ মনে করতেন না, প্রসূতিকে সাহায্য করবার জন্য একজন দাই যে রয়েছে, এটাকেই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হত। আমার ক্ষেত্রে যিনি দাই-মা'র কাজ করেছিলেন, তিনি পাশের গাঁয়ের এক বৃদ্ধা। সবাই তাঁকে ধরণী-বুড়ি বলত। স্প্রিংয়ের মতন পাকানো একমাথা ধবধবে সাদা চুল, মুখে অসংখ্য বলিরেখা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণা সেই মহিলাকে আমি যতই ভালবাসি না কেন, কিছুতেই তিনি আমাকে তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে দিতে চাইতেন না। বলতেন, "ও দাদা, আমাকে ছুঁতে নেই।"

জিজ্ঞেস করতুম, "কেন, ছুঁলে কী হয়?"

"তাও জানো না? ও আমার পোড়া কপাল! আমরা ছোট জাত, আমাদের ছুঁলে চান করতে হয়।"

আমি ও-সব মানতুম না, দাই-মা এলেই লাফিয়ে গিয়ে তাঁর কোলে উঠে পড়তুম। তার জন্যে আমাকে কখনও চান করতে হয়নি। পাড়া-পড়শিদের মধ্যে কেউ-কেউ এটা খুব ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁদেরই একজন মৃদু গলায় একবার এই নিয়ে আপত্তিও তোলেন। তাতে মা বলেছিলেন, "খোকার যখন জন্ম হয়, আমি তো তখন আঁতুড়ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলুম। ধরণীই প্রথম ওকে কোলে নিয়েছিল। সেই মানুষকে ছুঁয়ে যদি আজ ওকে চান করতে হয় তো আমাকে ছুঁলেও ওকে চান করতে হবে।"

মা একেবারে সার-কথাটাই সেদিন বলেছিলেন। যাঁর কোলে উঠে এই পৃথিবীর আলো আমি প্রথম দেখি, সে যদি অস্পৃশ্য হয়, তো স্পৃশ্য কে? পোড়া-সমাজের পাপ তো নেহাত কম জমেনি, তার সবই এবারে একে-একে ক্ষালন করতে হবে।

বাড়িতে না-জন্মে মণ্টু যে হাসপাতালে জন্মাল, তখন না-বুঝলেও এখন বুঝতে পারি যে, এটাও আসলে সামাজিক পরিবর্তনেরই একটা বার্তা বয়ে এনেছিল। বিত্তবানদের তো কথাই ওঠে না। মাঝারি বিত্তের মানুষরাও সেই সময়ে হাসপাতালের ছায়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। এর মূলে ছিল 'ছত্রিশ জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি'র ভয়। পল্লী-অঞ্চলে হাসপাতাল বলে কিছু ছিলই না। যেখানে

ছিল, সেই শহরাঞ্চলেরও বিস্তর বাড়িতে কিন্তু মিডউইফ্রি পাশ করা কিংবা না-করা দাইদের ডেকে এনে সন্তান-প্রসবের ব্যবস্থা করা হত। হাসপাতাল সম্পর্কে এখন যে ভয় দেখি, সেটা অন্যরকমের ভয়। নামে যা-ই হোক, কার্যত যা নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে যেতে হবে শুনলে আঁতকে ওঠাই তো স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের ধারণা, ওখানে গেলে আর সুস্থ হয়ে ফিরতে হবে না, বেঘোরে মারা পড়তে হবে।

মন্টুকে কোলে করে মা যেদিন বাড়িতে ফিরলেন, গোটা বাড়ি সেদিন যেন হেসে উঠেছিল। ফুটফুটে একরত্তি একটা বাচ্চা, কখনও কাঁদে, কখনও হাত-পা ছোড়ে, তুলতুলে গা-হাত-পা, যত দেখি, তত অবাক হই। কোলে নিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মা আমাকে কোলে নিতে দেন না, বলেন, "ফেলে দিবি।"

ফেলে না-দিলেও একদিন একটা দুর্ঘটনা প্রায় বাধিয়ে বসেছিলুম। ঠাণ্ডা লেগে মন্টুর সর্দি হয়েছিল, বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় করে শব্দ হচ্ছিল। তাতে আমি ভাবলুম, সর্দি লেগে নাক বন্ধ হয়ে গেলে একটা শিশি থেকে বাবা তো নাকের মধ্যে দু'চার ফোঁটা ওষুধ দেন, সেটা যদি মন্টুকে দিই তো ওর সর্দি নিশ্চয় সেরে যাবে। ভাগ্যিস দিতে পারিনি। মন্টুকে দোলনায় শুইয়ে, আমাকে পাহারায় রেখে, মা গেছেন স্নান করতে, সেই ফাঁকে বাবার টেবিলের টানা থেকে ওষুধটা বার করে সবে মন্টুর নাকে সেটা ঢালতে যাচ্ছি, এমন সময় ব্যাপারটা ছোটকাকার চোখে পড়ে যায়। বারান্দা থেকে তক্ষুনি ঘরে ঢুকে আমার হাত থেকে ওষুধের শিশি কেড়ে নিয়ে তিনি বলেন, "ও কী করতে যাচ্ছিলি? ও কি বাচ্চাদের ওষুধ? ওই ওষুধ নাকে ঢুকলে আর দেখতে হত না।"

এর থেকে যে শিক্ষা নিয়েছি, সেটা এই যে, ভাল কাজ করবার ইচ্ছা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সেটা করবার যোগ্যতাও থাকা চাই। দুই শিশুপুত্রের যাঁরা জননী, এই ঘটনা থেকে তাঁদেরও একটা শিক্ষা নেবার রয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স যদি হয় নেহাতই ছ'বছর, তা হলে তাকে দু-এক মাসের শিশুপুত্রটির পাহারায় রেখে স্নান করতে না যাওয়াই ভাল। গেলে একটা বিপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

২০

মাকে যখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে পাঠানো হয়, সংসারের হাল ধরবার জন্য রাজবাড়ি থেকে আমার বড়মামিমাকে তখন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সাংসারিক কাজেকর্মে আমার এই বড়মামি ছিলেন দারুণ দক্ষ। শৈশবে মাতৃহারা তাঁর ননদটিকে খুব স্নেহ করতেন। আমাদেরও ভালবাসতেন খুব। তা ছাড়া, যেমন জমিয়ে গল্প করতে পারতেন, হাস্য-পরিহাসেও তেমন তাঁর জুড়ি ছিল

না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁরই জন্যে ডক্টর লেনের ওই চমৎকার বাড়িটা আমাদের ছেড়ে আসতে হল।

মা তার কিছুদিন আগে হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন। বড়মামিও উতলা হয়ে উঠেছেন রাজবাড়িতে ফেরার জন্যে। কিন্তু মা তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। বড়মামি যত বলেন, "বুড়ি, এবার আমায় ছেড়ে দে," মা তত বলেন, "ওরেব্বাবা, তাই কখনও হয় নাকি? আমি যদি এখন গিয়ে হেঁশেলে ঢুকি, তো বাচ্চাটাকে কে সামলাবে?"

দেখতে-দেখতে অঘ্রান গিয়ে পৌষ এসে পড়ল। ফলে মা'ও পালটে ফেললেন তাঁর যুক্তি। পৌষমাসে নাকি ঠাঁইনাড়া হতে নেই, তাতে গেরস্তের অকল্যাণ হয়। "পৌষমাসটা কাটুক বৌদি, যেতে হয় তো তার পরে যেয়ো। নরেন রয়েছে, সুধা রয়েছে, ফণী রয়েছে, ওরাই কেউ রাজবাড়িতে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। বড়মামি অতএব রয়ে গেলেন। আমরাও তাতে দারুণ খুশি।

সেই সময়ে একদিন সন্ধেবেলায় বড়মামির কাছে বসে গল্প শুনছি, হঠাৎ মা বললেন, "ওই যা, বড্ড ভুল হয়ে গেছে!"

ভুলটা আর কিছুই নয়, জামাকাপড় কেচে রোজকার মতো সেদিনও ছাতে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাছে হিম পড়ে সব আবার ভিজে যায়, তাই বিকেলবেলা সেগুলা তুলে আনবার কথা, কিন্তু সেদিন তা আর তোলা হয়নি। মায়ের সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন, "বউদি, কাউকে সঙ্গে নিয়ে তুমি ওগুলো ছাত থেকে নামিয়ে আনো।"

বড়মামি বললেন, "সঙ্গে আবার কে যাবে, আমি একাই যেতে পারব।"

বলে আমাদের বসিয়ে রেখে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ছাতের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন বটে, কিন্তু তার মিনিট খানেক বাদেই যখন আবার দুদ্দাড় কবে নেমে এলেন, তখন তাঁর মুখচোখের চেহারা একেবারে অন্যরকম।

মা বললেন, "কী হল বউদি?"

খানিকক্ষণ বড়মামি কোনও কথাই বললেন না। তরপর একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, "বুড়ি, এই বাড়িটা তোরা ছেড়ে দে।"

কেন, এ তো দিব্যি বাড়ি, এসেছিও এই সেদিন মাত্র, এরই মধ্যে এ-বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা উঠছে কেন? কারণ হিসেবে বড়মামি যা বললেন, তাতে তো আমরা ভয়ে কাঁটা। বাড়ির পুবদিকে যে মস্ত নিমগাছটা রয়েছে, আর যার একটা ডাল এসে পড়েছে আমাদের ছাতের উপরে, সেই গাছে নাকি সাদা কাপড় পরা একটা লোক বসে ছিল।

মা বললেন, "যাঃ, নিশ্চয় তোমার দেখার ভুল! কোনও বাড়ির ছাত থেকে কারও কাপড় কি শাড়ি উড়ে এসে ওই গাছের ডালে জড়িয়ে রয়েছে, আর তাকেই তুমি মানুষ ভেবে বসে আছ!"

বড়মামি বললেন, "ওরে বুড়ি, এটা চোখের ভুল নয়। আমি যা দেখেছি, ঠিকই দেখেছি।"

একটু বাদে কাকারা বাড়ি ফিরলেন। বড়মামির কথা শুনে তাঁরা তো হেসেই অস্থির। বাবা বাড়ি ফেরার পর তাঁকেও সব বলা হল। তিনি হাসলেন না। শুধু বললেন, "মনে হচ্ছে, ভয় দেখিয়ে কেউ আমাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে।"

কাকারা বললেন, "তাতে কার কী লাভ?"

বাবা বললেন, "সেটা বুঝলে তো সমস্যা মিটেই যেত। শুনেছি আমরা এসে ঢুকবার আগে অনেকদিন এই বাড়িটা খালি পড়ে ছিল। অথচ এত সুন্দর খোলামেলা বাড়ি, এ তো খালি পড়ে থাকবার কথা নয়।"

বড়কাকা ইতিমধ্যে একটা টর্চ নিয়ে ছাত থেকে ঘুরে এসেছিলেন। তিনি বললেন, "কই বউদি, কিছুই তো নেই। ভেবেছিলুম তোমার কথাই ঠিক। গাছের ডালে নিশ্চয় শাড়ি কি ধুতি উড়ে এসে পড়েছে। কিন্তু তাও তো দেখলুম না।"

বড়মামি বললেন, "ও-সব নয়, মানুষই ছিল। এ আমি স্পষ্ট দেখেছি। তবে হ্যাঁ, বললুম তো মানুষ, কিন্তু ভরসন্ধেয় একটা মানুষ যে কেন নিমগাছের ডালে বসে পা দোলাবে, সে তোমরা বোঝো। মোট কথা, আমি আর এ-বাড়িতে থাকছি না। ওরে বুড়ি, হয় এ-বাড়ি ছাড়, আর নয়তো জামাইকে বলে তুই কালই আমাকে রাজবাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দে।"

বাবা বললেন, "বড় মুশকিলে ফেললেন দেখছি। এই টাকায় এমন বাড়ি এখন আমি কোথায় পাব ?"

মা বললেন, "পেতেই হবে, তা ছাড়া আর উপায় কী। বউদি চলে গেলে এই দুধের বাচ্চা নিয়ে একা আমি সংসার সামলাতে পারব না।"

বাড়িটা অগত্যা ছাড়তেই হল। সেই সঙ্গে পালটাতে হল পাড়া। তালতলা-পাড়া ছেড়ে চলে আসবার ইচ্ছে অবশ্য মায়েরও ছিল না, কিন্তু কী আর করা যাবে, ধারেকাছে যে-সব বাড়ির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল, তার সবই দু-তিন ভাড়াটের বাড়ি, এদিকে পুরো বাড়ি নিয়ে থাকলে যেহেতু অনেক স্বাধীনভাবে থাকা যায়, মা তাই সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পুরো বাড়িই তাঁর চাই। ফলে, তালতলা থেকে আমরা শেয়ালদার কাছে চাঁপাতলায় উঠে এলুম।

বাড়ির মালিকরা কলকাতার বনেদি বড়লোক, নিজেরা থাকেন শহরের অন্য এলাকায়, মধ্য-কলকাতার এই বাড়িখানা তাঁরা স্রেফ ভাড়া দেবার জন্যেই তৈরি করিয়েছেন। মাঘ মাসে আমরা যখন সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকি, মিস্ত্রি-মজুরের কাজ তখন সদ্য শেষ হয়েছে, তবে টাটকা চুনকামের যে একটা গন্ধ থাকে, সেটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। তা ছাড়া ইলেকট্রিকের কানেকশন তখনও মেলেনি বলে চাঁপাতলার সেই বাড়িতে আমাদের প্রথম দু-তিনটে রাত লণ্ঠন জ্বেলে কাটাতে হয়েছিল। পাঁজি না দেখে পুরনো আস্তানা ছাড়বার কি নতুন আস্তানায় ঢুকবার কথা তখন কল্পনাও করা যেত না। দিনমানে ভাল সময় ছিল না বলে সন্ধে লাগবার খানিক বাদে ছ্যাকড়া-গাড়িতে করে আমরা তালতলা থেকে চাঁপাতলায় চলে আসি; ঠেলাগাড়ি বোঝাই মালপত্র নিয়ে কাকারা। অবশ্য দুপুরবেলাতেই সেখানে এসে গিয়েছিলেন। সে-রাত্তিরে মা আর রান্নাবান্না করেননি। কাছেই সুরভি ভাণ্ডার। বাবা সেখান থেকে দিস্তে কয়েক লুচি ভাজিয়ে এনেছিলেন। সঙ্গে ছিল মস্ত এক চ্যাঙাড়ি সন্দেশ। ভাতের জন্যে বায়না তুলে সেই গৃহপ্রবেশের রাত্তিরেই যে মায়ের কাছে আমি মার খেয়েছিলুম, তাও স্পষ্ট মনে পড়ে।

১৯৩১ সালের গোড়ায় এই যে নতুন বাড়িতে এসে উঠলুম, এখানেই আমার গোটা ছাত্রজীবন তো বটেই, কর্মজীবনেরও প্রথম কয়েকটা বছর কেটেছে। এই বাড়িতেই মারা যান আমার বাবা। আবার মৃত্যুশোকের পাশাপাশি অনেক উৎসব আর আনন্দের ঘটনাও এই বাড়িতেই ঘটেছে। তারই মধ্যে দিয়ে আমরা ক'ভাইবোন এখানে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠি। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, সেই মিন্টুরও জন্ম হয়েছিল আমরা এই চাঁপাতলায় থাকতেই।

চাঁপাতলার এই বাড়িটা ছিল তিনতলা। একতলায় তিনটে, দোতলায় তিনটে আর তিনতলায় একটা, সব মিলিয়ে সাতটা ঘর। তিনতলার ঘরটার দু'পাশে ছাত। তা ছাড়া তিনতলাতেই ছিল একটা লফ্‌ট। আকারে সেটা এত বড় যে, আমরা সেটাকে সাড়ে-তিনতলা বলতুম। লফ্‌টে সাধারণত অদরকারি জিনিসপত্র রাখা হয়, কিন্তু বাসা-বদলের সঙ্গে-সঙ্গে নিকট ও দূর সম্পর্কের এত সব আত্মীয় আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকে পড়েন যে, জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে, সেই

লফ্‌টও ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তাতে জায়গা ছিল অনেকখানি, কিন্তু দাঁড়াবার উপায় ছিল না, দাঁড়াতে গেলেই মাথায় খেতে হত সিলিংয়ের ঠোক্কর। সিঁড়ি ছিল না বলে, রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে, লফ্‌টের উপরে হাতের ভর রেখে একটু বিপজ্জনকভাবে ঝুল খেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়তে হত। ছেলেবেলায় অনেক সময় দুষ্টুমি করে মায়ের হাতে মার খাবার ভয়ে আমি সাড়ে-তিনতলায় গিয়ে ঢুকে পড়তুম। মা নীচে দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন করতেন; বলতেন, 'নেমে আয় বলছি, ভাল চাস তো এক্ষুনি নেমে আয়।' কিন্তু যতক্ষণ না মায়ের রাগ পড়ছে, ততক্ষণ আমি নামতুম না। ভাগ্যিস মা কখনও ছুতোর মিস্ত্রি ডাকিয়ে একটা কাঠের সিঁড়ি বানিয়ে নেবার কথা ভাবেননি। তা যদি ভাবতেন, তা হলে ওই পালিয়ে বাঁচবার পথটা কবেই বন্ধ হয়ে যেত।

তালতলা-পাড়ায় থাকতেই দিদির ইস্কুল একবার পালটাতে হয়েছিল। মেয়েদের যে প্রাইমারি ইস্কুলে সে পড়ত, আমাকেও যে সেখানে ঢোকাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। দরোয়ানের হাত কামড়ে আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসি। ইস্কুলটা যে খুব ভাল ছিল, তাও বলা চলে না। ফলে, দিদিকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পুব দিকে লি মেমোরিয়াল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এটাও ছিল আমাদের ডক্টর লেনের বাড়ির খুব কাছেই। কিন্তু তালতলা-পাড়া ছেড়ে আসায় আবার তার ইস্কুল পালটাবার দরকার হল। এবারে তাকে ভর্তি করা হল ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশানে। আমাদের নতুন বাসা থেকে এটা খুব দূরে নয় বটে, তবে খুব কাছেও নয়। অগত্যা ব্যবস্থা করতে হল মাসকাবারি রিকশার। রিকশাওয়ালা তাকে ইস্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসবে, আবার ইস্কুলে ছুটি হলে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

আমাকে তখনও ইস্কুল ভর্তি করা হয়নি। মা তাই নিয়ে বাবাকে মাঝে-মাঝে তাড়া লাগাতেন। তাতে বাবা বলতেন, "আহা, এত ব্যস্ত হবার কী আছে? ভর্তি একদিন করে দিলেই তো হল।"

মা বলতেন, "কবে আর ভর্তি করবে? ওর বয়েস যে গত কার্তিক মাসেই ছয় পূর্ণ হয়েছে, সেটা ভুলে যাওনি তো?"

বাবা বলতেন, "ছয় পূর্ণ হয়েছে তো কী হয়েছে? ইস্কুল তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এর মধ্যে একদিন কাউকে দিয়ে ইশকুলে পাঠিয়ে দিলেই হবে। হেড মাস্টারমশাইকে আমি বলে রাখব। ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।"

কিন্তু সেই বলাটাই আর হচ্ছিল না। ফলে, আমিও মনের আনন্দে বড়কাকার কাছ থেকে তালিম নিয়ে লাট্টু ঘুরিয়ে আর ঘুড়ি উড়িয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম। লেত্তিতে পাক দিয়ে লাট্টুটাকে ছেড়ে দিয়ে সেটা মাটি ছোঁবার আগেই আবার শূন্য থেকে সেই ঘুরন্ত লাট্টুকে হাতের তেলোয় ফিরিয়ে আনবার বিদ্যায় তখন আমি যৎপরোনাস্তি পারঙ্গম হয়ে উঠেছি, সেই সঙ্গে টানা-মাঞ্জা আর লাটা-মাঞ্জার তাবৎ 'নো হাউ' তখন আমার নখদর্পণে। বিকেলের বাতাস বুকে লাগিয়ে চড়চড় করে আকাশে উঠে যায় আমার ঘুড়ি, আর ডাকাতের মতো অন্য সব ছেলের ঘুড়ির উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। আকাশী যুদ্ধে অন্যের ঘুড়ি যখন কাটা পড়ে, আর ডানা-কাটা পাখির মতো সেই ঘুড়ি যখন আকাশ থেকে নেমে আসতে থাকে মাটির দিকে, তখন ছাতের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আমি চেঁচাতে থাকি, ভোঁ কাট্টা! বড়কাকা তাঁর ছ'বছর বয়সের শিষ্যের কৃতিত্ব দেখে খুশি হন। মাঝে-মাঝেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "শাবাস বাচ্চা, একটা 'অল ইন্ডিয়া কাইট ফ্লাইং কম্পিটিশন'-এর ব্যবস্থা হলে নির্ঘাত তাতে তুই ফার্স্ট হবি।"

এই কথাটা মায়ের সামনে একদিন বলে ফেলায় মা খুব রেগে যান। বলেন, "আদর দিয়ে যে ওর মাথাটা খাচ্ছিস, সেটা বুঝতে পারিস না? তুই কী ভেবেছিস বল তো? ও তো পড়াশুনোর ধারে-কাছেও ঘেঁসতে চায় না। শুধু লাট্টু আর ঘুড়ি নিয়ে থাকলেই ওর চলবে?"

বড়কাকা তাতে হেসে বলেন, "আহা বউদি, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? লাট্টুই ঘোরাক আর ঘুড়িই ওড়াক, ও তো বাড়ির মধ্যেই রয়েছে সারাক্ষণ। রাস্তায় বেরিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তো আর টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। সেটাই লাভ।"

কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়। দুপুরবেলায় মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে পড়তুম বাড়ি থেকে। তারপর এ-গলি ও-গলি ঘুরে টুক করে এক সময় আবার বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকে পড়তুম। ছোটভাইটা হওয়ায় এই একটা সুবিধে হয়ে গিয়েছিল যে, মা আর সারাক্ষণ আমার উপরে নজর রাখতে পারতেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখনও-কখনও যে একটু দূরে চলে যেতুম না, তাও নয়। ভরদুপুরে ওদিকে শেয়ালদা ইস্টিশন থেকে এদিকে গোলদিঘি পর্যন্ত আপন মনে তখন ঘুরে বেড়িয়েছি। ঘুরতে-ঘুরতে ঘোর লেগে যেত।

চাঁপাতলায় আমাদের বাড়িটা ছিল নুর মহম্মদ লেনে। এই গলির একটা মুখ যেমন অখিল মিস্ত্রি লেনে গিয়ে মিশেছে, আর একটা মুখ দিয়ে তেমন হ্যারিসন রোডে অর্থাৎ এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোডে বেরিয়ে যাওয়া যায়। বেরোতে গেলে, মোড়ের মাথায় পড়ে নিলামওয়ালাদের সারি-সারি দোকান। দোকানগুলো এখন আর নেই, শুধু 'নিলামবালা এক আনা, যা লিবে তা এক আনা' এই ডাকটা এখনও কানে লেগে আছে। ওখানে ছুরি, কাঁচি, কাচের নিবের ফাউন্টেন পেন, টিনের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, জুতোর বুরুশ ইত্যাদি কত রকমের জিনিস যে পাওয়া যেত। শুনতুম, সবই জাপানি মাল। ঠুনকো। তা হোক, দামও তো ছিল অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা। ওই যে এক রকমের চোঙ পাওয়া যায়, চোখের সামনে ধরে ঘোরাবার সঙ্গে-সঙ্গে পালটে যেতে থাকে যার ভিতরকার বাহারি সব নকশা, সেই ক্যালাইডোস্কোপও ওখানে ওই এক আনা দামেই বিক্রি হত। এক আনা মানে সেই আমলের চার পয়সা। ভাবা যায়? এখন তো মাথা খুঁড়লেও ও-জিনিস পাঁচ-দশ টাকায় পাওয়া যায় না। একদিন আমার হাত থেকে পড়ে একটা ক্যালাইডোস্কোপ ভেঙে যায়। ভেতব থেকে কয়েকটি মাত্র পাথরেব কুচি বার হয়েছিল। তাই দিয়ে যে অমন সুন্দর সব নকশা তৈরি হতে পারে, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

হ্যারিসন রোড আর মির্জাপুর স্ট্রিটের মোড়ে এখন দু'দুটো সিনেমা হল। একটা সামনে, একটা পিছনে। ও দু'টোর একটাও তখন ছিল না। ছিল নাগ কোম্পানির ওষুধের দোকান আর একটা অস্টোফোটোর দোকান। সেখানে এক টাকায় আটখানা ফোটো তোলা হত। আর একটু এগোলে একটা সেলুন। তার পর বাঁয়ে মোড় ফিরলে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক'। পাড়াব যাঁরা বয়স্ক মানুষ, তাঁরা বলতেন মির্জাপুর পার্ক। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামটা তখনও তেমন চালু হয়নি।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকে, আমহার্স্ট স্ট্রিটের পশ্চিম ফুটপাথে, একটা মাঠকোঠার দোতলায় ছিল পার্ক কেবিন। এক কাপ চা দু'পয়সা, মাখনের সঙ্গে চিনি কিংবা গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়ানো একটা টোস্ট দু'পয়সা, সিঙ্গল ডিমের ওমলেট দু'পয়সা, ডবল ডিমের ওমলেট চার পয়সা—তাবৎ রেস্তোরাঁয় দামটা ছিল এইরকম। পার্ক কেবিনে কিন্তু চা আর টোস্ট একসঙ্গে নিলে তিন পয়সায় পাওয়া যেত। ডবল ডিমের ওমলেটও মিলত ওই তিন পয়সাতেই। তবে কিনা মধ্য কলকাতার কোনও দোকানেই কাউকে কখনও 'ওমলেট' শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনিনি। সবাই 'মামলেট' বলতেন।

বড়কাকা ছিলেন রেস্তোরাঁর পোকা। মাঝে-মাঝে আমাকে চায়ের দোকান থেকে মামলেট খাইয়ে আনতেন। মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে খানিক পশ্চিমে এগোলেই ডাইনের ফুটপাথে বামা কেবিন। সেখানে চার পয়সা দামে মস্ত একখানা বান রুটি আর বড়-চামচের এক চামচ মাখন পাওয়া যেত। সেই সঙ্গে বড় দানার এক চামচ চিনি। সে খুব লোভনীয় ব্যাপার ছিল।

সুরভি ভাণ্ডারের কথা বলেছি। আমহার্স্ট স্ট্রিটের পশ্চিম ফুটপাথে এটা অনেক দিনের দোকান। বাবার হাত ধরে প্রথম যেদিন সুরভি ভাণ্ডারে যাই, দোকানের দেওয়ালে তখন খুব তেজস্বী চেহারার একজন মানুষের ছবি টাঙানো থাকতে দেখেছিলুম। বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, ছবিখানা শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শ্যামাকান্ত ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। সার্কাসে বাঘের খেলা নাকি বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম দেখান।

সেদিন বাড়ি ফিরে ভারিক্কি চালে দিদিকে বলি, "খুব তো ইশকুলে যাস, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছিস ?"

দিদি আমাকে অবাক করে দিযে বলে, "ও মা, তা কেন জানব না? মস্ত বড় কুস্তিগির ছিলেন। বাঘ-সিংগিও গায়ের জোবে তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত না। পবে কিন্তু সন্নিসি হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর কী নাম হয়েছিল, বল্ তো ?"

বললুম, "জানি না।"

"কী করে জানবি?" দিদি বলল, "খালি তো ঘুড়ি ওড়াস আর লাট্টু ঘোরাস, "ওই করে কিছু জানা যায় ? সন্নিসি হবার পরে তাঁর নাম হয়েছিল সোহহং স্বামী।"

আমি তো লজ্জায় একেবারে অধোবদন। কোথায় ভেবেছিলুম, বাবার কাছে সদ্য যা শিখেছি, তা-ই শুনিয়ে দিদিকে জব্দ করব, তা নয়, দিদিই কিনা উল্টে আমাকে জব্দ করে দিল !

মা বললেন, "তবেই বোঝ যে, ইস্কুলে না-যাবার এই হচ্ছে পরিণাম ! তোর দিদি সেই চার বছর বয়েস থেকে ইস্কুলে যাচ্ছে, তাই এবই মধ্যে কত-কিছু শিখে ফেলেছে। আব তুই ? ছ'বছর বয়েস হল, তবু ইস্কুলে যাবার নাম নেই। তার ফলটা কী হয়েছে ? না কিচ্ছুই তুই শিখতে পারিসনি। তোর কপালে অনেক দুঃখু লেখা আছে।"

দিদির বয়স তখন প্রায় ন'বছব। ফ্রক পবে ইস্কুলে যায় বটে, কিন্তু বাড়িতে মাঝে-মধ্যে শাড়িও পরে। সম্ভবত সেই কারণেই কথাও বলে একটু ভারিক্কি ভঙ্গিতে। গম্ভীর গলায় বলল, "না মা, আর দেরি করাটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি এবারে বাবাকে একটু ভাল করে বলো। নইলে তো দেখছি খোকার অব্যেসটাই খারাপ হয়ে যাবে। সেদিন তো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রাস্তারয় একেবারে মাঝ-মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ব্যাটবল খেলছিল।"

মা বললেন, "অ্যাঁ, বলিস কী ?"

"ঠিকই বলছি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশতে শুরু করেছে, তখন আর দেখতে হচ্ছে না, এখন ব্যাটবল খেলছে, এরপর খারাপ-খারাপ কথাও বলবে।"

আমি বললুম, "মোটেই আমি খারাপ কথা বলি না।"

দিদি বলল, "এখন বলিস না হয়তো, কিন্তু পরে বলবি।"

মা বললেন, "ও মা, আমি কোথায় যাব ! দাঁড়া, তোর বাবা আজ বাড়ি ফিরুন, তোর ব্যাটবল খেলার মজা তখন বার করছি।"

আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না ঠেকিয়ে রেখে বললুম, "আমি এখানে থাকব না, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি ঠাকুর্দার কাছে ফিরে যাব। তোমরা আমাকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও ! কালই পাঠিয়ে দাও ! কলকাতা ছাই-জায়গা, কলকাতা বাজে-জায়গা, কলকাতা বিচ্ছিরি জায়গা।"

বলতে-বলতেই হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললুম।

তার দিন কয়েক বাদেই আমাকে বঙ্গবাসী ইস্কুলের ক্লাস টু'তে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

২১

ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমার বয়স তখন ছ'বছর তিন মাস। ভর্তি হওয়াটা তখন এত মারদাঙ্গার ব্যাপার ছিল না। আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ, কিন্তু পয়সাওয়ালা ঘরের বাপ-মায়েদেরও তখন এমন কোনও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল না যে, শহরের সবচেয়ে নামজাদা ইস্কুলেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে হবে। ইংরেজদের অধীন ছিলুম বলেই বোধহয় ইংলিশ-মিডিয়াম ইস্কুল সম্পর্কে বাঙালি বাপ-মায়ের মোহ ছিল অনেক কম; অন্তত যে-মোহ এ-ব্যাপারে আজকাল দেখতে পাই, তার কণামাত্র তখন দেখিনি। ইস্কুল একটা হলেই হল, ছেলেমেয়েদের সেইখানে ঢুকিয়ে দিয়েই তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতেন। শুধু একটা কথা, ইস্কুলটা কাছেপিঠে হওয়া চাই।

তাই বলে যে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে বাঙালি অভিভাবকদের কোনও অশ্রদ্ধা কিংবা অনাগ্রহ ছিল, তাও নয়। আর কিছু না হোক, কর্মজীবনে উন্নতি করতে হলে ওটা যে শেখাই চাই, তা তাঁরা বেশ ভালই জানতেন। তবু যে তাঁরা ইংলিশ-মিডিয়াম ইস্কুলের ছায়া মাড়াতে আদৌ উদ্‌গ্রীব হতেন না, তার কারণ আর কিছুই নয়, বাংলা-মিডিয়াম ইস্কুলেও সেকালে ইংরেজি ভাষাটা নেহাত খারাপ শেখানো হত না। এই প্রসঙ্গে বলি, উত্তরকালে যে-সব বাঙালি লেখক ইংরেজি ভাষায় কলম চালনা করে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এই বিদেশি ভাষার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বাংলা-মিডিয়াম ইস্কুলেই। হতে পারে যে, এইসব ইস্কুলে যাঁরা ইংরেজি পড়াতেন, তাঁদের অনেকেরই উচ্চারণ খুব দুরস্ত নয়, সাহেবসুবোদের মতন তো নয়ই, কিন্তু ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধ ইংরেজি কীভাবে লিখতে হয়, সেটা যে তাঁরা ইংলিশ-মিডিয়াম ইস্কুলের কোনও শিক্ষকের চেয়ে কিছু কম জানতেন, এমন কথা মানব না। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নেসফিল্ড সাহেবের পরম ভক্ত। তাঁর গ্রামার গ্রন্থখানিকে তাঁরা একেবারে ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য করতেন।

আসল কথা, ইংলিশ-মিডিয়ামই হোক আর বাংলা-মিডিয়ামই হোক, তাতে কিছু এসে যেত না, মোটামুটি সমস্ত ইস্কুলেই ইংরেজি পঠন-পাঠনের মানটা তখন একালের তুলনায় অনেক উঁচু ছিল। উপরন্তু বাংলা-মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ার এই একটা বাড়তি সুবিধা ছিল যে, মাতৃভাষাটাও সেখানে উত্তমরূপে শেখা যেত, যা কিনা ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে যেত না। তা সত্ত্বেও যে এ দুটি ভাষার কোনওটিই আমি খুব ভাল করে শিখে উঠতে পারিনি, সে-দোষ একান্তভাবে আমারই, কলকাতার যে দুটি বিদ্যালয়ের আমি ছাত্র ছিলুম, সেই বঙ্গবাসী ইস্কুল আর মিত্র ইনস্টিটিউশনের মাস্টারমশাইদের নয়। নিজ-নিজ বিষয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কৃতবিদ্য পুরুষ। যিনি যতটা জানতেন, ছাত্রদের তা শেখাতে কোনও আলস্যও তাঁদের ছিল না। তাঁরা দিতেই চাইতেন, আমরা নিতে পারিনি। তার জন্য এখন বড় আক্ষেপ হয়।

মাস্টারমশাইদের প্রত্যেকেই যে ডিগ্রি-ডিপ্লোমাধারী ছিলেন, তা কিন্তু নয়। তবে তাতে কিছু এসে যেত না। ডিগ্রির জোর কি জলুস না থাকা সত্ত্বেও যে শিক্ষক হিসাবে যৎপরোনাস্তি সফল হওয়া যায়, তাঁদের অনেকেই ছিলেন তার জলন্ত উদাহরণ। পরে হয়তো উল্লেখ করতে ভুলে যাব, তাই এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখনই বলে রাখি। ছাত্র ভর্তির সময়ে অভিভাবকদের হাতে ইস্কুলের একখানা ছাপানো প্রসপেক্টাস বই তুলে দেওয়া হত। তাতে যেমন ইস্কুলের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থাকত, তেমনই থাকত শিক্ষকদের নাম। আমার ভর্তি হওয়ার সময়ে বঙ্গবাসী ইস্কুলের যে প্রসপেক্টাস বই আমাদের হাতে আসে, তাতে অনেক শিক্ষকেরই নামের পাশে আই. এ. প্লাক্‌ড বা বি. এ. প্লাক্‌ড লেখা থাকতে দেখেছি। এটা কোনও অগৌরবের ব্যাপার বলে গণ্য হত না। বরং, উচ্চশিক্ষার মান একালের তুলনায় অনেক উঁচু ছিল বলেই এটা ধরে নেওয়া হত যে, ফেলই করুন আর পাশই করুন, কেউ যে আই. এ. কিংবা বি. এ.-র পাঠ শেষ করেছিলেন এবং কলেজ থেকে তাঁকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছিল, এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এতে অন্তত এইটুকু বোঝা যাবে যে, শিক্ষার একটা বিশেষ স্তর কিংবা ধাপ পর্যন্ত ইনি উঠতে পেরেছিলেন।

কথায়-কথায় একটু দূরে সরে এসেছি, এখন আবার আমার ইস্কুল-জীবনের সূচনা-লগ্নে ফিরে যাই। বঙ্গবাসী ইস্কুলে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা খুব মধুর নয়। ভর্তি হওয়ার পরে ইস্কুলের দরোয়ান যেখানে আমাকে পৌঁছে দিয়ে এল, সেটা একতলার পিছন-দিকের একটা স্যাঁতসেঁতে ঘুপচি-ঘর। বঙ্গবাসী ইস্কুলে তখন ক্লাস ওয়ান বলে কিছু ছিল না। আমি ক্লাস টু'র ছাত্র। তার ফার্স্ট পিরিয়ড তখন সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু সেকেন্ড পিরিয়ডের মাস্টারমশাই তখনও ক্লাসে এসে ঢোকেননি। ছাত্ররা তাই খুব হইচই করছিল। আমি গিয়ে ঢুকবামাত্র তারা আমাকে ঘিরে ধরে। আমার কথাবার্তায় তখনও পূর্ববঙ্গীয় প্রভাব অতি প্রবল, তাই আমি যে একেবারে কাঠ-বাঙাল, এটা বুঝতে তাদের তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি। বাস্, বুঝমামাত্র শুরু হয়ে যায় নির্যাতনের পালা। সহপাঠীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পিছন থেকে আচমকা একটা ধাক্কা মেরে আমাকে মেঝের উপরে ফেলে দেয়। বইখাতাপত্র ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে। সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সদ্য উঠে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন আমার সামনে এগিয়ে এসে হাত ঘুরিয়ে বলতে থাকে, "বাঙালু, রসো খাইলু, ভাঁড় ভাঙিলু, পইসা দিলু না।" গোটা ক্লাস তাতে মজা পেয়ে গিয়ে 'পইসা দিলু না বাঙাল, পইসা দিলু না' বলে এমন হল্লা জুড়ে দেয় যে, অপমানে ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে আমার কান। ঠিক সেই মুহূর্তেই 'কী, হচ্ছে কী' বলতে বলতে মাস্টারমশাই এসে ঘরে ঢোকেন।

সেকেন্ড পিরিয়ডের বাদবাকি সময়টা মোটামুটি শান্তিতে কেটে যায় বটে, কিন্তু পিরিয়ডের শেষে মাস্টারমশাই যেই ক্লাস ছেড়ে বেরিয়েছেন, অমনি আবার সেই আগের মতোই শুরু হয় আমার লাঞ্ছনা। ঢ্যাঙা-মতো একটা ছেলে খুব নিরীহ গলায় আমাকে বলে, "এই, তুই ইংরিজি জানিস?"

ঢোক গিলে বলি, "একটু একটু জানি।"

"ঠিক আছে, ওতেই হবে। বল্ তো, রামেরা পাঁচ ভাই, এর ইংরিজি কী?"

বললুম "রামস আর ফাইভ ব্রাদার্স!"

বাস্, অমনি আবার শুরু হয়ে গেল হাসির হর্‌রা। তাতে মনে হল, কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল করে ফেলেছি। যে ছেলেটা পিছন থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে মেঝের উপরে ফেলে দিয়েছিল, সে হঠাৎ সামনে এসে পেনসিল দিয়ে আমার পেটে একটা মোক্ষম খোঁচা মেরে তারপর তার বন্ধুদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "শাকচুন্নির একটা পুত/তার নাম কী?"

যেন-বা এই প্রশ্নটার জন্যই অপেক্ষা করছিল গোটা ক্লাস। নিমেষে পাদপূরণ করে সমস্বরে সবাই চেঁচাতে লাগল, 'বাঙাল ভূত, বাঙাল ভূত!'

যাঁরা বলেন যে, শিশুরা একেবারে ফুলের মতোই কোমল, নিজেদের এলাকায় বাক্যে ও ব্যবহারে মাঝে-মাঝে যে তারা কত কঠিন ও নিষ্ঠুর হতে পারে, তা তাঁরা জানেন না। না, ক্লাসের মধ্যে সেদিন আর তারা বড়-রকমের কোনও ঝামেলা বাধায়নি। দুই পিরিয়ডের মাঝখানে যে একটু ফাঁক থাকে, তখন আমাকে লক্ষ করে কিছু-কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপ তারা নিক্ষেপ করছিল বটে, সেই সঙ্গে হয়তো আশাও করছিল যে, তার উত্তর দিতে গিয়ে বাঙাল-টানে দু'চারটে কথা আমি বলে ফেলব, আর তাই নিয়ে ফের তারা শুরু করে দেবে তাদের মজার খেলা। কিন্তু কথা বলব কী, তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময়ে, অপমানে আমি একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলুম।

বড়-রকমের ঝামেলা বাধল ইস্কুল-ছুটির পরে। সেটা আমিই বাধাই। সেই যে ছেলেটা পিছন থেকে আচমকা ধাক্কা মারায় মুখ থুবড়ে আমি ক্লাস-রুমের মেঝের উপরে পড়ে গিয়েছিলুম, ইস্কুলের চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় নামামাত্র বইখাতা সব রাস্তায় ছুড়ে ফেলে আমি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তারপর একেবারে উন্মাদের মতন কিল, চড় আর লাথি মারতে থাকি তাকে। বড় ক্লাসের ছাত্ররা এসে যখন আমাদের ছাড়িয়ে দেয়, তখন তার জামা ছিঁড়ে গেছে, ঠোঁট কেটে গিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। অবাক ব্যাপার এই যে, তার বন্ধুরা তো তার সঙ্গেই ছিল, কিন্তু আমি যখন তাকে মারতে-মারতে রাস্তার উপরে শুইয়ে ফেলেছি, তখনও তাদের কেউ এগিয়ে এসে আমাকে বাধা দেয়নি। বরং আমাদেব চারপাশ ঘিরে উৎসাহী দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে গিয়ে ক্রমাগত তারা হাততালি দিচ্ছিল, যাতে এই মজার খেলাটা আরও অনেকক্ষণ ধরে আমি চালিয়ে যাই।

মারামারির সময় আমার পোশাকেও রাস্তার ধুলো কিছু কম লাগেনি। তা ছাড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল বইয়ের মলাট। ভেবেছিলুম নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে ইস্কুলের পোশাক ছেড়ে বাড়ির জামা আর ইজের পরে নেব। সেই সঙ্গে বইয়ের মলাটও জুড়ে নেব গদের আঠা দিয়ে। কিন্তু মায়ের নজর এড়ানো গেল না। ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সদর-দরজার কাছেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল রে?"

মায়ের কাছে সেই প্রথম মিথ্যে কথা বলি। মাথা নিচু করে বললুম, "একটা সাইকেলের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।"

দিদি তার ইস্কুল থেকে আমার খানিক আগেই ফিরে এসেছিল। মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা তার কানে গিয়ে থাকবে। আড়াল থেকে সে এইসময় সামনে ছুটে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, "এ কী রে, তোর হাত-পা তো দেখছি অনেক জায়গায় ছড়ে গেছে!"

ক্লাসের মধ্যে যখন ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই, তখনই সম্ভবত ওটা হয়ে থাকবে। তবে নুনছাল তো এমন কতই উঠে যায়, আমি কিছু টের পাইনি। বললুম, "একটু ধুলো চাপড়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

মা বললেন, "বলিস কী, রাস্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলি, ওখানে ধুলো চাপড়ালে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরবি যে!" তারপর আমাকে কলঘরে নিয়ে গিয়ে কার্বলিক সাবান দিয়ে ছড়ে-যাওয়া জায়গাগুলো ভাল করে ধুইয়ে দিয়ে সেখানে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন।

পরদিন খুব ভয়ে-ভয়ে ইস্কুলে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, কালকের মতো আজও সবাই আমার পেছনে লাগবে। ছড়া কাটবে, বাঙাল বলে খ্যাপাবে, পিছন থেকে আচমকা আবার ধাক্কা মারবে। কিন্তু না, সেদিন আর কোনও ঝামেলা হল না। বরং, আগের দিন রাস্তায় যাকে খুব মেরেছিলুম,

সে-ই দেখলুম নিজের থেকে এগিয়ে এসে এক-টুকরো আমসত্ত্ব দিয়ে আমার সঙ্গে ভাব করে নিল।

আমাদের ইস্কুল স্কট লেনে। সেখান থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছেই। একা-একাই আমি ইস্কুলে যাই, ছুটির পরে বাড়ি ফিরি। আমরা যে নুর মহম্মদ লেনে থাকি, ইস্কুল ছুটির পরে এই কথা শুনে ছেলেটি বলল, "তা হলে তো ভালই হল, আমরা তোদের পাশের গলি অখিল মিস্ত্রি লেনে থাকি। চল্‌, তা হলে আজ একসঙ্গে ফিরব।"

হাঁটতে-হাঁটতে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল আমাদের। তার মধ্যে যে-কথাটা শুনে আমি একেবারে তাজ্জব বনে যাই, সেটা এই যে, তারাও বাঙাল।

"তা হলে তুই আমাকে বাঙাল বলে খেপালি কেন?"

"শুধু আমি কেন খেপাব, সবাই তো খেপাচ্ছিল। ওদের মধ্যেও অনেক বাঙাল আছে। কিন্তু কেউ তা জানাতে চায় না। পাছে অন্যেরা তাদের পিছনে লাগে।"

তো এই হচ্ছে ব্যাপার। শহরে তখন বাঙালদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সেই কারণেই তাদের মধ্যে যারা একটু ডাকাবুকো প্রকৃতির মানুষ, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে জন্মগত সম্পর্কের কথাটা তারা বুক ফুলিয়ে বলত বটে, কিন্তু অনেকেই ওটা চেপে যেত। ভয় ওই পিছনে লাগার। ঠাট্টা-তামাশার লক্ষ্য হবার। দুঁদে লোকের পাল্লায় পড়লে ঠাট্টা কীভাবে মাঠে মারা যায়, তা নিয়েও তখন অনেক মজার-মজার গল্প শোনা যেত। একটা গল্পের কথা বলি। হয়তো এটা অনেকেই শুনেছেন, তবু আবার বললেও ক্ষতি নেই। বাজারে এক ভদ্রলোকের মুখে বাঙাল-টানের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত এক পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁকে শুধিয়েছিলেন, "কী মশাই, কালই ঢাকা মেলে কলকাতায় এসেছেন বুঝি?" প্রশ্নটা যে ব্যঙ্গাত্মক, তাঁকে রাগিয়ে দেবার জন্য করা হয়েছে, বাঙাল-ভদ্রলোক সেটা বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ধুরন্ধর ব্যক্তি তো, তাই একটুও রেগে না-গিয়ে দারুণ বিস্মিত হবার ভান করে পালটা-প্রশ্ন করলেন, "আরে সত্যিই তো, কালই তো আমি ঢাকা মেলে কলকাতায় এসেছি, তা আপনি সেটা বুঝলেন কী করে বলুন তো?" এ-সব লোকের কথা আলাদা। যারা ভিতু প্রকৃতির মানুষ, স্বভাবতই তারা একটু গুটিয়ে থাকত।

আমার দিদির কথাই ধরা যাক। বাঙাল-পরিচয় নিয়ে দিদির বড্ড সংকোচ ছিল। এই নিয়ে একবার খুব একটা মজার ব্যাপার ঘটে। বললুম বটে 'মজার ব্যাপার', আসলে কিন্তু আমার পক্ষে সেটা মোটেই মজার হয়নি। দিদি তখন সদ্য ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়েছে। সেই সময়ে তাদের ইস্কুলে একটা ফাংশান হয়। দিদির কাছে শুনতুম, তাদের ইস্কুলটা বিরাট বড়। যেমন বড় বাড়ি, তেমন বড় বাগান আর খেলার মাঠ। দিদিমণিরাও নাকি দারুণ ভাল। তা ছাড়া, তার যে-সব বন্ধু ইতিমধ্যে জুটে গিয়েছিল, তাদের বিষয়ে গল্প করতেও দিদির কোনও ক্লান্তি ছিল না। ইদানীং অবার সে ফাংশানের গল্প করতে শুরু করেছিল। সেখানে নাচ হবে, গান হবে, বিপদে পড়লে মেয়েরা কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে সেটা দেখানো হবে, আর হবে ম্যাজিক।

এই শেষের কথাটা বলে দিদি মোটেই ভাল করেনি। নাচ, গান, মেয়েদের আত্মরক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, কিন্তু যেই শুনলুম যে, ফাংশানে ম্যাজিক দেখানো হবে, অমনি বললুম, "আমি যাব।"

দিদি বলল, "তুই কী করে যাবি?"

মা বললেন, "কেন, ভাইবোন কাউকে সঙ্গে নিতে নেই?"

"তা নয়," দিদি বলল, "কিন্তু ওর কথাবার্তা থেকে তো বাঙাল-টানটা একটুও মিলিয়ে যায়নি। ফাংশানে আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যেখানে বসব, সেখানে ও মুখ খুললেই তো চিত্তির,

লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।"

"তাই বলে তোর ছোট্ ভাইকে নিয়ে যাবি না?"

খানিকক্ষণ একেবারে মুখ গোঁজ করে বসে রইল দিদি, তারপর বলল, "ঠিক আছে, নিয়ে যাব। কিন্তু এই আমি দিব্যি দিয়ে রাখলুম, যতক্ষণ ওখানে থাকবে, একটাও কথা বল্‌বে না। শুধু হ্যাঁ, নাম জিজ্ঞেস করলে সেটা বলবে, কিন্তু আর একটাও কথা নয়।"

খুবই অপমানজনক শর্ত। কিন্তু তার মাত্রই কয়েকদিন আগে ছোটকাকার সঙ্গে টালার ওদিককার একটা বাড়ির বাগানে আমি গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক দেখে এসেছি। তাঁর আমলে তিনিই ছিলেন সেরা ম্যাজিশিয়ান। তাঁর খেলায় সাজ-সরঞ্জামের চটক বিশেষ ছিল না। কিন্তু প্রতিটি খেলাই ছিল তাক লাগিয়ে দেবার মতো। সেদিন তাঁর শেষ খেলাটা ছিল তাসের। খেলার ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন, পিছন থেকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে তাঁরা আমাকে একেবারে সামনের সারির একটা চেয়ারে এনে বসিয়ে দেন। শেষ খেলাটা দেখাবার আগে দু'চার কথায় খেলার একটা বর্ণনা দিয়েই গণপতি আমার সামনে এসে বলেন, "এসো তো খোকা।" তারপর বাগানের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার হাতে এক প্যাকেট তাস গুঁজে দিয়ে বলেন, "বুঝলে খোকাবাবু, তুমিই এখন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্যাকেটের তাসগুলোকে তুমি এবার যত জোরে পারো আকাশের দিকে ছুড়ে দাও তো।"

তা দিয়েছিলুম। আর উড়ন্ত তাসগুলো ফের বাগানের ঘাসের উপরে এসে পড়বার আগেই গণপতি চক্রবর্তী একটা তরোয়াল দিয়ে সেইগুলোকে গেঁথেও ফেলেছিলেন। একটাও তাস মাটিতে পড়তে পারেনি।

সেই খেলা তখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। বলতে গেলে একরকম বোবা সেজে বসে থাকতে হবে, ম্যাজিক দেখার লোভে বিচ্ছিরি এই শর্তটা মেনে নিয়েই তাই সেদিন দিদিদের ফাংশানে যেতে রাজি হয়ে যাই।

দিদির দেখলুম অনেক বন্ধু। তারা আমার নাম জিজ্ঞেস করলে নাম বলি, কিন্তু তারপরেই আমার মুখে একেবারে কুলুপ পড়ে যায়। দিদিকে তারা জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ রে লতিকা, তোর ভাই এত কম কথা বলে কেন?" তাতে দিদি বলে, "বড্ড লাজুক তো, তাই বাইরে এলে মুখই খুলতে চায় না।"

ফাংশান শুরু হতে অবশ্য সব্বাই চুপ করে গেল। একেবারে গোড়ায় একটা কোরাস গান ছিল, তারপর ছিল দুটো বক্তৃতা। একে-একে আরও দু-চারটে গান হল। তারপর পর্দা ফেলে দিয়ে ঘোষণা করা হল যে, এবারে মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল দেখানো হবে। খানিক বাদে যখন আবার পর্দা উঠল, তখন দেখলুম স্টেজের উপরে একটি বেশ জোয়ানমতো ছেলে আর একটি রোগা পাতলা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিদির বন্ধুদের কথা শুনে বোঝা গেল, যাকে ছেলে ভেবেছিলুম, সেও আসলে মেয়েই, তবে ছেলেদের পোশাক পরেছে। খালি-হাতেও স্রেফ জুজুতসুর প্যাঁচ মেরে কী ভাবে বলবানকে জব্দ করে দেওয়া যায়, পরপর তার অনেকগুলি কায়দা সেদিন দেখানো হয়েছিল। ব্যাপারটা এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল যেন রোগা-পটকা একটা মেয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে আর পথের মধ্যে তাকে আক্রমণ করছে এক তাগড়া গুণ্ডা। কিন্তু প্রত্যেকবারেই ওই রোগা মেয়েটা মোক্ষম একটা প্যাঁচ মেরে তাকে চিতপটাং করে দিচ্ছে। বারবার যে ওই রোগা মেয়েটাই জিতবে, দু-তিনটে খেলা দেখার পরেই সেটা আমি টের পেয়ে যাই।

দিদি আর তার বন্ধুরা সম্ভবত সেটা ধরতে পারেনি। তাই যখনই গুণ্ডাটা এসে রোগা মেয়েটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তখনই শিউরে উঠছিল তারা। পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠবার আক্রমণের সময়েও

একইভাবে তাদের শিউরে উঠতে দেখে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। দিদির বন্ধুদের বললুম, "তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? দেখে নিয়ো, এবারেও ওই রোগা মেয়েটাই জিতবে।"

কথাটা একেবারে বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় আমাদের ওদিককার ফরিদপুরিয়া উচ্চারণে বলেছিলুম। দিদির বন্ধুরা সেই উচ্চারণ শুনে একেবারে হতবাক। হাঁ করে, গালে হাত দিয়ে, গোল-গোল চোখে এমনভাবে তারা আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন চিড়িয়াখানা থেকে ছাড়া পেয়ে আজব কোনও জীব তাদের ফাংশানে এসে ঢুকে পড়েছে। ব্যস্, দিদিও আর একটিও কথা না বলে, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না-করে, হিড়হিড় করে আমাকে টানতে-টানতে হল থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে অপেক্ষা করছিল মাসকাবারি রিকশা। তাতে আমাকে তুলে দিয়ে, নিজেও উঠে পড়ে কঠিন গলায় রিকশাওয়ালাকে বলল, "বাড়ি চলো।"

বাড়িতে পৌঁছে এক-ধাক্কায় আমাকে মায়ের দিকে ঠেলে দিয়ে দিদি একেবাবে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, "এই জন্যেই তোমার ছেলেকে আজ আমি ফাংশানে নিয়ে যেতে চাইনি!"

মা তো রান্না ফেলে উঠে এসেছিলেন। আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বললেন, "কেন রে, কী হল?"

"যা হবার, তা-ই হয়েছে! এই বাঁদরটা সেখানে সক্কলের সামনে কথা বলেছে!"

মা বললেন, "তা যদি বলেই থাকে তো তাতে এত কান্নাকাটি করবার কী আছে?"

"বাঃ, আমার বন্ধুরা জেনে গেল না যে, আমরা বাঙাল?" বলেই দিদি আবার কেঁদে ফেলল।

তা দিদি সেদিন যেমন হাপুস নয়নে কেঁদেছিল, তেমন আবাব আমিও সেদিন আমার কৃতকর্মের জন্য কিছু কম আফসোস করিনি। আমার দুঃখের কারণ অবশ্য ভিন্ন। স্রেফ বেফাঁস বাঙাল কথা বলার জন্যেই সেদিন ফাংশানে যাবার সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত আর ম্যাজিকটা আমার দেখা হল না!

২২

ক্লাস টু'তে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন ক্ষিতীশবাবু। তাঁর চেহারায় আর জামাকাপড়ে যে একটা অসন্তোষ ও দারিদ্র্যের ছাপ ছিল, সেই বয়সেও সেটা ঠিকই বুঝতে পারতুম। কখনও তাঁকে ফর্সা পাটভাঙা পাঞ্জাবি কি ধুতি পরতে দেখিনি। পায়ে ময়লা কেড্‌স জুতো। দাড়িটা নিয়মিত কামাতেন না। তার উপরে মেজাজও, সম্ভবত অভাব-অনটনের কারণেই, ছিল একটু খিটখিটে। অল্পেই চটে যেতেন, বকাঝকা করতেন, কথাবার্তায় তখন একটু তোতলামিও এসে যেত। তবে বড়-হাতের আর ছোট-হাতের এ বি সি ডি অক্ষরগুলো বেশ সুন্দর করে লিখে দেখাতে পারলে

সেই মানুষটিরই খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখখানা যে একেবারে অমলিন হাসিতে ভরে যেত, তাও মনে পড়ে। ইংরেজি বর্ণমালার সঙ্গে আমার প্রথম-পরিচয় দেশের বাড়িতে থাকতেই হয়ে গিয়েছিল, তবে ইংরেজিতে কী করে বাক্যগঠন করতে হয়, তার বিন্দুবিসর্গও তখন জানতুম না। সেটা ক্ষিতীশবাবুই শেখান। আই গো, উই গো, ইউ গো, হি গোজ, রাম গোজ, শ্যাম গোজ, যদু গোজ, মধু গোজ—বাক্যগঠনের এই প্রথম ধাপটা তিনিই আমাদের হাতে ধরে পার করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলা-মিডিয়াম ইস্কুলের নীচের দিকের ক্লাসে তখন প্যারীচরণ সরকার মশাইয়ের 'ফার্স্ট বুক' পড়ানো হত। সে-বই এখনও প্রথম শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় কি না জানি না, তবে বইখানি যে অতি উত্তম ছিল, সে-কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। অনেককে তো এখনও বলতে শুনি যে, বাচ্চাদের ইংরেজি শেখাবার যে-সব বইয়ে আজকাল বাজার ছেয়ে গেছে, তাতে নতুন-নতুন কায়দা-কানুন যতই থাক, তার কোনওটাই 'ফার্স্ট বুক'-এর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারার যুগ্যি নয়।

ক্ষিতীশবাবু অবশ্য 'ফার্স্ট বুক'-এর উপরেও বিশেষ জোর দিতেন না। ওই বয়সে আমাদের যতটুকু যা না-শেখালেই নয়, বইয়ের সঙ্গে যৎসামান্য যোগ-সম্পর্ক বজায় রেখে, মুখে-মুখে আমাদের সেইটুকুই তিনি শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। হাতের লেখা আর বানানের উপরে জোর দিতেন একটু বেশি মাত্রায়। শব্দার্থ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'ওসব পরে হবে, বানানটা আগে ভাল করে শিখে নাও।' রোজ একপাতা হাতের লেখা তাঁকে দেখাতে হত। তাতে একটা বানানও ভুল হবার জো ছিল না। বানান-ভুল করলে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে দিতেন। ফলে, ক্লাস টু'তে পড়বার সময় 'আই গো', 'উই গো' ইত্যাদি কয়েকটি বাক্য ছাড়া অন্য যে ইংরেজি বাক্যটি চটপট শিখে ফেলি, সেটি হল: স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ।

শব্দের বানান ও অর্থের প্রসঙ্গে একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে। গল্পটা স্বর্গত সুবোধ ঘোষের কাছে শোনা। তখনও তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেননি, জীবনের প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' লিখেই ওই যে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন, সেটা তো আরও কিছুকাল পরের ঘটনা। থাকতেন হাজারিবাগে। সেই সময়ে একটি কাজের ব্যাপারে কলকাতায় এসে তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। ভদ্রলোক তখন বাড়িতে ছিলেন না, তবে খানিক বাদেই তাঁর ফিরবার কথা, সুবোধদাকে তাই বৈঠকখানা ঘরে বসতে বলা হয়। বাড়ির দুটি শিশু তখন সেখানে তাদের গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ছিল।

সুবোধদা বলেন, "গৃহশিক্ষকটিকে দেখে আমি তাজ্জব বনে যাই। হাজারিবাগেরই ছেলে, কিন্তু পরপর দু'তিন বছর ফেল করার ফলে তার লেখাপড়া আর এগোয়নি, ইস্কুলের একেবারে নীচের দিকের ক্লাস থেকেই তাকে বিদায় নিতে হয়। সে যে কী করে প্রাইভেট টিউটরের কাজ চালাচ্ছে, সেটা ভেবেই আমার ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল।"

ধাঁধাটা অবশ্যই খানিক বাদেই কেটে যায়। গৃহশিক্ষকটি তখন ইংরেজি শব্দের বানান শেখাচ্ছেন। 'কে আই টি ই কাইট... কে আই টি ই কাইট... কে আই টি ই কাইট... নাও, ভাল করে শেখো... কে আই টি ই কাইট... নাও, একেবারে মুখস্থ করে ফ্যালো...'

'মাস্টারমশাই, কাইট মানে কী?'

'মানে পরে হবে, এখন বানানটা ঠিক ভাবে শেখো তো। কাইট তো হল, এবারে স্কাই। এস কে ওয়াই স্কাই...এস কে ওয়াই স্কাই...কই, মুখস্থ করছ না যে?'

'মাস্টারমশাই, স্কাই মানে কী?"

'আঃ, আবার মানে? কতবার না বলেছি যে, বানানের দিন বানান শেখাব আর মানের দিন মানে! তা আজ কি মানে শেখাবার দিন? এখন বানান শিখছ, বান্যান শেখো, এর মধ্যে আবার মানে আসছে কোত্থেকে? পরে হবে ... পরে হবে।'

কী করে যে সে প্রাইভেট টিউটরের কাজ চালাচ্ছে, সেটা বুঝে নিতে এর পরে আর অসুবিধে হবার কথা নয়।

সুবোধদার কাছে এই গল্পটা যখন শুনি, নিজের শিশু-বয়সের কথা তখন চকিতে একবার মনে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু এ-কথা বলছি বলে যেন কেউ আবার না ভেবে বসেন যে, আমাদের ক্ষিতীশবাবুও ছিলেন এই রকমের শিক্ষক। তা তিনি মোটেই ছিলেন না। ইংরেজি তিনি ভালই জানতেন। তবে যখন যেটা শেখাচ্ছেন, তা থেকে তাঁর মনোযোগ যে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন মনে হলে আর রক্ষা ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন।

দুই আর তিন, যদ্দুর মনে পড়ে, ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে এই দুটো ক্লাস আমরা ক্ষিতীশবাবুর হাতে ছিলুম, ক্লাস ফোরে উঠে আমরা নারানবাবুর হাতে সমর্পিত হই। দু'জনেই মূলত ইংরেজির শিক্ষক ('মূলত' বলছি এই কারণে যে, দরকার পড়লে অন্য দু-একটা বিষয়ও তাঁদের পড়াতে হত, যেমন কিনা ক্লাস ফোরে আমাদের ইতিহাস পড়াবার ভার ছিল ক্ষিতীশবাবুর উপরে), কিন্তু দু'জনের পড়াবার ধরনে তফাতটা ছিল একেবারে আশমান-জমিন। মানুষ হিসাবেও দু'জনে ছিলেন দুই রকমের। ক্ষিতীশবাবুর মুখে এক-টুকরো বিক্ষোভের ছায়া যেন সবসময়েই লেগে থাকত। নারানবাবুর মুখে তেমন কোনও ছায়া কখনও দেখিনি। ছটফটে আমুদে স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি, মুখে সর্বদাই কথার খই ফুটত, ছাত্রদের সঙ্গে এক-আধ টুকরো রঙ্গ-রসিকতাও করতেন, আবার তাই বলে যে কখনও রেগে যেতেন না, তাও নয়। রেগে গেলে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে দেবার বদলে বিনা দ্বিধায় হাত চালাতেন।

অন্যদিকে, সরস্বতী পুজো থেকে শুরু করে বার্ষিক স্পোর্টস পর্যন্ত আমাদের ইস্কুলের তাবৎ উৎসবে-অনুষ্ঠানে নারানবাবুরই ছিল প্রধান ভূমিকা। কিন্তু এই যে মানুষটি সাইকেল চালিয়ে ইস্কুলে আসতেন, মালকোচা মেরে কাপড় পরতেন, সরস্বতী পুজোর দিনে ছাত্রদের পঙ্ক্তি-ভোজে বসিয়ে পেতলের বালতিতে করে পরম উৎসাহে খিচুড়ি, বাঁধাকপির ঘন্ট, বিলিতি বেগুনের চাটনি আর শুকনো বোঁদে পরিবেশন করতেন, তারপর ভাসানেব দিন ছাত্রদের সঙ্গে লরিতে উঠে হই-হই করতে-করতে গঙ্গার ঘাটে ঠাকুর-বিসর্জন দিতে যেতেন, আর স্পোর্টসের দিন একটার পর একটা ইভেন্টে টিনের চোং মুখে লাগিয়ে প্রতিযোগীদের নম্বর হাঁকতেন, পড়াশুনোর ব্যাপারে তাঁকে ফাঁকি দেবার কোনও উপায় ছিল না।

ফোর থেকে সিক্স, মোট এই তিনটে বছর তাঁর কাছে আমরা পড়েছি। তারই মধ্যে তিনি আমাদের শিখিয়ে ছেড়েছিলেন যে, 'কগ্‌নেট অবজেকট' বলতে কী বোঝায়, 'ইনট্রোডাক্টরি দেয়ার'টাকে কোথায় কী ভাবে ব্যবহার করতে হয়, 'সিকোয়েন্স অব টেনস' রক্ষা করতে হয় কীভাবে, এবং 'নট ওন্‌লি' যদি এসে পড়ে তো তার পিছনে-পিছনে' 'বাট অলসো'ও আসবেই। 'কীভাবে আসবে স্যার?' লঘু গলায় এই প্রশ্ন তুলে আমাদের ক্লাস-সিক্সের একটি চপলমতি ছাত্র বড় বিপদে পড়েছিল। খপ্ করে তার কান ধরে টান মেরে নারানবাবু বলেছিলেন, 'কান টানলে কীভাবে মাথাটাও চলে আসে, দেখলি তো? ঠিক এইভাবে আসবে।'

যদি বলি যে, নারানবাবু ছিলেন চলন্ত একখানি ইংলিশ গ্রামার-গ্রন্থ, খুব-একটা ভুল বলা হবে না। তাঁর গ্রামার পড়াবার পদ্ধতিটাও ছিল একেবারে নিজস্ব ধাঁচের। দেওয়ালের উপরে ছায়াবাজি করে দেখাবার কায়দায় পাঁচ আঙুল দিয়ে একটা হরিণের মুখের আদল তৈরি করে কোন্ আঙুলটা

কিসের প্রতীক সেটা বুঝিয়ে দিতেন, তারপর বলতেন, "দ্যাখ্, বুড়ো আঙুল, মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে হরিণটার মুখ তৈরি হল, তর্জনী আর কনিষ্ঠা দিয়ে কান। এখন মনে রাখ, মুখের আঙুলে 'ভেরি' বসাবি আর কানের আঙুলে 'মাচ্'। সংক্ষেপে কী দাঁড়াল ? না 'মুখে ভেরি, কানে মাচ্'। এইটে যদি মনে রাখিস, তবে আর কোথায় 'ভেরি' বসবে আর কোথায় 'মাচ', তা নিয়ে কক্ষনো ঝঞ্ঝাটে পড়বি না।"

ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত অনেক লেখককেও আজকাল 'যদি'-অর্থে 'প্রোভাইডেড'-এর বদলে 'প্রোভাইডিং' লিখতে দেখি। 'দ্য রিজন ইজ বিকজ'ও আকছার চোখে পড়ে। নারানবাবুর হাতে পড়লে তাঁদের হেনস্থার সীমা থাকত না। পিরিয়ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্ঘাত 'নিল ডাউন' করিয়ে রাখতেন।

তাঁর উচ্চারণ যে অন্তত একটা ক্ষেত্রে নির্ভুল ছিল না, সেটা অবশ্য অনেক বছর বাদে জানতে পারি। ইস্কুলে তাঁর কাছে যা শিখেছিলুম, সেই অনুযায়ী গৃহকর্ত্রী বোঝাতে আমরা 'হাজিফ' বলতুম। পরে, কলেজ-জীবনে মিলফোর্ড সাহেব ভুলটা শুধরে দিয়ে বলেন যে, শব্দ যদিও একই, তবু দুই-অর্থে তার দুই রকমের উচ্চারণ। 'হাজিফ' বললে ছুঁচসুতোর বাক্স বোঝাবে, আর 'হাউসওয়াইফ' বললে গৃহকর্ত্রী। কথাটা আর নারানবাবুকে জানানো হয়নি, তবে জানালেও তিনি নিশ্চয় ক্ষুণ্ন না-হয়ে খুশিই হতেন।

ছোট মাপের সহজ শব্দ যে নারানবাবু বিশেষ পছন্দ করতেন না, এটাও মনে পড়ে। 'আপ্স অ্যান্ড ডাউনস' লিখেও যে মানুষের অবস্থার উত্থানপতনের কথাটা দিব্যি বোঝানো যায়, তা কি আর তিনি জানতেন না ? খুবই জানতেন। তবু ওই কথাটা লিখে তাঁকে খুশি করতে পারিনি, হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার খাতা যখন ফেরত পাওয়া গেল, তখন দেখি, লাল পেনসিল দিয়ে জায়গাটা কেটে লিখে দিয়েছেন 'ভিসিসিটিউড'। আমি তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। বাবাকে নিয়ে খাতাটা দেখাতে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, "ভালই তো, একটা নতুন কথা শিখলি। তবে হ্যাঁ, ওতে যে একটাই সি আর দুটো এস্, এটা কিন্তু মনে রাখা চাই।" আর একটা ঘটনার কথা বলি। ট্রানস্লেশনের খাতায় 'জলপথে ভূপ্রদক্ষিণ'-এর ইংরেজি করতে গিয়ে আমাদের ক্লাসের একটি ছাত্র 'সেইল রাউণ্ড' কথাটা ব্যবহার করেছিল। নারানবাবুর কাছে সেটাও ছাড়পত্র পায়নি। কথাটা কেটে দিয়ে তিনি লিখে দেন 'সার্কাম্ন্যাভিগেট'। তাঁকে খুশি করবার জন্য, যখনই সুযোগ মিলত, তখনই আমরা আমাদের সেই বয়সের সাধ্য অনুযায়ী ভাষাটাকে যথাসম্ভব কঠিন করে তুলতে লেগে যাই। 'হি ওয়েন্ট টু স্কুল' না-লিখে আমরা লিখতুম 'হি রিপেয়ার্ড টু স্কুল', 'হি ডায়েড'-এর বদলে 'হি ব্রিদ্ড হিজ লাস্ট'। নারানবাবু তাতে খুশি হতেন। যা-ই লিখি না কেন, তার মধ্যে কঠিন-কঠিন দু-একটা শব্দের তুড়ুম ঠুকে দিয়েছি, এইটে দেখলে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকত না।

ক্লাস সেভ্ন থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত যাঁদের কাছে ইংরেজির পাঠ নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল, এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা ছিল কিন্তু একেবারে অন্য রকম। সুহৃৎকৃষ্ণ ঘোষ মশাই তো প্রথম দিনেই একেবারে খোলাখুলি বলে দিলেন, 'যত পারিস, সহজ শব্দ দিয়ে ইংরেজি বাক্য গড়বি। আর সেই বাক্যগুলোও হবে যতটা সম্ভব ছোট মাপের। মনে রাখবি, যত বেশি কঠিন শব্দ লাগাবি আর সেনটেন্স যত লম্বা হবে, ভুলের সম্ভাবনাও তত বাড়বে।'

শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। বাড়িতে ফিরে বাবাকে বললুম, "তা হলে কি আর 'রিপেয়ার্ড টু' লিখব না ?"

বাবা বললেন, "দরকার কী। 'ওয়েন্ট' লিখলেই তো দিব্যি হয়।"

"আর ওই 'ব্রিদ্‌ড হিজ লাস্ট' ? ওটা ?"

"ওটাও না, 'এক্সপায়ার্ডও' না।" বাবা সেই আগের মতোই মৃদু হেসে বললেন, "স্রেফ 'ডায়েড'। লোকটা যে মরেছে, তাতেই সেটা বোঝা যাবে।"

"কেন, একটু কঠিন শব্দ লিখলে দোষ কী ?"

বাবা পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। খাতাগুলোকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন, "দ্যাখ, আমরা যে কাউকে কিছু বলি, সে তো সেটা বুঝবে বলেই বলি। তো, যা বলবার, শক্ত-শক্ত শব্দ দিয়ে যদি সেটা বলি, তা হলে তা বুঝতে পারাটাও তো তার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তবে আর বলে কী লাভ হল ?"

পরের দিনই বাবা আমাকে ইংরেজি খানকয় বই এনে দেন। সবই গল্পের বই। তার মধ্যে একখানার নাম এখনও মনে আছে ; লেজেন্ডস অব গ্রিস অ্যান্ড রোম। তাতে যে-সব গল্প ছিল, তার কিছু আমি সেই শিশুবয়সেই বাবার কাছে শুনেছি। যা তার আগে শুনিনি, সেই রকমের একটা গল্প সেদিন রাত্তিরে তিনি নিজেই আমাকে পড়ে শোনান। তারপর বলেন, "নে, বাদবাকি গল্পগুলো তুই নিজে নিজে এবারে পড়ে ফেল। রোজ একটা করে পড়বি।"

এ তো গেল ইংরেজির কথা। বাংলা বই জোগাড়ের ব্যবস্থা তার আগেই হয়ে গিয়েছিল। রজনীকান্ত গুপ্ত ছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত সাহিত্যিক। যা তাঁর মস্ত গুণ বলে আমার মনে হয়, সেটা এই যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা ঘটনা তিনি ভারী সুন্দর করে গল্পের আকারে লিখতে পারতেন। তাঁর এক পৌত্র আমার সঙ্গে ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। তার পোশাকি নামটা আজ আর মনে নেই, তবে ডাকনাম ছিল মন্টু। রজনী গুপ্ত রো বলে আমাদের পাড়ায়, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দক্ষিণে, একটা রাস্তা ছিল বটে, তবে মন্টুরা সে-রাস্তায় থাকত না, তাদের বাড়ি ছিল অখিল মিস্ত্রি লেনে। মন্টুর সঙ্গে সেই বাড়িতে যেদিন প্রথম যাই, তাদের বইপত্রের সংগ্রহ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। রজনীকান্ত তার অনেক বছর আগেই গত হয়েছেন। মন্টু নিজেও তাঁকে কখনও দেখেনি, তবে তাঁর বইয়ের আলমারিগুলি তো ছিলই, তা-ই ছিল ও-বাড়ির মস্ত সম্পদ।

আলমারির মধ্যে রজনীকান্তের নিজের লেখা বইয়েরও অভাব ছিল না।

অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে-সব বইও একের পর এক পড়তে থাকি। 'আর্যকীর্তি' তো আগেই পড়েছিলুম, ও বই আমাদের দেশের বাড়ির লাইব্রেরিতেই ছিল। এবারে মন্টুর সঙ্গে বন্ধুত্বের দৌলতে 'বীরমহিমা' আর 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস'ও পড়া হয়ে যায়। রজনীকান্ত গুপ্ত ছিলেন খুব তেজস্বী চেহারার পুরুষ, 'আর্যকীর্তি' বইখানার মধ্যে তাঁর যে ছবি দেখেছি, তাতে অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল। তাঁর লেখার মধ্যেও ছিল সেই তেজের একটা চাপা আভা। অতীত গৌরবের বর্ণনা তিনি এমনভাবে দিতেন, যে, অনেক কাল আগে যা ঘটে গেছে, তা আবার তাঁর কলমের ছোঁয়ায় জ্যান্ত হয়ে উঠত। পড়তে-পড়তে মনে হত যেন চোখের সামনে এক আশ্চর্য জগতের দরজা ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে।

অখিল মিস্ত্রি লেনে মন্টুদের সেই বাড়িটাও ছিল ভারী মায়াময়। সামনের দিকটা একতলা, তারপর বেশ বড়সড় একটা উঠোন। সেটা পেরোলে মস্ত দোতলা বাড়ি। একতলাটা ছায়াচ্ছন্ন। দোতলার জানালায় লাল-নীল কাচ বসানো। তার ভিতর দিয়ে রোদ্দুর এসে ঘরগুলোর মধ্যে একটা রঙিন মোহ তৈরি করে তুলত। মনে হত, অনেক কাল আগের একটা সৌরভ যেন ওই ঘরগুলোর মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছে। মন্টুদের সেই বাড়িটা এখনও আছে কি না জানি না। অনেক দিন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা হয়নি।

ছেলেবেলায় কিন্তু ওটাই ছিল নিত্য যাতায়াতের পথ। অখিল মিস্ত্রি লেন ধরে দক্ষিণ দিকে

খানিক এগিয়ে বাঁয়ে মোড় ফেরো, আর একটু এগোলেই বৈঠকখানা রোড পেয়ে গেলে। সেখানে বাঁ-দিকে পড়বে রিপন কলেজ আর হ্যারিসন রোড, আর ডান দিক ধরে এগিয়ে গেলে বৈঠকখানার বাজার। আমরা কিন্তু ওদিক দিয়ে বাজারে গেলেও ইস্কুলে যাবার সময় ধরতুম অন্য পথ। তাতে বাজারের পথের ভিড়-ভাট্টা এড়ানো যেত। অখিল মিস্ত্রি লেন ধরে খানিক এগিয়ে বাঁয়ে না ঘুরে ডাইনে মোড় নিয়ে পৌঁছতুম জেলেপাড়ায়। সামনেই রাজচন্দ্র সেন লেন। সেখান থেকে স্কট লেন মাত্র এক মিনিটের পথ। ক্যানিং হস্টেল আর গির্জা পেরোলেই আমাদের ইস্কুল। যাবার পথে অখিল মিস্ত্রি লেন থেকে মণ্টুকে ডেকে নিয়ে যেতুম। বেল্টে-বাঁধা বইখাতা নিয়ে আমার ডাকের জন্যে সে একেবারে তৈরি হয়ে থাকত।

কিছু ছেলে টিফিনের কৌটো সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলে আসত। যারা একটু বড়ঘরের ছেলে, টিফিনের সময় যে তাদের বাড়ি থেকে ভৃত্যের হাত দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হত, এটাও মনে পড়ে। অলঙ্কার-ব্যবসায়ী বি সরকারের বাড়ি থেকে তাদের ছেলেদের জন্য আসত দুধ আর সন্দেশ। আমার মা'কে তো বিশাল সংসারের ঝক্কি সামলাতেই হিমসিম খেতে হত, তিনি তাই টিফিন তৈরি করে দেবার সময় পেতেন না। ঝি-চাকর দিয়ে জলখাবার পাঠিয়ে দেওযার প্ল্যানটাও তাঁর মাথায় কখনও খেলেনি। তিনি আমার হাতে রোজ একটি পয়সা তুলে দিয়ে বলতেন, "কিছু-একটা কিনে খাস। কিন্তু খবরদার, রাস্তার আজেবাজে জিনিস কক্ষনো খাবি না।"

'আজেবাজে জিনিস' মানে আলুকাবলি, ঘুগনি আর ডালমুট। আমার বিবেচনায় যা কিনা সুখাদ্য হিসাবে একেবারে তুলনাহীন। টিফিন আওয়ারে দেখতুম যে, উঁচু ক্লাসের দাদারা গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে সে-সব খাচ্ছে। কিন্তু হরিয়ার ভয়ে আমি গেট পেরোতে পারতুম না। ইস্কুল আর কলেজ তখন একই বাড়িতে। হরিয়া ছিল বঙ্গবাসী কলেজের বেয়ারা। দরকারি নানা কাগজপত্র বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবার জন্য রোজ রাত্তিরে সে একবার করে আমাদের বাড়িতে আসত। প্রথম দিনেই মা তাকে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি যেন ইস্কুল থেকে রাস্তায় না বেরোই। ফলে, যতদিন নীচের ক্লাসের ছাত্র ছিলুম, হরিয়ার নজরদারিতে টিফিন আওয়ারে রাস্তায় বেরোতে পারিনি। গেটের এদিক থেকে আলুকাবলিওয়ালার দিকে তাকিয়ে ততদিন শুধুই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়েছে।

টিফিন আওয়ারে আমার জলখাবার ছিল আধপয়সার আলুর দম আর আধ পযসার একটা জিভেগজা। ইস্কুলের বেয়ারা গয়া ও-দুটো জিনিস ইস্কুলের মধ্যেই বিক্রি করত। খেতে যে খুব খারাপ ছিল, তা নয়, তবে আলুকাবলি কি ঝালচানার তুলনায় খুব-একটা পুষ্টিকর নিশ্চয় ছিল না।

ইস্কুলের সামনে রাস্তার ও-পারে একটা দোকান ছিল। তাতে খাতা, পেনসিল, ইরেজার, পেনসিল কাটবার কল, ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স ইত্যাদি হরেক জিনিস পাওয়া যেত। সেখানে 'মেড ইন ব্যাভেরিয়া' যে কপিয়িং পেনসিল বিক্রি হত, তার তুল্য মোলায়েম পেনসিল সেকালে আর ছিল না। কিন্তু বিলিতি পেনসিল কেনা বারণ ছিল বলে সেদিকে তাকিয়ে থাকাই সার হত, কখনও একটা কিনতে পারিনি। তার বদলে এফ. এন. গুপ্ত কোম্পানির দিশি পেনসিল দিয়ে কাজ চালাতুম। তার কাঠ ছিল এত শক্ত যে, ব্লেড দিয়ে কাটতে গিয়ে প্রায়ই আঙুল কেটে যেত। তার শিষও ভেঙে যেত মটমট করে। পেনসিল কাটার কল যেহেতু বিদেশি, তাই সেটাও কেনা যেত না। কালি তৈরি করতুম জেবিডি বড়ি গুলে। তার জন্যে যে কাঠের তৈরি কলম ছিল, তার মাথায় আলাদা করে নিব পরিয়ে নিতে হত। নিব বলতে ছিল 'রেড ইংক' আর 'রিলিফ'। একটা সরু, অন্যটা মোটা। নিবের গায়ে লেখা থাকত 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড'। অর্থাৎ সেও বিলিতি জিনিস।

তা হলে আর ব্যাভেরিয়ার পেনসিলে আপত্তি কেন? মায়ের কাছে এই প্রশ্ন তুলে খুব সুবিধে হয়নি। কড়া ধমক খেয়েছিলুম।

২৩

ছেলেবেলার একটা মস্ত অংশ দেশের বাড়িতে ছিলুম বলে মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক, আমার ক্ষেত্রে তাতে একটা ফাঁক থেকে যায়। তালতলার বাড়িতে সেই ফাঁকটা আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে উঠছিল। যতই বকাঝকা করুন, মা'কে সেখানে কাছে পাওয়া যেত। কিন্তু ওই যে আমরা পাড়া পালটে চাঁপাতলায় চলে এলুম, তারপর থেকে আর তাঁকে বিশেষ কাছে পাইনি। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে তিনি হাজার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সেটা না-থেকে তাঁর উপায়ও ছিল না। তার কারণ, বাড়িটা ইতিমধ্যে যেন একটা হোটেল-বাড়ি হয়ে উঠেছিল। আত্মীয় অনাত্মীয়দের ভিড় বেড়ে গিয়েছিল হু-হু করে। সাত কামরার তিনতলা বাড়ি, তবু একটু নিশ্বাস ফেলবার মতো জায়গা সেখানে খুঁজে পাওয়া যেত না। সর্বত্র লোক একেবারে গিসগিস করত। অধিকাংশই ছাত্র, কেউ-কেউ ছাত্রাবস্থা পেরিয়ে এখন চাকরিপ্রার্থী। পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্যে কিংবা চাকরি-বাকরি খুঁজে নেবার জন্যে কলকাতায় থাকা দরকার, অথচ থাকবার জায়গা নেই, সুতরাং এক-হাতে একটা টিনের সুটকেস আর অন্য-হাতে বালিশ-জড়ানো একটা সতরঞ্চি নিয়ে শেয়ালদা ইস্টিশানে নেমে, যে কোনও একটা সম্পর্ক কি পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁরা আমাদের বাসায় এসে উঠতেন, তা সেই সম্পর্কটা যতই ক্ষীণ হোক।

একটা কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে। সেটা এই যে, বিছানাটা পাতবার মতো এক ফালি জায়গা আর দু'বেলার সাদামাটা আহার যে নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে, এতেই তাঁরা খুশি থাকতেন, এর চেয়ে বড় কোনও প্রত্যাশা তাঁদের ছিল না। বাজারও ছিল প্রায় শায়েস্তা খাঁয়ের আমলের মতো। মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় আমরা চাঁপাতলার বাড়িতে এসে ঢুকেছিলুম, তারপর আর সেই ভাড়ার কোনও নড়চড় হয়নি। মির্জাপুর স্ট্রিটের পরিমল ভাণ্ডার থেকে উৎকৃষ্ট যে বালাম চাল কেনা হত, তার দাম ছিল মন-পিছু সাড়ে চার টাকা। কাঁচা বাজারের অবস্থাও একই রকম। একটা টাকা নিয়ে শেয়ালদা বাজারে গেলে ফিরতি-পথে মুটের ঝাঁকায় মাল না-চাপিয়ে উপায় থাকত না, নিজে বইতে গেলে পিঠ বেঁকে যাবার উপক্রম হত। এই সবই ঠিক কথা। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও ভুললে চলবে না যে, আমাদের বাড়িতে এক-এক বেলায় তখন তিরিশ-পঁয়তিরিশটি মানুষের পাত পড়ছে। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে মানুষটি এদিকে ব্যবসায়ী নন, নেহাতই একজন অধ্যাপক। তাঁর বাঁধা-মাইনের টাকায় সেই বিশাল সংসার চালাতে গিয়ে মা'কে একেবারে চোখে অন্ধকার দেখতে হত। তাঁর নিজের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, ছেলেপুলেদেরও কোনও শখ মেটাবার

উপায় তখন তাঁর ছিল না।

অখিল মিস্ত্রি লেনে রজনীকান্ত গুপ্তের পৌত্র মণ্টুদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলুম, তার একটা আলাদা ঘর রয়েছে। সেখানে চেয়ারে বসে টেবিলে বই রেখে সে পড়ে। বাড়িতে এসে দিদিকে সে-কথা বলতে দিদি বলল, "ঠিক আছে, এক্ষুনি মা'কে গিয়ে বলছি, আমাদেরও টেবিল-চেয়ার চাই।" মা প্রথমটায় গররাজি হননি, কিন্তু টেবিল-চেয়ারের দাম জানবার জন্যে যাকে সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে পাঠালেন, সে যখন ফিরে এসে বলল যে, এক-এক জোড়া টেবিল-চেয়ারের দাম পড়বে অন্তত সাড়ে তিন টাকা, মায়ের তখন চক্ষুঃস্থির। দিদি আর আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "পড়াশুনো তো গোল্লায় গেছে, এখন টেবিল-চেয়ার চাই! যাযাঃ, অত বাবুগিরি করতে হবে না! তোদের বাবা তো বরাবর ফার্স্ট হতেন, তা তাঁর কি কখনও টেবিল-চেয়ারের দরকার হয়েছিল?"

আর আলাদা ঘর? ও-সব আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না। মাথা গুঁজবার মতো একটু জায়গা পেলেই আমরা তখন বর্তে যাই। বাড়িতে একগাদা লোক, চাঁপাতলায় উঠে আসবার পর খুব-একটা সময় লাগেনি, দু-চার মাসের মধ্যেই আমি সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলুন। দোতলার দশ বাই দশ ফুট যে-ঘরে আমি ঘুমোতুম, সেখানে তক্তপোশের বালাই ছিল না, মেঝের ওপর পাশাপাশি চারটে বিছানা পড়ত। বিছানা মানে আড়াই-ফুটি সতরঞ্চির উপবে পাতলা একটা তোশক কিংবা শুজনি, আর একটা বালিশ। পরের দিকে আমাদের পায়ের কাছেও, দরজার জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়ে, একটা বিছানা পড়তে শুরু করে। পাঁচজনই ছাত্র। কেউ ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের, কেউ কলেজের। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। সেই তপশ্চর্যার কাজটাও চলত বিছানার উপরেই। ঘুম থেকে উঠে যে যার বিছানা গুটিয়ে পাটিসাপটার মতন করে ফেলতুম। বালিশসুদ্ধ গোটাতুম বলে পাটিসাপটার পেটটা হত একটু ফুলো-মতন। ওরই উপরে বই রেখে আমি তারস্বরে চিৎকার করে পড়তুম: ওয়ান মর্নিং আই মেট এ লেম ম্যান...। ওরই উপরে খাতা রেখে আমি অঙ্ক কষতুম আর হাতের লেখা লিখতুম। কলকাতায় এসে পনরো বছর বয়স পর্যন্ত তো পদ্যও কিছু কম লিখিনি। তারও সবই ওই পেটফোলা পাটিসাপটার উপরে খাতা রেখে লেখা।

আমার লেখার হাত কোনও কালেই খুব ভাল নয়। তবে বাল্যকালে একটা ডেস্কো কিংবা টেবিল যদি পেতুম, তা হলে হয়তো হাতের লেখার ছাঁচটা আর-একটু সুন্দর হতে পারত। সুন্দর হস্তাক্ষরের মূল্য যে কতখানি, পরবর্তী কালে কাগজের আপিসের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ নিয়ে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি। বাইরে থেকে যে অজস্র লেখা সেখানে আসে, তার কোনও কোনওটার হস্তাক্ষরের ছাঁদ একেবারে কাগাবগার ঠ্যাঙের মতো। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে কনভেন্ট রোডের দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকায় কাজ করতুম। মাইনে যা-ই হোক, আমি তখন তার ম্যাগাজিন-এডিটর। সেখানে অনেক কষ্টে এই রকমের একটি লেখার মর্মোদ্ধার করে প্রেসে পাঠাই। খানিক বাদেই প্রেস-ম্যানেজার এসে আমাকে বলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি চান যে, আমার লাইনো অপারেটররা সবাই পাগল হয়ে যাক?" হঠাৎ এমন কথা উঠছে কেন, সেটা জিজ্ঞেস করবারও সময় পাইনি। যে-লেখা প্রেসে পাঠিয়েছিলুম, টেবিলের উপবে সেটা নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ছেলেবেলার কথায় ফিরে যাই। আমাদের ইস্কুলের মাঠ বলতে কিছু ছিল না। বাড়ির পিছনে মির্জাপুর পার্ক। সেখানে বড়-বড় নেতাদের একটা-না-একটা মিটিং রোজ হতই। প্রত্যেকেই তাঁরা 'জ্বালাময়ী বক্তৃতা' দিতেন। সম্ভবত সেই কারণেই মাটি এত তেতে থাকত যে, নামে পার্ক হলেও ওখানে কখনও ঘাস গজাতে পারত না। অন্তত আমাদের যৌবন বয়স পর্যন্ত মির্জাপুর পার্কে

আমরা ধুলো ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। তবে সেখানে দোলনা ছিল, স্লিপ ছিল। রিং আর প্যারালেল বারও ছিল। বেশি বয়সের ছেলেরা সেখানে দরদর করে ঘামতে-ঘামতে শরীরচর্চা করত। আমাদের ছোটদের নজর ছিল দোলনা আর স্লিপের দিকে। কিন্তু সেখানে এত লম্বা-লম্বা সব লাইন পড়ে যেত যে, দোলনায় ওঠা কিংবা স্লিপে চড়ার সৌভাগ্য বড় একটা ঘটত না। অগত্যা গলিটাকেই করে নিতে হয়েছিল আমাদের খেলার মাঠ।

গলিতে আমরা হা-ডু-ডু খেলতুম, ক্রিকেট খেলতুম, লাট্টু ঘোরাতুম। কলকাতার ছেলেরা হা-ডু-ডু বলত না, তারা বলত চু-কিতকিত। আমাদের বাচ্চাদের মহলে ক্রিকেট নামটাও তখন বিশেষ চালু হয়নি, ওটাকে আমরা ব্যাটবল বলতুম। ইট দিয়ে উইকেট সাজিয়ে শক্ত লেদার-বলের বদলে ক্যাম্বিসের বল দিয়ে খেলা হত। শক্ত-বলে যে মাথা ফাটবার কি কারও বাড়ির জানলার কাচ ভাঙবার ভয় ছিল, সেটা বড় কথা নয়, তা হলে তো ডাংগুলি খেলাও বন্ধ করতে হত, আসলে লেদার বল কিনবার মতো পয়সাই ছিল না।

নুর মহম্মদ লেনের একটা অংশ চওড়া, একটা অংশ সরু। সেই সরু অংশটা একে তো আমাদের বাড়ির পিছন দিকে, তার উপরে সেখানে রিকশা ছাড়া অন্য-কোনও গাড়ি-ঘোড়া কখনও ঢুকত না। খেলাও তাই সেইখানেই জমত। তাও একদিন দিদির কাছে ধরা পড়ে যাই। সে-কথা আগেই বলেছি। রাস্তায় খেলাও তখন থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ানোটা অবশ্য কখনও বন্ধ হয়নি। মৌলালিতে আবদুলের যে ঘুড়ির দোকান ছিল, বড়কাকা সেখান থেকে আমার জন্যে ঘুড়ি কিনে আনতেন। ফড়েপুকুরের ঘুড়িরও খুব নামডাক ছিল। মাঝেমধ্যে তাও যে কিনে আনতেন না, এমন নয়। আলেকজান্ডার সুতোর কাটিম কিনে নিজেরাই কাচ গুঁড়িয়ে টানা আর লাটা, দু'রকমের মাঞ্জা তৈরি করে নিতুম। সে ছিল এক এলাহি ব্যাপার। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সকাল থেকেই একেবারে হই-হই কাণ্ড বেধে যেত। রঙে রঙে আকাশ সেদিন একেবারে ছয়লাপ। মনে হত, ঘুড়ি তো নয়, অজস্র রঙের ফুলের পাপড়িতে আকাশটা ছেয়ে আছে। সারা কলকাতাই যেন সেদিন ছাতে উঠে আসত। ন্যাড়া ছাত থেকে পড়ে গিয়ে দু'একটা ছেলের যে মাথা ফাটত না, তাও নয়।

বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন অর্থাৎ পয়লা আশ্বিন থেকেই শুরু হয়ে যেত আগমনী গান। এখন আর বাড়িতে এসে ও-গান কেউ শোনায় না। তখন কিন্তু নিত্য সকালে থান-পরা কদমছাঁট চুলের এক বুড়ি আমাদের বাড়িতে এসে খঞ্জনি বাজিয়ে গান ধরত: 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার ভারী কেঁদেছে।' ওই গানই যেন কাছে টেনে আনত পুজোর দিনগুলিকে। আমার মায়ের যে এত কাজ, তবু দেখেছি যে, আগমনী গান শুনলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যেখানে যে-কাজেই ব্যস্ত থাকুন, দৌড়ে এসে সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে যেতেন। গান শেষ হবার পরে বুড়ির ঝুলিতে চাল ঢেলে দিয়ে বলতেন, "কাল আবার এসো কিন্তু। গান শুনিয়ে যেয়ো।" বলবার দরকার ছিল না। মহালয়ার দিন পর্যন্ত সে রোজ আসত। কখনও এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিনি।

যেমন এই বুড়ির কথা, তেমন আর-একটি লোকের কথাও মনে পড়ে। শেষ-রাত্তিরের আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে তার সুরেলা গলার ঝংকার শুনতুম: ভজো গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লহো গৌরাঙ্গের নাম রে। মাসান্তে একবার এসে সে তার বরাদ্দ নিয়ে যেত। বরাদ্দ ছিল এক আধুলি। সেটা সব-বাড়িতেই মিলত, এমন নয়। তবে কপালে-তিলক-কাটা সহাস্য বৃদ্ধটির যে তাই নিয়ে কোনও অনুযোগ ছিল, এমনও মনে হয় না।

যারা বাড়িতে বাড়িতে এইভাবে আগমনী গান গেয়ে, কি শেষ-রাত্তিরে নাম-গান শুনিয়ে,

জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের ভিখারি বলে ভাবতে আমার বড় সংকোচ হয়। মা বলতেন, "ওরা পয়সার জন্যে গান গায় না, এই যে ওরা গেরস্তকে গান শোনাচ্ছে, এটাই ওদের ধর্ম।" মা যে ভুল বলতেন, এমন আমার মনে হয় না।

দেশের বাড়িতে থাকতে খুব-একটা শাসনের মধ্যে আমি ছিলুম না। সেখানে আমার স্বাধীনতা ছিল একেবারে নিরঙ্কুশ। কিন্তু সেটা যে আমাকে দুর্বিনীত করে তুলেছিল, তাও নয়। বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলকাতায় থাকতে হচ্ছিল বলে এখানে আসার পর থেকেই আমি একটু জেদি ও গোঁয়ার হয়ে উঠি। মা ভাবতেন, এ আর কিছুই নয়, তিনি যে তাঁর ইচ্ছেমতো আমাকে বড় করে তুলতে পারেননি, এটা তারই ফল। মা'কে দোষ দিতে পারি না। প্রত্যেক মায়ের মনেই একটা ছাঁচ থাকে। সেই ছাঁচে তাঁর ছেলেমেয়েদের তিনি ঢালাই করতে চান। আমার ক্ষেত্রে তিনি সেটা পারেননি। কিংবা বলা যায়, তার সুযোগই আমার ছেলেবেলায় তিনি পাননি। তাই নিয়ে তাঁর দুঃখ ছিল। মন্টু হওয়ায় আমার মায়ের দুঃখ খানিকটা মেটে। সম্ভবত ভেবেছিলেন, বড় ছেলের শৈশবে তো তাকে কাছে পাওয়া যায়নি, এবারে এই ছোট ছেলেটিকে তিনি তাঁর আপন ইচ্ছেমতো নিজের হাতে মানুষ করে তুলবেন।

বাড়িতে বাবা, মা আর দিদির সঙ্গে আমার একটা ছবি দেখতুম। ছবিটা দেওঘরে তোলা। বাবা আর মা পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছেন। বাবার কোলে আমি। দিদি দাঁড়িয়ে আছে মায়ের পাশে। তখন আমার বয়স তিন বছরের বেশি হবে না। দেখে মনে হয় তখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্যটা বেশ ভালই ছিল। ম্যালেরিয়ার নিরন্তর আক্রমণে বছর-চারেক বয়স থেকেই সেটা একদম ভেঙে যায়। ডি. গুপ্তের ওষুধের তখন খুব নাম ডাক। লোকে বলত, ডি. গুপ্ত খাও, ও হচ্ছে ম্যালেরিয়ার যম। আমার ক্ষেত্রে ডি. গুপ্তের ওষুধে বিশেষ সুবিধে হল না। বোতল-বোতল যম-তেতো ওই ওষুধ খেতুম, কান সারাক্ষণ ভোঁ-ভোঁ করত, কিন্তু সন্ধে হলেই সেই যে কাঁপিয়ে জ্বর আসত, অনেক দিন পর্যন্ত তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়নি। বাবার ডাক্তার-বন্ধু ইন্দ্রকাকা বললেন, "ভাল করে ওকে দুধ খাওয়ান তো বউঠান, তা নইলে ওর ওই কান ভোঁ-ভোঁ করাটা যাবে না।" কিন্তু দুধে আমার ঘোর অরুচি। দু'বেলা আমার মুখের সামনে জামবাটি-ভরা দুধ এগিয়ে ধরে মা আমাকে সাধ্যসাধনা করেন, কিন্তু একটা মাত্র চুমুক দিয়েই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। এই নিয়ে কী যে অশান্তি হত, সে আর বলবার নয়। শেষে আর ধৈর্য রাখতে না পেরে মা একদিন দুম-দুম করে আমার পিঠে গোটা কয়েক কিল বসিয়ে দিয়ে বললেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে, তুই কি মরবি বলে পণ করেছিস?"

যদ্দুর বুঝতে পারি, ভাল করে দুধ খাওয়াবার প্রেসক্রিপশনটা আমার মায়ের খুব মনে ধরেছিল। সম্ভবত সেই কারণেই, আমার ক্ষেত্রে যখন সেটা প্রয়োগ করতে পারলেন না, তখন ঠিক করলেন যে, ছোট ছেলেটাকে যথাসম্ভব তিনি দুধের উপরেই রাখবেন। ছেলেবেলায় মন্টু যে একেবারেই ভাত খেত না, তা নয়, তবে ভাত যা খেত, দুধ খেত সেই তুলনায় অনেক বেশি। প্রথমে সে খেত গোরুর দুধ। পরে, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে মা যখন শুনলেন, গোরুর দুধের চেয়ে ছাগলের দুধ অনেক সহজপাচ্য আর তাতে গুণও অনেক বেশি, তখন ঠিক হল, মন্টুকে এবারে ছাগলের দুধ খাওয়াতে হবে। পাড়ায় যে লোকটা ছাগল এনে দুইয়ে দিত, উদ্যোগী হয়ে আমিই তাকে ডেকে আনি। সে এসে বলল, দিনে সে এক পো'র বেশি দুধ আপাতত দিতে পারবে না। ছাগলের দুধের দামও শুনলুম গোরুর দুধের চেয়ে অনেক বেশি। শুনে ছাগলওয়ালাকে মা বললেন, "ঠিক আছে, আপাতত ওই এক পো করেই দাও।" আর ছাগলওয়ালা চলে যাবার পরে আমাদের বললেন, "এক পো দুধে কী হবে? তার উপরে দামও তো দেখছি ভয়ঙ্কর।

এ তো মহা সমিস্যো হল!"

এই ঘটনার দিন দুই-তিন বাদে ইস্কুল থেকে ফিরে দিদি বলে, "মা, তোমার সমিস্যের সমাধান হয়েছে।"

কিসের সমস্যা, মা বোধহয় সে-কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দিদির কথার অর্থ কী, তা ধরতে না-পেরে তিনি বললেন, "কিসের সমিস্যো?"

দিদি বলে, "ছাগলের দুধের। আমার ইস্কুলের বন্ধু দুনিয়াদের বাড়িতে নাকি বিস্তর ছাগল। দুনিয়াকে আমি বলেছিলুম যে, আমার ছোটভাইটার জন্যে ছাগলের দুধ জোগাড় করতে পারছি না। দুনিয়া বাড়ি ফিরে সেই কথা তার মা'কে বলেছে। তাতে তার মা বলেছেন যে, তাঁদের তো ছাগলের অভাব নেই, তার থেকে একটা দুধেল ছাগলি তিনি আমাদের দিয়ে দেবেন। আমরা যদি চাই তো আজই দুনিয়াদের বাড়িতে গিয়ে ছাগলিটাকে নিয়ে আসতে পারি। রোজ নাকি অন্তত দেড় সের করে দুধ দেবে।"

শুনে তো মা দারুণ খুঁশি। বললেন, "বলিস কী, এ তো খুবই ভাল কথা।"

রাজবাড়ি থেকে মেজদা তার কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছেন। তিনি বললেন, "কিন্তু পিসিমা, সমস্ত দিক ভেবে দেখেছ?"

মা বললেন, "এর আবার ভাবাভাবির কী আছে?"

"আছে বইকী।" মেজদা বললেন, "ছাগল তো আনছ, কিন্তু সেটাকে দুইবে কে?"

"কেন, তুই দুইতে পারবি না?"

মেজদা বললেন, "অসম্ভব। শুধু আমি কেন, এ-বাড়ির কেউই ওটা পারবে না। এইজন্যেই বলছিলুম যে, কিছু-একটা করবার আগে সমস্ত দিক ভেবে দেখা চাই।"

মা বললেন, "ঠিক আছে, তোরা কেউ না-পারলেও লক্ষ্মী-ঠাকুর নিশ্চয়ই পারবে।"

লক্ষ্মী-ঠাকুর আমাদের বাড়ির রাঁধুনি বামুন। প্রস্তাব শুনে সে শিউরে উঠল বললে কমই বলা হয়। জিভ্ কেটে, কানের লতিতে হাত ছুঁইয়ে, তিন পা পিছিয়ে গিয়ে সে যা বলল, তার মমার্থ এই যে, দ্বারভাঙা থেকে কলকাতায় এসে এই যে মছলি পাকাচ্ছে, এতেই তার নরকদর্শন একেবারে অবধারিত,এর উপরে আবার ছাগল দুইয়ে সে তার পাপের বোঝা আর বাড়াতে পারবে না।

ছাতের উপরে তারের জাল লাগানো বাক্সের মধ্যে আমি তখন খরগোশ পুষি। তার উপরে বড়কাকার কাছে ভরসা পাওয়া গিয়েছিল, খুব শিগগিরই তিনি আমাকে একজোড়া বিলিতি ইঁদুর কিনে দেবেন। ইতিমধ্যে আবার একটা ছাগল আসছে শুনে আমি তো বেজায় খুশি। এখন মেজদা আর লক্ষ্মী-ঠাকুরের কথা শুনে মনে হল, প্রস্তাবটাকে তাঁরা একেবারেই আমল দিচ্ছেন না। বড্ড দমে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মায়ের কথা শুনে আবার চাঙ্গা ভাবটা ফিরে এল। মা বললেন, "যত্ত সব অপদার্থ!" তারপর দিদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর এই বন্ধুরা কোথায় থাকে?"

দিদি বলল, "জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে। বাড়ির ঠিকানা আমি লিখে এনেছি। আজ যদি যাই তো আজই দিয়ে দেবে।"

মা বললেন, "তোকে যেতে হবে না। নিতু আর খোকা গিয়ে নিয়ে আসুক। তুই একটা চিঠি লিখে দে।"

নিতু অর্থাৎ মেজদা বললেন, "ঠিক আছে। রিকশা করে ছাগলটাকে না হয় নিয়েই এলুম। কিন্তু আসল সমস্যাটার তো কোনও বিহিত হল না।"

"সমিস্যোটা আবার কী?"

"দুইবে কে?"

মা বললেন, "সে তোদের ভাবতে হবে না। আমাদের গলিতে যে-লোকটা দুধ বিক্রি করে, তার কাছ থেকে রোজ এক পো করে দুধ যখন নিচ্ছি, তখন তাকে বললে সে-ই দুধ দুইয়ে দেবে। তার জন্যে তাকে অবিশ্যি মাসে আরও দুটো করে টাকা দোব। যা, এখন ছাগলটাকে গিয়ে নিয়ে আয় তো।"

সেই যে একবার দিদিদের ইস্কুলের ফাংশানে গিয়ে বাঙাল কথা বলে খুব অপদস্থ হই, দিদির বন্ধুদের সম্পর্কে সেই থেকে আমার খুব ভয় জন্মে যায়। কে জানে, সেদিন যারা হিহি করে হেসেছিল, এই বন্ধুটি তাদেরই একজন কি না। মেজদার সঙ্গে খুব দুরুদুরু বক্ষে সেদিন তাই জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে যাই। গিয়ে দেখলুম, শুধু দুনিয়াদিদি কেন, তাঁর মা আর বাবাও দারুণ ভাল লোক। ওঁরা অবশ্য বাঙালি নন, ওঁদের বাড়ি লখনউয়ে, ব্যবসার সূত্রে কলকাতায় থাকেন। মেজদা আর আমাকে খুব যত্ন করে ফির্নি আর শরবত খাওয়ালেন। তারপর দুনিয়াদিদির বাবা আমাদের নিয়ে কাছেই আর-একটা বাড়িতে গিয়ে অনেকগুলো ছাগল দেখিয়ে বললেন, বকরিগুলোর সব ক'টাই এখন দুধ দিচ্ছে, এর মধ্যে "তুমাদের যেটা পসন্দ্ হোবে, লিয়ে যাও বেটা। অগর বাচ্ছাটাকেও সঙ্গে লিতে হোবে।"

দাড়িওয়ালা বেশ বড়সড় একটা ছাগলির শিং দুটো দেখলুম পেতল দিয়ে বাঁধানো। সেইটে আর তার বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় চেপে বাড়ি চলে এলুম। বাড়িতে সেদিন একেবারে আনন্দের জোয়ার। মা বললেন, "বাব্বা, ছাগলের দুধের যা দাম, একটা হিল্লে হল।"

তা কিন্তু হল না। পাড়ার ছাগলওয়ালা পরপর দু'দিন দুধ দুইতে এসে বলল, "এর তো দেখছি দুধই নেই।"

মা বললেন, "তা কী করে হয়? নিশ্চয়ই বাচ্ছাটা সব দুধ খেয়ে নিচ্ছে।"

আমি বললুম, "না মা, বাচ্চাটাকে অল্প একটু দুধ খাইয়ে তারপর আমি তো ওদের আলাদা-আলাদা জায়গায় বেঁধে রাখি।"

সেটা যে মিথ্যে কথা নয়, মা'ও সেটা জানতেন। তা হলে কেন এমন হচ্ছে? প্রশ্নটাব উত্তর পাওয়া গেল আরও হপ্তাখানেক বাদে। রবিবারের সন্ধেবেলায় সাঁজোবাসীর কাছে মা জামাকাপড়ের হিসেব বুঝে নিচ্ছেন, এমন সময় একতলার রান্নাঘর থেকে লক্ষ্মীঠাকুর একেবারে দাপাতে-দাপাতে উপরে এসে বলল, "মাইজি, এই বকরিটো রাচ্ছসি আছে!"

মা বললেন, "সে কী রে?"

"হাঁ মাইজি, নিজের দুধ ও নিজেই পিয়ে লিচ্ছে।"

দৌড়ে নীচে গিয়ে দেখি, লক্ষ্মী-ঠাকুর মোটেই মিথ্যে বলেনি। ঘাড় বাঁকিয়ে, কোমর থেকে বাঁধা ছিট-কাপড়ের থলি সরিয়ে, নিজেরই বাঁটে মুখ লাগিয়ে ছাগলিটা তখনও সমানে দুধ খেয়ে চলেছে। মা বললেন, "এ কী সব্বোনেশে কাণ্ড! বিদেয় কর্, বিদেয় কর্!"

কোথায় আর বিদেয় করব। ইস্কুলের বন্ধুদের মধ্যে কাদের বাড়িতে ছাগলের দুধের দরকার পড়েছে, খোঁজখবর নিয়ে দু'দিন বাদেই সেই বাচ্চাসমেত বকরিকে সেখানে চালান করে দিই। তারা নিতে আসেনি, মায়ের কাছ থেকে রিকশা-ভাড়া নিয়ে আমিই গরজ করে তাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলুম।

২৪

নানান ব্যাপারে অমিল থাকলেও অন্তত একটা ব্যাপারে সেকাল আর একালের মধ্যে একটা মিল চোখে পড়ে। একালের অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেপুলেদের যেমন 'লাইন' ধরাবার কথা ভাবেন, সেকালের অভিভাবকদেরও তেমন এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভাবিত হতে দেখতুম। যে-সব ছেলের অঙ্কে বিশেষ মাথা নেই, তারা 'লাইন' ধরতে পারবে না। তারা আর্টস পড়ে কেরানি, ইস্কুল-মাস্টার কি বড়জোর অধ্যাপক হবে। আর যারা অঙ্কে দড়, তারা পড়বে সায়েন্স। আই. এসসি. পাশ করে তারা কেউ পড়বে ডাক্তারি, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকবে। ওটাই হচ্ছে 'লাইন'। 'লাইন' ধরতে হলে সায়েন্স পড়তে হয়। তার জন্য অঙ্কে দড় হওয়া চাই। ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যারা অঙ্কে কাঁচা, টেনেটুনে কোনওরকমে পাশ করে যায়, তাদের অভিভাবকদের দুঃখ করে বলতে শুনতুম, "নাঃ, ওকে আর 'লাইন' ধরানো যাবে না!"

অঙ্কে আমিও কাঁচা, তাই আমাকে নিয়েও আমার মায়ের বড় ভাবনা ছিল। কিন্তু আমার কথা পরে হবে, তার আগে আমার ছোটকাকার কথা বলি। তিন কাকার মধ্যে এই ছোটকাকাই ছিলেন ছাত্র হিসাবে সবচেয়ে মেধাবী। বাবার মতো তিনিও ছিলেন ভাঙ্গা স্কুলের ছাত্র, সেখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্টার পেয়ে কলকাতায় পড়তে আসেন। সাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, যেমন বাংলা তেমন ইংরেজিটাও জানতেন চমৎকার, আর্টস পড়লে যে অধ্যাপক হিসাবে খুবই সফল হতে পারতেন, অন্তত আমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কেও যে লেটার পেয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়াল। বাবা তাঁর এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে বিলক্ষণ চিনতেন, তিনি চেয়েছিলেন ফণী আর্টস পড়ুক। কিন্তু ঠাকুর্দার তাতে সায় ছিল না। দেশের বাড়ি থেকে তিনি নির্দেশ পাঠালেন, 'অঙ্কে যখন লেটার পেয়েছে, তখন ওকে লাইন ধরিয়ে দাও।' ঠিক হল, ছোটকাকা আই. এসসি. পড়বেন, তারপর ডাক্তারি। কিন্তু এই যে লাইন যে ধরানো হল, এর ফলে তাঁর জীবনটাই যে বেলাইন হয়ে যেতে পারে, এটা খেয়াল করে দেখা হল না।

বেলাইন হলেই যে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়, তা নিশ্চয় নয়। ছোটকাকার জীবনও ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তী কালে যার নাম হয়েছে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, তিনি যখন সেই কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তখনই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, মড়ার হাড়গোড় হাতে নিয়ে গ্রে'জ অ্যানাটমির পাতা ওলটান বটে, কিন্তু সেটা নেহাতই রীতিরক্ষার জন্য, আসলে ও-সব ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর চিত্তের কোনও যোগসম্পর্ক নেই। সেটা না-থাকলেও পরীক্ষায় পাশ করা যায়। ছোটকাকাও করেছিলেন, সরকারি ডাক্তার হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজও করেছিলেন দীর্ঘদিন, কিন্তু এই একটা ব্যাপার লক্ষ করতুম যে, আমাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়,

তখন খবরাখবর জেনে নেবার পরে আমাদের সঙ্গে যা-কিছু কথাবার্তা বলেন, তার চোদ্দো-আনাই সাহিত্য নিয়ে। বুঝতে পারতুম, ডাক্তারি করেন বটে, কিন্তু সাহিত্যগ্রন্থ পড়েন প্রচুর। বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের হাল-হকিকত যে তাঁর নখদর্পণে, খানিকক্ষণ কথা বললেই সেটা ধরতে পারা যেত।

আমার এই ছোটকাকার মতো মানুষ আমি আরও অনেক দেখেছি। জীবনে তাঁরা সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। সফল সচ্ছল সংসারী মানুষ বলতে পাঁচজনে যা বোঝে, ঠিক তা-ই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা বলে যা মনে হয়েছে, তা এই যে, যেটা তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা, কর্মজীবনে সেটাকে মুক্তি দিতে পারেননি বলেই যেন চিত্তের কোনও একটা জায়গায় একটা বেদনা তাঁরা বহন করে চলেছেন। সন্দেহ করি, গুরুজনের চাপে পড়ে তাঁরাও একদিন 'লাইন' ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ছোটকাকার দৃষ্টান্তটা চোখের সামনে ছিল, এবং তার থেকেই আমার গুরুজনদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু করানো উচিত নয়। তার উপরে আবার ছোটকাকার তুলনায় আমি ছাত্রও অতি খারাপ। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি কম্পালসরি আর অ্যাডিশনাল, গণিতের এই দুটো পেপারেই নব্বইয়ের উপরে নম্বর পেয়েছিলেন, আর ক্লাস সেভেন থেকেই আমি এই বিষয়ে চল্লিশের উপর নম্বর পাই না। তবু যে কেন মা আমাকে লাইন ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তা একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। সেই সময়ে মায়ের সঙ্গে আমার একদিন যে কথাবার্তা হয়েছিল, এখনও সেটা ভুলিনি। ইস্কুল থেকেই জনাকয় বন্ধুর সঙ্গে সেদিন ময়দানে খেলা দেখতে গিয়েছিলুম, ফিরতে ফিরতে সাতটা বেজে যায়। ভেবেছিলুম, কলঘরে গিয়ে হাত-পা ধোবার ঝুঁকি না নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়তে শুরু করব, মা নিশ্চয় অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, আমি যে দেরি করে বাড়ি ফিরেছি সেটা ধরতে পারবেন না। কিন্তু তা আর হল কই। মা একেবারে দোতলার সিঁড়ির মুখেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি গিয়ে দোতলায় উঠবামাত্র খ্যাঁক করে আমাকে চেপে ধরলেন। মায়ের সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্রের অতঃপর যে কথা হল, তা এখানে তুলে দিচ্ছি:

"তুই কি এই বংশের মুখে চুনকালি না মাখিয়ে ছাড়বি না?"

এই রে, প্রশ্নটা শুনবামাত্র বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল। প্রথমেই মনে হল, কাজটা যে মোটেই ভাল হচ্ছে না তা বুঝেও নেহাতই কৌতূহলের তাড়নায় দিন দুই আগে যে আমি আমাদের রাঁধুনি বামুন লক্ষ্মী ঠাকুরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তার জ্বলন্ত বিড়িতে একটা টান মেরেছিলুম, মা নিশ্চয় সেটা জানতে পেরেছেন। তবু গোবেচারার মতন জিজ্ঞেস করলুম, "কেন, আমি কী করেছি?"

"কী করেছিস, তাও বলতে হবে? বল ইস্কুল থেকে কোথায় গিয়েছিলি? রাত যে এখন আটটা বাজে, সেদিকে খেয়াল আছে?"

যাক, এটা তা হলে সেই ব্যাপার নয়। বললুম, "আটটা কোথায়, সবে তো সাতটা বাজল।"

"ফের মুখে-মুখে কথা? গিয়েছিলি কোথায়?"

"ময়দানে খেলা দেখতে গিয়েছিলুম।"

"তা হলে ওই খেলাই দ্যাখ্, তোকে আর লাইন ধরতে হচ্ছে না!"

লাইন কথাটা সেই যে প্রথম শুনলুম, তা নয়, তবে এক্ষেত্রে ওর যে একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, সেটা সেই প্রথম আঁচ করি। মা বলেছিলেন, "অঙ্কে যে ছেলে চল্লিশ পায়, সে ডাক্তারি পড়বে কী করে?"

আমি বলেছিলুম, "ডাক্তার হতে আমার বয়েই গেছে! আমি মড়া কাটতে পারব না!"

"বেশ, তা হলে ইঞ্জিনিয়ার হবি। বাড়ি বানাবি। তার জন্যেও অঙ্ক শেখা চাই।"

"আমি যদি বাড়ি বানাই তো সে-বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।"

"ডাক্তারও হবি না, ইঞ্জিনিয়ারও হবি না।" গালে হাত দিয়ে মা বললেন, "তা হলে তুই হবিটা কী?"

"আমি কিচ্ছু হব না। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি দেশের বাড়িতে ফিরে যাব। গিয়ে চাষবাস করব।"

মায়ের মুখে এর পরে আর একটিও কথা সরেনি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি একতলায় নেমে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। সম্ভবত বুঝে গিয়েছিলেন যে, যতই বকাঝকা করুন, এর আর কিছু হবার নয়। হবেও না।

একটা ব্যাপারের উল্লেখ এখানে না-করলেই নয়। অঙ্কে আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত নম্বর নেহাত খারাপ পাইনি, কিন্তু ক্লাস সেভেন থেকেই সেটা চল্লিশে নেমে যায়। মা, ছোটকাকা আর পিসতুতো ও একটু দূর-সম্পর্কের এক জ্যাঠতুতো দাদা তাই নিয়ে আমাকে খুব বকাঝকা করতেন বটে, কিন্তু নম্বরটা হঠাৎ চল্লিশে নামল কেন, আর কেনই বা ঠিক চল্লিশেই অতঃপর কয়েকটা বছর ধরে সেটা আটকে রইল, একটুও উঠল না কিংবা একটুও নামল না, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর খোঁজার চেষ্টাই কখনও তাঁরা করেননি। প্রোগ্রেস রিপোর্টে অঙ্কের নম্বর দেখে ছোটকাকা বলতেন, "ফের সেই চল্লিশ? এ যে একেবারে নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু! ব্যাপার কী রে, অ্যাঁ?"

ব্যাপারটা আসলে এতই সরল যে, আজ সে-কথা মনে পড়লে হাসি পেয়ে যায়। এখনকার কথা বলতে পারব না, নানান শাখাপ্রশাখায় জড়িয়ে গিয়ে অঙ্ক একালে ইস্কুলের পর্যায়েও ঘোর জটিল একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনকার দিনে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত অঙ্ক বলতে একমাত্র অ্যারিথমেটিক অর্থাৎ পাটীগণিতই আমাদের শিক্ষণীয় ছিল। তার মোট নম্বর ছিল একশো। ক্লাস সেভেন থেকে ওই একশো নম্বর ভাগাভাগি হয়ে যেত পাটীগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতির মধ্যে। পাটীগণিতে চল্লিশ, বীজগণিতে তিরিশ আর জ্যামিতিতে তিরিশ। তা আমার মনে হল, স্রেফ পাটীগণিতের অঙ্ক কষেই যখন পাশ-নম্বর পাওয়া যাচ্ছে, তখন আর ওই নতুন দুটো বিষয় অ্যালজেব্রা আর জিওমেট্রি নিয়ে বেকার কেন মাথা ঘামাতে যাব! তা কখনও ঘামাইওনি। কে. পি. বসুর অ্যালজেব্রা আর হল অ্যান্ড স্টিভেন্সের জিওমেট্রি বই যেমনকে তেমন বইয়ের তাকে তোলা থাকত, তার একটা পাতাও কখনও উলটে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। যাদব চক্রবর্তীর পাটীগণিতকে কিন্তু বিন্দুমাত্র অবহেলা করিনি। বস্তুত ওরই দৌলতে চল্লিশটা নম্বর একেবারে নিয়ম-মাফিক এসে যেত। এক নম্বর কমও না, এক নম্বর বেশিও না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অবশ্য এর একটু ব্যত্যয় ঘটে যায়। ধরেই রেখেছিলুম, আমার বিবেচনায় যা ফুল মার্কস, এবারেও ঠিক সেই চল্লিশই পাব। কিন্তু মার্কশিটে চোখ বুলিয়ে দেখি, সাঁইত্রিশ পেয়েছি। মনে হয়, পাটীগণিত অংশের কোনও একটা অঙ্ক নিশ্চয় এমন নিয়মে কষেছিলুম, পরীক্ষক যাতে খুশি হননি। হয়তো সেই কারণেই, উত্তর নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও, তিনটে নম্বর তিনি কেটে নেন।

কথা বলতে-বলতে অনেক দূরে চলে এসেছি, এবার একটু পিছিয়ে যাই। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু মশাই ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে ১৯৩৩ সালে তিনি যখন অবসর নেন, তাঁর বয়স তখন আশি বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে কলেজ থেকে এক সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এটাও ঠিক হয়েছিল যে, অল্পবয়সী কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দিয়ে সেখানে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়ানো হবে।

গানটি লিখেছিলেন অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী। বঙ্গবাসী কলেজে তিনি বাংলা পড়াতেন।

তাঁর পরিচয় একালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে কতটা রাখেন তা আমার জানা নেই। তবে কিনা তাঁর ক্লাস করবার সৌভাগ্য তো আমারও হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার জোরে বলতে পারি যে, অমন সুন্দর করে আর অত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে যে কিছু পড়ানো যায়, শ্যামাপদ চক্রবর্তীকে অধ্যাপক হিসাবে না পেলে তা আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। অন্যান্য কলেজ থেকেও বিস্তর ছাত্র ছুটে আসত তাঁর ক্লাস করতে। প্রতিটি ক্লাসেই ভিড় যেন একেবারে উপচে পড়ত। অনেক অধ্যাপককেও, ক্লাস-রুমে জায়গা না পেয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে দেখেছি।

কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা পড়াতেন। পরে তাঁকেও আমাদের অধ্যাপক হিসাবে পাই। তবে এ যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স মাত্র ন'বছর, ইস্কুলের নেহাতই নীচের ক্লাসের পড়ুয়া, অধ্যাপক কিংবা কবি হিসাবে এঁদের খ্যাতির কথা তখন আমি কিছুই জানতুম না। এইটুকু শুধু জানতুম যে, এঁরা দু'জনেই আমার বাবার বন্ধু। দু'জনেই ছিলেন রসিক মানুষ। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। যেমন শ্যামাপদ চক্রবর্তী, তেমন প্যারীমোহন, দুজনেই ছিলেন আমাদের কাকাবাবু।

হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে এসে শ্যামাপদ-কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ রে, তোরা গান গাইবি?"

'তোরা' মানে দিদি আর আমি। আমরা তো অবাক। বাবাও মনে হল একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন। বললেন, "গান গাইবে? তার মানে?"

"মানে আর কী?" কাকাবাবু বললেন, "গিরিশ বসুর সংবর্ধনা-সভার দিন তো এসে গেল। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে না?"

"সেটা ওরা গাইবে?"

"উপায় কী। ঠিক করেছি, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দিয়ে এটা গাওয়াব। তা হাতের কাছে ওরা যখন রয়েছে, তখন আর বাচ্চা-ছেলেমেয়ের খোঁজে এ-বাড়ি সে-বাড়ি হাতড়ে মরব কেন?"

"কিন্তু গানের গ'ও তো ওরা জানে না?"

"ও আমি শিখিয়ে নেব।" শ্যামাপদ চক্রবর্তী বললেন, "কাল বিকেল থেকেই ওদের নিয়ে আমি বসে যাচ্ছি।"

যে কথা, সেই কাজ। পরদিন থেকেই সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসে গেল। কখনও আমাদের বাড়িতে, কখনও অধ্যাপক সত্যানন্দ রায়ের বাড়িতে। তিনিও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। প্রথম দিকে আমাদের পিছনের দিকের একটা বাড়িতে থাকতেন, পরে আমাদের একেবারে সামনের বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে আসেন। সমবেত কণ্ঠে মোট পাঁচজনকে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে। আমাদের বাড়ি থেকে ছিলুম আমি আর দিদি, সেই সঙ্গে সত্যানন্দ-কাকাবাবুর বাড়ি থেকে তাঁর দুই মেয়ে পারুল-মুকুল আর ভাইঝি রেণু। উদ্বোধন সঙ্গীতের প্রথম লাইনটা এখনও ভুলে যাইনি: 'ঝরঝর ঝরে সুধা মঙ্গলধারা, সুধাময়ী করো ধরণীরে।'

শ্যামাপদ চক্রবর্তী মশাইয়ের গানের গলা ছিল যেমন দরাজ, তেমন সুরেলা। গান শেখাতেনও খুব যত্ন করে। কোলের কাছে হারমনিয়াম টেনে নিয়ে দু-এক কলি গেয়েই আমাদের বলতেন, "ও কী, তোমরা চুপ করে থাকলে চলবে কেন! ধরো, ধরো, আমার সঙ্গে তোমরাও ধরো।" আমরা মাঝে-মাঝেই তালে ভুল করতুম, গলা যেখানে যতটা চড়ায় ওঠানো কিংবা খাদে নামানো দরকার, ঠিক ততটাই যে ওঠাতে-নামাতে পারতুম তাও নয়, স্কেলের গণ্ডগোলও ঘটে যেত, কিন্তু তিনি হাল ছাড়তেন না। সেই জয়ন্তী উৎসবের পরেও তিনি বেশ কিছুদিন আমাদের ক'জনকে গানের তালিম দিয়েছিলেন। রাগ-রাগিণীর ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে প্রায়ই তিনি মজার-মজার

এক-একটা কলি বানিয়ে তারপর সেটিকে বিভিন্ন রাগে গেয়ে শোনাতেন। 'ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়', স্রেফ এই তিনটি মাত্র শব্দ দিয়ে বানানো কলিটিকে তিনি যে একবার হরেক রকমে গেয়ে শুনিয়েছিলেন, সেটা এখনও মনে পড়ে।

মানুষটি ছিলেন রোগা-পাতলা। ধুতির সঙ্গে হালকা-কমলা রঙের পাঞ্জাবি পরতেন। গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন বলে সেটা খুব মানিয়েও যেত। নেশা বলতে ছিল পানজর্দা। ডিবেভর্তি খিলিপান আর জর্দার কৌটো সামনে এগিয়ে দিলেই হল, একটার-পর-একটা গান শুনিয়ে যেতেন। তা ছাড়া, ছোটদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যেতেন যে, মনে হত তিনি একেবারে তাদেরই সমবয়সী বন্ধু। হাস্য-পরিহাসে আর রঙ্গ-রসিকতাতেও তাঁর তুলনা ছিল না।

প্যারীমোহন সেনগুপ্তও ছিলেন মজলিশি মানুষ। তবে ছেলেবেলায় আমরা শ্যামাপদ চক্রবর্তীকে যতটা কাছে পেয়েছিলুম, তাঁকে ততটা পাইনি। বাবার সঙ্গে যখন গল্প করতেন, তখন দূর থেকে মাঝে-মাঝে তাঁর অট্টহাসি শুনতে পেতুম, এই মাত্র। পরে অবশ্য আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ হয়। সে-কথা পরে আসবে। এখন আবার ইস্কুলের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

যদ্দুর মনে পড়ে, ইস্কুলে সেকালে ক্লাস ফোর পর্যন্ত ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থ্য আর ইতিহাস পড়ানো হত। ভূগোল আর ইতিহাসের যে পাঠ্য বই পড়তুম, তাতে কোনও ধারানুক্রমিক ব্যাপার ছিল না। বদ্বীপ, অন্তরীপ, অববাহিকা, উপনদী, শাখানদী, মালভূমি, প্রণালী, যোজক ইত্যাদি বলতে কী বোঝায় সেটা জানতে হত, আর সেইসঙ্গে এটাও মুখস্থ করতে হত যে, পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা কমলালেবুর মতো গোল বটে, তবে উত্তরে-দক্ষিণে একটু চাপা। কমলালেবুর ক্ষেত্রে কোনটা উত্তর আর কোনটা দক্ষিণ, ক্লাসে একদিন এই প্রশ্ন তুলে মাস্টারমশাইয়ের কাছে প্রচণ্ড ধমক খাই। সম্ভবত তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁকে ঠাট্টা করা হচ্ছে। তা কিন্তু করিনি। সত্যি বলতে কী, কমলালেবু নিয়ে যে প্রশ্নটা সেদিন তুলেছিলুম, পৃথিবী সম্পর্কেও সেটা বোধহয় তোলা যেত। মহাশূন্যের তো কোনও উত্তর-দক্ষিণ নেই, পুব-পশ্চিমও না, সুতরাং তার মধ্যে যা ঘুরপাক খাচ্ছে, তারই বা দিঙ্‌নির্ণয় কীভাবে করব? কেপ অভ্‌ গুড হোপ-এর বাংলা যে উত্তমাশা অন্তরীপ, এইটে জেনে অবশ্য খুব ভাল লেগেছিল। ওর চেয়ে সুন্দর তর্জমা আর কিছু হতে পারত না। তা, ক্লাস ফোর পর্যন্ত ওই অব্দি ছিল আমাদের ভূগোলবিদ্যার দৌড়। আর ইতিহাস বলতে রাজা-রাজড়াদের জীবনের কিছু গল্প আমাদের পড়তে হত। তার মধ্যে 'সবক্তগিন ও হরিণশিশু'র গল্পটা এখনও মনে পড়ে।

মনে পড়ে মারাত্মক একটা ভূমিকম্পের কথাও। সদ্য তখন বোধহয় ক্লাস ফাইভে উঠেছি। বড়দিনের ছুটি শেষ হয়ে সদ্য ইস্কুল খুলেছে, জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাস, শীত কমেছে, কিন্তু একেবারে যে ফুরিয়ে গিয়েছে তা নয়, দুপুরবেলা, মাস্টারমশাই যথারীতি পড়াচ্ছেন, কিন্তু নতুন বছর সবে শুরু হয়েছে বলেই পড়াশুনোয় আমাদের মন তখনও তেমনভাবে বসেনি। হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, ইস্কুল-বাড়িটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। শীতকাল বলেই ফ্যান চলছিল না। কিন্তু উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, বন্ধ-ফ্যানও পাগলের মতন দোল খাচ্ছে। পিছনের বেঞ্চি থেকে কে যেন এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প!' আশপাশের বাড়ি থেকে শাঁখ বাজতে লাগল মুহুর্মুহু। ব্যস, পরমুহূর্তেই ক্লাস একদম ফাঁকা। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে দেখি, রাস্তার উপরে ভিড় জমে গিয়েছে। তার পরে আর ক্লাস বসেনি। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে দেখলুম, কোনও রাস্তাতেই ভিড়ের কিছু কমতি নেই। মনে হল, বাড়ি ফাঁকা করে গোটা শহর যেন রাস্তায় এসে নেমেছে।

ভূমিকম্প সম্পর্কে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। ভূমিকম্প বলে একটা কথা মাঝে-মাঝে

বড়দের মুখে শুনতুম বটে, কিন্তু ওটা যে কী বস্তু, মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসে, নাকি আকাশ থেকে মাথার উপরে ভেঙে পড়ে, সে-সব আমি কিছুই জানতুম না। মাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, "পৃথিবী মাঝে-মাঝে কেঁপে ওঠে তো, সেই কাঁপুনিকেই বলে ভূমিকম্প। তাতে কত বাড়িঘর যে ভেঙে পড়ে, আর কত লোক যে তার তলায় চাপা পড়ে মারা যায়, তার ঠিকঠিকানা নেই।"

"তা তো বুঝলুম, কিন্তু পৃথিবী মাঝে-মাঝে কেঁপে ওঠে কেন?"

"কাঁপবে না?" মা বললেন "মানুষ কি কম পাপ করে? সেই পাপের একটা বোঝা আছে না? তা অত-অত বোঝার ভার বওয়া কি সহজ কথা নাকি? মা-বসুমতী আর কত পাপের বোঝা বইবেন? যখন আর পারেন না, তখন কেঁপে উঠেন।"

"মানুষ কী পাপ করে মা?"

মা বললেন, "ওরে বাবা, পাপের কি শেষ আছে নাকি? চুরি করে, ডাকাতি করে, লুটপাট করে, খুন করে, মিথ্যে কথা বলে, লোককে ঠকায়। এই যে তুই মন দিয়ে লেখাপড়া করিস না, এও তো পাপ।"

রাত্তিরে বাবাকে সে-কথা বলতে তিনি হেসে বললেন, "না রে, অত সহজ নয়। যেমন ঝড় হয়, বন্যা হয়, এও তেমন একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার; এর সঙ্গে পাপপুণ্যের কোনও সম্পর্ক নেই।"

বাড়িতে সেদিন শুধু ভূমিকম্প নিয়েই সবাই কথা বলছিল। পরদিন সকালে খবরের কাগজ আসতে হেডলাইনের উপরে চোখ বুলিয়েই ছোটকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও বউদি, এ তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড!"

মা রান্নাঘরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি ছুটে এলেন। অন্যান্য ঘর থেকেও দুড়দাড় করে বেরিয়ে এল সবাই। সকলে এসে খবরের কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তা ভয়ঙ্কর কাণ্ডই বটে। ভূমিকম্পে এক বিহারেই নাকি হাজার-হাজার লোক মারা গিয়েছে। পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে চাঁদা আর কাপড়-জামা জোগাড় করবার পালা। সে-সব শুনলুম বিহারে পাঠানো হবে। একখানা ধুতি, চাদর কি শাড়ির চার কোনা চারজনে ধরে গলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দোতলা-তিনতলার বারান্দা কি ছাত থেকে বাড়ির মেয়ে-বউরা তার মধ্যে সিকি-দোআনি কি পুরনো জামাকাপড় ফেলে দিচ্ছে, অনেক দিন পর্যন্ত এই দৃশ্য তখন দেখেছি।

বন্যার চাঁদার জন্যও তখন মাঝে-মাঝেই এইভাবে মিছিল বার হত। তবে কিনা মন্তর ছাড়া যেমন পুজো হয় না, তেমন গান ছাড়া এই ধরনের মিছিলের কথা তখন ভাবা যেত না। মিছিলের একেবারে সামনে থাকত গলা থেকে সিংগ্‌ল রিডের হারমোনিয়াম ঝোলানো একটা লোক। একটা গানের প্রথম দুটি লাইন ছিল এইরকম: 'পূর্ববঙ্গে মৈমনসিঙে উঠিল ভীষণ ঘূর্ণী-ঝড়,/ভিক্ষা দিয়ে রক্ষা করো গো তাদের প্রাণ, তাদের ঘর।' একালেও বন্যা হয়, ঘূর্ণী-ঝড় হয়, ভূমিকম্প হয়, তাতে মানুষও বিস্তর মারা পড়ে, কিন্তু এইভাবে আর গান গেয়ে কোনও সঙ্ঘ-সমিতিকে ত্রাণের মিছিল বার করতে দেখি না।

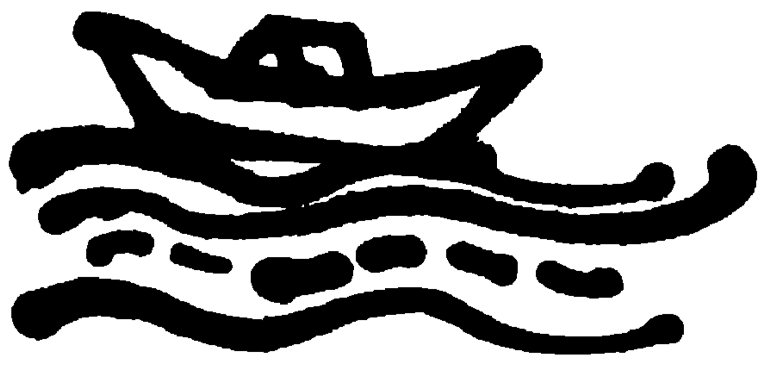

২৫

কনে দেখা আলোয় যখন দেখি, সব কিছুকেই তখন ভারী সুন্দর দেখায়। মাঠ ঘাট নদী নালা ঘর বাড়ি, সব সুন্দর, সব। ওই মায়াবী আলো সব দৈন্য ঢেকে দেয়। এঁদো গলির পলস্তারা-খসা বাড়িগুলোও তখন নিমেষে বড় রহস্যময় হয়ে ওঠে। দূরত্বেরও আছে ঠিক ওই রকমেরই এক জাদু। কালিদাসের কাব্যে লঙ্কা থেকে প্রত্যাগমনের পথে রামচন্দ্র যেহেতু পুষ্পক রথে বসে শূন্যপথ থেকে ভারতভূমিকে দেখেছিলেন, তাই তমালতালিবনরাজি-শোভিতা উপকূলের সৌন্দর্যটুকুই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সে-দেখা দূর থেকে দেখা বলেই কোনও কুশ্রীতা তখন তাঁর চোখে পড়েনি। এই অভিজ্ঞতা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদেরও। যার সর্বত্র জমে থাকে পাহাড়প্রমাণ জঞ্জাল, আর যার রাস্তাঘাটের অবস্থা ব্রণবিধ্বস্ত মুখের মতো, আকাশ থেকে যখন দেখি, তখন সেই শহরেরও কঙ্কালসার চেহারাটা আমরা আর দেখতে পাই না, তাকেও যেন হঠাৎ বড় লাবণ্যময় বলে ঠেকতে থাকে।

আমরা যে পিছনে চোখ ফিরিয়ে শৈশব আর বাল্যবয়সের দিকে তাকাই, সেও আসলে দূরের দেখা। মাঝখানে কেটে গেছে অনেকগুলি বছর ; সেই সময় আর এই সময়ের মাঝখানে ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে মস্ত একটা দূরত্ব। ফলে সেই সময়ের যা-কিছু খারাপ, যা-কিছু আমাদের সেই বয়সের দিনগলিকে মাঝে-মাঝে বড় দুঃখময় আর তিক্ত করে তুলত, এখন আর সে-সব আমাদের চোখেই পড়ছে না ; যা-কিছু দেখছি, সবই একেবারে আদ্যন্ত সুন্দর ঠেকছে।

কিংবা, কে জানে, এমনও হয়তো সম্ভব যে, মানুষের মাথার মধ্যে বসানো রয়েছে এক তাজ্জব ফিলটার। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা-কিছু অভিজ্ঞতা আমরা আহরণ করছি, মস্তিষ্কের মাধ্যমে দিনের পর দিন তা আমাদের স্মৃতির কলসিতে গিয়ে জমছে। কিন্তু ঠিক কতটা গিয়ে জমছে সেখানে ? সবটাই নিশ্চয় জমা পড়ছে না। মাঝখানে রয়েছে ওই ফিলটার। যে অভিজ্ঞতা তত মধুর নয়, দুঃখদায়ক, কদর্য কিংবা তেতো, ওই ফিলটারেই তা আটকে যায় ; আর যা সুন্দর, যা সর্বৈব গ্লানিহীন, একমাত্র তা-ই আমাদের স্মৃতির কলসিতে গিয়ে জমা হতে থাকে। আমরা যখন পিছনে তাকাই, হয়তো এইজন্যেই আমাদের অতীতটাকে তখন বড় সুন্দর দেখায়। এত গ্লানিহীন, এত মালিন্যহীন। কখনও যে অকারণে কঠিন শাস্তি পেয়েছিলুম, কিংবা হয়েছিলুম নির্মম বিদ্রূপের লক্ষ্য, কিংবা নিষ্ঠুর অপমানের যন্ত্রণানা যে সেই দূর অতীতেও কখনও কখনও রাত্রির ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তা আর তখন আমাদের মনে পড়ে না।

স্মৃতি নাকি সততই সুন্দর। কথাটা যে মিথ্যে, তা নিশ্চয় বলব না। তবে এটা সত্য শুধুই তাদের ক্ষেত্রে, যাদের মাথার মধ্যে ওই ফিলটার বসানো রয়েছে।

আমার মাথায় বোধহয় অমন কোনও ফিলটার বসানো নেই। তাই শৈশব আর বাল্যবয়সের বছরগুলির কথা যখন ভাবি, তখন সেই সময়টা যে একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল, এমন আমার মনে হয় না। ছিল, অনেক সুখের পাশাপাশি কিছু-কিছু দুঃখও তখন ছিল। কিছু গ্লানি, কিছু বেদনা, কিছু অপমান। বিনা-দোষে ইস্কুলে একদিন কঠিন শাস্তি পেয়েছিলুম। শাস্তিটা যিনি দিয়েছিলেন, সেই মাস্টারমশাইয়ের জন্য এখন বড় দুঃখ হয়। ভাবি, তিনিও বোধহয় খুব সুখী মানুষ ছিলেন না। কিন্তু আজও যখন সেই দিনটির কথা মনে পড়ে, মুখটা যে তখন হঠাৎ বড় তেতো হয়ে যায়, তাও স্বীকার করব।

তখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। ক্লাস ফোর পর্যন্ত এক অঙ্ক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে পরীক্ষা হত মৌখিক। মাস্টারমশাইরা মুখে মুখে প্রশ্ন করতেন, আমরা মুখে মুখে উত্তর দিতুম। এই প্রথম 'লিখিত পরীক্ষা' দিচ্ছি। বাড়ি থেকে দোয়াত-কলম নিয়ে এসেছি, দু'বেলায় দুটো পরীক্ষা দিতে হবে। হলে ঢুকে দেখি, ক্লাস ফাইভ আর ক্লাস সিক্সের ছাত্রদের মিলিয়ে মিশিয়ে সেখানে এমনভাবে বসতে দেওয়া হয়েছে, যাতে একই ক্লাসের দু'জন ছাত্রের আসন পাশাপাশি না পড়ে। এটা আর কিছুই নয়, ইস্কুলে যাকে আমরা 'টুকলিফাই করা' বলতুম, সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা। আমার আসন পড়েছে বেঞ্চির এক ধারে। পাশের আসনে বসে ক্লাস সিক্সের যে ছেলেটি পরীক্ষা দিচ্ছিল, তাকে চিনতুম। শুনেছিলুম যে, পরপর তিন বছর সে পাশ করতে পারেনি। 'গুণ্ডা ছেলে' বলে তার একটু দুর্নামও ছিল।

হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করে বসে। এটা লক্ষ করেছিলুম যে, সে কিছুই লিখতে পারছে না। উত্তরের খাতার প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় 'গড ইজ গুড' লিখে সেই যে সে চুপচাপ বসে আছে, তারপর আর সেই সাদা পাতায় একটা আঁচড়ও পড়েনি। হলে যিনি গার্ড দিচ্ছিলেন, তিনি কড়া ধাতের মাস্টারমশাই। দু'দিকে পরপর বেঞ্চি পাতা, তার মাঝখানকার সরু পথ দিয়ে ক্রমাগত তিনি পায়চারি করছিলেন, আর নজর রাখছিলেন কেউ 'টুকলিফাই' করছে কি না। এইভাবে যখন একবার সদ্য তিনি আমাদের বেঞ্চির পাশ দিয়ে এক পা এগিয়ে গিয়েছেন, তখন বলা নেই কওয়া নেই, পাশের আসনের ছেলেটি হঠাৎ আমার পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁর সাদা ধবধবে জামার পিঠের দিকটায় কালি ছিটিয়ে দেয়।

ব্যাপারটা যতই নিঃশব্দে ঘটে থাকুক, কিছু একটা যে হয়েছে, মাস্টারমশাই সেটা আঁচ করেছিলেন ঠিকই, নইলে নিশ্চয় পায়চারি করতে করতে থেমে গিয়ে তিনি পিছন ফিরে তাকাতেন না। কিন্তু ক্লাস সিক্সের ছেলেটি তার আগেই গুটিয়ে নিয়েছিল তার হাত। যা ঘটেছে, আমিই তার একমাত্র সাক্ষী। গোটা হলঘরে আর কেউ কিছু দেখতে পায়নি, পাবার কথাও নয়, মুখ গুঁজে সবাই তখন পরীক্ষা দিচ্ছিল।

আমাদের ঠিক পিছনের বেঞ্চির ধারে বসে যে ছেলেটি পরীক্ষা দিচ্ছিল, মাস্টারমশাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "দ্যাখ তো, আমার জামার পিছনে কিছু লেগে আছে কি না।"

ছেলেটি বলল "হ্যাঁ, স্যার, কালির দাগ। কেউ নিশ্চয় কালি ছিটিয়ে দিয়েছে।" বলে, কালির উপরে আঙুল বুলিয়ে আঙুলটায় যে কালি লেগেছে সেটা দেখে নিয়ে বলল, "একেবারে টাটকা কালি।"

মাস্টারমশাই আর কথা বাড়ালেন না, এক পা পিছিয়ে আমাদের বেঞ্চির পাশে এসে আমাকে বললেন, "উঠে আয়।"

তারপরেই শুরু হল মার। একেবারে এলোপাথাড়ি মার। এমন মার যে, সেই রাত্রেই আমার কাঁপিয়ে জ্বর আসে, বাদবাকি পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না। জ্বর তখন আমার প্রায়ই হত বলে

বাড়িতে আর এ নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেননি। ডি. গুপ্তের বোতল কিংবা পাইরেক্সের শিশি দু'একটা সব সময়েই মজুত থাকত। তা-ই খেতুম, ঘর যেমন আসত, তেমন চলেও যেত, কথায় কথায় ডাক্তার ডাকা হত না।

যে ছেলেটির জন্য সেদিন আমাকে মার খেতে হয়, ফেল করাটা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে পরের ক্লাসে উঠে তাকে আমার সহপাঠী হিসাবে পাই। প্রথম দিনই সে আমাকে বলে, "সেদিন যে তুই আমাকে ধরিয়ে দিসনি, এটা খুব বুদ্ধির কাজ করেছিস।"

"কেন ?"

"ধরিয়ে দিসনি বলে স্যারের হাতে মার খেলি, আর ধরিয়ে দিলে ইস্কুল ছুটির পরে আমার হাতে মার খেতি। তা হলে তোকে প্রাণে বাঁচতে হত না।"

শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যে, ওকে আমি মারব। ভাবলে এখন হাসি পায় ঠিকই, কিন্তু অস্বীকার করব না যে, সেদিন থেকে বেশ কিছুদিনের জন্যে এটাই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় যে, যেমন করেই হোক, ওকে মারতে হবে। কিন্তু এই শরীর নিয়ে সেটা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যটা ভাল করতে হবে। তার জন্যে ব্যায়াম করা দরকার। পরদিন থেকেই ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ডন-বৈঠক শুরু করে দিই। বাবাকে বলে একটু কম-ওজনের ডাম্বেল আনিয়ে নিই দুটো। নিয়মিত সেগুলো ভাঁজতে শুরু করি। মাস কয়েক এইরকম শরীরচর্চা চলে। তারপর যখন মনে হয় যে, আমাকে দু'ঘা দিলে আমিও চার ঘা বসিয়ে দিতে পারব, তখন ঠিক করি যে, এবারে একদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওকে ধরতে হবে। ছেলেটার বাড়ি কোথায়, তা জানি না, তবে ছুটির পরে ও যে স্কট লেন থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়ে তারপর রাস্তা পার হয়ে একটু দক্ষিণে গিয়ে ডাইনে মোড় ফিরে চুনাপুকুর লেনে ঢোকে, তা জানি। আমি উইলিয়ামস লেন আর স্কট লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। কিন্তু মারামারিটা সেখানে করব না। ওর পিছু নিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত যাব। যা হবার, সেখানেই হবে।

প্ল্যান অনুযায়ী ইস্কুল ছুটির পরে উইলিয়ামস লেনের মোড়ে অপেক্ষা করতে শুরু করি। প্রথম তিনদিন ওর দেখা মেলে না। চতুর্থ দিন ওকে দেখতে পাই। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে পিছুও নিই ওর। কিন্তু তার খানিক বাদেই যা ঘটে, সে একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার। ক্যানিং হস্টেল ছাড়িয়ে ছেলেটা সবে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় রাজচন্দ্র সেন লেনের ভিতর থেকে কয়েকটা ছেলে বেরিয়ে এসে ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর রাস্তার লোকেরা কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই একেবারে চ্যাংদোলা করে ওকে গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

ছেলেটা তারপর বেশ কিছুদিন ইস্কুলে আসেনি। যেদিন প্রথম এল, সেদিন দেখলুম ওর কপালে মস্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমার বয়স তখন দশ বছরের বেশি নয়। কিন্তু বয়স যতই কম হোক, এটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, একা আমার নয়, আরও অনেকেরই রাগ ছিল ওর উপরে। এখন বুঝি, এও এক রকমের 'পোয়েটিক জাস্টিস'। এ জীবনে 'বুলি' তো নেহাত কম দেখলুম না। যেমন ইস্কুলে, তেমন ইস্কুলের বাইরেও বিস্তর দেখেছি। এটাও দেখেছি যে, তাদের পরিণাম সাধারণত এই রকমই হয়ে থাকে।

আমাদের এই 'বুলিটি' এর কিছুদিন বাদেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ইস্কুল ছেড়ে চলে যায়। জানি না, এরপর সে অন্য কোনও ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল কি না। যদি হয়েও থাকে, তা হলে, আশা করি, সেখানে সে তার কোনও সহপাঠীকে বিপদে ফেলে দিয়ে 'বীরত্ব' দেখাবার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু এ তো গেল ছেলেটির কথা। বিনা অপরাধে যিনি আমাকে সেদিন বেধড়ক ঠেঙিয়েছিলেন, তাঁর বিষয়ে কী বলব? অপরাধটা আমার কি না তা যে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, এটাও তিনি ভেবে দেখেননি। অবশ্য জিজ্ঞেস করলেই যে অপরাধীর নামটা তাঁকে আমি বলে দিতুম তাও নয়, কিন্তু তাঁর তো একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু তা তিনি করলেন না। সেটুকু ধৈর্যও তাঁর ছিল না। যেই তিনি শুনলেন যে, তাঁর জামায় কালি ছেটানো হয়েছে, অমনি অপরাধী যে আমিই, এটা ধরে নিয়ে, তৎক্ষণাৎ আমাকে পেটাতে শুরু করলেন। তিনি যে ভুল করতে পারেন, এটুকু বুঝতে পারার মতো ক্ষমতাও তখন তাঁর নেই। তিনি সেদিন এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে, অন্তত সেই সময়টুকুর জন্য তাঁর যুক্তিবুদ্ধি একেবারে পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল। অথচ, তিনি একজন সাধারণ মানুষ নন, তিনি একজন শিক্ষক। তা এমন একজন শিক্ষক সম্পর্কে আমার ধারণা ঠিক কী হতে পারে?

না, তিনি যে আমাদের ভুলভাল পড়াতেন, তা কিছুতেই বলা যাবে না। গোটা ক্লাসকে শক্ত শাসনে বেঁধে রাখতেন, পড়াতেনও চমৎকার। নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে, কিংবা ওই যাকে 'দিনগত পাপক্ষয়' বলে তেমন দায়সারাভাবে কখনও তাঁকে ক্লাস নিতে দেখিনি। হোম টাস্কের প্রতিটি খাতা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন, কোথাও কোনও বাক্যে ভুল চোখে পড়লে মার্জিনে সেটিকে শুদ্ধ করে লিখে দিতেন, সে-সব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করব যে, পরবর্তী জীবনে যে মোটামুটি চলনসই ইংরেজিতে চাকরি কিংবা ছুটি কিংবা অগ্রিম বেতনের দরখাস্ত করতে গিয়ে কলম ভাঙতে হয়নি, সেটাও তাঁর শিক্ষার গুণে। এ-সব কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হব কেন? তিনি আমার শিক্ষক, আমি তাঁর ছাত্র। তাঁর কাছ থেকে যে আমি অনেক পেয়েছি, এবং আমার তরফে আর-একটু যত্ন আর আগ্রহ থাকলে যে আরও অনেক আমি পেতে পারতুম, সে-কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব।

কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা কথা আমাকে কবুল করতে হবে। সেটা এই যে, যত ভাল শিক্ষকই হোন, মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, এই কথাটা ভাবতে গেলে আমার চিত্ত হঠাৎ গুটিয়ে যায়। তখন মনে হয় যে, তিনি ক্রোধী মানুষ ছিলেন, তিনি বিবেচনাবুদ্ধির ধার ধারতেন না। এটাও মনে হয়, ক্রোধ সেদিন তাঁকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিল। ফলে এই কাণ্ডজ্ঞানটুকুও তখন তাঁর ছিল না যে, আমার পক্ষেও কিছু বলবার কথা থাকতে পারে, শাস্তিটা দেবার আগে যা কিনা তাঁর শোনাই চাই।

নিজের সম্পর্কে বলি, আমার ইস্কুল-জীবনের উপরে সেদিনকার ওই ঘটনা একটা মারাত্মক ছাপ ফেলে দেয়। বিনা দোষে শাস্তি পেয়েছি, এটা যেন আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। রাতের পর রাত তখন ঘুমোতে পারতুম না। সুস্থ হয়ে আবার ইস্কুলে যেতে শুরু করেছিলুম, কিন্তু সারাক্ষণই জ্বলতুম অপমানের জ্বালায়। মাস্টারমশাইরা যে-সব পড়া জিজ্ঞেস করতেন, তার উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও কিছু বলতে ইচ্ছে করত না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতুম। একটু জেদি আর গোঁয়ার তো ছিলুমই, সেই সঙ্গে যাঁরা আমার শিক্ষক, যাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাশীল হবার কথা, সাধারণভাবে তাঁদের সম্পর্কে একটা তাচ্ছিল্য-ভাব এসে যায়। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অভিশাপ আর কিছুই হতে পারে না।

পড়াশুনোয় মনোযোগও তখন থেকেই কমতে থাকে। একই সঙ্গে বেড়ে যায় গল্পের বই পড়বার ঝোঁক। আমাদের ছেলেবেলায় 'সন্দেশ' ছিল না, তার আগেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে অন্য যে শিশুপাঠ্য পত্রিকাটি আমাদের অভিভাবকরা কিনে দিতেন, সেটি ছিল বড্ডই জ্ঞানগর্ভ। সমুদ্রে কেন ঢেউ ওঠে, নদীতে কেন জোয়ারভাটা হয়, আকাশটাকে কেন নীল দেখায়,

বৃষ্টির পরে রামধনু ওঠার রহস্যটা কী, এ-সব কথা সেই পত্রিকাটি পড়লে জানা যেত ঠিকই, কিন্তু জানবার জন্যে আমি যে বিশেষ ব্যগ্র ছিলুম, তা বলতে পারি না। আমি চাইতুম ভূতের গল্প পড়তে, গোয়েন্দা-গল্প পড়তে, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়তে। ফলে জলখাবারের পয়সা জমিয়ে আমি 'মৌচাক' কিনতে শুরু করি। তার কিছুদিন আগেই আমার ছোটকাকার এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি এক কপি 'আবার যখের ধন' উপহার পেয়েছিলুম। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই বইখানা পড়ে কী যে ভাল লেগেছিল, তা আজও ভুলিনি। 'মৌচাক' পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার নিয়মিত লিখতেন। কাগজখানাকে মূলত সেই কারণেই তখন বড্ড ভালবাসতুম। তার জন্যে যে ইস্কুলের জলখাবার সেই আলুর দম আর জিবেগজা বাদ পড়ে যাচ্ছে, সেটা গ্রাহ্যও করতুম না। রজনীকান্ত গুপ্তের স্মৃতিরক্ষার জন্য আমহার্স্ট স্ট্রিটে যে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারও সদস্য হয়ে যাই। রোজই গিয়ে বই নিয়ে আসতুম। সবই গল্পের বই। ভূতের কিংবা গোয়েন্দার কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। তাতেই মশগুল হয়ে থাকতুম। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আমার কোনও কালেই খুব দৃঢ় ছিল না। এখন সেটা ক্রমেই আরও শিথিল হতে লাগল। এদিকে আবার বছর পাঁচেক বয়েস থেকেই তো পদ্য লিখতে শুরু করি, তার ঝোঁক ইতিমধ্যে আরও বেড়ে গিয়েছিল। গল্পের বই পড়ে যেটুকু সময় হাতে পাই, তা পদ্যের মিল খুঁজতেই কেটে যায়। লেখাপড়ার সঙ্গে বলতে গেলে কোনও সম্পর্কই আর রইল না।

মা সেটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি আর তখন আমাকে 'লাইন' ধরাবার স্বপ্ন দেখছেন না। ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারব কি না, তাই নিয়ে তাঁর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তিনি তো বকাঝকা করতেনই, পদ্য লিখে সময় নষ্ট করছি বলে আত্মীয় আর অনাত্মীয়েরা ব্যঙ্গবিদ্রূপও কিছু কম করতেন না। আত্মীয়েরা প্রকাশ্যে বলতেন, পদ্য লিখে আমি উচ্ছন্নে যাবার পথ পরিষ্কার করছি, আর অনাত্মীয়েরা আড়ালে বলতেন, এই যে আমি পদ্য লিখি, এর পরিণাম আর কিছুই নয়, পরবর্তী কালে আমাকে মুদির দোকানে খাতা লেখার চাকরি নিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। সবই আমার কানে আসত, কিন্তু আমি কিছুই বলতুম না। ইস্কুলে যেমন পারতপক্ষে মুখ খুলতুম না, বাড়িতেও তেমন চুপ করে থাকতুম। ওই যে বিনা দোষে ইস্কুলে একদিন প্রচণ্ড শাস্তি পাই, এখন বুঝতে পারি যে, ওই একটা ঘটনাই ভীষণভাবে পালটে দিয়েছিল আমাকে। আমার মনে হতে শুরু করেছিল যে, কাউকে কিছু বলবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, কেননা বললেও এরা শুনবে না, আর শুনলেও কিছু বুঝবে না। ফলে, বাইরে থেকে কোনও আক্রমণের আশঙ্কা ঘটলে শামুক যা করে, একেবারে তা-ই আমি করেছিলুম। নিজেকে আমি সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলুম নিজের মধ্যে।

বাড়িতে একমাত্র বাবা-ই ছিলেন ব্যতিক্রম। আমি যে গল্পের বইয়ের পোকা হয়ে উঠেছি, মায়ের কাছে এই অনুযোগ শুনে তিনি বলেছিলেন, "গল্পের বই পড়ে? সে তো কিছু খারাপ নয়।"

"তা হলে পড়ার বই কখন পড়বে? ইস্কুলে রেজাল্ট তো যাচ্ছেতাই হচ্ছে।"

"হোক গে," বাবা বলেছিলেন, "ইস্কুলের রেজাল্ট নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ো না, পরে নিশ্চয় ভাল করবে।"

আর পদ্য? আমি যে পদ্য লিখে খাতা ভরাই, পুজোর ছুটিতে একবার দেশের বাড়িতে গিয়ে ঠাকুমার কাছে এই কথা শুনে বাবা বলেছিলেন, "তাই নাকি? একটা লিখে আমাকে দেখা তো।"

শুনে বললুম, "কী নিয়ে লিখব?"

"তাও তো বটে।" বাবা খানিক চিন্তা করে বললেন, "ঠিক আছে, এখন তো শরৎকাল, তুই শরৎকাল নিয়ে একটা পদ্য লেখ।"

তক্ষুনি আমি খাতা পেনসিল নিয়ে বসে যাই। কী লিখেছিলুম সবটা মনে নেই, তবে তার একটা লাইন আজও ভুলিনি। 'শুভ্র মেঘে আকাশ নাচে, বৃষ্টির নামগন্ধ নাই।' লাইনটা মনে থাকবার কারণ আর কিছুই নয়, বাবা এই লাইনটা পড়ে হাসতে হাসতে বলেন, "আকাশের তো পা নেই, তবু কিনা তাকে তুই নাচিয়ে ছাড়লি!"

শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি। তখন বুঝিনি যে, ওটা বাবার মনের কথা নয়। রাত্তিরে বুঝলুম। তখন আমি বাবার পাশে শুয়ে ঘুমোই। বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "তখন হেসেছিলুম বটে, কিন্তু লাইনটা তুই ভালই লিখেছিস।"

পদ্যটা যখন লিখি, আমার বয়স তখন মেরেকেটে পাঁচ কিংবা সাড়ে পাঁচ। তখনই তো বাবার অনুমোদন পেয়ে গিয়েছি, তবে আর ভাবনা কী, পদ্য নিয়ে বাবার কাছে যে যতই নালিশ করুক, তিনি নিশ্চয় কারও কথা কানে তুলবেন না। তোলেনওনি। গল্পের বইয়ে আমার আসক্তির কথা বলে যখন ফল হল না, তখন নালিশ উঠল পদ্য লেখা নিয়ে। ঘটনাটা আমার সামনেই ঘটেছিল। বাবা পরীক্ষার খাতা দেখছেন, আর খাটের একদিকে বসে আমি পড়ছি 'মৌচাক'। এমন সময় আমার এক দাদা এসে ঘরে ঢোকেন। বাবা প্রথমে তাঁকে দেখতে পাননি। পরে গলা খাঁকারি শুনে চোখ তুলে বলেন, "কী ব্যাপার?"

"একটা কিছু তো করতে হয়।"

"কী ব্যাপারে?"

"খোকার ব্যাপারে। ওর তো পড়াশুনোয় একেবারেই মন নেই। পদ্য লিখে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।"

শুনে বাবা একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর পরীক্ষার খাতাগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন, "দ্যাখ, একটা কথা তোদের বলি। ঠিকঠাক হিসেব পাবার তো কোনও উপায় নেই। তবে আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত যারা উচ্ছন্নে গিয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই তাদের জীবনে এক লাইনও পদ্য লেখেনি।"

"কিন্তু পড়াশুনোও তো কিছুই করছে না।"

"তার মানে? ওই তো চুপচাপ বসে কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। ওটা পড়া নয়?"

মামলা কি ডিসমিস হয়ে গেল? তা কিন্তু হল না। দাদা চলে যাবার পরে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওটা তুই কী পড়ছিস রে?"

"হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটা গল্প, বাবা।"

"তা তো ভালই। কিন্তু ইস্কুলের পড়াও তো করতে হবে। সে-সব ঠিকমতো করছিস তো?"

"ইস্কুলের পড়া আমার ভাল লাগে না, বাবা।"

বাবা হেসে বললেন, "সে তো আমারও লাগত না। কিন্তু উপায় কী বল? ম্যাট্রিকটা তো পাশ করতে হবে। তারপর কলেজে ঢুকে দেখবি, তোর যা ভাল লাগে, সেটাই শুধু পড়তে হচ্ছে। তখন আর তোকে অঙ্ক করতে হবে না।"

২৬

একালের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেপুলেরা, আর-কিছু না হোক, অন্তত একটা ব্যাপারে সেকালের তুলনায় ঢের বেশি সাহসী, সেটা একেবারে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব। ইস্কুলে যাবার নাম শুনলে তাদের মাথা ধরে না, পেট কামড়ায় না, কম্প দিয়ে জ্বর আসে না। সাত-সকালে তারা ঘুম থেকে ওঠে, স্নান সেরে নেয়, বইখাতা গোছায়, তারপর যা হোক কিছু মুখে দিয়ে, প্যান্ট-শার্ট কি স্কার্ট-ব্লাউজ পরে নিয়ে, জলের বোতল গলায় ঝুলিয়ে স্কুল-বাসের জন্যে রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গে মা থাকেন, তাঁরই হাতে পুত্র কিংবা কন্যার বইখাতার বাক্স। যত বাচ্চা তত মা। মায়েরা নিজেদের মধ্যে গল্প করেন। সেকালের মায়েদের মতো রান্নাবান্না কি সেলাই-ফোঁড়াইয়ের গল্প নয়, ছেলেপুলেদেরই লেখাপড়ার বিষয়ে অতি উচ্চাঙ্গের আলোচনা। ছেলেপুলেরা গুলতানি করে নিজেদের মধ্যে। থলে হাতে বাজার যাওয়ার পথে এই দৃশ্য রোজই দেখতে পাই। ইস্কুলে যেতে কেউই যে বিশেষ গররাজি, তাদের মুখ দেখে অন্তত এমন কথা আমার একবারও মনে হয় না।

বরং মনে হয়, বেশ গরজ করেই এরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ঝকঝকে ইউনিফর্ম, গলায় টাই, পায়ে চকচকে জুতো, মুখে হাসি, বাস আসতেই যেমন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'-এর ভঙ্গিতে ঝপাঝপ তার মধ্যে উঠে পড়ে, তাতেই বুঝতে পারি, ইস্কুল সম্পর্কে কোনও ভয়ই এদের নেই। ভাবি, এই যে পরিবর্তন, এটা কী করে ঘটল। মেয়েদের কথা হচ্ছে না। তাদের ইস্কুলে তো মারধরের ব্যাপারটাই নেই। পড়া না-পারার কিংবা হোম টাস্কের অঙ্ক কষে না-আনার কিংবা ক্লাসের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলার অপরাধে কোনও দিদিমণি গিয়ে তার ছাত্রীর গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একখানা থাপ্পড় কষিয়ে দিচ্ছেন, কিংবা হেড-দিদিমণি বাতাসের মধ্যে লিকলিকে একখানা বেত নাচাতে নাচাতে হুমহাম শব্দে পরীক্ষার হলের ভেতর দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে গেলেন, এমন দৃশ্য সেকালেও দেখা যায়নি, একালেও যায় না। মেয়েদের ভাগ্য সেদিক থেকে ভালই বলতে হবে। কিন্তু ছেলেদের ইস্কুলের পরিবেশ তো একেবারেই অন্যরকম। অন্তত আমি যদ্দুর জানি, সে হচ্ছে ঘোর বিভীষিকাময় একটা জায়গা। তা হলে ' বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলো এই যে মুখে-চোখে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব ফুটিয়ে সেখানে যাচ্ছে, এটা কী করে সম্ভব হল? ইস্কুলে কি আজকাল মারধর একেবারেই করা হয় না?

আমাদের ছেলেবেলায় সেটা করা হত বললে খুব কমই বলা হয়। হিংসার পথে স্বরাজ আসবে, না অহিংসার পথে, কিংবা সন্ধের সময় বৈঠকখানা-বাজারে আলুর দর সের পিছু কতটা কমে, দেড় পয়সা না এক পয়সা, এইসব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নানা ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাক, যেটা নিয়ে আমাদের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা ষোলো আনার উপরে দু'আনা চাপিয়ে আঠারো আনা একমত ছিলেন বলে মনে হয়, সেটা এই যে, স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়ল দ্য চাইল্ড।

তফাত মাত্র এইটুকুই যে, কেউ বেশি মারতেন আর কেউ কম। কিন্তু মারতেন প্রত্যেকেই। একমাত্র রবিবার ছাড়া যিনি দাড়ি কামাতেন বলে কখনও মনে হয়নি, তিনিও মারতেন, আবার গিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে কোঁচা দুলিয়ে ফুলবাবুটি সেজে ক্লাসে আসতেন বলে দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে-আবডালে যাঁকে 'জামাইবাবু' বলে উল্লেখ করত, তিনিও মারতেন। কাউকে-কাউকে আবার ছাত্রদের জুলপি ধরেও বেদম জোরে টানতে দেখেছি। কানমলাটা তো নেহাতই সাধারণ ব্যাপার। তবে, সেটাকেও কেউ-কেউ এমন মারাত্মক একটা শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে, মাস্টারমশাইয়ের হাত যে কারও কানের দিকে এগোচ্ছে, এইটে দেখলেই গোটা ক্লাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রাণ নিয়ে যদি বা বাড়ি ফেরা যায়, কান নিয়ে ফেরা যাবে কি না, আমাদের ক্লাসের কেউই বস্তুত এ ব্যাপারে সেই সময়ে খুব একটা নিশ্চিন্ত ছিলুম না। মনে হত, আমাদেরই মাথার সঙ্গে লেপটে আছে বটে, কিন্তু ওই কানজোড়া আসলে মাস্টারমশাইদেরই সম্পত্তি, ও দুটোকে শেষ পর্যন্ত ওঁদের হাতেই সমর্পণ করে আসতে হবে।

এ তো গেল শারীরিক শাস্তির কথা। এর উপরে ছিল কথার মার। মাস্টারমশাইদের মধ্যে কেউ কেউ দেখেছি কথার বাণে ছাত্রদের বিদ্ধ করতে খুবই দক্ষ ছিলেন। আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে তাঁরা কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করতেন বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমাদের সহপাঠী বিষ্ণুচরণের কথা মনে পড়ছে। বিষ্ণু আমাদের চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ত, কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষায় তিন-তিনটে সাবজেক্টে ফেল করায় প্রোমোশন পায়নি বলে ক্লাস এইটে উঠে আমরা তাকে ধরে ফেলি। একটা কথা এখানে বলা দরকার। লেখাপড়ায় তার মাথাটা তেমন না-ই খুলুক, মানুষ হিসেবে বিষ্ণু ছিল বড্ড ভাল। সেদিক থেকে তার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু কোমল স্বভাবের, নিতান্ত নিরীহ ও স্পর্শকাতর এই ছেলেটিকেও মাস্টারমশাইদের কেউ কেউ দেখেছি বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে বেশ মজা পেতেন। এটাও মনে পড়ে যে, বিষ্ণুর বাবার যে একটা রঙের দোকান ছিল, তা নিয়েও তাঁরা ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। প্রায়ই বলতেন, 'আর লেখাপড়া করে কী হবে রে বিষ্টু, ও তোর হবার নয়, বাবাকে বলে এবারে বরং রঙের দোকানে বসে যা!'

কণ্ব মুনির আশ্রমে ঢুকে নিতান্ত নিরীহ একটি কৃষ্ণসারকে যখন বধ করতে উদ্যত হন, তখন '...ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ' বলে দুষ্মন্তকে ঠেকানো গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিরীহ জেনেই যখন কেউ কাউকে বধ করতে চান, তখন আর তাঁকে কী বলে ঠেকানো যাবে? কথাটা আরও এই জন্য বলছি যে, বিষ্ণুকে নিয়ে যাঁরা মজা করতেন, ক্লাসের হাড়ে-বজ্জাত ছেলেগুলোকে তাঁরা দেখেছি পারতপক্ষে ঘাঁটাতেন না।

তেমন ছেলেও প্রতিটি ক্লাসেই বেশ-কয়েকজন থাকত বই কী। পিছনের দিকের বেঞ্চিতে বসে চাপা-গলায় এরা নিজেদের মধ্যে গুলতানি করত, মেঝের উপরে চটি ঘষে শব্দ তুলত, তা ছাড়া সংস্কৃতের এক মাস্টারমশাইয়ের ক্লাসে কাগজ দিয়ে উড়োজাহাজ বানিয়ে এ-দিকে ও-দিকে ছুড়ে মারত। তবে কিনা, পেনসিলের ডগায় একটা দাড়ি কামাবার ব্লেড বসিয়ে আঙুলের টোকা মেরে সেই ঘুরন্ত ব্লেডখানিকে যেভাবে এরা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিত, সেটাই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক খেলা। এইরকমের একটা ব্লেড একবার সংস্কৃত-স্যারের নাকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি তখন পঞ্চতন্ত্রের সিংহ ও ইঁদুরছানার উপাখ্যানটি আমাদের পড়াচ্ছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে যান। মেঝে থেকে ব্লেডখানাকে কুড়িয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেটিকে নিরীক্ষণ করেন, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বলেন, "থাক, আজ আর তোমাদের

পড়াতে পারব না।"

নিরীহ স্বভাবের এই পণ্ডিতমশাইটির ক্লাসে পড়াশুনো যে এমনিতেও বিশেষ হত, তা নয়। শক্ত ধাতের মানুষ তো নন, তাই দুষ্টুমি আর গণ্ডগোল করবার জন্যে তাঁর ক্লাসকেই যে বেছে নেওয়া হবে, সেটা স্বাভাবিক। হঠাৎ তাঁর একটা দুর্বলতার খোঁজ পাবার পরে সেটার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। খোঁজটা আমাদের এক সহপাঠীই দিয়েছিল। একই পাড়া থেকে আসত বলে পণ্ডিতমশাইদের বাড়ির কিছু-কিছু হাঁড়ির খবর তার কাছে পাওয়া যেত। পণ্ডিতমশাইয়ের এক পুত্র যে কবিতা লেখেন, এবং শুধু যে লেখেন তা নয়, 'দীপালি', 'দুন্দুভি' 'বাতায়ন' ইত্যাদি পত্রিকায় যে মাঝে-মাঝে ছাপাও হয় তাঁর কবিতা, এটাও আমরা তারই কাছে জানতে পারি। তবে কিনা খবরটা চাউর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে পিছনের বেঞ্চিতে একটা মতলব গজিয়ে উঠেছিল, সেটা তখনও জানতুম না।

পরের দিন যথারীতি সংস্কৃতের পিরিয়ড শুরু হয়েছে। পণ্ডিতমশাই পড়াতে আরম্ভ করেছেন সেই রাজার গল্প, আরও সব বড়-বড় রাজার মুকুটমণির প্রভায় যাঁর চরণযুগল চর্চিত হত বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর পুত্র চারটির মন নেই বলে বড্ডই যাঁর দুঃখ ছিল। গল্পটা সংক্ষেপে বলে নিয়ে পণ্ডিতমশাই সদ্য তখন 'প্রবরনৃপমুকুটমণিমরীচিচয়চর্চিতচরণযুগলঃ'—সমাসবদ্ধ এই বিশাল শব্দসমষ্টিকে ভাঙতে শুরু করেছেন, হঠাৎ পিছনের বেঞ্চি থেকে সুখেন বলল, "স্যার, আজ আর সমস্কৃতো শিখতে ইচ্ছে করছে না, তার চে বরং গদাইদার একটা কবিতা পড়ুন।"

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখ দেখে মনে হল, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ থেকে চশমাজোড়াকে ঠেলে কপালের উপরে তুলে দিয়ে বললেন, "কার কবিতা পড়তে বললে ?"

সুখেন বলল, "গদাইদার কবিতা, স্যার।"

"কে গদাইদা ?"

"গদাধর ভট্‌চায, স্যার। আপনার পুত্র।"

"ওঃ, গদাধর !" এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন পণ্ডিতমশাই। "তা গদাধর যে কাব্যরচনা করে, তা তোমরা জানলে কী করে ?"

সুখেনের পাশ থেকে প্রেমচাঁদ বলল, "বাঃ, উনি লিখতে পারবেন, আর অন্যেরা তা জানতে পারবে না ? প্রতিভা কি কখনও চাপা থাকে স্যার ? এই তো, এবারের 'দুন্দুভি'তেই তো গদাইদার একটা পদ্য বেরিয়েছে।"

'দুন্দুভি'খানা প্রেমচাঁদ একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। সেখানা উঁচিয়ে ধরে সে বলল, "দারুণ পদ্য, স্যার। আমাদের বাংলা বইয়ে যা-সব পদ্য পড়ি, তার চাইতে অনেক ভাল। একবারটি আপনি পড়ে শোনাবেন স্যার ?"

কাগজখানা হাতে-হাতে পণ্ডিতমশাইয়ের টেবিলে গিয়ে পৌঁছল। সমাসবদ্ধ শব্দসমষ্টিকে ভেঙে-ভেঙে বোঝাবার কাজটায় একটা বড়-রকমের বিঘ্ন ঘটল বটে, কিন্তু যে-কারণে সেটা ঘটল, পণ্ডিতমশাই তাতে বিশেষ বেজার হয়েছেন বলে মনে হল না। পুত্রের কবিতাটি তিনি নিঃশব্দে বেশ মনোযোগ সহকারে বার কয়েক পড়ে নিলেন, তারপর আমাদের উদ্দেশে বললেন, "দ্যাখো, গদাধরের সমস্ত রচনাই যে তোমাদের মতো বালক-বয়সীদের উপযুক্ত তা নয়, তবে হ্যাঁ, এটা তোমাদের শোনানো যেতে পারে।"

কবিতা তো শুনলুমই, পুত্রস্নেহাতুর পিতার মুখে গদাধরচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কেও বিস্তর কথা সেদিন শোনা গেল। প্রসঙ্গত, তাঁর বাল্যবয়সের খুঁটিনাটি নানান কথাও

বাদ গেল না। যথা, গদাধর লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না বটে, কিন্তু শব্দে-শব্দে একেবারে ছেলেবেলা থেকেই মিল দিতে পারতেন চমৎকার। দুগ্ধপানে তাঁর দারুণ আপত্তি ছিল, তবে সন্দেশ-রসগোল্লা ও পরমান্ন খেতে খুব পছন্দ করতেন। নাকি পরমান্নের উপরে ছেলেবেলায় একটা পদ্যও তিনি লিখেছিলেন। অঙ্ক কযতে তাঁর ভাল লাগত না, সংস্কৃতেও বড্ড কাঁচা ছিলেন। তবে কিনা পন্ডিতমশাই তাই নিয়ে তাঁকে তাড়না করায় সেই সময়েই গদাধরচন্দ্র তাঁর পিতৃদেবকে নাকি বলেছিলেন, এ নিয়ে এত ভাবনার কিছু নেই, "স্বয়ং কবি কালিদাসও যে তাঁর যৌবনবয়স অবধি সংস্কৃতের স-ও জানতেন না, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

শুনে তো আমরা মুগ্ধ। সমস্বরে পন্ডিতমশাইকে জানিয়ে দিলুম, "আমরাও স্যার গদাইদার মতো হতে চাই।"

পন্ডিতমশাই মৃদু হাস্য করে বললেন, "হবে, হবে, নিশ্চয় হবে। কার মধ্যে যে কী প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তা কি বলা যায়? তোমাদের মধ্যে থেকেও যে দু-একজন গদাধর বেরিয়ে আসবে না, তা কে বলবে। আসতেই পারে।"

সংস্কৃতের পিরিয়ড এর পর থেকে খুবই আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ হল এক দিকের কথা। অন্যদিকে, সংস্কৃত পঠন-পাঠনেরও যে তখন থেকেই বারোটা বাজাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়, সেটাও স্বীকার করতে হবে। পন্ডিতমশাই এর আগে দেখেছি ক্লাসে ঢুকে পড়ানো শুরু করবার আগে একে-ওকে তাকে দুমদাম কয়েকটা প্রশ্ন করে বসতেন। কাউকে জিজ্ঞেস করতেন, 'লতা' শব্দেব পঞ্চমীর দ্বিবচন, কাউকে 'সাধু' শব্দের চতুর্থীর বহুবচন। এইভাবে সম্ভবত বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন যে, আগের আগের শ্রেণীগুলোতে যা শেখানো হয়েছে, ছেলেরা ইতিমধ্যে সে-সব ভুলে মেরে দিয়েছে কি না। প্রশ্নের এই বুলেটগুলোর মধ্যে কোনটা কখন কাকে তাগ করে ছুড়বেন তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না বলে সংস্কৃতের পিরিয়ডের প্রথম কয়েকটা মিনিট ক্লাসসুদ্ধ আমরা সব্বাই বড় তটস্থ থাকতুম।

কিন্তু এখন আব কোনও ভয় নেই, কেননা ক্লাসে ঢুকে কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগই তিনি পান না। অবশ্য 'সুযোগ পান না' না বলে 'সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয় না' বললেই ঠিক কথা বলা হয়। ঘন্টা পড়বার পর পন্ডিতমশাই এসে ঘবে ঢুকে চেয়াবের পিঠে যথারীতি তাঁব চাদরখানাকে পাট করে ঝুলিয়ে রাখেন, তারপর ক্লাসরুমের দিকে ঘুরে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই ছাত্রদের মধ্যে কেউ-না-কেউ অতি ব্যগ্র গলায় তাঁকে প্রশ্ন করে, "স্যার, গদাইদা কি নতুন-কিছু লিখলেন?" প্রশ্ন শুনে পন্ডিতমশাইয়ের মুখখানি একেবারে অমলিন হাসিতে ভবে যায়। কখনও বলেন, "না রে, শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছিল তো, তাই এর মধ্যে আর কিছু লিখে উঠতে পারেনি।" কখনও-বা পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ বার করতে করতে বলেন, "এটা কাল রাত্তিরে লিখেছে। তোদের শোনাব বলে ওর খাতা থেকে আমি টুকে এনেছি।"

খোলার থেকে সদ্য নামানো টাটকা পদ্য। এই পদ্য কাগজে পাঠানো হবে, সেখানে ছাপা হবে। কিন্তু তার আগেই আমরা তা শুনতে পাচ্ছি। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? পন্ডিতমশাই তাঁর পুত্রের রচিত পদ্য পড়েন। আমরা শুনি। পদ্যপাঠ শেষ হবার পরে নতুন করে আবার শুরু হয় গদাইদা-বিষয়ক আলোচনা। গদাইদা কখন লেখেন? কী দিয়ে লেখেন? ফাউন্টেন পেন দিয়ে না পেনসিল দিয়ে? মোট কথা, গদাইদা সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন একবার শুরু হলে আর চট করে শেষ হতে চায় না। ফলে পিরিয়ডের প্রায় অর্ধেকটাই কাবার হয়ে যায়। বাকি অর্ধেকটা পন্ডিতমশাই নমো-নমো করে শেষ করে দেন। আমরাও অন্তত সেদিনকার মতো হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের 'ব্যাকরণ কৌমুদী' আর বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্রম্' ও 'হিতোপদেশম্' থেকে স্নেহান্ধ পন্ডিতমশাইয়ের তাবৎ আগ্রহকে গদাধরচন্দ্রের পদ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সংস্কৃত-শিক্ষার ফাঁকি দেবার এই অসাধু প্রয়াস যে আমাদেরই বছর থেকে শুরু হয়েছিল, সে-কথা মিথ্যে নয়, তবে একই পন্থায় এই একই চেষ্টা যে আরও কয়েক বছর ধরে চলেছিল, তাও ঠিক। পন্ডিমশাই যতদিন না অবসর নেন, ততদিনই হয়তো চলত, কিন্তু তা আর চলেনি, ঘটনাচক্রে হঠাৎই একদিন এটা বন্ধ হয়ে যায়।

তার অনেক আগেই আমরা অবশ্য ম্যাট্রিক পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। তবে, বয়সে যারা আমাদের চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের ছোট, তারা তো তখনও ইস্কুলের ছাত্র, তাদের অনেকে আবার আমাদের পাড়ারই ছেলে, সুতরাং ইস্কুল সম্পর্কে খবরাখবর যা পাবার, তা তাদের কাছেই পাওয়া যেত। এই খবরটাও তাদের কাছেই শুনি। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পন্ডিতমশাই সেদিনও নাকি যথারীতি ক্লাসে এসে ঢুকেছিলেন, আর ছাত্রদেরও একজন সেদিন যথারীতি তাঁকে শুধিয়েছিল যে, 'গদাইদা' ইতিমধ্যে নতুন কোনও পদ্য রচনা করেছেন কি না।

কিন্তু পন্ডিতমশাই আর যথারীতি এই প্রশ্নে সেদিন আহ্লাদিত হননি। প্রশ্ন শুনে গম্ভীর গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কার কথা বলছ?"

"কেন স্যার, গদাইদার কথা।"

"কে গদাই?"

"কেন স্যার, আপনার পুত্র গদাধরচন্দ্র ভট্টাচার্য।"

"আমার পুত্র? গদাধরচন্দ্র?" পন্ডিতমশাই নাকি বোমার মতন ফেটে পড়ে বলেছিলেন, "ওই নামে কোনও পুত্র আমার নেই। কখনও ছিল বলেও মনে পড়ে না।"

অতঃপর আর একটিও বাক্যব্যয় না-করে তিনি একধার থেকে 'লতা' 'সাধু' 'মুনি' 'হাহা' ইত্যাদি সব শব্দের কোনটার চতুর্থীর দ্বিবচনে কী হবে আর কোনটার ষষ্ঠীর বহুবচনে কী, একে একে সব্বাইকে তা জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন, আর যারাই তার উত্তর দিতে পারে না, তাদের প্রত্যেককেই বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে দেন। হাই বেঞ্চির উপরে দাঁড় করানোটাই ছিল তখনকার দিনের সবচেয়ে অপমানজনক শাস্তি। তা দু'চারজনকে নাকি তাও তিনি করিয়ে ছেড়েছিলেন। গোটা ক্লাস একেবারে হতভম্ব।

পাড়ার যে ছেলেটির মুখে এই খবর পাই, ঘটনার আদ্যন্ত বিবরণ দিয়ে সে বলে, "পন্ডিতমশাই কেন যে অত রেগে গেলেন, কিছুই তো বুঝলুম না, খোকাদা।"

বুঝতে পারছিলুম না আমিও। তবে কিনা, পন্ডিতমশাইদের পাড়ার যে ছেলেটি ইস্কুলে আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত, কলেজেও সে তখন আমার সহপাঠী। পরদিন কলেজে গিয়ে তাকে সব বলতে সে একগাল হেসে বলল, "তা পন্ডিতমশাই তো রেগে যেতেই পারেন।"

"কেন? রেগে যাবার মতো কী হয়েছে?"

"কী আবার হবে, বাঁপকে কিছু না-জানিয়ে গদাইদা একটা বিয়ে করে ফেলেছে, আর পণ্ডিতমশাইও তাই শুনে বলে দিয়েছেন যে, অমন কুলাঙ্গার পুত্রের তিনি মুখদর্শনও করতে চান না।"

তো যা বলছিলুম। পারিবারিক অশান্তির কারণে হঠাৎ একদিন রেগে গিয়ে যা-ই করে থাকুন না কেন, আমাদের এই পণ্ডিতমশাইটি আসলে ছিলেন খুবই ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ। সেদিক থেকে তাঁকে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে। অমন ব্যতিক্রম আরও কিছু কি আর ছিলেন না? তা ছিলেন অবশ্যই। তবে কিনা শিক্ষকসমাজে তাঁরা ছিলেন নিতান্তই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অন্যদিকে,

সেই গুরুমশাইরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু, কাছে ঘেঁষবার তো কথাই উঠছে না, এমনকি দর্শনেরও না, দূর থেকে যাঁদের গলা-খাঁকারি শুনলেও আমাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যেত। আপন-আপন বিষয়ে এঁদের কারও অধিকারই যে কিছুমাত্র কম ছিল তা নয়, কিন্তু মারধর না-করেও যে সে-সব বিষয়কে ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব, অন্তত ঢোকাবার একটা চেষ্টা অবশ্যই করা যেতে পারে, এমন কথা সম্ভবত এঁদের একজনও বিশ্বাস করতেন না। তার ফল যা হবার, সচরাচর তা-ই হত। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে যে অনুরাগ না জাগলেই নয়, মাঝারি মেধার ছাত্রদের মধ্যে সেটা তো জাগতই না, বরং তার বদলে জেগে উঠত ঘোর আতঙ্ক।

ছাত্র-নির্যাতনের নব-নব পদ্ধতি উদ্ভাবনেও সেকালের কোনও কোনও শিক্ষকের প্রতিভা ছিল প্রশ্নাতীত। একজনের কথা মনে পড়ছে। পড়া না-পারলে কিংবা দুষ্টুমি করলে তিনি শুধু 'নিল ডাউন' করিয়েই ক্ষান্ত হতেন না; অপরাধী ছাত্রটিকে ক্লাসরুমের সামনের বারান্দায় গিয়ে 'নিল ডাউন' হতে হত, যাতে অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররাও ওই অবস্থায় তাকে দেখতে পায়। আর-একজন শিক্ষকের কথাও ভুলিনি। তর্জনী ও মধ্যমা, হাতের এই আঙুল দুটিকে সাঁড়াশির মতন ব্যবহার করে অপরাধী ছাত্রদের বাহুমূলের খানিকটা নীচের অংশ তিনি এমনভাবে মোচড়াতে থাকতেন যে, সেখানকার মাংস প্রায় ছিঁড়ে আসবার উপক্রম হত। আর-একজনের শাস্তি, দৈহিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক না-হলেও যে-কোনও, ছাত্রের পক্ষেই ছিল ঘোর অপমানজনক। কেউ পড়া না-পারলে তার পাশের ছেলেটিকে তিনি বলতেন, "দে তবে, ওর মুখে তবে তোর বাঁ-হাতখানা বুলিয়ে দে।" শিক্ষকের কাজ যে শুধু পড়ানো নয়, ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে যথাসাধ্য সাহায্য কবাটাও যে তাঁর কর্তব্যের অঙ্গীভূত, এটা সম্ভবত তাঁর জানা ছিল না। তা ছাড়া, এটাও সম্ভবত তিনি কখনও ভেবে দেখেননি যে, একদিকে যেমন এটা ঘোর গ্লানিকর একটা শাস্তি, অন্যদিকে তেমন এরই মাধ্যমে তিনি দুটি ছাত্রের মধ্যে একটা শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি কবে দিচ্ছেন।

কথাটা যখন উঠেই পড়েছে, একটি ঘটনার উল্লেখ তখন না করলেই নয়। ক্লাস সেভেনে যাঁদের আমরা শিক্ষক হিসাবে পাই, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন একটু বেশি রকমের রাগী। রেগে গেলে তিনি হাতের বদলে চামড়ার একটা বেল্ট দিয়ে পেটাতেন। এবং সেই বেল্টটি সরবরাহ করত আমাদেরই এক সহপাঠী। মাস্টারমশাই এসে ক্লাসে ঢুকবার পর, তাঁরই ইঙ্গিতে ছেলেটি তার প্যান্টের বেল্ট খুলে নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের টেবিলের উপবে রেখে আসত। ছেলেটি ছিল একটু নির্বোধ প্রকৃতির। যদিও সে আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, তবু গোটা ক্লাসের রাগ যে এর ফলে তারই উপরে গিয়ে পড়ছে, এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধিও তার ছিল না। বুঝল সেদিন, আমাদের ইস্কুল থেকে বিদায় নিয়ে এই মাস্টারমশাইটি যেদিন অন্য একটি ইস্কুলে চলে যান। সেই দিনই সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে লাট্টুপাড়ার মোড়ে আক্রান্ত হয় আমাদের এই সহপাঠী ছাত্রটি। তারই ক্লাসের গুটিকয় ছাত্র সেদিন অতর্কিতে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তাকে রাস্তার উপরে ফেলে রেখে তারা উধাও হয়ে যায়।

ইস্কুল-জীবন সম্পর্কিত এ-সব ভয়ের গল্প কি আর ইস্কুল-বাড়ির মধ্যেই আটকে থাকত? তা থাকত না। ছড়িয়ে পড়ত ইস্কুলের বাইরেও। ফলে, ইস্কুলে যেতে ছেলেরা ভয় তো পেতই, ইস্কুলে ঢুকবার পরেও সেই ভয় কিছুমাত্র কাটত না। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা ধরেই নিত যে, ইস্কুলে একটা কয়েদখানা। ইস্কুলে যাবার সময় উপস্থিত হলে তাদের মাথা ধরত, পেট কামড়াত, কারও-কারও জ্বরও এসে যেত। তাদের দোষ দিতে পারি না। পক্ষান্তরে, ইস্কুল জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে যে-সব বৃদ্ধ বলেন যে, সে বড় মধুর জীবন ছিল, আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস, হয় তাঁদের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে, অথবা তাঁরা ঘোর মিথ্যাবাদী।

২৭

যা সত্য, অনেক ক্ষেত্রেই তা লজ্জাজনক। কিন্তু সেটাকে চেপে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে দ্বিগুণ লজ্জা। তাই স্বীকার করা ভাল, ওই যে আমাকে ইস্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল, বিনা প্রহারে সেটা সম্ভব হয়নি। ইস্কুল সম্পর্কে ছেলেবেলায় যে-সব ভীতিপ্রদ গল্প শুনতুম, তাতে আমার এই রকমের একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, মাস্টারমশাইরা সেখানে পড়ান বটে, তবে সেটা একেবারেই গৌণ ব্যাপাব, বেধড়ক ঠেঙিয়ে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের হাড়মাস আলাদা করাটাই হচ্ছে তাঁদের মুখ্য কাজ। অমন জায়গায় কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায়?

আমি অন্তত চাইনি। আমার ছোট ভাই মন্টু অবশ্য, অন্যান্য সব ব্যাপারের মতো, এটাতেও আমার উপরে টেক্কা দিয়ে ছেড়েছিল। ইস্কুলে যেতে হবে, এই প্রস্তাব উঠবামাত্র সে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। আমাকে যে ইস্কুলে পাঠানো শেয পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ আর কিছুই নয়, বাড়িতেই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড প্রহার। সে একেবারে উঠতে-বসতে মার। তাতেই আমার সুবুদ্ধির উদয় হয়। বুঝতে পারি, বাড়িতে থেকেও যখন প্রহারের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশা নেই, তখন গুটি-গুটি এবারে বইখাতা নিয়ে ইস্কুলের পথে রওনা হওয়াই ভাল। সেখানে অন্তত নিত্যি-নিত্যি এই চোরের মার খেতে হবে না।

মন্টু ছিল আরও কঠিন পাত্র। সে যেমন মিষ্টি কথায় টলেনি, তেমন বকাঝকা আর মারধরেও না। অগত্যা একবার ঝাঁকামুটেব মাথায় চাপিয়ে তাকে ইস্কুলে পাঠাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি, মুটের মাথার ঝাঁকা থেকেও সে ছটকে পালিয়ে যায়। তাতে যে তার লেখাপড়ার খুব-একটা ক্ষতি হচ্ছিল, তা অবশ্য নয়। আট বছর বয়সে সে যখন প্রথম ইস্কুলে যায়, তখন দেখা গেল, ছ'বছর বয়স থেকে ইস্কুলে যেতে শুরু করলে সে যতটা শিখতে পারত, বাড়িতে বসে তার চেয়ে সে বেশি ছাড়া কম শেখেনি।

আট বছর বয়সেই মন্টু যে খুব নির্ভয় চিত্তে ইস্কুলে যেতে শুরু করেছিল, তাও বলতে পারি না। এ ব্যাপারে তার আপত্তি তখনও প্রচণ্ড। মন্টুর ইস্কুল-জীবনের প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। আমি তখন ক্লাস-টেনের ছাত্র। ছোটভাইকে তার ক্লাসে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি আমার ক্লাসে চলে আসি। প্রথম পিরিয়ডের ঘন্টা পড়ল। বৈদ্যনাথবাবু ক্লাসরুমে এসে ঢুকলেন। তাঁর পড়াবার বিষয় ব্রাউনিঙের সেই বিখ্যাত কবিতা 'দ্য পাইড পাইপার অভ্ হ্যামেলিন'। ইঁদুরের উৎপাতে হ্যামেলিন শহরে কী মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, এক বাঁশিওয়ালা এসে কীভাবে সেই উৎপাতের অবসান ঘটায়, কিন্তু সংকটমোচনের পরে শহরের মেয়র কীভাবে কথার খেলাপ করে, আর তার পরিণামে কী সর্বনাশ ঘটে যায় হ্যামেলিন শহরে, এই নিয়ে যে একটা কিংবদন্তি রয়েছে, তারই উপরে ব্রাউনিং লিখেছিলেন তাঁর এই কবিতা। কবিতার শেষটা বড্ড করুণ, তবে গোড়ার

দিকটায়—মানে ওই যেখানে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে দিশেহারা মেয়র-মশাইয়ের ছটফটানির বর্ণনা রয়েছে, সেই অংশটা—পড়তে বেশ মজাই লাগে।

তার উপরে আবার বৈদ্যনাথবাবু সেই অংশটা পড়াচ্ছিলেনও বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। পুরসভার বৈঠক চলছে, সেখানে তুমুল উত্তেজনা, মেয়রকে 'বোকার বেহদ্দ' বলে গালাগাল করছে সবাই, তারই মধ্যে ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, আর সেটাও সম্ভবত ইঁদুরের শব্দ, এই কথা ভেবে আঁতকে উঠে মেয়র বলছেন: "...এনিথিং লাইক দ্য সাউন্ড অব আ র‍্যাট/ মেক্স মাই হার্ট গো পিট-আ-প্যাট!"

গলায় যতটা আতঙ্ক ঢালা সম্ভব, ঠিক ততটাই ঢেলে দিয়ে বৈদ্যনাথবাবু যখন এই লাইন দুটো আমাদের পড়ে শোনাচ্ছেন, বাস্তবেও ঠিক তখনই ঘটল একটি নাটকীয় ঘটনা। আমাদের ক্লাস-রুমের ভেজানো-দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল, আর ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেয়েই মন্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা!'

গোটা ক্লাস হতভম্ব। মন্টু হাউমাউ করে কাঁদছে। বৈদ্যনাথবাবু রাশভারী মানুষ। কিন্তু তিনিও একেবারে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল, কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। বললুম, "স্যার, এ আমার ছোট ভাই, আমাকে ছুটি দিন, আমি একে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বৈদ্যনাথবাবু বললেন, "তা-ই যাও। ওঃ! ইট মেড মাই হার্ট গো পিট-আ-প্যাট।"

মন্টুকে সেই যে বাড়িতে রেখে এলুম, তারপরে আব অনেক দিন সে ইস্কুলে আসেনি। বছর খানেক বাদে যখন আবার এল, তখন একেবারে তৈরি হয়েই এল। বরাবর ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ড হত। সেও মূলত সাহিত্যেরই ছাত্র, তবে অঙ্কটাকেও ভয় পেত না।

বৈদ্যনাথবাবুর উল্লেখ করেছি। তাঁর সম্পর্কে আব দু-একটা কথা বলা দবকার। আমার ইস্কুল-জীবনের যে ক'জন শিক্ষকের কথা প্রায়ই মনে পড়ে, তিনি তাঁদেরই একজন। মাত্র একটা বছরই তাঁর কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, কিন্তু সেই একটা বছবের স্মৃতিই আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। অমন সৌম্যকান্তি মানুষ বড়-একটা চোখে পড়ে না, অমন ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষও না। একটু রাশভারী ছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর চোখেব কোণে মাঝে-মাঝেই একটু কৌতুক যে ঝিলিক মারত, তাও লক্ষ করেছি। মারধর করতে পছন্দ করতেন না, এমনকি বকাঝকা করতেও তাঁকে খুব কমই দেখেছি। অথচ তাঁর ক্লাসে যে একদিনও কোনও গণ্ডগোল কিংবা বিশৃঙ্খলা ঘটেছে, এমনও মনে পড়ে না। পড়াতেন অসম্ভব রকমের ভাল। এবং তারই জাদুতে গোটা ক্লাসকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। সত্যি বলতে কী, বৈদ্যনাথবাবুর মতন শিক্ষককে দেখেছি বলেই বুঝতে পারি যে, শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনোগ্রাহী করে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা যিনি ধরেন, ছাত্রদের বশে রাখা তাঁর পক্ষে আদৌ কোনও কঠিন কাজ নয়, বেত্র আস্ফালনের কোনও দরকারই তাঁর হয় না।

বৈদ্যনাথবাবু ক্লাস-নাইনে আর ক্লাস-টেনে পড়াতেন। তাঁর কাছে যে আমি মাত্র একটা বছরই পড়েছিলুম, তার কারণ, ক্লাস-নাইনে উঠেই আমি অন্য ইস্কুলে চলে যাই, তারপর একটা বছর বাদে আবার পুরনো ইস্কুলে ফিরে আসি। ক্লাস নাইনটা কেটেছিল মিত্র ইন্সটিটিউশনে।

এর একটা কারণ ছিল। আগেই বলেছি, ক্লাস সেভেন থেকেই অঙ্কে আমার নম্বর নেমে আসে চল্লিশে। হঠাৎ সেটা নিয়ে আমার ছোটকাকা একটু চিন্তায় পড়ে যান। অ্যালজেব্রা আর জিওমেট্রিকে যে আমার পাঠ্যজীবনে আমি আদৌ ঢুকতেই দিইনি, ও দুটো বিষয়কে দরজার একেবারে

বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে স্রেফ অ্যারিথমেটিকের চল্লিশ নম্বরের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, এটা তিনি বুঝতে পারেন না, আর-পাঁচজনের মতো তাঁরও ধারণা হয় যে, অঙ্কে আমি বড্ড কাঁচা। সুতরাং ইস্কুল পালটানো দরকার, যাতে কিনা মিত্র ইস্কুলের কড়া-ধাতের মাস্টারমশাইরা অঙ্কেও আমাকে আর-একটু পাকা করে তুলতে পারেন।

মিত্র ইস্কুলের তখন দারুণ নামডাক। সেটা বিচিত্র নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যে ইস্কুলের ছেলেরা গাদা-গাদা লেটার নিয়ে বেরুচ্ছে, তার যদি না নামডাক হয় তো কার হবে। স্টারও অনেকেই পেত। এখানে মনে রাখতে হবে, অবজেকটিভ পরীক্ষার কল্যাণে মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্টার পাওয়াটা একালে যত শস্তা হয়ে গিয়েছে, সেকালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্টার পাওয়া তত শস্তা ছিল না। ম্যাট্রিকে ওই ইস্কুল থেকে স্ট্যান্ডও করত মাঝে-মাঝে। অনেক ক্ষেত্রে আবার একাধিকজনও প্রথম দশের মধ্যে থেকে যেত। ছাত্র-ভর্তির ব্যাপারেও তাই কড়াকড়ি ছিল খুব। আমি তো ধরেই রেখেছিলুম যে, ওখানকার অ্যাডমিশন টেস্টের বেড়া ডিঙোনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরীক্ষাতেও তাই বসতে চাইনি। কিন্তু ছোটকাকা এমন জোর করতে লাগলেন যে, বসতেই হল।

আমাদের শেয়ালদা-পাড়ার মিত্র ইনস্টিটিউশনটাই মূল ইস্কুল, ভবানীপুরের মিত্র ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় কিছুকাল পরে, ওটা ব্রান্চ। তবে এত নামজাদা ইস্কুল হলে কী হয়, এই যে মেন্ ইস্কুল, এর নিজের বলতে কোনও বাড়ি ছিল না। এখন ও-ইস্কুল মির্জাপুর স্ট্রিটে উঠে এসেছে, তখন কিন্তু সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় একটা ভাড়াবাড়িতে ওর ক্লাস বসত। ওই বাড়িতেই একতলার একটা ঘুপচি-ঘরে বসে আমাকে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হয়েছিল, পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ইংরেজি আর অঙ্কের। নম্বর বরাদ্দ ছিল এক-একটা বিষয়ে পঞ্চাশ করে। তা ইংরেজির পরীক্ষা খুব একটা খারাপ দিইনি। কিন্তু অঙ্কের প্রশ্নপত্র দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম। মোট পাঁচটা অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র একটাই পাটীগণিতের। বাদবাকি চারটেই দেখলুম অ্যালজেব্রা থেকে এসেছে। বলা বাহুল্য, মাত্র একটা অঙ্ক কষেই খাতা জমা দিয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়।

বাড়ি ফিরে ছোটকাকাকে বললুম, "হবে না।"

ছোটকাকা বললেন, "কী করে বুঝলি ?"

"অঙ্কে দশের বেশি পাব না।"

"কেন," ছোটকাকা বললেন, "অঙ্কে তো তুই বরাবরই দেখি একশোর মধ্যে চল্লিশ পাস, তা হলে পঞ্চাশের মধ্যে অন্তত কুড়ি পাবি না কেন ?"

কেন যে পাব না, ছোটকাকাকে আর সে-কথা বুঝিয়ে বলা গেল না। পাড়ার বন্ধুরা এসে ওদিকে ডাকাডাকি করছিল। তাদের সঙ্গে খেলতে বেরিয়ে গেলুম। অ্যাডমিশন-টেস্টে যারা পাশ করেছে, দু-চার দিন বাদেই দেওয়ালে তাদের নাম টাঙিয়ে দেওয়া হল। দেখে এলুম, লিস্টিতে আমার নাম নেই।

মিত্র ইস্কুল আমাকে নেবে না জেনে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। তাই হঠাৎ যে-দিন ওখান থেকে একটা চিঠি আসে, সে-দিন একেবারে অবাক হয়ে যাই। অভিভাবকের নামে চিঠি, তাতে তাঁকে বলা হচ্ছে যে, চিঠি পেয়ে ওয়ার্ডকে সঙ্গে নিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তিনি যেন মিত্র ইনস্টিটিউশনে গিয়ে হেড মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন।

চিঠির বয়ান শুনে মা বললেন, "আজই গিয়ে দেখা কর।"

বললুম, "আমার সঙ্গে তো বড়দের কারও যাওয়া দরকার, কে যাবে ?"

বাবা অসুস্থ, তাঁর যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বড়কাকা সাত-সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

যান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ছোটকাকাও বাড়িতে নেই। থাকবার মধ্যে আছেন শুধু মেজকাকা। তাঁকে আমরা কাকুন বলি। মা বললেন, "ঠিক আছে, তোর কাকুনকেই সঙ্গে নিয়ে যা।"

তা-ই গেলুম। চিঠি দেখিয়ে ঢোকাও গেল হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে। আমার দিকে আঙুল তুলে কাকুনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছেলেটিই কি পরীক্ষা দিয়েছিল?"

কাকুন ছিলেন নেহাতই ভালমানুষ। এ যখনকার কথা, ঠাকুর্দা মারা যাওয়ায় স্থায়ী ভাবে তিনি তখন দেশের বাড়িতে থাকতেন, কোনও একটা কাজের সূত্রে তার আগের দিনই কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র। ইস্কুল পালটে আমাকে যে মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করবার চেষ্টা চলছে আর সেইজন্যই যে ইতিমধ্যে আমাকে ভর্তি-পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এত সব ব্যাপার তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। হেডমাস্টার নির্মল মিত্র মশাইয়ের গম্ভীর গলার প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী রে, তুই পরীক্ষা দিয়েছিলি নাকি?"

পরীক্ষা যে কেমন দিয়েছি, সে তো জানিই, তাই ঢোক গিলে বললুম, "হ্যাঁ।"

হেড মাস্টারমশাই সে-কথায় কানই দিলেন না। সন্দিগ্ধ চোখে কাকুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কী, আপনার ওয়ার্ড পরীক্ষা দিয়েছিল কি না, তাও আপনি জানেন না? কেমন গার্জেন আপনি?"

কাকুন তাতে আরও ঘাবড়ে গেলেন। কয়েকটা দিনের জন্যে কলকাতায় এসে যে এইরকমের জেরার মুখে পড়তে হবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি। তিনি একেবারে চুপ করে বসে রইলেন। অগত্যা আমাকেই বুঝিয়ে বলতে হল যে, গার্জেন আমার বাবা, কিন্তু তিনি অসুস্থ, তাই তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়, তবে অ্যাডমিশন ফর্মে যেখানে-যেখানে সই করা দবকার, আমাকে ভর্তি করা হলে তা তিনি করে দেবেন।

এতক্ষণে আমার দিকে চোখ পড়ল হেডমাস্টারমশাইয়ের। আমার কথা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। কিছু-একটা ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখো, অঙ্কে যে ছেলে পঞ্চাশের মধ্যে দশ পেয়েছে, তাকে আমাব ভর্তি না-করাই উচিত। কিন্তু তবু আমি ঠিক করেছি যে, তোমাকে ভর্তি কবে নেব। তার কারণ, ইন্‌সক্রাইব কথাটা একমাত্র তুমিই ব্যবহার করেছ।"

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অ্যাডমিশন-টেস্টের ইংরেজি প্রশ্নপত্রে একটা বাংলা প্যাসেজ ইংরেজিতে অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল। প্যাসেজটা এক ঘড়িচোবের দুর্গতি নিয়ে। লোকটা একটা ঘড়ি চুরি করেছিল। কিন্তু ডালার মধ্যে ঘড়ির নম্বরটা যে খোদাই করা রয়েছে, তা সে জানত না। ফলে পুলিশের হাতে ধবা পড়বার পরে সে প্রমাণ করতে পারেনি যে, ঘড়িটা তাবই। প্রকৃত মালিক কিন্তু নম্বরটা জানত। পুলিশকে সেই নম্বরটা জানাতে সে তার ঘড়ি ফেরত পেয়ে যায়।

নেহাতই সামান্য একটা ব্যাপার। তবু যে সেটা ভুলে যাইনি, তার কারণ সবাই বুঝতে পারবেন। আর-কিছু নয়, প্যাসেজের মধ্যে ওই যে 'খোদাই করা' বলে একটা কথা ছিল, আর ওটার ইংরেজি করতে গিয়ে ওই যে আমি ইন্‌সক্রাইব শব্দটা ব্যবহার করেছিলুম, স্রেফ ওরই জোরে অঙ্কে দশ পাওয়া সত্ত্বেও আমি মিত্র ইন্সটিটিউশনে ঢুকবার ছাড়পত্র পেয়ে যাই।

তবে সেখানকার যা প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা, সেও একেবারে দমিয়ে দেবার মতো। অটলবাবু ছিলেন চৌখস মাস্টারমশাই। যেমন ইংরেজি, তেমন আরও দু-তিনটে বিষয়ে তাঁর বেশ ভালরকম দখল ছিল, ছাত্রদের স্নেহও করতেন খুব, তবে একই সঙ্গে আবার মুখফোঁড়ও নেহাত কম ছিলেন না। আমাকে তো প্রথম দিনেই তিনি ঘোর অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেন। তাও সেটা আবার প্রথম দিনের প্রথম পিরিয়ড। নতুন ইস্কুল, সহপাঠীদের কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি, খুবই

সংকুচিতভাবে বেঞ্চির এক কোণে চুপচাপ বসে আছি, অটলবাবু ক্লাসে ঢুকে গোটা ঘরের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর আমার দিকে সেকেন্ড দুয়েক একেবারে মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন ছেলে?"

দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা কোন ইস্কুল আঁধার করে এলে?"

থতমত খেয়ে বললুম, "বঙ্গবাসী ইস্কুল, স্যার।"

"তা-ই বলো।" অটলবাবু এবারে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরা জেনে রাখ্ রে, যত আমার বয়েস বাড়ছে, ততই যেন চট্ করে আর কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। নয়তো কাল রাত্তিরেই তো এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।"

স্যার যে খুব-একটা মজার কথা বলতে চলেছেন, আর সেটা যে আমাকে নিয়েই, গোটা ক্লাস ততক্ষণে সেটা বুঝে ফেলেছে। অটলবাবুকে উশকে দেবার কোনও দরকার ছিল না, তবু ফার্স্ট বেঞ্চের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "কেন স্যার, এ-কথা কেন বলছেন?"

অটলবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললেন, "তা হলে শোন্। কাল সন্ধেয় আমাকে বৈঠকখানা বাজারে যেতে হয়েছিল। তা বাজার সেরে স্কট লেন দিয়ে ফিরবার সময় দেখি, গোটা পাড়া একেবারে অন্ধকার। তার মধ্যে আবার বঙ্গবাসী ইস্কুলেই দেখলুম অন্ধকারটা একেবারে যেন থান ইটের মতন জমাট বেঁধে গেছে। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে ..."

ফার্স্ট বেঞ্চের সেই ছেলেটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বোঝা উচিত ছিল স্যার?"

"বোঝা উচিত ছিল যে, নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ ওই ইস্কুল থেকে বিদায় নিয়েছেন।"

গোটা ক্লাস হোহো করে হেসে উঠল। হাতের ইঙ্গিতে তাদের থামিয়ে দিলেন অটলবাবু। তারপর ফের আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা তুমিই সেই মহাপুরুষ?"

আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মনে-মনে বলছিলুম, 'মা ধরণী, দ্বিধা হও।'

শুধু অটলবাবু কেন, এই ধরনের অস্বস্তিকর কথা মিত্র ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের মধ্যে আরও অনেকে বলতেন। দারুবাবু বলতেন, বীরেনবাবু বলতেন, নরেনবাবু বলতেন, রাজেনবাবু বলতেন। শিক্ষক হিসেবে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দক্ষ ও পরিশ্রমী, একাধারে কঠোর ও স্নেহশীল। আবার ব্যঙ্গবিদ্রূপে রঙ্গ-পরিহাসেও এঁদের কারও-কারও উৎসাহ যে অপরিসীম ছিল, সেটাও লক্ষ করেছি।

তবে সবচেয়ে যাঁকে বেশি সমীহ করতুম, গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা, তাঁকে কখনও রেগে যেতে কিংবা কাউকে ধমক-ধামক দিতেও দেখিনি। সত্যি বলতে কী, কৃষ্ণদয়াল বসু যে কখনও কাউকে কোনও বাঁকা কথা বলেছেন, এমনও মনে পড়ে না। রঙ্গ-রসিকতা যে একেবারেই করতেন না, তা নয়, তবে তাও একটা মাত্রার মধ্যে বাঁধা থাকত। পোশাকে-পরিচ্ছদেও ছিলেন শুচিতার প্রতিমূর্তি। ধুতির উপরে সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা উড়ুনি, এ ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে পরতে দেখা যেত না। শীতকালে সাদা উত্তরীয়ের বদলে পাড়বিহীন যে শালখানি ব্যবহার করতেন, তার রংও সাদা। যাঁরা ব্যাকরণবিদ, সাহিত্যের রসগ্রহণের ব্যাপারে প্রায়ই তাঁদের একটু ঘাটতি থাকতে দেখা যায়। কৃষ্ণদয়ালবাবুকে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে। ব্যাকরণে তাঁর পদচারণা ছিল অনায়াস, আবার তাৎক্ষণিক অর্থের আড়ালে যা অনেক সময় লুকিয়ে থাকে, কবিতার সেই নিহিতার্থের কথাও খুব সুন্দর করে তিনি বুঝিয়ে বলতেন। কোনটা কবিতা আর কোনটা নয়, ছন্দোবদ্ধ কিছু শব্দের সমাহার মাত্র, সেটা শনাক্ত করতে যে তাঁর কোনও অসুবিধা হত না, তার কারণ তিনি নিজেও ছিলেন কবিমানুষ। ছোটদের কাগজের জন্য লেখা তাঁর ছড়া

আর কবিতা মাঝে-মাঝে চোখে পড়ত। সে-সব লেখা যেমন মধুর, তেমন নিটোল। আমিও যে একটু-আধটু কবিতা লিখবার চেষ্টা করি, সেটা অবশ্য সাহস করে কখনও তাঁকে জানানো হয়নি।

এই কৃষ্ণকায়, মৃদুভাষী, মধুর প্রকৃতির মানুষটির ক্লাসে যে অতি দুরন্ত ছেলেও একেবারে চুপটি করে বসে থাকত, সেটা প্রধানত তাঁর ব্যক্তিত্বেব কারণে। ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত জিনিস। ওটা যাঁর থাকে, তাঁর থাকে। ক্রোধের ভিতর দিয়ে ওটা প্রকাশ করবার কোনও দরকারই তাঁর হয় না। সর্বদা শান্ত থেকেও সকলের আনুগত্য তিনি ঠিকই আকর্ষণ করতে পারেন। সবাই বলত, কৃষ্ণদয়ালবাবু খুবই শান্ত স্বভাবেব মানুষ। আমার মনে হত, তিনি একটু দূরের মানুষও বটেন। মনে হত, এই যে তিনি ক্লাসের মধ্যে রয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াচ্ছেন, তবু যেন আমাদের খুব-কাছে তিনি নেই, যেন নিজের চারপাশে একটা বলয় তিনি রচনা করে রেখেছেন, যেটা ডিঙিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছনো আমাদেব পক্ষে সম্ভব হবে না।

এর অনেক বছর বাদে কবি কালিদাস রায়েব সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনিও নামজাদা শিক্ষক। তবে মিত্র মেন-এ নয়, তিনি পড়াতেন মিত্র ইস্কুলের ভবানীপুব ব্রাঞ্চে। আমি যে মেন-এর ছাত্র ছিলুম, এটা শুনে তিনি বলেন, "বাঃ, তবে তো তুমি কৃষ্ণদয়ালের কাছে পড়েছ। অমন শিক্ষক ইস্কুল তো ইস্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতেও আজকাল কমই মেলে।"

কৃষ্ণদয়াল বসু যে ছাত্রদের বিশেষ বকাঝকা করতেন না, সে-কথা আগেই বলেছি। এখন বলি, ছাত্রদের মধ্যে কার কোথায় শক্তি আব কার কোথায় দুর্বলতা, অথবা কে মনোযোগী আব কে তা নয়, সে-সব তিনি ঠিকই লক্ষ কবতেন। ফাঁকি দিয়ে তাঁব কাছে পাব পাবাব উপায় ছিল না। চালাকি করতে গেলে বিপদে পড়তে হত। চালাকিটা ঠিকই ধবে ফেলতেন, এবং পরীক্ষার খাতায় তাই নিয়ে যে-সব মন্তব্য কবতেন, তার অনেকগুলিই হত মর্মভেদী। একটা ঘটনাব কথা বলি। বাংলায় 'এসে' লিখতে গিযে, কোনও একটা বক্তব্যেব সমর্থনে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মন্তব্য উদ্ধার করার অভ্যাসটা আমাদের অনেকেরই ছিল। মন্তব্যগুলোর সবই কি আব সত্যি? অনেকে অনেক মন্তব্য নিজেরা বানিযে নিযেও 'এসে'র মধ্যে বসিয়ে দেয়, কিন্তু সব পরীক্ষক তা ধরতে পারেন না। আমাদেরই এক বন্ধু যেমন একবার কাকের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে উপসংহাবে লিখে এসেছিল, 'মহামতি বাদারফোর্ড বলিয়াছেন, কাক না থাকিলে ধাঙড়দের কাজ বাড়িয়া যাইত।' কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু ওই মহামতি রাদারফোর্ড যে একেবারেই মনগড়া ব্যাপাব, পবীক্ষক তা ধরতে না পারায় সে পারও পেয়ে যায়।

কিন্তু কৃষ্ণদয়ালবাবুর কাছে কে পার পাবে? বাংলা 'এসে'র উপসংহারে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আমাদের সহপাঠী যে ছাত্রটি লিখেছিল "তাই তো ঋষি বলিয়াছেন...", তার পরীক্ষার খাতা যখন ফেরত এল, তারপরে আর দিন কয়েক সে মুখ তুলে কারও সঙ্গে কথাই বলতে পারেনি। 'ঋষি' শব্দটাকে লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে কৃষ্ণদয়ালবাবু তার পাশে লিখে দিয়েছেন: "কোন ঋষি? চালাকি কোবো না।"

২৮

যাঁকে সঙ্গে নিয়ে মিত্র ইনস্টিটিউশনে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলুম, আমার সেই মেজকাকা, সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু-একটা কথা না-বললেই নয়। আমরা তাঁকে কাকুন বলে ডাকতুম। ওটা আদরের ডাক। কাকুন ছিলেন নিতান্ত নিরীহ, নির্বিরোধ মানুষ। একটু ঘরকুনোও ছিলেন। কলেজে পড়বার সময় মানুষের তো কত বন্ধুবান্ধব হয়। তেমন বন্ধু বড়কাকারও ছিল, ছোটকাকারও ছিল। কিন্তু কাকুনের তেমন কোনও বন্ধু ছিল বলে মনে হয় না। থাকলেও তাঁদের কাউকে কখনও আমাদের ভালতলা কি চাঁপাতলার বাড়িতে এসে কাকুনের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে শুনিনি। কলেজ থেকে বড়কাকা আর ছোটকাকার ফিরতে অনেক সময় দেরি হত। কাকুনের কখনও দেরি হত না। ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বাড়ি ফিরতেন, আর ফিরেই লেগে যেতেন সংসারের কাজে। লেখাপড়ায় চৌখস ছিলেন না, বয়সের তুলনায় একটু পিছিয়েও ছিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধা, স্নেহ, মায়া, মমত্ববোধ ইত্যাদি যে-সব বৃত্তির সমাহার ঘটলে তবেই একটি মানুষের চরিত্র পরিপূর্ণতা পায়, কাকুনের মধ্যে তার কোনওটারই কিছুমাত্র ঘাটতি কখনও দেখিনি। একটু মুখচোরা মানুষ ছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই বড়দের জগতে ততটা স্বস্তি পেতেন না, যতটা পেতেন শিশু-মহলের সান্নিধ্যে।

দেবরদের মধ্যে তাঁর প্রতিই আমার মায়ের স্নেহ ছিল সর্বাধিক। সাংসারিক কাজে কাকুনের উপরে তিনি নির্ভরও করতেন অনেকখানি। মা বলতেন, "সুধা যত বুঝেশুনে গুছিয়ে বাজার করে আনে, এমন আর কেউ পারে না।" মা বলতেন, "সুধা তো জ্বরে পড়েছিল, তাই মুদির দোকানের মাসকাবারি এ-মাসে যাচ্ছেতাই হয়েছে।" মা বলতেন, "সুধা যে কোত্থেকে চা কেনে, তা জানি না বাপু, তবে সে-চায়ে যেমন চমৎকার লিকার হয়, তেমন ভুরভুর করে তার গন্ধ।" মা বলতেন, "ওরে সুধা, সামনে তোর পরীক্ষা বলে তোর মেজদাকে আজ বাজারে পাঠিয়েছিলুম, তার ফল কী হয়েছে দ্যাখ্। একে তো বরফ-চাপা রুইমাছ নিয়ে এসেছে, তার উপরে আবার যে লাউটা নিয়ে এসেছে, সেটার বয়েস বোধহয় আমার চেয়েও বেশি। তা লাউ আনলে সেইসঙ্গে এক-ভাগা কুচো-চিংড়িও তো আনবে। নাঃ, তাও আনেনি।"

কাকুনের উপর আমার মায়ের এই যে নির্ভরশীলতা, কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবার সময়ে এটা আরও বেড়ে যেত। দেশের বাড়িতে যেতে হলে বিছানা-বালিশ নেবার দরকার হত না ঠিকই, তবে এত সব লোকজনের জন্যে এত সব জিনিসপত্র নিতে হত যে, বাজারে-বাজারে ঘুরে দামদস্তুর যাচাই করে সে-সব কিনে এনেই ঝামেলা মিটত না, সেগুলোকে বাঁধাছাঁদা করে গুছিয়ে তোলাটাও ছিল এক বিশাল পর্ব। আর কাউকে ভার দিয়ে মা যেহেতু নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না, তাই তার দায়িত্বও সেই কাকুনের ঘাড়ে এসে পড়ত। যাত্রার দিন ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আনতেন কাকুন, শেয়ালদা ইস্টিশানে পৌঁছে কুলি ঠিক করতেন কাকুন, তারপর ঢাকা

মেলে উঠে বেঞ্চিতে ঝটপট সতরঞ্চি বিছিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থাও সেই কাকুন-ই করতেন। বাক্সের উপরে আর বেঞ্চির তলায় মালপত্রগুলিকে গুছিয়ে রেখে এবং বিস্তর কথা-কাটাকাটি আর ঝগড়াঝাটি করে কুলির পাওনাগণ্ডা মিটিয়েই যে তাঁর কাজ ফুরোত, তা নয়। গাড়ি ছাড়বার আগে যেমন করেই হোক, আমার মায়ের জন্যে তো বটেই, নিজের জন্যেও এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলতেন। দু'জনেই ছিলেন চায়ের ভক্ত। একমাত্র ঘুমের সময়টুকু বাদে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় তাঁদের চা চাই। তা ছাড়া তাঁদের চলত না।

শেষ রাত্তিরে ওই যে রাজবাড়ি ইস্টিশানে নেমে গাড়ি পালটে ব্রাঞ্চ-লাইনের গাড়িতে উঠতে হত, সেও ছিল এক মস্ত ঝামেলার ব্যাপার। সেটাও সেই কাকুন-ই একা সামলাতেন। গোবিন্দপুর ইস্টিশানে নৌকো ভাড়া করতে হত। কিন্তু বাবা যেহেতু ইস্টিশানে নেমেই 'তোমরা এদিকটা দ্যাখো, আমি এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি' বলে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে চলে যেতেন, তাই নৌকো ভাড়া করা থেকে শুরু করে পথের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা, সমস্ত কাজ করতে হত কাকুনকেই। গোবিন্দপুর জায়গাটা যে ফরিদপুর শহরেরই একটা অংশ, আগে কোথাও সে-কথা বলে থাকব। ফরিদপুরে বাবার অনেক বন্ধুবান্ধব। তাঁদের মধ্যে দীনেশ সেন মশাইয়ের বাড়িতে গেলে সহজে তিনি ছাড়া পেতেন না। দীনেশ সেন ছিলেন ফরিদপুরের নামজাদা রাজনৈতিক কর্মী। (চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেন মশাইয়ের তিনি বাবা। বলা বাহুল্য, এ যখনকার কথা বলছি, আমারই মতো মৃণালবাবু তখন ইশকুলের ছাত্র মাত্র। তাও নীচের দিকের ক্লাসের।)

বাবা গেছেন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে, কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। এদিকে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাকুন গেছেন চাল, ডাল, তেল, নুন, সবজি, চিঁড়ে, মুড়ি আর রসগোল্লা কিনতে। গোবিন্দপুর খালের ধারে তোরঙ্গ আর বেডিংয়ের উপরে একটা গাছতলায় আমরা বসে আছি। বাবার ফিরতে প্রায়ই বড্ড দেরি হত, বাজার সেরে কাকুনই বরং আগে ফিরতেন। মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে, এক হাতে একটা ইলিশ মাছ আর অন্য হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি ঝুলিয়ে, কাঠের পোলের ধার দিয়ে কাকুন খালপাড়ে নেমে আসছেন, এই দৃশ্য চোখে পড়বামাত্র কী যে স্বস্তি পেতুম, সে আর বলবার নয়।

মা বলতেন, "বাজার তো করে আনলি। মনে করে ইট তিনটে এনেছিস তো?"

মাঝপথে ফাঁকামতন কোনও একটা জায়গা দেখে, সেখানে নৌকো ভিড়িয়ে উনুন সাজিয়ে দুপুরবেলার রান্না হবে। তা সেই উনুনের জন্যে তিনখানা ইট চাই। কাকুন বলতেন, "শুধু ইট কেন, চ্যালাকাঠও এনেছি। একজনের বাগান থেকে গোটা কয়েক কলাপাতাও চেয়ে নিয়ে এলুম।"

শুনে মা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বলতেন, "এইজন্যেই তো বলি যে, সুধা হচ্ছে আমার ডানহাত। তুই না থাকলে চলে?"

কাকুনকে ছাড়া আমার মায়ের সত্যি চলত না। আমাদেরও না। হেগেনবেকের সার্কাস দেখতে যাব, তার জন্যে যেমন কাকুনকেই চাই, তেমন আবার কাছে গিয়ে উড়োজাহাজ দেখব বলে দমদমে যাব, তার জন্যেও চাই কাকুনকে। মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন বলে আর ছোটদের তাবৎ বায়নাকে এককথায় নাকচ করে দেবার বদভ্যাস ছিল না বলে অল্পবয়সীদের সঙ্গী হিসেবে ছিলেন একেবারে আদর্শ। নিজে একটু ভালমন্দ খেতে ভালবাসতেন। সম্ভবত সেইজন্যেই তাঁর সঙ্গে যখন কোথাও যেতুম, তখন এই একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যেত যে, সারাটা পথ খেতে-খেতে যাওয়া যাবে। আমাদের সব অভিভাবকই বিশ্বাস করতেন যে, ইস্টিশানের সমস্ত খাবারই একেবারে বিষবৎ পরিত্যাজ্য, ও-সব যারা খায়, তাদের নির্ঘাত কলেরা হয়। কিন্তু কাকুন

ছিলেন ব্যতিক্রম। মায়ের সামনে মুখ খুলতেন না বটে, কিন্তু আড়ালে-আবডালে আমাদের বলতেন, 'ধুর! তা যদি হত, তা হলে এখনও বেঁচে আছি কী করে, কলেরায় কবে ফৌত হয়ে যেতুম।' ফলে মা আর বাবা তো সাধারণত বড়দিনের ছুটিটা কলকাতাতেই কাটাতেন, সেই সময়ে ওই যে কয়েকটা দিন ঠাকুমা আর ঠাকুর্দার কাছ থেকে ঘুরে আসব বলে চিটাগং এক্সপ্রেসে উঠে কাকুনের সঙ্গে দেশের বাড়িতে রওনা হয়ে যেতুম, তার আনন্দই ছিল আলাদা। কাকুনকে কিছু বলতেও হত না, তার কারণ ছোটদের কাছে রানাঘাট মানেই যে পান্তুয়া, কুষ্টিয়া মানেই যে রাঘবসাঁই সন্দেশ আর পোড়াদা মানেই যে কাঁচাগোল্লা, তা তিনি খুব ভালই জানতেন। এসব একেবারে রুটিনমাফিক এসে যেত।

কেনাকাটার ব্যাপারে ছিলেন দারুণ ঝানু। কী কিনবেন, সেটা কোনও ব্যাপারই নয়, এক দিস্তে কাগজই কিনুন আর একপাতা ছুঁচই কিনুন, পাঁচটা দোকানে দাম যাচাই না-করে কিনতেন না। কোথায় কোন্ জিনিসটা কী দরে বিকোচ্ছে, সবকিছু তাঁর একেবারে মুখস্থ। পুজোর তাবৎ কেনাকাটার দায়িত্ব তাঁর এই অনুগত দেবরটির হাতে সঁপে দিয়ে মা তাই যতটা নিশ্চিন্ত থাকতেন, এমন আর অন্য কারও হাতে দিয়ে নয়। কাকুন আমাদের পুজোর জুতো কিনে দিতেন বউবাজারের চিনে-দোকান থেকে। এই একটা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যে আমার একটু খটাখটি লেগে যেত, তাও মনে পড়ে। আমি চাইতুম বাহারি চপ্পল কিংবা কাবলি জুতো, কিন্তু কাকুন তা কিছুতেই কিনে দেবেন না। বউদির কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন, খোকার জন্যে শু-জুতো কিনবি, অতএব অন্যরকম বায়না তুললেই কপট ধমক দিয়ে বলতেন, "খবর্দার! হয় শু নাও, নয়তো কিচ্ছু পাবে না!"

চিনে-দোকানে 'ফিক্সড্ প্রাইস' বলে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো থাকত বটে, কিন্তু এটা ছিল নেহাতই লোক-দেখানো ব্যাপার, বরং আর-পাঁচটা দোকানেব তুলনায় দাম-দস্তুর ওখানে বেশি ছাড়া কম চলত না। তবে আমার কাকুন এই ব্যাপারটাকে যেমন অবলীলাক্রমে একেবারে অবিশ্বাস্য একটা স্তরে নিয়ে যেতেন, তেমন আর কাউকে কখনও করতে দেখিনি। দাম নিয়ে তাঁর ঝুলোঝুলিটা ছিল দেখবার, এবং দেখে তাজ্জব হবার মতো ব্যাপার। সেই সময়ে বাংলার সঙ্গে হিন্দি মিশিয়ে যে-ভাবে কথা বলতেন, তাতে আমাদেরই হাসি পেয়ে যেত, সুতরাং চিনে-দোকানিরা যে হেসে খুন হবে, সে আর বিচিত্র কী। কাকুনের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির প্রথম অস্ত্র ছিল বিরক্তিমিশ্রিত একটা গাম্ভীর্যের ভাব। অর্থাৎ দোকানে ঢুকে গোড়াতেই এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন দোকানিরা ডাকাডাকি করছিল বলেই ঢুকেছেন, নয়তো এই রকমের আজেবাজে দোকানে কিছু সওদা করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। "ডাকাডাকি তো সেই থেকে করতা, উমদা চিজ কিছু হ্যায়?"

দোকানি একগাল হেসে বলত, " জরুর হ্যায় বাবুজি।"

কাকুন একটুও হাসতেন না। গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলতেন, "হ্যায় তো এই বাচ্চার পায়ের শু দেখাও।"

দোকানি জোড়ার-পর-জোড়া শু দেখিয়ে যেত। কাকুনের পছন্দ হত না। এটার সোল্ যদি পছন্দ হয় তো উপরকার চামড়া পছন্দ হয় না। আবাব ওটার উপরকার চামড়া যদি পাসমার্কা পেয়ে যায় তো 'সোল্ তো বিলকুল কাচ্চা চামড়া হ্যায়।' এটা আর কিছুই নয়, প্রথম ধাক্কাতেই দোকানিকে একটু দমিয়ে দেবার কায়দা। শেষ পর্যন্ত যদি-বা একজোড়া পছন্দ হত, মুখটুখ বেঁকিয়ে যেন-বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিনতে হচ্ছে এইরকম বিরক্ত গলায় সেই শু জোড়ার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করতেন, "মাল তো বহুত খারাপ, তা এর দাম কেতনা?"

"এক রুপিয়া চার আনা।"

চোখ কপালে তুলে কাকুন বলতেন, "কেয়া বোলা? হাম্ ঠিকমতো শুনা তো?"

"হাম তো বোলা এক লুপিয়া চার আনা।"

এইবারে শুরু হত মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির দ্বিতীয় পর্ব। কাকুন একেবারে হো-হো করে হেসে উঠতেন। দমকে-দমকে হাসতেন। যেন এমন অদ্ভুত কথা ইতিপূর্বে আর কখনও তিনি শোনেননি। তারপর হঠাৎ একেবারে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলতেন, "দেখো ভাই, হাম মাল কিনবার জন্যে আয়া হ্যায়, ঠাট্টা-তামাশা মাত করো। ইসকা দাম চার আনা হোনেসেও বহুত বেশি হোতা। তো হাম ছ আনা দেগা।"

এবারে শুরু হত দোকানির হাসি। দোকানি হাসত, তার বউ হাসত, তার বুড়ো বাপ হাসত, তার ছেলেপুলেরাও হাসত। একজন দোকানিকে তো একবার হাসতে-হাসতে দোকানের মেঝের উপরে গড়াগড়ি খেতেও দেখেছিলুম। সে হাসছিল, আর সেই অবস্থায় মাঝে-মাঝেই নিজের পেটটাকে খাম্‌চে ধরে বলছিল, "খেপা আদমি ! বিলকুল খেপা আদমি !"বলছিল আর সমানে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

এই সবই ঠিক কথা। কিন্তু কাকুন এই যে স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী এগোতেন, এতে যে কাজ হত না, তাও নয়। পাঁচ-ছ আনায় শুরু করে তিনি যেমন একটু-একটু করে উপবে উঠতেন, পাঁচ-সিকেয় শুরু করে দোকানিও তেমন একটু-একটু করে নীচে নামত। শেষ পর্যন্ত রফা হত বারো কিংবা চোদ্দ আনায়। দোকানি বলত, তাব খুব লোকসান হয়ে গেল, চোদ্দ আনায় এই যে জুতোজোড়া সে বিক্রি করল, এতে তার চামড়াব দামও উঠবে না। কাকুন বলতেন, দামটা দশ আনা হলেই ঠিক হত, নেহাত ভালমানুষ বলেই আরও চারগন্ডা পয়সা তিনি বেশি দিয়েছেন।

বাক্সপ্যাঁটরা গুছোনো আর বাঁধাছাঁদার ব্যাপারে কাকুনের যে প্রতিভার কথা বলেছি, তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটত স্বাস্থ্যোদ্ধার কি ছুটি কাটানোর জন্য পুরী, দেওঘর ইত্যাদি সব জায়গায় যাবার সময়। দেশের বাড়িতে যেতে হলে বিছানা-বালিশ সঙ্গে নেবার দবকার হত না, কিন্তু এসব জায়গায় যেতে হলে ও-সব জিনিস অপরিহার্য। সেইসঙ্গে নিতে হত রান্নাবান্নার তাবৎ উপকরণ। বাঙালি মধ্যবিত্তদের বাইরে যাওয়ার ঝোঁক দিনে-দিনে বেড়েছে বই কমেনি। তবে কোথাও গিয়ে থিতু হয়ে বসবার সেই পুবনো অভ্যাসটা আর একালে বিশেষ দেখি না। বাইরে গিয়ে হয তাঁবা হোটেলে ওঠেন, নয় হলিডে-হোমে। দিন-তিনেক যদি পুরীতে থাকেন, তো চতুর্থ দিনই চলে যান ভুবনেশ্বরে। তা ছাড়া রয়েছে সরকারি আর বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের হরেক রকমের প্যাকেজ-ট্যুর। পয়সা ফেললেই নিশ্চিন্ত, একুশ দিনের সফরে তাঁরা বিয়াল্লিশ তীর্থ দর্শন করিয়ে আনেন।

সেকালে এমন এক ঢিলে একশো পাখি মারার কথা ভাবাও যেত না। লোকে বাইরে যেত মূলত তীর্থদর্শন কিংবা হাওয়া-বদলের জন্য, এবং উদ্দেশ্যটা স্বাস্থ্যোদ্ধার হলে যেখানেই যাক, মোটামুটি মাসখানেক সেখানে কাটিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে তবে কলকাতায় ফিরত। হলিডে-হোম বস্তুটা নেহাতই একালের সৃষ্টি, ওটা তখনও গজিয়ে ওঠেনি। হোটেল তখনও দু-চারটে ছিল বটে, কিন্তু একে তো পুরো একমাস হোটেলে কাটাবার মতো আর্থিক সঙ্গতি অনেকেরই থাকে না, তার উপরে আবার হোটেলের খাবার মুখেও রুচত না অনেকের। ফলে দরকার হত মাসখানেকের জন্য একটা বাড়ি ভাড়া করার। তার জন্য অনেক আগে থেকেই খবরাখবর করতে হত, লোক লাগাতে হত। কিন্তু বাড়ির খবর পাওয়া গেলেই যে আমার মায়ের সে-বাড়ি পছন্দ হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। এ ব্যাপারে মাকে সন্তুষ্ট করা ছিল খুব শক্ত ব্যাপার। কেমন বাড়ি তাঁর পছন্দ? না সেটা বাজারের খুব কাছে হলেও চলবে না, আবার খুব দূরে হওয়াও চলবে না, টাউনের একেবারে মাঝমধ্যিখানে হলেও চলবে না, আবার এমন নির্জন এলাকায় হওয়াও

চলবে না যে, ডাকাতির ভয়ে রাত্তিরের ঘুমের বারোটা বেজে যাবে। তার উপরে আবার খোঁজখবর করে জানতে হবে যে, ছোঁয়াচে রোগে সেই বাড়িতে কেউ মরেছে কি না। এত সব শর্ত মেনে বাড়ি খোঁজা কি চাট্টিখানি কথা!

তা খোঁজখবর করে তেমন বাড়িও পাওয়া যেত বই কী। নইলে আর ও-সব জায়গায় গিয়ে ছুটি কাটাতুম কী করে? আমার বিশ্বাস, ওই ছোঁয়াচে রোগে কারও মরার ব্যাপারটা আমার মায়ের কাছে মাঝেমধ্যে স্রেফ চেপে যাওয়া হত। শুধু দালালরাই যে চেপে যেত তা নয়, আমার বাবাও মাঝে-মাঝে চেপে যেতেন। আমি নিজেই তো একটা ঘটনার সাক্ষী। বাবা তখন অসুস্থ। সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে পুরী গিয়েছি। উঠেছি চক্রতীর্থের একটা বাড়িতে। বিকেলবেলায় একদিন বাবার পাশে সমুদ্রের ধারে বসে আছি, অকস্মাৎ এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সেখানে আবির্ভাব ঘটল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে, যে-বাড়িতে আমরা উঠেছি, তার খুব-একটা সুনাম নেই। দুর্নামটা যে কিসের, তা অবশ্য তিনি খোলসা করে জানালেন না। বাবা তাঁকে যত জিজ্ঞেস করেন ব্যাপারটা কী, ততই তিনি মুখ কাচুমাচু করে বলেন, "সবই তো বোঝেন। এ-সব নিয়ে কিছু না-বলাই ভাল।"

ভদ্রলোক চলে যাবার পরে বাবা বললেন, "শুনলি তো?"

"শুনলুম। বোধ হয় ভূতের ভয় দেখাচ্ছেন।"

বাবা বললেন, "যারই ভয় দেখিয়ে থাকুন, তোর মা'কে আবার এসব কথা বলতে যাস না। কিছু একটা শুনলেই হল, অমনি বলবেন বাড়ি পালটাও।"

তা যে-কথা বলছিলুম। বাড়ির খোঁজ শেষপর্যন্ত পাওয়া যেত। মায়ের অনুমোদনও মিলত ঠিকই। তারপর এসে পড়ত যাত্রার মুহূর্ত। গোছগাছ আর বাঁধাছাঁদার পর্ব যে তার দু'চার দিন আগেই শুরু হত, সে-কথা না বললেও চলে। যে-কথা আর-একবার না বললেই নয়, সেটা এই যে, যাত্রার এই উদ্যোগপর্বেই কাকুনের প্রতিভার প্রকাশ ঘটত একেবারে পূর্ণ মাত্রায়। সেই সময়ে তাঁর কর্মপদ্ধতি লক্ষ করে বুঝতে পারতুম, পর্বটিকে তিনি তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। (১) বাক্সপ্যাঁটরায় কাপড়জামা গুছিয়ে তোলা, (২) কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে রান্নাবান্নার তাবৎ সরঞ্জাম ঢুকিয়ে ফেলা, এবং (৩) বেডিং বেঁধে ফেলা।

এই যে উদ্যোগপর্ব, এতে কাকুনের ভূমিকা যদিও কম্যাণ্ডার-ইন-চিফের, তবু এর মধ্যে প্রথম কাজটা তাঁকে করতে হত আমার মাতৃদেবীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। গোটা দুই-তিন তোরঙ্গ বার করে দিয়ে মা বলতেন, "ওরে সুধা, প্রত্যেকের জন্যে এক প্রস্থ করে গরম-জামাকাপড়ও যে নেওয়া চাই, সেটা আবার ভুলে যাস না যেন!"

কাকুন বলতেন, "যাচ্ছি তো সেপ্টেম্বর মাসে, অক্টোবরে ফিরব, তা হলে আর ও-সব লাগবে কেন?"

"লাগবে, লাগবে," মা বলতেন, "অক্টোবর মাসে ও-সব জঙ্গুলে জায়গায় হাড় কাঁপানো শীত পড়ে যায়। শেষকালে কি নিমুনিয়া বাধিয়ে বসবি?"

ফলে যেমন হালকা জামাকাপড়, অর্থাৎ সুতির ধুতি, জামা, শাড়ি, প্যাণ্ট, ফ্রক ইত্যাদি নিতে হত, তেমন নিতে হত শাল,'আলোয়ান, জাম্পার, সোয়েটার। ইস্তক প্রত্যেকের জন্যে একটা করে মাফলার। দু-একটা বাঁদুরে টুপিও বাদ পড়ত না। কাকুন সেগুলোকে ভাঁজ করে-করে তোরঙ্গের মধ্যে ঢোকানোর পর দেখা যেত যে, একটা তোরঙ্গেরও ডালা বন্ধ করা যাচ্ছে না। তখন এক-এক করে প্রতিটি তোরঙ্গকে দরজার কাছে টেনে নিয়ে এসে কাকুন বলতেন, 'খোকা, ডু ইয়োর ডিউটি!'

এটাই ছিল সবচেয়ে মজার কাজ। দরজা বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে সেখান থেকে তোরঙ্গের উপরে ঝাঁপ খেতে হবে। ডালা বন্ধ করার এটাই ছিল মোক্ষম উপায়। কাজটা আমি খুব আনন্দের সঙ্গে করতুম।

তোরঙ্গের পর প্যাকিং বক্স। তার মধ্যে ঢুকত হাতা, খুন্তি, বেড়ি, সাঁড়াশি, বালতির তোলা-উনুন, থালা, গেলাস, বাটি, কড়াই, চাটু, চাকি, বেলুন ইত্যাদি রান্নাঘরের তাবৎ জিনিস। আমার মায়ের এই একটা ধারণা ছিল যে, কলকাতা আর তাঁর বাপের বাড়ি রাজবাড়ি বাদে বাকি সমস্তই জঙ্গুলে জায়গা। শেয়ালদা কি হাওড়া থেকে রেলগাড়ি একবার ছাড়লেই হল, তার পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে জঙ্গলের রাজত্ব। সেখানে যতই কান্নাকাটি করো, কিচ্ছুটি মিলবে না। তাই, পুরো একমাস একটা সংসার চালাতে গেলে যা কিছু দরকার হয় বা হতে পারে, তার সবই কলকাতা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চাই। না নিলে একটা বিপদ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। বস্তুত, এই কারণ দেখিয়ে প্যাকিং বক্সের মধ্যে অন্তত সের দশেক চাল, সের দুয়েক ডাল, কিছু আলু, কিছু কয়লা, আর একটা সর্ষের তেলের টিন ঢোকাতে কাকুনকে তিনি বাধ্য করতেন। বলতেন, "নিয়ে নে সুধা, নিয়ে নে! যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যদি কিছুই না পাই তো উনুন ধরিয়ে চাট্টি ভাতে-ভাত তো তোদের বেঁধে দিতে পারব।"

একবারের কথা বলি। প্যাকিং বক্সে সব ঢোকানো হয়ে গেছে। হাতুড়ি মেরে পেরেক ঠুকে বেশ জম্পেশ করে তার ডালাও বন্ধ করে দিয়েছেন কাকুন। ঠিক তখনই মা হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন, "ওরে সুধা, হাতপাখাটাই তো নেওয়া হয়নি, তা হলে উনুন ধরাব কী করে?"

কাকুন তাতে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেন, 'ঠিক আছে, ও নিয়ে তুমি ভেবো না, তোমার হাতপাখা আমি বেডিংয়েব মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।'

শুধু হাতপাখা কেন, ঠিক সময়ে মনে না-পড়ায় ওই রকমের যত সব জিনিসপত্রকে যথাস্থানে ঢোকানো হয়নি, সেই ঝড়তি-পড়তি মালগুলোর প্রত্যেকটিকে বেডিংয়ের মধ্যে ঢোকাতে হত। বেডিংই ছিল তাদের শেষ আশ্রয়। ফলে তার আকার-আয়তনও হত পেল্লায। মধ্যবিত্ত সংসারে তখনও হোল্ড-অল বস্তুটা বিশেষ চালু হয়নি; হলেও সেটা দিয়ে আমাদের প্রযোজন মেটানো সম্ভব হত না, কেননা বিছানা-বালিশ-লেপ-তোশকের সঙ্গে সঙ্গে আস্ত একটা শিলনোড়াকেও যা অক্লেশে আপন গর্ভে ধারণ করতে পারে, এমন হোল্ড-অল তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমাদের বেডিংয়ে কিন্তু সবই ধরে যেত। অবশ্য সেই বেডিং বাঁধার জন্য যে খান পাঁচ-সাত সতরঞ্চির দরকার হত, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

আমি ছিলুম কাকুনের অ্যাসিস্ট্যান্ট। তিনি বলতেন, "সতরঞ্চি লে আও!" আমি গিয়ে এর-ওর-তার বিছানার তলা থেকে নিঃশব্দে সেগুলো বার করে আনতুম। যাদের সতরঞ্চি লোপাট হত, ব্যাপারটা ধরা পড়বার পর তারা কপাল চাপড়াত ঠিকই, কিন্তু বেডিং বাঁধার পর্ব যেহেতু ইতিমধ্যেই সমাধা হয়ে গেছে, তাই তখন আর কিছু করবার থাকত না। ছোটকাকার গ্রে'জ অ্যানাটমি থেকে শুরু করে ছাতা, ছড়ি, মায় আমার ক্রিকেট ব্যাট পর্যন্ত অবলীলাক্রমে ঠাঁই পেয়ে যেত সেই বেডিংয়ের মধ্যে। আমার ছোটভাই মন্টু একবার বায়না ধরেছিল যে, তার ক্যারামবোর্ডটাকেও বেডিংয়ের মধ্যে ঢোকাতে হবে। কাকুন তাতে রাজি হননি; ঢোক গিলে, মাথা চুলকে বলেছিলেন যে, বেডিংয়ের শেপ তাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে কিনা, ক্যারামবোর্ড না ঢোকালেও, মন্টুর ট্রাইসাইকেলটাকে যে তিনি একবার বেডিংয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা ভুলিনি।

আগে কোথাও বলেছি নিশ্চয়, তবে আর-একবার বললেও ক্ষতি নেই-যে, বেডিং বাঁধার কাজ সমাপ্ত হবার পরে, আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে ঝানু চিত্ররসিকেরা যেমন একটু দূরে দাঁড়িয়ে,

মাথাটাকে একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে হেলিয়ে মুখ গম্ভীর করে ছবি দেখেন, কাকুনও সেইভাবে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করতেন তাঁর সদ্য-সমাপ্ত রচনাটিকে। বেডিংয়ের সাইজ দেখে মা কিন্তু ঘাবড়ে যেতেন। বলতেন, 'ওরে সুধা, এ তো ভীষণ ব্যাপার! এই গন্ধমাদন পাহাড় শেষকালে রেলের দরজায় আটকে যাবে না তো?'

তা আটকে যে কখনও যায়নি, তা নয়। ময়ূরভঞ্জে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরছি। বারিপদা থেকে রূপসা জংশন পর্যন্ত ছোট-রেলগাড়িতে এলুম। মাঝরাত্তিরে সেখান থেকে ডাউন মাদ্রাজ মেল ধরব। ট্রেন সেখানে দাঁড়ায় মাত্র মিনিট খানেক। তারই মধ্যে তুলতে হবে মালপত্র, আর উঠতে হবে নিজেদেরও। হুড়োহুড়ি করে নিজেরা তো উঠলুম, তোরঙ্গ আর প্যাকিং বক্সও ঠেলেঠুলে তোলা হল, টুকিটাকি মালপত্র আমাদের হাতে-হাতে তার আগেই উঠে গিয়েছিল। এখন বাকি শুধু বেডিংটা। এক কাকুনই শুধু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কুলিদের দিয়ে বেডিংটা ভিতরে ঢুকিয়ে তবে তিনি উঠবেন।

ঠিক এই সময়ে পরপর চারটি ঘটনা ঘটল। ঘণ্টা পড়ল, ট্রেন ভোঁ দিল, গার্ডসাহেব ফুরফুর করে তাঁর বাঁশি বাজালেন, এবং কামরায় একটা ঝাঁকুনি লাগিয়ে আস্তে-আস্তে গড়াতে শুরু করল রেলগাড়ির চাকা। এদিকে আমরা দেখলুম, পেল্লায় সেই বেডিং আমাদের কামরার দরজায় আটকে রয়েছে, এবং কাকুন ভিতরে ঢোকেননি। বেডিং ডিঙিয়ে ভিতরে ঢোকা যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝে গিয়ে তিনি তখন প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন: পুল্ দ্য চেন, পুল্ দ্য চেন!

চেন্ ধরে কে ঝুলে পড়েছিল, মণ্টু না আর কেউ, সেটা আর মনে নেই, তবে চলন্ত রেলগাড়ি হঠাৎ থেমে যেতেই মাদ্রাজ মেলের লালমুখো গার্ডসাহেব যে 'হেই বাবু, হোঅট'স দিস' বলতে-বলতে আমাদের কামরার সামনে ছুটে এসে মহা হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা ভুলিনি। দরজায় আটকে থাকা বেডিংটাকে ফের প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দড়িদড়া কেটে তার ভিতরকার মালপত্রগুলিকে আলাদা-আলাদা করে সেদিন কামরার মধ্যে তুলে আনতে হয়। গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় কাকুনও এসে ভিতরে ঢোকেন। সারাটা পথ তিনি আর সেদিন একটাও কথা বলেননি। তাঁরই বিধ্বস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে একেবারে চুপচাপ তিনি বসে ছিলেন।

২৯

আমার পৈতে হয় বারো বছর বয়সে। অনুষ্ঠানটা আমাদের দেশের বাড়িতে হয়েছিল। তখন গ্রীষ্মকাল চলছে বলে কষ্টের সীমা ছিল না। প্রথম কয়েকটা দিন বহির্জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ঘরের মধ্যে আটকা থাকতে হয়। কেউ তিন দিন থাকে, কেউ পাঁচ দিন, কেউ সাতদিন। আমার বড়কাকিমা অতি শুদ্ধাচারী মহিলা। পুরো সাতদিনই তিনি আমাকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তেরাত্তির কাটতেই আমি দণ্ডিঘর থেকে বেরিয়ে আসি। এটাও মনে আছে যে, তাঁরই কাছ থেকে আমি আমার প্রথম 'ভিক্ষা' গ্রহণ করেছিলুম।

যেমন আমার বড়কাকিমা তেমন আমার মা'ও আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, পৈতে হওয়া মানে দ্বিজ হওয়া। মা বলেছিলেন, "জন্মেই কেউ দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয় না। এখন তুই দ্বিজ হয়েছিস, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার জন্মেছিস। এই যে নতুন করে জন্ম নিলি, এখন থেকে তোকে একেবারে অন্যরকম ভাবে চলতে হবে।"

আমি বললুম, "অন্য রকমভাবে চলতে হবে মানে কীভাবে চলতে হবে?"

"মানে আর কী," মা বললেন, "আগের মতো আর বাঁদরামো করা চলবে না।"

বড়কাকিমা বললেন, "সন্ধ্যা-আহ্নিক সব একেবারে নিয়মমতো করতে হবে। পঞ্চদেবতাকে অন্ন উৎসর্গ না করে ভাত খাওয়া চলবে না। একবেলা ভাত খাবি, একবেলা ফলমূল আর দুধ। আর হ্যাঁ..."

কথাটা শেষ না করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বড় কাকিমা বললেন, "ও বড়দি, একাদশীর কথাটাও কি এখুনি বলে দেব?"

মা বললেন, "বলে দেওয়াই ভাল। নইলে পরে অশান্তি হবে।"

শুনে বড়কাকিমা বললেন, "একাদশীর দিন একবেলাও ভাত পাবি না। দিনেও ফল আর দুধ, রাত্তিরেও ফল আর দুধ। তবে হ্যাঁ, খুব যদি খিদে পায় তো ভাতের বদলে এক-আধখানা সুজির রুটি হয়তো পেলেও পেতে পারিস।"

মা বললেন, "না রে ননি, তুই ঠিক কথা বলছিস না। আমাদের কুলগুরু যা বিধান দিয়েছেন, সেটা ওকে পষ্ট করে জানিয়ে দে।"

বড়কাকিমা বললেন, "কুলগুরু বলেছেন, একাদশীর দিন পুরোপুরি লঙ্ঘন দিতে হবে।"

কিছুই বুঝতে পারলুম না। বললুম, "পুরোপুরি লঙ্ঘন মানে?"

"লঙ্ঘন মানে উপোস। একাদশীতে পুরো উপোস করে থাকতে হবে। কিন্তু তা কি তুই পারবি?"

খিদের জ্বালায় দণ্ডিঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি। এখন গ্রীষ্মকাল। ভেবেছিলুম যে, মাছভাজা দিয়ে এখন একথালা পান্তাভাত খাব। তার বদলে এ-সব কী শুনছি। বললুম, "বাজে কথা বোলো না তো। শিগগির আমাকে খেতে দাও।"

বড়কাকিমা বললেন, "এখন কী করে খাবি? আগে আহ্নিক করে নে। তারপর ফলমূল কেটে দিচ্ছি, তা-ই খাবি। ভাত খাবি সেই দুপুরবেলায়। বললুম না, এখন থেকে মাত্র একবেলা ভাত খেতে হবে?"

"ও-সব বুঝি না।" আমি বললুম, "অ্যাদ্দিন যেমন চারবেলা ভাত খেয়েছি, এখনও তেমন চারবেলাই ভাত খাব। সকালে খাব, দুপুরে খাব, বিকেলে খাব, রাত্তিরে খাব।"

মা বললেন, "খবর্দার, ও-কথা মুখেও আনবি না। আহ্নিক কর, তারপর তোর বড়কাকিমা যা খেতে দিচ্ছে, সোনামুখ করে খেয়ে নে। ...হ্যাঁ রে, অন্যকে দেখেও কি তোর শিক্ষা হয় না? তুই এদিকে ভাতের জন্যে হেঁদিয়ে মরছিস, আর ওদিকে আমাদের গুরুপুত্তুরকে দ্যাখ। কই, সে তো তোর মতো ভাত-ভাত করে দণ্ডিঘর থেকে বেরিয়ে আসেনি!"

'গুরুপুত্তুর' মানে আমাদের কুলগুরুর পুত্র। আমার যে উপনয়ন হবে, এই খবর পেয়ে কুলগুরু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে এসে বলেন যে, অর্থাভাবে তিনি তাঁর এই পুত্রটির পৈতে দেবার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। সুতরাং আমার সঙ্গে তারও পৈতে দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে তিনি খুবই উপকৃত হবেন। শুনে বাবা বলেন, "বাঃ, এ তো খুবই ভাল কথা। খোকাকেও তা হলে আর দণ্ডিঘরে একা থাকতে হবে না, দিব্যি একজন সঙ্গী পেয়ে গেল।"

মা এখন সেই গুরুপুত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাকে বকাবকি করছেন দেখে আমার রাগ হয়ে যায়। এতক্ষণ যা চেপে রেখেছিলুম, সেটা আর ফাঁস না-করে পারি না। বলি, "ও কেন দণ্ডিঘর থেকে বেরুবে। পারলে ও তো সারা জীবনই থেকে যাবে ওই ঘরের মধ্যে।"

বড়কাকিমা বলেন, "তার মানে?"

"মানে আর কী, ভাত খেতে ওর ভাল লাগে না। দণ্ডিঘরে বসে এই যে আম, কাঁঠাল, কলা, দুধ আর সন্দেশ সাঁটাচ্ছে, এটাই ওর খুব পছন্দের খাবার। নিজেরটা তো খেতই, আমার জন্যে যা দিতে, থালাবাটি-সুদ্ধ তাও আমি ওকে ধরে দিতুম।"

গালে হাত দিয়ে মা বলেন, "বলিস কী রে! তার মানে তুই তিন দিন ধরে কিছু খাসনি?"

"তা কেন খাব না?" আমি বলি, "আমটা খেতুম। বাদবাকি ওই সব কি খাওয়া যায় নাকি?"

বড়কাকিমা আর কথা না-বাড়িয়ে বলেন, "বড়দি, ওকে আর বকাঝকা করে লাভ নেই। উরে বাবা রে, তিন দিন ধরে ছেলেটা শুধু আম খেয়ে রয়েছে। শিগগির ওর আহ্নিকের ব্যবস্থা করে দিন, আমি এদিকে ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।"

তখনকার মতো রক্ষা পেয়ে যাই বটে, কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটে বিকেলবেলায়। রোদ্দুর একটু পড়ে আসতেই বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে নিয়ে ফুটবল খেলতে মাঠে চলে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে লেগে যায়। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল। উঠোনের টিউবওয়েলে তাড়াতাড়ি করে হাত-পা ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে কাকিমাকে বলি, "এক্ষুনি খেতে দাও।"

উনুনে কিছু একটা চাপানো ছিল। কাকিমা ফিরে না তাকিয়েই বলেন, "হাত-পা ধুয়েছিস?"

"এইমাত্তর ধুয়েছি।"

"ঠিক আছে, তা হলে বড়ঘরে চল্। সেখানে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সন্ধে-আহ্নিকটা সেরে নে, তারপর খেতে দেব।"

"অত দেরি করতে পারব না, এক্ষুনি দাও।"

উনুনে যা চাপানো ছিল, সেটা নামিয়ে রেখে বড়কাকিমা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান, এবং তাকিয়েই ভূত-দেখার মতো চমকে উঠে বলেন, "এ কী, তোর পৈতে কোথায়?"

প্রশ্নটা করলেন বটে, কিন্তু উত্তর দিতে দিলেন না। আমি কিছু বলবার আগেই তাঁর হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললেন, "চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্, কথা বললেই মার খাবি।" বলে উনুনে এক হাঁড়ি জল বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে এলেন আমার মেজো কাকাকে সঙ্গে নিয়ে। আমার দিকে আঙুল তুলে কাকুনকে বললেন, "ঠাকুরপো, এই বাঁদর ছেলেটার কাণ্ড দ্যাখো! আজই দণ্ডিঘর থেকে বেরিয়েছে, অথচ আজই ওর গলায় পৈতে নেই। এক্ষুনি তোমার পৈতে থেকে একটা আল্ খুলে নিয়ে ওকে পরিয়ে দাও, নইলে ও তো কথাই বলতে পারবে না!"

তা-ই হল। কাকুন তার পৈতে থেকে একটা আল্ বার করে আমাকে পরিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল রে?"

ঘটনাটা আর কিছুই নয়, যা হবার তা মাঠেই হয়েছিল। সেখানে গিয়ে ইনফ্লেটার দিয়ে ফুটবলটা ফুলিয়ে নিয়ে দেখি, ব্লাডারের নল যা দিয়ে বাঁধব, সেই দড়িটাই সঙ্গে করে আনা হয়নি। ফলে, গলা থেকে পৈতেটাকে খুলে নিয়ে তাই দিয়ে ব্লাডারের নল বেঁধে আমি মাঠে নেমে যাই।

শুনে বড়কাকিমা শিউরে উঠে বলেন, "কী সব্বোনেশে ব্যাপার, এ তো মহাপাতকের কাজ করেছিস! বামুনবাড়ির ছেলে হয়ে তুই কিনা পৈতে দিয়ে ফুটবল বেঁধেছিস? ওবে, ও-কাজ করতে গিয়ে তোর বুকটা কি একবারও কেঁপে উঠল না? ও মা, আমি কোথায় যাব!"

কাকুন বললেন, "থাক্, থাক্ মেজোবউদি, যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন আর এ নিয়ে কিছু বোলো না। বড়বউদি জানতে পারলে হাঙ্গামা হবে, তার চেয়ে বরং চেপে যাও। তুমি আর আমি জানলুম, ব্যস্, আর-কাউকে এ-কথা জানাবার কোনও দরকারই নেই।"

বড়কাকিমা বললেন, "শুনলি তো? আর যেন কক্ষনো এমন না হয়। এখন আহ্নিক করে নিবি চল্।...পৈতে দিয়ে ছেলে কিনা ফুটবল বেঁধেছে! ওরে বাবা রে বাবা!"

গোঁজ হয়ে বললুম, "ফুটবল বাঁধিনি, ব্লাডার বেঁধেছি!"

আমাকে নিয়ে হেঁশেল থেকে উঠোনে নামতে-নামতে বড়কাকিমা বললেন, "ওই একই হল। কক্ষনো আর অমন কাজ করিস না!"

উপবীত ধারণের যে এত ঝঞ্ঝাট, আগে তা জানতুম না। লোভ দেখিয়ে আমাকে বলা হয়েছিল যে, এই উপলক্ষে আমি অনেক উপহার পাব। ফুটবল পাব, ফাউন্টেন পেন পাব, বই পাব। তা ছাড়া অনেক টাকাও নাকি পাওয়া যাবে। বড়কাকা বলেছিলেন, "টাকাগুলো যদি জমিয়ে রাখিস, তবে আর একটু বড় হয়ে একটা সাইকেলও কিনে নিতে পারবি।" কিন্তু এ তো দেখছি মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। একে তো আমাদের পরামানিক রসিকদা এসে কান বিঁধিয়ে রুপোর খড়কে পরাতে গিয়ে যে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে ছেড়েছে, তার যন্ত্রণা এখনও যায়নি, পাশ ফিরে শুতে গেলেই কান একেবারে টনটন করতে থাকে, তার উপরে আবার একদিকে যেমন সন্ধ্যা-আহ্নিক নিয়ে উঠতে-বসতে মা আর কাকিমার বকুনি খাচ্ছি, অন্য দিকে তেমন আবার ভাতের থালায় টান পড়েছে।

এই অবস্থায় কত দিন আর পৈতে ধারণ করা যায়! সাপে কাটলে চটপট ওটা দিয়ে যে একটা বাঁধন দেওয়া যায়, তা কি আর জানি না? জানি বই কী, কিন্তু তার জন্যে তো ওটাকে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই, পকেটে কিংবা ট্যাকে গুঁজে রাখলেও তো হয়। দিন কয়েক তা-ই রেখেছিলুম। তারপর, নজরদারির মাত্রা একটু কমে আসতেই, টুক করে ওটা একদিন ফেলে দিই। ধরা পড়বার পরে কথাটা বাবার কানেও উঠেছিল। বাবা নাকি হেসে বলেছিলেন, 'ও নিয়ে ভাববার কী আছে। ও তো চেনা বামুন, ওর পৈতে লাগবে না।"

পাশের বাড়ির বাদল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার এক বছর আগে তার পৈতে হয়। লেখাপড়ায় আমার চেয়ে বাদল অনেক বেশি ভাল ছিল। একদিকে যেমন সংস্কৃতে ছিল পাকাপোক্ত, অন্য দিকে তেমন অঙ্ক করত টকাটক। তার উপরে আবার চাল-চলনে আর কথাবার্তায় যেমন ভদ্র, তেমন শান্ত। এক কথায় বলতে পারি, যে রকমের ছেলেকে নিয়ে অভিভাবকদের কখনও কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না, বাদল ছিল একেবারে সেই রকমের ছেলে। পৈতে হলে যেসব নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, সবই সে একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলত। সত্যি বলতে কী, বাদলের মতো অমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবালক অন্তত সেই বয়সে আমি দুটি দিখিনি।

আমি ছিলুম বাদলের একেবারে বিপরীত। তবু যে আমাদের মধ্যে খুবই নিবিড় একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুটি শিশুর মধ্যেও অমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আমি যে জেদি, আমি যে লেখাপড়ায় অমনোযোগী, যাকে যা বলা উচিত নয়, তাও যে মাঝে-মাঝেই আমার মুখ ফশকে বেরিয়ে যায়, তা নিয়ে বাদল কখনও রাগ করত না, কিন্তু কষ্ট পেত খুব। প্রায়ই বলত, "কেন যে তুই বড়দের অত চটিয়ে দিস! ওঁরা যা বলেন, সে তো আমাদের ভালর জন্যেই বলেন। এটা তুই বুঝতে পারিস না কেন?" আমি যে সন্ধ্যা-আহ্নিকেব ধারও ধারি না, তাই নিয়েও সে খুব দুঃখ করত। বলত, "এটা কিন্তু তোর করা উচিত।"

আমি বলতুম, "করলে কী হয়?"

বাদল বলত, "সন্ধ্যা-আহ্নিক করলে মন ভাল থাকে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে, অসুখ-বিসুখ হয় না।"

আমি বলতুম, "বাজে কথা বলিস না। তুই তো ও-সব করিস। কিন্তু কই, তোর শরীর-স্বাস্থ্য কি ওতে একটুও ভাল হযেছে? যা তোর প্যাংলা চেহারা, একটু জোরে বাতাস বইলেই তো খড়ের কুটোর মতন উড়ে যাবি। সন্ধ্যা-আহ্নিক কবলে ঘোড়ার ডিম হয়।"

এ-সব কথায় বাদল কষ্ট পেত। একদিন সম্ভবত এই রকমের একটা কথা বলেছিল যে, এই যে আমি আচমন করি না, আহ্নিক-টাহ্নিক কবি না, এমন কী পঞ্চদেবতাকে অন্ন উৎসর্গ না করেই ভাত খেতে শুরু করে দিই, এতে ভগবানকে চটিযে দেওয়া হচ্ছে। কথাটা আমার মনে খুব লেগেছিল নিশ্চয়, নইলে আর মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে সেই রাত্তিরেই আস্ত একটা পদ্য লিখে ফেলব কেন। পদ্যের শুরুটা এই রকম:

ত্রিসন্ধ্যা আর গায়ত্রী-জপ করতে যদি না-ই পাবি,
আসন তোমার টলবে না কি প্রভু?
জাঁকজমকের লৌকিকতা যদিই নাহি সম্ভবে,
মুখ ফিরিয়ে রইবে বসে তবু?
আলোচালের মাপকাঠিতে ভক্তি তুমি মাপ করো?
শুনতে আমি চাই তা তোমার কাছে।
দেবতা, তুমি নও তা হলে দুঃখী আমি মোর তরে,
তোমায়-দেব কীই বা এমন আছে?

*

বাদল ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে আসে, তারপর কলেজ-জীবন শেষ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরি নেয়। এই চাকরির সূত্রে অনেকগুলি বছর তাকে বোম্বাইয়ে থাকতে হয়েছিল। পরে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফেরে। মাঝেমধ্যেই আমাকে ফোন করে, আর যখনই ফোন করে,

আমার বালক-বয়সে লেখা এক্কটি-দুটি পদ্য শুনিয়ে দেয়। সেই বয়সের পদ্যের খাতাগুলি আজও রয়েছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারি, একটা পদ্যের একটা লাইনও সে ভুলে যায়নি। সব তার মুখস্থ।

প্রকৃতির এত বৈপরীত্য সত্ত্বেও বাদল যে আমাকে ভালবাসত, আজও বাসে, তার একটা মস্ত কারণ যে পদ্য, তাতে আমার তখনও সন্দেহ ছিল না, এখনও নেই। ওই যে আমি আমাদের নিত্যদিনের কথাবার্তা, আমাদের গাছপালা, আমাদের পরিবেশ, আমাদের জীবনযাপন—অর্থাৎ একদিক থেকে যা নেহাতই মামুলি, আবার সেইজন্যেই যা আমাদের একটুও অচেনা নয়, তার সব্কিছুকেই আমার পদ্যের বিষয়বস্তু করে তুলছি, আবার লাইনে-লাইনে মিলও দিয়ে যাচ্ছি পটাপট, এইটে দেখে সে ভারী অবাক মানত। সে যেন ধরেই নিয়েছিল যে, আমার রাগ, আমার জেদ, আমার অবাধ্যতা, লেখাপড়ায় আমার অমনোযোগ—এগুলি আর কিছুই নয়, বাইরের একটা বিদঘুটে পোশাক মাত্র, নেহাতই একটা খেয়ালের খেলা, যার আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি। ওই পোশাকটা খসে গেলেই আমার একটা সুন্দর চেহারা বেরিয়ে পড়বে।

সেটা যে সে স্পষ্ট করে কখনও বলত না, তাও নয়। একদিনের কথা মনে পড়ে। পুকুরপাড়ে বসে দু'জনে গল্প করছি, বাদল হঠাৎ বলে বসল, "হ্যাঁ রে, পড়াশুনোয় তুই কি ইচ্ছে করে ফাঁকি দিস?"

বললুম, "পড়ার বইয়ের কথা বলছিস তো? ও-সব পড়তে আমার একটুও ভাল লাগে না।"

"ভাল না-লাগলেও পড়তে হয়।"

"কেন পড়ব?"

"না-পড়লে তুই ক্লাসে ফার্স্ট হবি কী করে?"

"ফার্স্ট না হলে তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না?"

"আমি কি তা-ই বলছি? আমি বলছি, একটু যদি পড়ার বই নাড়াচাড়া করিস, তা হলেই তোর রেজাল্ট কিন্তু অনেক ভাল হবে।"

"তাতে কী হবে?"

"যারা তোকে বকাঝকা করে, তাদের মুখ তখন বন্ধ হয়ে যাবে।" বাদল একগাল হেসে বলেছিল, "তুই তো আমার বন্ধু। তোকে কেউ বকলে আমার ভাল লাগে না।"

পাশের গ্রাম কাইচাল থেকে মাইনর পাশ করে বাদল, তারপর গিয়ে ভাঙ্গা স্কুলে ভর্তি হয়। তার বাবা আমার দূর-সম্পর্কের জ্যাঠামশাই। কর্মসূত্রে তাঁকে ভাঙ্গাতেই থাকতে হত। তাঁর আস্তানাটা ছিল মুন্সেফ-আদালতের পাশে। ওখানকার ইশকুলে ভর্তি হবার পরে বাদলও সেখানে গিয়ে থাকতে শুরু করে। আদালতের সামনে যেমন নদী, পিছনে তেমন একটা পুকুর আর সেই সঙ্গে অনেকখানি ফাঁকা জমি। বেশ মনোরম পরিবেশ। বাদল আর তার ইশকুলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দিনের পর দিন সেই নদীর ধারে কিংবা পুকুরের পাড়ে বসে আড্ডা দিয়েছি। কখন যে দিনের আলো মুছে যেত আর গা-ভরা ঘামাচির মতো আকাশ জুড়ে ফুটে উঠত তারা, আমাদের খেয়ালই থাকত না।

ভাঙ্গার যে একটা সাহিত্যিক পরিবেশ ছিল, সেটাও খুব টানত আমাকে। সদর-রাস্তার ধারে, সকলের চোখে পড়বার মতন করে, হাতে-লেখা একটা পত্রিকা টাঙানো থাকত। নাম, যদ্দুর মনে পড়ে, 'চল্তি পথে'। মূলত দুটি মানুষের উদ্যোগে এই কাগজখানা বার হত। ভূপেশরঞ্জন সেনগুপ্ত আর সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আমরা বলতুম গান্ধীদা আর নরহরিদা। দু'জনেই তেজী স্বভাবের মানুষ, দুজনেই ছাত্র-রাজনীতি করতেন, এবং বক্তৃতাও দিতেন দুজনেই বেশ গরম-গরম। আমার চেয়ে এঁরা নেহাতই দু'তিন বছরের বড়, কিন্তু যে-সব কথা বলতেন, তাতে মনে হত, ইংরেজদের

বিরুদ্ধে বেশ জবরদস্ত রকমের একটা লড়াই বাধিয়ে দেবার জন্যে এঁরা একেবারে তৈরি হয়েই আছেন।

আমি যে পদ্য লিখি, এই ব্যাপারটা নিয়ে বাদলের গৌরববোধের অন্ত ছিল না। গান্ধীদা আর নরহরিদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে সে তাই অনেকদিন ধরেই ছটফট্ করছিল। তা সেই পরিচয় এক্‌দিন হলও। ভাঙ্গায় গিয়ে নারায়ণ ভট্টাচার্য মশাইয়ের বইয়ের দোকানে বসে একদিন নতুন-আসা একখানা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি, হঠাৎ বাদল বলল, "এই তো নরহরিদা এসে গেছেন।....নরহরিদা, এই আমার সেই বন্ধু।"

প্রথম দর্শনেই নরহরিদাকে খুব ভাল লেগেছিল। ব্যায়াম-করা, পেটা স্বাস্থ্যের, মজবুত বাঁধুনির চেহারা। চোখ দুটির মধ্যে কিন্তু কোনও কাঠিন্য দেখলুম না, এক ঢাল কোঁকড়া চুলের ঘেরের মধ্যে বরং শ্যামলা রঙের মুখখানিকে ঈষৎ কোমলই দেখাচ্ছিল। পরিচয় হতেই বললেন, "কবিতা দাও।"

বললুম, "সঙ্গে করে তো নিয়ে আসিনি; আপনার সঙ্গে যে দেখা হয়ে যাবে, তাও তো জানতুম না, পরে বরং বাদলের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

"পরে মানে কত পরে?"

"এই ধরুন হপ্তাখানেকের মধ্যে।" আমি বললুম, "সামনের হপ্তায় আবার ভাঙ্গায় আসব।"

নরহরিদার তর সয় না। বলেন, "কিসের কবি তুমি, এক্ষুনি দু'চার লাইন লিখে দিতে পারো না?"

"তা কেন পারব না? তবে সেটা কবিতা হবে না, পদ্য হবে।"

"বেশ তো, চার লাইনের পদ্যই একটা লিখে দাও।"

তা মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা লেখা হয়ে যায়। লাইন ক'টা ভুলে যাইনি।

গুঁড়িয়ে গেছে তোমার বুকের মানিক?
সূর্য তোমার হারিয়ে গেছে বুঝি?
কাজ কী তোমার অশ্রু ফেলে খানিক?
মেঘের পারে সূর্যকে নাও খুঁজি।

নরহরিদা দারুণ খুশি। 'চল্‌তি পথে'র পরের সংখ্যাতেই তিনি সেটি বার করে দেন।

হাতে-লেখা পত্রিকা বার করতে হলে এমন কারও সাহায্য পাওয়াই চাই, যাঁর হাতের লেখার ছাঁদ একেবারে মুক্তোর মতন। তা নরহরিদার হাতের লেখা কেমন ছিল তা মনে নেই, তবে গান্ধীদার হস্তাক্ষর ছিল একেবারে তাক লাগিয়ে দেবার মতো। পত্রিকার আদ্যন্ত লিখে দেবার দায়িত্ব তাই তাঁরই ঘাড়ে পড়েছিল। এই দুটি সহৃদয় মানুষের কাছে প্রশংসা আর উৎসাহ পেয়ে আমি তো খুশি হয়েছিলুমই, তবে আমার তুলনায় বাদল খুশি হয়েছিল চতুর্গুণ।

দেশ ভাগ হওয়ার পরে নরহরিদা আর গান্ধীদা, দু'জনেই কলকাতায় চলে আসেন। তারও বছর কয়েক পরে দু'জনেই হারিয়ে যান আমার জীবন থেকে। হঠাৎ বছর কয়েক আগে গান্ধীদার ফোন পেয়ে অবাক হয়ে যাই। শুনি তিনি অধ্যাপনার কাজ নিয়ে পশ্চিম বাংলার বাইরে চলে গিয়েছিলেন, অবসর নিয়ে এখন কলকাতায় ফিরেছেন। বয়স হয়েছে, কিন্তু গলার দাপট কিছুমাত্র কমেনি। ইতিমধ্যে একদিন ফোন করেছিলেন নরহরিদাও। তাঁরও এখন অবসরের জীবন।

ভাঙ্গা স্কুলের শতবর্ষপূর্তির উৎসব চলছে। সেই উপলক্ষে গান্ধীদা গিয়েছেন বাংলাদেশে। নরহরিদা যেতে পারেননি। কিন্তু, শরীরটা যেখানেই থাক, মনে-মনে তিনিও যে এখন কুমার নদের ধারের সেই ছোট্ট শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাতে সন্দেহ করি না।

৩০

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আজকাল গোনাগুনতি তিনটির বেশি বিজ্ঞাপন থাকে না। কাগজের নাম বা মাস্ট-হেডের দু'পাশের ইয়ার-প্যানেলে ছোট-ছোট দুটি বিজ্ঞাপন, আর তলার দিকের ডাইনে একটি বড় বিজ্ঞাপন। আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এমনটা দেখিনি। প্রথম পৃষ্ঠার গোটাটাই তখন বিজ্ঞাপনের দখলে থাকত। বিজ্ঞাপনের জগতে তখনও সম্ভবত বর্ণভেদ-প্রথার সূচনা হয়নি। ফলে, যাকে আজকাল 'ক্লাসিফায়েড' বলা হয়, এবং যার জন্য আলাদা জায়গাই বরাদ্দ থাকে, সেই ধরনের চিত্রবিহীন বিজ্ঞাপনের পাশে সচিত্র 'ডিসপ্লে' বিজ্ঞাপনের অবস্থানে কোনও বাধা ছিল না। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ডোয়ার্কিনের হারমনিয়ম, চুলের তেলেব মধ্যে জবাকুসুম আর ওযুধের মধ্যে জারমলিন, ডোঙ্গরের বালামৃত ও পাইরেক্সের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। বিজ্ঞাপনের ছবি ও ভাষায় আজকাল ট্যানজেন্ট-মারের যে-সব কলাকৌশল দেখি, সেকালে সে-সব দেখা যেত না। যা বলবার তা সরাসরি বলা হত, সেই সঙ্গে ছবিটাও হত স্পষ্ট। একটি মেয়ে বসে হারমনিয়ম বাজাচ্ছে, এই ছিল ডোয়ার্কিনের বিজ্ঞাপনের ছবি। জারমলিন যে 'জ্বরের যম', সেটা জানবার জন্য গোটা বিজ্ঞাপনটা পড়বার দবকার হত না। পাইবেক্সও জ্বরের ওযুধ। তার বিজ্ঞাপনে দেখতুম পালক-লাগানো ঢোল-কাঁধে একটি জোয়ান মানুযের ছবি। ছবির তলায় মোটা হবফের ক্যাপশন : আর জ্বর হয় না। যদ্দুর জানি, এই ক্যাপশনটি স্বযং রাজশেখর বসু মশাই লিখে দিয়েছিলেন। আজকাল যাঁরা বিজ্ঞাপনের কপি লেখেন, তাঁদের নিন্দা না করেও বলব যে, 'আর জ্বর হয় না' কথাটা তখনকার ম্যালেরিয়াজর্জর বঙ্গভূমিতে যে আশ্বাসের বাণী বহন করে এনেছিল, তার তুলনা আজও খুঁজে পাইনি।

সিনেমা-থিয়েটারের বিজ্ঞাপনও যে অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হত, তাও মনে পড়ে। আলো ফেলার কৌশলে নাটকের কোন্ কোন্ দৃশ্য মঞ্চে একেবারে 'জীবন্ত' হয়ে উঠবে, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তার উল্লেখ থাকত। ওই বিজ্ঞাপন পড়েই মা বায়না ধরেন যে, তাঁকে অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' দেখাতে হবে। বাবার আপত্তি ধোপে টেকেনি। কলেজ থেকে একদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ট্যাক্সি ডাকিয়ে মা'কে নিয়ে তাঁকে হাতিবাগানের থিয়েটার-পাড়ায় যেতেই হয়। সঙ্গে ছিলুম দিদি আর আমিও। 'মহানিশা' তখন কোন্ রঙ্গমঞ্চে চলছিল, সেটা মনে নেই, তবে নাটকের শেষ-দিককার একটা দৃশ্যে যে গোটা মঞ্চটাকেই একটা স্টিমারের কেবিন ও তার সামনের ডেকের খানিকটা অংশের মতো দেখাচ্ছিল আর নাটকের অন্ধ নায়িকা (যদ্দুর মনে পড়ছে, তার নাম 'ধীরা') যে 'মহানিশা মহানিশা' বলতে-বলতে সেই ডেক থেকে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল, সেটা ভুলিনি। চারপাশ থেকে অনেকক্ষণ ধরেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার

শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল, এই দৃশ্যে সেটা প্রবল হয়ে ওঠে। যবনিকা পতনের পরে আলো জ্বলতে দেখি, মা'ও একেবারে হাপুস নয়নে কাঁদছেন।

অনুরূপা দেবী ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সম্পর্কে আজকালকার সাহিত্যিক ও সমালোচক-সমাজের ধারণা যে খুব উঁচু, এমন মনে হয় না। এঁদের সম্পর্কে এই আমলের পাঠকদের ধারণাও সম্ভবত বিশেষ স্পষ্ট নয়। কিন্তু এককালে যে এঁরা দুজনেই খুব জনপ্রিয় লেখিকা ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটা এই যে, ৮ যখনকার কথা বলছি, শরৎচন্দ্রের প্রতিভা তখন তুঙ্গে। তাঁর 'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথ নির্দেশ' তার অন্তত বছর দশেক আগেই 'যমুনা' পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে; তা ছাড়া 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেও ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে 'বিরাজ বউ' ও 'পল্লীসমাজ'। অথচ, অনুরূপা ও প্রভাবতী যে তখনও পাঠকের সমাদর সমানে পেয়ে যাচ্ছেন, এ কথা ভুলে যাওয়া চলে না। বইয়ের বাজার তখনও এত বড় হয়ে ওঠেনি। অথচ, সেই সময়েও, এক-একটা বিয়েতে এঁদের বই-ই উপহার হিসাবে পাওয়া যেত ভূরিপরিমাণ। গ্রামাঞ্চলেও এঁদের বইয়ের যে কাটতি ছিল, সে তো আমার স্বচক্ষে দেখা। মনে হয় একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমন তার বেদনা ও ব্যর্থতাবোধের ব্যাপারটাকে এঁরা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া, এই জনপ্রিয়তার অন্য কোনও কারণ আমি খুঁজে পাই না। অনেকে হয়তো বলবেন যে, এঁদের লেখা বড় 'সেন্টিমেন্টাল'। কথাটা একেবারে মিথ্যেও হয়তো নয়। কিন্তু অন্যদিকে এটাও মনে রাখা চাই যে, লেখকরা আকাশ থেকে পড়েন না, সমাজের ভিতর থেকেই তাঁরা উঠে আসেন। সমাজটা 'সেন্টিমেন্টাল' হবে, আর লেখক তা হবেন না, তাও কি হয় নাকি?

'মহানিশা'র মধ্যেও ভাবপ্রবণতার প্রাবল্য ছিল নিশ্চয়ই, তা নইলে আর নাটক দেখতে এসে হলসুদ্ধ লোক অমন হাপুস-নয়নে কাঁদবে কেন? মা'ও যে কেঁদেছিলেন, তাতে লাভ হল এই যে, হলের বাইরে এসে বাবা আমাদের প্রত্যেককে একটা করে লেমোনেড খাওয়ান। বোতলবন্দি মিনারেল ওয়াটারের স্বাদ সেই আমি প্রথম পাই। আজকাল যেমন এ-সব বোতলের মাথায় টিনের ক্যাপ থাকে, বিশের দশকের শেষের দিকে সেটা দেখিনি। বোতলের গলার কাছটা হত চ্যাপ্টামতো, আর সেইখানে একটা কাচের গুলি বসানো থাকত। সরু একটা কাঠ দিয়ে সেই বলটাকে ঘা মেরে নামিয়ে দিলেই বোতল থেকে বুজবুজ করে বেরিয়ে আসত জল। বুড়ো আঙুলের গুঁতো মেরেও কাচের গুলিটাকে অনেকে নীচে নামিয়ে দিতে পারতেন। এটা যাঁরা পারতেন, ছেলেবেলায় আমরা তাঁদের সমীহ করতুম। মনে হত, এটা খুবই বাহাদুরির ব্যাপার।

যেমন শহরে তেমন মফস্বলেও আজকাল বিরোধ একটা বাধলেই হল, পেটো আর পাইপগান ছাড়া তার মীমাংসা হয় না। সেকালে যে সবাই একেবারে নির্বিরোধ সুবোধ বালক ছিল, তা নয়, তবে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য এত বোমবাজি আর বন্দুকবাজি সেকালে কোথাও হতে দেখিনি। গ্রামাঞ্চলে লাঠিটাই প্রধানত চলত, কালেভদ্রে বেরিয়ে পড়ত মরচে-পড়া সড়কি আর বল্লম। শহরে সেক্ষেত্রে পাড়ায়-পাড়ায় ঝগড়া বাধলে সোডা আর লেমোনেডের বোতলই হয়ে দাঁড়াত যুযুৎসুদের প্রধান অস্ত্র। বোতলের মধ্যে গ্যাস রয়েছে, সুতরাং দু'বার ঝাঁকিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে আর দেখতে হত না, রাস্তায় পড়ে ফাটবামাত্র চূর্ণ বোতলের কাচ একেবারে ছররা গুলির মতন ছড়িয়ে যেত চতুর্দিকে। কোথাও মারামারি বাধবার উপক্রম হলে সেখানকার পানের দোকানগুলিতেই ঝাঁপ পড়ে যেত সর্বাগ্রে। তার কারণ, দোকানিরা এটা ভালই জানত যে, মারামারি করবার জন্য দোকান উজাড় করে যারা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যাবে, একটা বোতলেরও দাম তাদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার লড়াইয়ের সময়েও ইট-পাটকেল ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্রের

সঙ্গে সোডার বোতল বেশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি।

যা বলছিলুম। বহরমপুর থেকে সোনাপিসি আসায় তাঁকে নিয়েও মোটামুটি ওই সময়েই সবাই মিলে একদিন থিয়েটার দেখতে যাওয়া হয়। সেবারে দেখেছিলুম 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এ-ব্যাপারে আর যা মনে আছে, তা এই যে, এ-যাত্রায় মা, পিসিমা আর দিদির সঙ্গে চিকের আড়ালে বসে থিয়েটার দেখতে হয়েছিল। তা ছাড়া, হরলাল আর গোবিন্দর মধ্যে একজন যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্টেজে ঢুকেছিল, তাও মনে পড়ে। তবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দেখে কেউ বিশেষ কান্নাকাটি না-করার জন্যেই বোধহয় নাটক শেষ হবার পরে এ-যাত্রায় আর হল থেকে বেরিয়ে বাবা আমাদের লেমোনেড খাওয়াননি।

যেমন তালতলা, তেমন চাঁপাতলারও অধিকাংশ বাসিন্দা ছিলেন খাস কলকাতার লোক। আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবাইকে 'দেব' 'নেব' না-বলে 'দোব' 'নোব' আর 'দিয়েছি' 'নিয়েছি' না-বলে 'দিইচি' 'নিইচি' বলতে শুনে খুব মজা লাগত। পাশের বাড়ির তিন বউকে আমরা 'কাকিমা' বলতুম। যেদিন আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দেখতে যাই, তার পরদিন পাশের বাড়ির সেজোকাকিমা যখন মাকে বলেন, 'ও দিদি, কাল নাকি আপনারা ঠিয়াটার দেখতে গেসলেন!' তখন আমি আর দিদি হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ি। তখন-তখনই মা আমাদের এই নিয়ে কিছু বলেননি বটে, কিন্তু সেজোকাকিমার সঙ্গে কথা শেষ হয়ে যাবার পর একটা কড়া ধমক লাগিয়ে বলেছিলেন, 'থিয়েটারকে ঠিয়াটার বলেছে তো কী হয়েছে? একটা কথা মনে রাখবি, তোরা যেমন ওদের কথা শুনে হাসিস, তেমন তোদের বাড়ির বাঙাল-টানের কথা শুনে ওবাও কিছু কম হাসে না!'

পাশের বাড়ির চার ভাইয়ের মধ্যে বড়কর্তা থাকতেন একতলায়। মেজোকর্তা আর সেজোকর্তা দোতলায়। ছোটকর্তার বিয়ে হয়নি বলে তিনি সেজোকর্তার সঙ্গে থাকতেন। বড়কর্তা রেলে চাকরি করতেন, সেটা চলে যাওয়ায় তিনি খুব অসুবিধায় পড়ে যান, তাঁকে তখন বড় কস্টেসৃষ্টে সংসার চালাতে দেখেছি। চার ভাইয়ের মধ্যে মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন মেজোকর্তাই। আপিস থেকে বাড়িতে ফিরে, ধরাচুড়ো ছেড়ে, ঘরের পাশের ছাতে একটা চেয়াবে বসে তিনি বিশ্রাম করতেন, আর তালপাতার একটা হাতপাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে-করতে খুব ভারিক্কে গলায় হাঁক পাড়তেন, 'ছেনো!' ছেনু তাঁর ছেলের নাম। মেজোকর্তা যে-গলায় তাঁকে ডাকতেন, তাতে বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদ প্রকাশ পেত। ভাবখানা যেন এই যে, দ্যাখো, আমি নেহাত হেঁজিপেজি লোক নই, আপিস করে বাড়ি ফিরেছি, বউ আমাকে চা-জলখাবার দিয়েছে, এখন আমি নিজের বাড়ির ছাতে বসে হাওয়া খাচ্ছি, কিন্তু আমার আরাম করবার পালা এতেও ফুবিয়ে যাচ্ছে না, এই যে আমি আমার ছেলেকে ডেকে পাঠালুম, যেখানেই থাক এক্ষুনি ও ছুটে এসে কলেব গানের হাতল ঘুরিয়ে আমাকে কমলা ঝরিয়ার কেত্তন শোনাবে।

গ্রামোফোন কথাটা তখনও চালু হয়নি, আমরা ওই কলের গানই বলতুম। এ হল 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন' বলে যে একটা বিজ্ঞাপন বেরোত, তাবও অনেককাল আগের কথা। খুব কম বাড়িতেই তখন গ্রামোফোন যন্ত্রটা দেখা যেত। পাশের বাড়ির মেজোকর্তার অতএব গৌরববোধের কারণ ছিল বই কী। তাঁর যেমন মস্ত বড় কল্কেফুলের আকৃতির চোঙ বসানো একটা কলের গান ছিল, তেমন কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালা আর আঙুরবালার রেকর্ডও ছিল অনেকগুলি। আমরা যাকে 'কমিক' বলতুম, তাও দু'চারখানা ছিল বলে মনে পড়ে।

এখন তো ঘরে-ঘরে টিভি, ছাতে-ছাতে অ্যান্টেনা। তখন বেতারের এরিয়েলও খুব কম বাড়িতেই দেখা যেত। এখন তো বাসের মধ্যে ট্রানজিস্টর কানে লাগিয়ে ক্রিকেট টেস্টের ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে বাবুরা আপিসে যান, চাষিরা লাঙল ঠেলে, মাঝিরা দাঁড় বায়। যন্ত্রটি তখনও বাজারে

আসেনি। বাড়ির ছাতে 'এরিয়েল' খাটানো থাকলে তবে বুঝতে পারা যেত যে, হ্যাঁ, ওই বাড়িতে একটা বেতার যন্ত্র আছে বটে। ডাক্তার লেনে যখন থাকতুম, পাড়ার মাত্র একটি বাড়ির ছাতে তখন 'এরিয়েল' খাটানো থাকতে দেখেছি। নুর মহম্মদ লেনেও বিস্তর বাড়িতে ওটা শোভা পেত না। আমরা ঘুড়ি ওড়াতুম বলে বাঁশের সঙ্গে খাটানো তারটাকে ওই বয়সে খুব একটা পছন্দও করতে পারিনি। একে তো ঘুড়িটাকে আকাশে তোলবার ব্যাপারে ওটা ছিল একটা মস্ত বাধা, তার উপরে আবার ঝোঁপে যখন বৃষ্টি আসছে, তখন তাড়াহুড়ো করে নামাবার সময় আমাদের ঘুড়ি অনেক সময় ওতে আটকে যেত। সুতো-টুতো জড়িয়ে গিয়ে সে হত এক মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

সন্ধেবেলায় যখন পড়তে বসতুম, পাশের বাড়ির মেজোকর্তার কলের গান থেকে তখন সুরেলা মিহি গলায় ভেসে আসত গানের কলি। 'কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল, টগর যূথী বেলি মালতী চাঁপা গোলাপ বকুল।' কিংবা 'কে বিদেশি মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজালে বনে।' তার ফল যা হবার তা-ই হত। পড়ার বইয়ে মন বসাতে পারতুম না। দিনের পর দিন শুনতে শুনতে গানগুলো তখন প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নিজেও গাইতুম না তা নয়, তবে মা যেহেতু এইসব চপল গানের উপরে খুব খাপ্পা ছিলেন, তাই উঁচু গলায় গাইবার জো ছিল না। ভক্তির গান হলে অবশ্য আলাদা কথা। রজনীকান্তের গানের ভারী ভক্ত ছিলেন আমার মা। পাশের বাড়ির কলের গানে একটা গান সেই সময়ে প্রায়ই বাজত। গানটা আঙুরবালার না ইন্দুবালার তা মনে নেই। শুধু তার একটা লাইন এখনও মনে আছে: 'তাই মাতাল হল যত বাউরি ছুঁড়ি।' তালের গান, বার দুয়েক শুনেই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পার্ক থেকে খেলাধুলো করে বাড়ি ফিরে একদিন ওই গানটা গাইতে-গাইতে দোতলায় উঠবামাত্র মায়ের কাছে প্রচণ্ড বকুনি খাই। এটা যেমন মনে পড়ে, তেমন আবার এটাও ভুলিনি যে, তার দিন কয়েক বাদেই একদিন দুপুরবেলায় মা আমাকে তাঁর কাছে বসিয়ে বলেছিলেন, 'কান্ত কবির সেই গানটা একবার কর তো: তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।'

এক পিরিয়ড শেষ হয়েছে, কিন্তু পরের পিরিয়ডের মাস্টারমশাই এসে পৌঁছননি, মধ্যিখানে যে সময়টুকু, পিছনের বেঞ্চির কয়েকটি ছেলে সেটাকে সঙ্গীতচর্চার কাজে লাগাত। নিচু গলায় নিধুবাবুর টপ্পা। 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।' সেই সঙ্গে চোখ বুজে দু'দিকে মাথা নেড়ে, পাকা সমঝদারের ভঙ্গিতে যে-ছেলেটা হাইবেঞ্চিতে তবলার বোল তুলত, তার হাতটা নেহাত খারাপ ছিল না। পঙ্কজকুমার মল্লিকের 'ও কেন গেল চলে...' আর 'আমারে ভালবেসে আমারই লাগিয়া....' গান দুটি যখন খুব জনপ্রিয় হয়, আমরা তখন বোধহয় ক্লাস সিক্সের ছাত্র। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সব কলেজই খুব ঘটা করে একটা গানের মজলিশ বসাত। এই নিয়ে কলেজে কলেজে রেষারেষি তখনকার দিনে নেহাত কম ছিল না। অবশ্য শুধু গানের মজলিশ বলে কথা নেই, সরস্বতী ঠাকরুনের ভাসান উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটেও এই রেষারেষি প্রকাশ পেতে দেখেছি। মাঝে-মাঝে মারদাঙ্গা বাধারও উপক্রম হত। ফুটবলের মাঠে সেটা আবার উপক্রমণিকাতেই শেষ হত না। খেলাটা ইলিয়ট শিল্ডেরই হোক আর হার্ডিঞ্জ বার্থডে শিল্ডেরই হোক, দুই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মারামারি লেগে যেত প্রায়ই। আমরা বঙ্গবাসী ইশকুলের ছাত্র। সুতরাং বঙ্গবাসী কলেজের সমর্থক হিসেবেই মাঠে হাজির থাকতুম। উঁচু ক্লাসের দাদারা যত না খেলা দেখতেন, আস্তিন গুটিয়ে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের উপরে নজর রাখতেন তার চাইতে ঢের বেশি।

তিরিশের দশকে বঙ্গবাসী কলেজের ফুটবল-টিম ছিল দুর্ধর্ষ। চল্লিশের দশকের গোড়াতেও তার জের চলতে দেখেছি। কলকাতা ময়দানে সেই সময়ে যাঁরা এ-ডিভিশনের নানা টিমের হয়ে ফুটবল

খেলতেন, তাঁদের মধ্যে কতজন যে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন, তার হিসেব কষতে গেলে দু'হাতের দশটা আঙুলেও কুলোবে না। পরেশ মুখুজ্যে, পরিতোষ চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সুনীল ঘোষ, সোমানা— কত আর নাম করব, কলকাতা-ফুটবলের এই যে সব অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, যেমন নিজের-নিজের ক্লাব, তেমন বঙ্গবাসী কলেজের হয়েও এঁরা নিয়মিত খেলেছেন। ফলে, ইলিয়ট, হার্ডিঞ্জ বার্থডে আর হেরম্ব মৈত্র, কলেজ-ফুটবলের এই যে তিনটে শিল্ড, এর মধ্যে একটি তো বটেই, কখনও কখনও দুটোও চলে আসত বঙ্গবাসীর দখলে।

এখানে একটা মজার কথা বলি। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার সময়ে, স্কুলের ছাত্র হয়েও, আমরা যেমন চাইতুম যে, বঙ্গবাসী কলেজ জিতুক, তেমন আবার আমাদের নিজেদের মধ্যেও একটা প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল তো, এটার প্রবর্তনা হয়েছিল গিরিশচন্দ্র বসুর স্মরণে, তা সেই প্রতিযোগিতায় স্কুলকে যেহেতু লড়তে হত কলেজের বিরুদ্ধে, তাই কলেজই তখন আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াত। শত্রু মানে সাধারণ শত্রু নয়, আমাদের তুলনায় অন্তত দশগুণ বেশি শক্তিশালী শত্রু। এগারোজনের টিম। সুতরাং এগারোগুণ বেশি শক্তিশালী বললেই ঠিক হত। তবু যে এগাবোগুণ না বলে দশগুণ বলেছি, তার কারণ আর কিছুই নয়, সুনীল ঘোষ তখনও কলেজে ঢোকেননি, তখনও তিনি আমাদের ইশকুলের পড়ুয়া। আমার চেয়ে দু'তিন ক্লাস উপরে পড়তেন, যদ্দুব মনে পড়ছে, তখন তিনি ক্লাস নাইন কি ক্লাস টেনের ছাত্র। বয়স আর কতই বা হবে। চোদ্দ-পনরোর বেশি নিশ্চয় নয়।

কিন্তু এই কিশোরবয়সী ছাত্রটিই সেবারে এক অঘটন ঘটিয়ে দেন। যে কলেজ-টিম এ-ডিভিশনের খেলোয়াড় দিয়ে বোঝাই, চোদ্দ-পনরো বছরেব একটি ছেলে, বলতে গেলে প্রায় একা লড়ে গিয়ে, সেই টিমের হাত থেকে ছিনিযে নিযে আসেন গিবিশ বসু ট্রোফি। সুনীলদাকে নিয়ে গোটা ইশকুল সেদিন তোলপাড়। হেড মাস্টারমশাই ছুটি ডিক্লেয়ার কবে দিলেন।

ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের খেলোযাড় হিসেবে সুনীল ঘোয এর কিছুকাল পবে যে কী দাপটের সঙ্গে খেলে গিয়েছেন, তা হয়তো অনেকের মনে পড়বে। খাঁটি বল-প্লেয়ার ছিলেন। বডি-ফিটনেস আর স্কিল, দুয়ের কোনওটাতেই তাঁর কিছুমাত্র ঘাটতি ছিল না। দীর্ঘদেহী পুরুষ, তাই বলে কৃশকায় নন। শ্যামলা রঙের লাবণ্যময় চেহাবার এই মানুযটির শরীরটাও ছিল বেশ শক্তপোক্ত। আই.এফ.এ.শিল্ডের খেলায় আর্মির বেশ কিছু গোরা টিমও তখন কলকাতার মাঠে নামত। একে তো তারা বুট পরে খেলত, তার উপরে অনেকেরই চেহারা ছিল ভয় পাইয়ে দেবার মতো। কিন্তু সুনীল ঘোয তাদেরও অকুতোভয় ট্যাকল করতেন। এ-ব্যাপারে কখনও তাঁকে কিছুমাত্র গুটিয়ে যেতে দেখিনি।

এই সুনীল ঘোযেব সঙ্গে মারাত্মক একটা সংঘর্ষের ফলেই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিশালদেহী এক খেলোয়াড়ের পা ভেঙে যায়। মাঠে সেদিন হাজির ছিলুম বলেই বলতে পারি যে, ব্যাপারটা আদৌ ইচ্ছাকৃত নয়, নেহাতই দুর্ঘটনা। যাঁর পা ভেঙে যায়, তিনিও ছিলেন খুবই বড় মাপের ফুটবলার, উপরন্তু ভদ্র আচরণের জন্যও সবাই তাঁর খুব প্রশংসা করত। সুনীলের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে তিনি মাঠের মধ্যে পড়ে গেছেন, উঠবার চেষ্টা করছেন কিন্তু উঠতে পারছেন না, এই দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই।

কলেজ টিমের কথা বলতে গিয়ে একটু আগে যে পরেশ মুখুজ্যের নাম করেছি, তার বিষয়ে দু-একটা কথা না বললেই নয়। আমরা তাঁকে পরেশকাকা বলতুম। ঠিক কবে যে তিনি আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকেছিলেন, সেটা আর অ্যাদ্দিন বাদে বলতে পারব না, তবে যেভাবে এসে ঢুকেছিলেন, সেটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন বোধহয় আমি ক্লাস ফোর কি ফাইভের ছাত্র। সকালবেলায়

একতলার বাইরের ঘরে বসে হোমটাস্ক করছি, এমন সময় কেউ সদর-দরজার কড়া নাড়েন। দরজা খুলে যাঁকে দেখতে পাই, তাঁর বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি হবে না। পাতলা ছিপছিপে শরীর, গায়ের রং আমারই মতো কালো, মাথায় কোঁকড়া কালো ঠাসজমাট চুল। এক হাতে সেই তখনকার দিনের মার্কামারা টিনের সুটকেস, যার সবুজ রঙের ডালার উপরে মস্ত একটা লাল গোলাপ আঁকা থাকত (এবং যার হাতে সেটা থাকত, ধরেই নেওয়া যেত যে, সে একেবারে গাঁইয়া লোক), আর অন্য হাতে সতরঞ্চি-জড়ানো একটা বিছানা।

বললুম, "কাকে চাই?"

তাতে বিশুদ্ধ বাঙাল-টানে তিনি যা বললেন, তার মর্মার্থ এই যে, এ-বছর তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, কিন্তু কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে যে টাকা দরকার, তা জোগাড় করে উঠতে পারেননি। তাই প্রফেসর জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, যদি তাঁর কলেজে তিনি একটা-কিছু ব্যবস্থা করে দেন।

বুঝলুম, দশ-ফুট বাই দশ-ফুট আমাদের যে ঘরে এখন পাঁচটা বিছানা পড়ে, এখন থেকে তাতে ছ'টা বিছানা পড়বে। তা-ই পড়েছিল, তবে তার আগে বাবার সঙ্গে পরেশকাকার প্রথম সাক্ষাতের কথাটা বলা দরকার। বাবা বরাবর দেরি করে ঘুমোতেন বলে বিছানা ছেড়ে উঠতেনও একটু দেরিতে। সেদিনও আটটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে, চোখমুখ ধুয়ে সদ্য খবরের কাগজে চোখ বুলোতে শুরু করেছেন, এমন সময় পরেশকাকাকে নিয়ে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সতরঞ্চিতে জড়ানো বালিশ আর বিছানাটাকে মেঝেয় নামিয়ে রেখে, টিপ করে বাবাকে একটা প্রণাম করে, পরেশকাকা বলেন, "স্যার, আমি আপনার কলেজে পড়তে চাই, কিন্তু কলেজে পড়বার মতো টাকাপয়সা আমার নেই।"

কেউ পড়তে চায়, কিন্তু টাকা নেই বলে পড়ার খরচ চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর বেশি আর বাবাকে কিছু বলবার দরকার হত না, বঙ্গবাসী কলেজে তার একটা ফ্রি স্টুডেন্টশিপের ব্যবস্থা হয়ে যেতই। পরেশকাকাকেও ফ্রি-স্টুডেন্টশিপের আশ্বাস দিয়ে বাবা বললেন, "ঠিক আছে তোমাকে মাইনে দিতে হবে না, তা হলে তোমার পড়াশুনোটা চালিয়ে যেতে পারবে তো?"

"তাও পারব না স্যার, কলকাতা শহরে আমার কোনও আত্মীয়স্বজনও নেই। আমার থাকা খাওয়ার খরচ কী করে চালাব?"

"ক্যানিং হস্টেলে একটা ফ্রি-সিটেরও ব্যবস্থা হয়তো হতে পারে," একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বাবা বললেন, "কিন্তু তার একটা মুশকিল আছে। হয় তোমাকে ভাল ছাত্র হতে হবে; আর নয়তো ভাল খেলোয়াড়। তা তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট তো দেখছি খুব একটা ভাল হয়নি, এদিকে স্বাস্থ্যও তো মনে হচ্ছে সুবিধের নয়, খেলতে-টেলতে পারো?"

কাচুমাচু মুখে পরেশকাকা বললেন, "গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলতুম স্যার।"

"দু'পা চলে?"

"তা চলে স্যার।"

"ঠিক আছে," বাবা বললেন, "আপাতত এখানেই থাকো। আর আজই একটা দরখাস্ত লিখে আমার হাতে দিয়ে দাও। দেখি কদ্দুর কী করা যায়।"

স্নানে যাবার জন্য বাবাকে তাড়া লাগাতে মা ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। বাবা বললেন, "এ হচ্ছে পরেশ, ঢাকা মেলে আজ সকালে এসে পৌঁছেছে। ওর জলখাবারের ব্যবস্থা করে দাও। এখন কয়েকটা দিন আমাদের কাছেই থাকবে। ইশকুলে ফুটবল খেলত। এখানকার মাঠে কেমন খেলবে, কে জানে।"

জানতে খুব দেরি হল না। প্রথম যেদিন বঙ্গবাসী কলেজের হয়ে খেলতে নামেন, সেইদিনই গোল পেয়ে যান। তারপর ইলিয়ট শিল্ড আর হার্ডিঞ্জ বার্থডে শিল্ডের খেলায় উপর্যুপরি যে-সব কাণ্ড তিনি ঘটাতে লাগলেন, তাকে ভেল্কিবাজি বললেও খুব-একটা বাড়িয়ে বলা হয় না। প্রথম দিনের খেলার সুবাদেই ক্যানিং হস্টেলে তাঁর বিনা-খরচায় থাকার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মধুর স্বভাবের এই মানুষটি সম্পর্কে আমাদের বাড়িসুদ্ধ লোকের ইতিমধ্যে এতটাই মায়া পড়ে গিয়েছিল যে, আমরা তাঁকে জায়গা পালটাতে দিইনি।

পরেশকাকার খেলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁকে ভুলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাঁর খেলা দেখেছি নেহাতই আমার বালক-বয়সে। কিন্তু আজও সেই মানুষটির কথা যখন ভাবি, সে-সব খেলা তখন যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসতে থাকে। খেলতেন ফরোয়ার্ড-লাইনে, কিন্তু ক্রমাগত এত জায়গা পালটে খেলতেন যে, কখন যে তিনি কোথায় থাকবেন, বিপক্ষের ডিফেন্স কখনওই চট করে সেটা বুঝে উঠতে পারত না। মানুষটি ছিলেন রোগা-পাতলা, কিন্তু দম ছিল অসাধারণ। বডি-ফিটনেসের অভাবটা তেমন পুষিয়ে নিয়েছিলেন স্কিল দিয়ে। যেভাবে বল ট্র্যাপ করতেন, তাতে মনে হত, দু'পায়ে যেন আঠা মাখিয়ে নিয়ে মাঠে নেমেছেন। অকারণে দৌড়োদৌড়ি করতেন না, কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ একেবারে আচমকা যখন বাড়িয়ে নিতেন তাঁর গতিবেগ, বিপক্ষের সীমানায় তখন বিশাল ত্রাসের সঞ্চার হত। বছর কয়েক আগে স্পেনে যে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের খেলা হয়, তাতে ইতালির পাওলো রসির একটা গোল দেখে আমাদের পি. কে. ব্যানার্জি বলেছিলেন, ও যেন গোলের গন্ধ পাচ্ছিল। কথাটা কাগজে পড়ে আমার পরেশকাকার কথা মনে পড়ে যায়। পরেশকাকাও গোলের গন্ধ পেতেন। কলকাতার ময়দানে তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন তাই সেরা স্ট্রাইকার। তাঁর পরের যুগেও অমন স্ট্রাইকার আমরা দু'তিনজনের বেশি দেখিনি। এখনকার কথা সেক্ষেত্রে যত কম বলা যায়, ততই ভাল।

পরেশকাকা কলকাতার মাঠে খেলতে-খেলতেই ই. বি. আর. অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের চাকরি নিয়ে ঢাকায় চলে যান। সেই সময়ে ইসলিংটন করিনথিয়ানস নামে একটা ফুটবল দল বিলেত থেকে ভারতে এসেছিল। দুর্ধর্ষ টিম। যেখানেই যায়, সেখানেই জেতে। আমরা তো ধরেই নিয়েছিলুম যে, এ-দেশে অন্তত এই টিমকে কেউ হারাতে পারবে না।

কিন্তু সেই ইসলিংটন করিনথিয়ানসও হারল। এবং কোথায় হারল? না ঢাকায়। কাগজের হেডলাইন পড়েই ছোটকাকা একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাবার ঘরে এসে হাজির। "দাদা, ঢাকায় ওরা এক গোলে হেরে গেছে!"

বাবা হেসে বললেন, "দ্যাখ, গোলটা নিশ্চয় পরেশের।"

না, গোলটা দিয়েছিলেন বি. সেন, অর্থাৎ সেকালের বিখ্যাত ফুটবলার পাখি সেন। তবে জনাকয়েককে কাটিয়ে এনে বলটা যিনি পাখি সেনেব পায়ে তুলে দেন, কাগজ পড়ে জানলুম যে, তাঁর নাম পরেশ মুখুজ্যেই বটে।

৩১

খুব ছেলেবেলায় যে বাবাকে কখনও অসুস্থ হয়ে থাকতে দেখেছি, এমন আমার মনে পড়ে না। সাধারণ সর্দিজ্বর কি মাথা-ধরা? না, তাও কখনও দেখিনি। বীরেশ্বরকাকা ঠাট্টা করে বলতেন, ওর হচ্ছে লোহার শরীর, অসুখ-বিসুখের সাধ্য কী যে ওখানে দাঁত ফোটাবে। মির্জাপুর পার্ক থেকে বাড়িতে ফিরে তাই যেদিন দেখি যে, সেই সন্ধেবেলাতেই বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন, সেদিন খুব অবাক হয়ে যাই। মা'কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, কলেজ থেকে বাবা একটা মিটিংয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন।

একটু বাদেই আসেন বাবার বন্ধু, আমাদের পারিবারিক ডাক্তার, ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ব্লাডপ্রেশার নিয়ে বাবাকে বলেন, "ঠিক আছে, এখন দু-একটা দিন আর কলেজে যেয়ো না, একটু বিশ্রাম নাও।"

ইন্দ্রকাকা ঘর থেকে বেরোবার পর মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, "ভয়ের কিছু নেই তো?" তখন কিন্তু তাঁকে অন্য কথা বলতে শুনলুম। গম্ভীর মুখে বললেন, "একেবারে যে নেই, তা কিন্তু নয়, বউঠান। প্রেশার তো দেখছি বড্ড চড়া। ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিন। তবে কিনা বিশ্রামই সবচেয়ে বড় ওষুধ। ও-সব মিটিং-ফিটিং এখন একদম বন্ধ থাকবে। অন্তত এক হপ্তা এখন কলেজেও যেতে দেবেন না।"

কংগ্রেস করতেন বলে বাবার সঙ্গে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের যোগাযোগ ছিল ঠিকই, এর আগের বছর আমার বড় পিসেমশাইয়ের ঘোরতর অসুখের সময় বার-দুয়েক আমাদের বাড়িতে এসে তাঁকে তিনি দেখেও গিয়েছিলেন। কিন্তু একবারও যেহেতু ভিজিট নেননি, তাই তাঁকে কল্ দিতে বাবা খুব অস্বস্তি বোধ করতেন। এবারে অবশ্য কল্ দেবার উপায়ও ছিল না। পরের দিনই সকালবেলার কাগজ খুলে জানতে পারা যায় যে, বোম্বাই থেকে ডাক্তার রায় যখন কলকাতায় ফিরছিলেন, তখন ওয়ার্ধা স্টেশনে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। এ হল ১৯৩১ সালের কথা। দেশ জুড়ে তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল।

বাড়ির কাছে নামকরা ডাক্তার ছিলেন অমল রায়চৌধুরী। ঠিক হয়েছিল, তাঁকে দিয়ে বাবাকে একবার পরীক্ষা করানো হবে। কিন্তু বাবা-ই তাতে রাজি হলেন না। বললেন, "ইন্দ্র যে ওষুধ দিয়েছে, সেটা খেয়ে তো ভালই আছি, তা হলে আবার আর-কাউকে ডাকবার কথা উঠছে কেন? আর তা ছাড়া, জীবনে একটা মাথাধরা ছাড়াবার বড়ি পর্যন্ত খাইনি সেটা জানো তো। তাই ভাবছি যে, গুচ্ছের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে শেষকালে আবার না হিতে-বিপরীত হয়।"

মা বললেন, "বেশ, তা হলে অন্য ব্যবস্থা করি। শাস্ত্রী-মশাইয়ের ওযুধ খেয়ে বাবা তো শুনি উপকার পাচ্ছেন, তাঁর ছেলের জন্যও তা হলে সেই ব্যবস্থাই হোক।"

তা-ই হল। ঠাকুর্দা যাঁর ওযুধ খেয়ে উপকার পাচ্ছিলেন, পরের দিনই কল্ দেওয়া হল সেই যোগেন্দ্র ষড়দর্শনতীর্থ মশাইকে।

যোগেন্দ্র ষড়দর্শনতীর্থ ছিলেন তখনকার সেরা আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক। তাঁর অনেক উপাধির একটা ছিল দর্শনশাস্ত্রী। সেই কারণে অনেকে তাঁকে শাস্ত্রীমশাইও বলত। অনেকেক্ষণ ধরে বাবাকে তিনি পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "কিচ্ছু চিন্তা করবেন না।"

মায়ের সেই একই প্রশ্ন, "ভয়ের কিছু নেই তো?"

শাস্ত্রীমশাই বললেন, "শরীর তো একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। যন্ত্রের যেমন কলকব্জা থাকে, তেমন শরীরেরও থাকে। তা মাঝে-মাঝে সেই কলকব্জাগুলো একটু বিগড়েও যায়। তখন সেগুলোকে একটু মেরামত করে নিতে হবে না? তাতে ভয়ের কী আছে?"

বাবা বললেন, "কলেজে যেতে পারব তো?"

"তা কেন পারবেন না?" শাস্ত্রীমশাই বললেন, "তবে শরীরের এখন একটু বিশ্রাম চাই। আপাতত দিন-তিনেক বিশ্রাম নিন। তারপরে কলেজ কববেন। কিন্তু একটা কথা। নিত্য গঙ্গাস্নান করা চাই।"

মা বললেন, "রোজ রোজ ওঁকে গঙ্গায় গিয়ে চান করে আসতে হবে?"

শাস্ত্রীমশাই বললেন, "শুধু যে রোজ যেতে হবে, তা নয়, হেঁটে যেতে হবে, তারপর গঙ্গাস্নান করে আবার হেঁটে ফিরতে হবে। এ-রোগে ওর চেয়ে ভাল ওযুধ আর নেই।"

বাবা তো এককথায় রাজি। শাস্ত্রীমশাই চলে যাবার পরে বললেন, "ছেলেবেলায় মামাবাড়িতে থাকতে বৈঠাখালির খালে সাঁতার কেটেছি, আব ভাঙ্গা ইশকুলের বোর্ডিংয়ে থাকতে কুমার নদীর জলে। এখন আবার নতুন করে জল ঝাঁপাবার ব্যবস্থা হল। এ তো দেখছি দারুণ ব্যাপার! কী, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নকি?"

যাবার ইচ্ছে মায়ের যে একেবারেই ছিল না, তা নয়, তবে নিত্যি-নিত্যি হেঁটে যাওয়া-আসা করতে হবে শুনেই বোধহয় তাঁর উৎসাহ একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছিল। মুখে অবশ্য সে-কথা স্বীকার করলেন না। বললেন, "এই ভূতের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে যখন হরিদ্বারে গিয়ে থাকব, তখন নিত্যি কেন, রোজ দু'বেলা গঙ্গাস্নান করব। এখন অত পুন্যি আমার সহ্য হবে না।"

কিন্তু একজন কাউকে তো বাবার সঙ্গে যেতেই হবে। কে যাবে? বড়কাকা ভোর না হতেই সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। কাকুনকে পাঠালে বাজারে যাবে কে? এদিকে ছোটকাকার আই. এসসি. পরীক্ষারও আর দেরি নেই, তাঁকেও তাই পাঠানো চলে না। তা হলে?

শেষ পর্যন্ত আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "কী রে খোকা, পারবি?"

আমি দেখলুম, বাবার সঙ্গে যদি বেরিয়ে পড়ি, রোজকার মতো ঘুম থেকে উঠে তা হলে আর আমাকে বি/এ/টি ব্যাট, সি/এ/টি ক্যাটও করতে হয় না, তেরো কিংবা সতেরোর ঘরের নামতাও মুখস্থ করতে হয় না, গুরুজনদের ধমক-ধামকও খেতে হয় না। ঘাড় হেলিয়ে বললুম, "খুব পারব।"

"বাবার, উপরে সব সময়ে নজর রাখবি। একদম সাঁতার কাটতে দিবি না। বাবার হাত ধরে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে কোমর-জল অব্দি নামবি, তারপর দুটো ডুব দিয়েই বাবাকে নিয়ে ফের উপরে উঠে আসবি।...কী রে, মনে থাকবে তো।"

আবার ঘাড় হেলিয়ে বললুম, "খুব থাকবে।"

আমার বয়স তখন আর কত হবে, মেরে-কেটে সাত। কিন্তু ওই বয়সেও বুঝতে পারতুম যে, মায়ের দুর্ভাবনা আসলে আমাকে নিয়ে ততটা নয়, যতটা বাবাকে নিয়ে। তা দুর্ভাবনার কারণ ছিল বই কী। এমনিতে বাবা খুবই হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু এত বেশি টগবগে আর প্রাণবন্ত যে, হঠাৎ-হঠাৎ এক-একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন। বাড়ি থেকে বেরোবার পরে যতক্ষণ না আবার তিনি ফিরে আসছেন, ততক্ষণই তাই মা'কে বড় ভয়ে-ভয়ে থাকতে হত।

গঙ্গাস্নান করে ফেরার পথেও একদিন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন। প্রথম দু'চার দিন সবই চলেছিল একেবারে নিয়মমাফিক। শাস্ত্রীমশাই যা বলে দিয়েছিলেন, তার কোথাও এতটুকু নড়চড় হয়নি। মায়ের কথাটা অবশ্য পুরোপুরি রাখা যেত না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে যেতুম জগন্নাথঘাটে, সেখানে ফোঁটা-তিলক-কাটা, ভিন্ন প্রদেশবাসী একটি লোকের দোকানে আমাদের পোশাক পালটে, তাকে দিয়েই বুকে পিঠে বেশ ভাল করে সর্ষের তেল মর্দন করিয়ে নিয়ে, পিতাপুত্র দুজনেই খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে গঙ্গাস্নান কবতুম, তারপর হ্যারিসন রোড আর স্ট্র্যাণ্ড বোডের মোড়ে মস্তবড় যে মিষ্টির দোকানটা আজও দেখতে পাই, সেখানে হালুয়া-কচুরি আর সন্দেশ-রসগোল্লা বেশ উত্তমরূপে সাঁটিয়ে ফের হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতুম। বাবা হাঁটতেন, পিছন পিছন আমাকে দৌড়তে হত। নইলে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারতুম না। সব মিলিয়ে সময় লাগত ঘণ্টা দুয়েক।

দিন কয়েক বাদেই বাবা বললেন, "না রে, এভাবে চলবে না, পড়াশুনোর জন্যেও একটু সময় চাই তো, এখন থেকে তাই হেঁটেই আসব বটে, কিন্তু বাসে করে ফিরব।"

হালুয়া-কচুরি খেতে-খেতে বললুম, "কিন্তু শাস্ত্রীমশাই তো বলেছেন, হেঁটে আসতে হবে, হেঁটে ফিরতে হবে। তিনি কিন্তু জানতে পাবলে খুব রাগ করবেন।"

বাবা বললেন, "শাস্ত্রীমশাইকে জানাবার দরকার কী।...আর হ্যাঁ, তোর মা'কেও কিছু বলিস না।"

সেইদিন থেকেই আমরা গঙ্গার ঘাট থেকে বাসে করে ফিরে আসতে শুরু করি। একটু আগে যে কাণ্ডের কথা বলেছি, সেটাও ঘটে ওই বাসে করে ফিরবার পথে। মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে সেদিন আমরা যে বাসে উঠি, সেটা ছাড়বার আগের মুহূর্তে এক বৃদ্ধাও তাতে উঠে পড়েছিলেন। ভুল করে উঠেছিলেন। তিনি পোস্তার ওদিকে যাবেন। তাই হ্যারিসন রোডের বাসে নয়, যে বাস স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে উত্তরদিকে যায়, তাতেই তাঁর উঠবার কথা। বাবা সে-কথা জানতে পেরে কণ্ডাকটরকে বলে বাস থামাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কণ্ডাকটর তাঁর কথা শুনে ঘণ্টি মেরে বাস থামায়নি। দু-একটা কটু বাক্যও বলেছিল। বাস একেবারে চিতপুর রোডে এসে থামে।

তারপরই ঘটে ধুন্ধুমার কাণ্ড। বাবা তাঁর আসন ছেড়ে উঠে বিশালকায় কাণ্ডাকটরটির ঢোলা জামার সামনের দিকটা খামচে ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে বাস থেকে রাস্তার উপরে নামিয়ে এনেই হাতের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করেন। আমি একেবারে ডাক ছেড়ে চেঁচাতে থাকি। সঙ্গে-সঙ্গে লোক জমে যায়। কিন্তু আমার পিতৃদেবের মারমূর্তি দেখে কেউই তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে না। বাসের ড্রাইভারও তার সঙ্গীটিকে সাহায্য করতে এগোয়নি। বাবার সেই তখনকার চেহারা দেখে সেও সম্ভবত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাস নিয়ে সে নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

মার খেতে-খেতে লোকটা যখন রাস্তার উপরে পড়ে যায়, এমনকি একটা আর্তনাদও করে না, তখনই সম্ভবত বাবার হুঁশ ফেরে। হাতের লাঠি উঁচিয়ে চলন্ত একটা ট্যাক্সি থামান তিনি।

রাস্তা থেকে লোকটিকে কুড়িয়ে এনে পিছনের সিটে তাকে তুলে দিয়ে আমাকে বলেন, "তুইও পিছনে বোস।" তারপর নিজে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে বলেন, "মেডিক্যাল কলেজ।"

মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ডাক্তারবাবুটি আই. এসসি. পাশ করেছিলেন বাবার কলেজ থেকে। এখন বুঝতে পারি যে, এই জন্যই এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনও পুলিশ-কেস হয়নি। দিন-তিনেক বাদে লোকটি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। সেই ক'টা দিন বাবা যে রোজ দু'বেলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর করতেন, সেটা মনে পড়ে। ছাড়া পাবার দিন বাবা যে তাকে একশোটা টাকা দিয়েছিলেন, সেটা মনে পড়ে। তবে ডাক্তারবাবুর কথাটাও ভুলে যাইনি। ডাক্তারবাবু বাবাকে বলেছিলেন, "স্যার, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। লোকটা অন্যায় করেছিল, আপনি তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু স্যার, কতটা মারলে সেটা শাস্তি হয়, আর কতটা মারলে একটা মার্ডার কেসে জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, সেটা তো আপনার বোঝা দরকার।"

বাবা বলেছিলেন, মা'কে এই ব্যাপারটা জানানো চলবে না। তা আমি জানাইনি। আমাদের গঙ্গাস্নান অতএব নিয়মমতো চলতে লাগল। তাতে যে বাবা খুব উপকার পেয়েছিলেন, তাও বলতে হবে। বাবার একমাত্র রোগ ওই রক্তের চাপ। তা, বছর পাঁচেক সেটা নিয়ে আর কোনও ঝামেলা হয়নি।

বাবা ছিলেন পিতৃভক্ত মানুষ। নিজের বিষয়ে প্রতিটি কথা জানিয়ে ঠাকুর্দাকে তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন। কবিরাজী চিকিৎসায় উপকার পাচ্ছেন, এই কথাটাও জানাতে তাঁর ভুল হয়নি। উত্তরে ঠাকুর্দা লিখেছিলেন, রোগপীড়ার ব্যাপারে শাস্ত্রীমশাই সর্বজ্ঞ মানুষ, তাঁর বিধান যেন তাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়। তেলযুক্ত মাছ আর চর্বিযুক্ত মাংস যে এ-রোগে অত্যন্ত ক্ষতিকারক, চিঠির মধ্যে সেটাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মাংসের প্রসঙ্গে ঠাকুর্দার শেষ-জীবনের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সেটা এখনই বলে ফেলি, নয়তো পরে ভুলে যাব।

ঠাকুর্দা যখন মারা যান, আমার বয়স তখন দশ পেরিয়ে এগারো চলছে। কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন, সারাদিন ঘরে বসেই কাটাতেন, বড় একটা বাইরে বেরুতেন না। মৃত্যুর মাসখানেক আগে মাঝে-মধ্যে একটু আধটু জ্বর হচ্ছিল, সেইসঙ্গে কাসির দমকও হঠাৎ বেড়ে যায়। কলকাতা থেকে কাকুনকে সেই সময় দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা কাকুনকে বলে দিয়েছিলেন, "বাবা কখন কেমন থাকেন, তা জানিয়ে রোজ একখানা করে পোস্টকার্ড পাঠাতে যেন ভুল না হয়।" বাবা বলেছিলেন, "দরকার বুঝলে ভাঙ্গার বড়-ডাকঘরে লোক পাঠিয়ে টেলিগ্রাম করবি।"

কিন্তু দিন-তিনেক বাদেই প্রথম যে টেলিগ্রামটি এল, তা পড়ে কেউ কোনও অর্থোদ্ধার করতে পারলেন না। বিকেল চারটে নাগাদ টেলিগ্রাম এসেছিল, বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। তবে বড়কাকা আর ছোটকাকা, দু'জনেই তখন বাড়িতে। শনিবার ছিল বলে আমিও তার একটু আগেই ইশকুল থেকে ফিরেছি। টেলিগ্রামে লেখা ছিল: সেণ্ড কেংগ্রাজ ইমিডিয়েটলি। বড়কাকা মাথা চুলকে বললেন, "এ কী বিদ্‌ঘুটে কথা রে বাবা! কেংগ্রাজ! এমন কোনও শব্দ তো কখনও শুনিনি!" ছোটকাকা ডিকশনারি ঘাঁটছিলেন। ঠাস্ করে সেটা বন্ধ করে বললেন, "থাকলে তবে তো শুনবে। ডিকশনারিতে অমন কোনও শব্দই নেই!" মা বললেন, "বলিস কী! সুধা একটা কথা লিখে পাঠাল, আর বইয়ে সেটা থাকবে না? তাও কি হয় নাকি? খোঁজ, খোঁজ, ভাল করে খোঁজ!"

বাবা এর একটু বাদেই কলেজ থেকে ফেরেন। টেলিগ্রাম পড়ে তিনিও অবশ্য কিছুই বুঝতে

পারলেন না। বললেন, "নাঃ, এই সুধাটাই দেখছি আমার মাথা খারাপ করে ছাড়বে! কিছু একটা পাঠাতে বলছে, কিন্তু সেটা যে কী, তা তো ছাই বুঝতে পারছি না।"

ঠাকুর্দাকে আমি দাদা বলতুম। বড়দের মুখে 'কেংগ্রাজ' কথাটা বারবার শুনতে শুনতে একেবারে হঠাৎই একটা চিন্তা এই সময় আমার মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলি, "বুঝতে পেরেছি, দাদা কী চান, আমি বুঝতে পেরেছি!"

বাবা বলেন, "কী বুঝেছিস?"

"দাদা নিশ্চয় কাঁকড়া খেতে চান। কাকুন তাই কাঁকড়া পাঠাতে বলেছে।"

বড়কাকা বলেন, "তা হলে কেংগ্রাজ লিখতে গেল কেন? ক্র্যাব লিখলেই তো গোল মিটে যায়।"

ছোটকাকা বলেন, "কাঁকড়া পাঠাতে বলেছে? হতেই পারে না। আমাদের দেশের বাড়ির পুকুরে কি কাঁকড়ার অভাব যে, এখান থেকে পাঠাতে বলবে?"

বাবা বললেন, "না রে নরেন, না রে ফণী, খোকা বোধহয় ঠিক ধরেছে। বাবা কাঁকড়া খেতে পছন্দ করেন, আমি জানি। তবে আমাদের খালে-বিলে-পুকুরে যা পাওয়া যায়, সেই ভুসো-কাঁকড়া নয়।...ফণী, তোর বউদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে এক্ষুনি তুই হগ্‌সাহেবের বাজারে চলে যা। ওখানে যে বড়-সাইজের কিংক্র্যাব পাওয়া যায়, তা-ই গোটাকয় কিনে আন। ওদের দিয়েই প্যাক করিয়ে আনবি। কালই সকালের ট্রেনে কাউকে দিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

ছ্যাঁদা-করা টিনের বাক্সের মধ্যে জ্যান্ত আধডজন কাঁকড়া নিয়ে ছোটকাকা সেদিন রাত দশটায় বাড়ি ফেরেন, আর সেই বাক্স হাতে করে তিনিই তার পরদিন ভোরের ট্রেনে ফরিদপুর রওনা হয়ে যান। সেদিন রাত্তিরে বাবা আমাকে বলেন, "হ্যাঁ রে, তোর দাদা যে কাঁকড়া খেতে চেয়েছেন, তা তুই বুঝলি কী করে?"

বুঝেছিলুম স্রেফ একটা ঘটনার কথাতা মনে পড়ে যাওয়ায়। আমাদের গ্রামের দুটো পাড়ার মাঝ-বরাবর চিন্তার বাগ বলে একটা জঙ্গুলে জায়গা ছিল। আমি যখন দেশের বাড়িতে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে থাকতুম, সেই সময়ে সেখানে একদিন বেশ বড়সড় একটা শজারু বেরিয়ে পড়ে। এমনিতে শজারু খুবই নিরীহ প্রাণী। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারও তবু যে এই নিরীহ প্রাণীটির গায়ে থাবা বসায় না, যথাসাধ্য তাকে এড়িয়ে চলে, সে তার গা-ভর্তি কাঁটার জন্যে। আবার ভয় পেলেই তার গায়ের সঙ্গে লেপটে-থাকা কাঁটাগুলো যেহেতু খাড়া হয়ে ওঠে, সেইজন্যেই সে মানুষের হাতে ধরা পড়ে যায়। স্রেফ একটা কলাগাছ কেটে নিয়ে তার পিঠের উপরে তখন ছুড়ে মারলেই হল, কাঁটায়-বিঁধে যাওয়া কলাগাছের ভার নিয়ে শজারু আর ছুটে পালাতে পারে না।

চিন্তার বাগে যে মস্ত শজারুটা দেখা গিয়েছিল, তাকেও ধরা হয়েছিল এই একইভাবে। যারা ধরেছিল, পিটিয়ে মেরে তার মাংসও কেটেকুটে ভাগ করে নিয়েছিল তারা। আমি সেখানে ছিলুম বলে কচুর পাতায় মুড়ে আমাকেও খানিকটা দিতে চেয়েছিল। আমি নিইনি।

বাড়িতে ফিরে ঠাকুর্দাকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, "সে কী দাদা, তোমাকে শজারুর মাংস দিতে চেয়েছিল, আর তুমি তা নিলে না?"

"কেন নেব? ওই মাংস কি আমরা খাই?"

"ওরে দাদা," ঠাকুর্দা বললেন, "তোমরা বোকা, তাই খাও না।"

"তুমি খাও?"

"এখন আর পাচ্ছি কোথায় যে খাব? তবে হ্যাঁ, ছেলেবেলায় যশোরে থাকতে খেয়েছি। কলকাতায় থাকতেও একদিন খেয়েছিলুম। তবে কিনা তোমার ঠাকুমা রান্না করতে চাননি, ফলে

আমাকেই রান্না করে নিতে হয়েছিল।"

"ঠাকুমা রান্না করতে চাননি কেন?"

"তাঁর ধারণা, শাস্ত্রে নিষেধ আছে। ওরে দাদা, তাই কখনও থাকতে পারে?" ঠাকুর্দা বললেন, "শজারু হচ্ছে শল্লকী, তার মাংস অতি সুস্বাদু। অমন মাংস খেতে মুনি-ঋষিরা নিষেধ করবেন, তাও কি হয় নাকি? তোমার ঠাকুমা'র কথা বাদ দাও। তিনি মাছ ছাড়া আর কোনও আমিষই খান না। আমি কচ্ছপ, কাঁকড়া, সব খাই। এখানে যে কাঁকড়া পাওয়া যায়, সেই ভুসো-কাঁকড়া অবশ্য মুখে তোলার জুগ্যি নয়।"

ঠাকুর্দার এই শেষের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল বলেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, টেলিগ্রামের ওই 'কেংব্রাজ' বস্তুটা আসলে কাঁকড়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বাবাকে সে কথা বলতে তিনি বললেন, "ঠিক ধরেছিস। কিন্তু সুধা অমন 'কেংব্রাজ' লিখতে গেল কেন। 'ক্র্যাব' শব্দটা তো ওর জানা উচিত।"

দোষ যে কাকুনের নয়, সেটা পরে জানতে পারি। টেলিগ্রাম করে যে খবর পাঠাতে হবে, সেটা বাংলায় লিখে আমাদের এক প্রজার হাত দিয়ে প্রাপকের নাম-ঠিকানা সমেত চিরকুটখানা তিনি ভাঙ্গার বড়-ডাকঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার-বাবু 'কাঁকড়া'র ইংরেজি জানতেন না। 'কেংব্রাজ'টা তাঁরই কীর্তি। যা-ই হোক, ঠাকুর্দার যে কাঁকড়া খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, আর সেই ইচ্ছেটা যে মেটানোও গিয়েছিল, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

ঠাকুর্দা এর মাস খানেক বাদেই মারা যান। শ্লেষ্মাটা বেড়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা চলছিল নিয়মিত। কিন্তু মাঝে-মাঝেই যেহেতু একটু সুস্থ হয়ে উঠছিলেন, তাই ডাক্তার-বদ্যিরাও বুঝে উঠতে পারেননি যে, মৃত্যুটা একেবারে হঠাৎ এসে দেখা দেবে। ঠাকুমা, কাকুন, ছোটকাকা আব বড়কাকিমা ছাড়া আমরা সবাই তখন কলকাতায়। দুপুরে টেলিগ্রাম এল, 'অবস্থা খারাপ, চলে এসো।' সেইদিনই রাত্তিরের গাড়িতে রওনা হব বলে চটপট সবাই তৈরি হয়ে নিচ্ছি, কিন্তু রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগেই এল দ্বিতীয় টেলিগ্রাম: 'সব শেষ।' টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে বাবা একেবারে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে আর আজকের ট্রেনে যাব না, শ্রাদ্ধশান্তির টাকা জোগাড় করে কাল যাব।"

তা-ই গিয়েছিলুম। এমন নিরানন্দ মনে এর আগে আর কখনও কলকাতা ছাড়িনি। সারাটা পথ যে বাবা একেবারে চুপ করে ছিলেন, সেটা মনে পড়ে। দেশের বাড়িতে যে শোক কিছুটা স্তব্ধ হয়ে এসেছিল, আমরা গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা যে আবার উত্তাল হয়ে ওঠে, তা মনে পড়ে। শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়েছিল বিশাল মাপের। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর গ্রামের মানুষরা সবাই এসেছেন। গোটা বাড়ি যেন মানুষের ভিড়ে থইথই করছে। শ্রাদ্ধবাসরে আমারও কিছু করণীয় ছিল। সেটা করি। তারপর নিঃশব্দে এক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। ভিড় থেকে দূরে সরে গিয়ে সারাটা দুপুর একলা-একলা সেদিন পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে বসে ছিলুম। দূর থেকে ভেসে আসছিল শ্রাদ্ধের মন্ত্র। সেই সঙ্গে অনেক মানুষের কোলাহল। কিন্তু কোনও কিছুই যেন আমাকে ঠিক স্পর্শ করতে পারছিল না।

ঠাকুর্দা আমাকে তাঁর কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। তিনি চাননি যে, গ্রাম ছেড়ে আমি শহরে যাই। কিন্তু তা-ই আমাকে যেতে হয়েছিল। অথচ, শহরে গিয়েও, ভিতরে-ভিতরে কি তাঁরই কাছে আমি থেকে গিয়েছিলুম? তখনও আমার এ-সব কথা বুঝবার মতো বয়স হয়নি। বুঝতে আমি পারছিলুমও না। একলা-বালক একটা পুকুরের ধারে নির্বাক বঁসে ছিলুম শুধু। গোটা দুপুরটাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে আমার কেটে যায়। বাড়িতে সেদিন কেউ আমার খোঁজ করেছিল

কি না, তাও আমি জানি না।

নিয়মভঙ্গের পরদিনই সবাই কলকাতায় ফিরে যায়। থেকে যাই শুধু বাবা আর আমি। বাবা-ই ঠিক করেন যে, বাড়ি আর জমিজমার কাজ দেখাশোনার জন্য বড়কাকা এখন থেকে দেশের বাড়িতে থাকবেন। আমাদের বেশিরভাগ জমি চাষ করেন আইনদ্দি-কাকা। তাঁকে বলেন, "নরেন ছেলেমানুষ, কিন্তু তুমি যখন আছ, তখন আর আমার ভাবনা নেই, তুমিই ওকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে পারবে।"

ঠাকুমা বলেন, "সুধাও এখন মাসখানেক এখানে থেকে যাক্।"

বাবা বলেন, "খোকাও থাকতে পারে। কলকাতা তো ওর ভালই লাগে না।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, "কী রে, থাকবি নাকি?"

না, এক্ষুনি আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি বুঝতে পারি যে, কার জন্যে এখানে আমি ছুটে আসতুম। বুঝতে পারি, এর পরেও আমি প্রতিটি ছুটিতে এখানে আসব বটে, কিন্তু সেই আসার পিছনে এতদিন যে তাগিদ ছিল, সেটা আর থাকবে না।

পৌত্রের প্রতি পিতামহের যে ভালবাসা, সাধারণত তা একটু উচ্চারিত প্রকৃতির হয়ে থাকে। ঠাকুর্দার ভালবাসা যে কখনও সেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এমন আমার মনে পড়ে না। সংযত, শান্ত স্বভাবের মানুষ, এমনিতেই তিনি কথা বলতেন খুব কম। কোনও ব্যাপারেই কখনও তাঁকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখিনি। শুধু মাঝে-মাঝে এমন স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন যে, মনে হত, ওই দৃষ্টির ভিতর দিয়েই যেন আমাকে আরও শক্ত করে তিনি বেঁধে রাখছেন।

আমি এটাও বুঝতে পারি যে, সেই মানুষটি চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার জীবনের অন্তত একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল।

৩২

তালতলার বাড়িতে থাকতে কিছুদিন আমরা খুব চরকা কেটেছিলুম। বাবা বলতেন, 'শুধু খদ্দরের জামাকাপড় পরাটাই যথেষ্ট নয়, বুঝলি? তার জন্যে যে সুতো দরকার, সেটাও আমরা নিজেরাই বানিয়ে নেব।' দেশের বাড়িতে ঠাকুর্দা আর ঠাকুমাকেও সুতো তৈরি করতে দেখেছি। তবে তাঁরা চরকা চালাতেন না, তকলি ঘুরিয়ে তুলোর পাঁজ থেকে সুতো বার করে আনতেন।

চরকায় সুতো কাটা নিয়ে একটা গানও সেই সময়ে অনেককে গাইতে শুনতুম। যদ্দুর মনে করতে পারি, তার প্রথম কয়েকটা লাইন ছিল এইরকম। 'ঘোর ঘোর ঘোর ঘোর রে, আমার সাধের চরকা ঘোর। /হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর/এমনি আমার চরকার ঘোর,/স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।' এ-গান কার লেখা, তা তখনও জানতুম না, এখনও জানি না। তবে গানটা যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন কলকাতায়, তেমনই গাঁ-গঞ্জেও এ-গান তখন অনেক লোককে গাইতে শুনেছি।

চরকা কাটায় বাবার উৎসাহ ছিল খুব। তবে দক্ষতা বিশেষ ছিল না। মা মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, 'সুতো যা বেরুচ্ছে, তাতে ধুতি-শাড়ি তো দূরের কথা, একটা গামছা পর্যন্ত হবে না। তবে নৌকো বাঁধার কাছি হয়তো একটা হলেও হতে পারে।' বাবা তাতে বিলক্ষণ রেগে যেতেন। বলতেন, 'দ্যাখো, সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাশা চলে না।' এ-সব কথা আগেও বলেছি।

বাবার তৈরি সুতোয় মাঝে-মাঝেই গিঁট পড়ে যেত। সে-সুতো মোটাও হত খুব। তবে সেই সুতো দিয়ে যখন তিনি কাছের এক তাঁতিবাড়ি থেকে একখানা ধোকড় বানিয়ে আনেন, আমার মাতৃদেবীই তখন বোধহয় সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন। তার দিন কয়েক বাদে আমি দেশের বাড়িতে ফিরে যাই। ধোকড়খানাকে কাচিয়ে এনে আমার হাত দিয়ে তখন ঠাকুর্দার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে বাবার একটি চিঠি ছিল। নিতান্তই তিন লাইনের সংক্ষিপ্ত চিঠি; তবে সংক্ষিপ্ত বলেই তার একটি লাইনও আমি ভুলিনি। 'কোনও কাজই আমি খুব নিপুণভাবে করিতে পারি না। এটিও অপটু হাতে তৈয়ার করিয়াছি। তবে আপনি ইহার মূল্য বুঝিবেন।'

ধোকড়খানা সেই যে ঠাকুর্দার গায়ে উঠল, তারপরে আর, নেহাতই কাচাকাচির সময় ছাড়া, ওটি আর কখনও তাঁর গা থেকে নামতে দেখিনি। সদাসর্বদা ওটিকে তিনি গায়ে জড়িয়ে বসে থাকতেন। শীতকালে তিনি বালাপোষ পরতেন। কিন্তু সেই বালাপোষের উপরেও জড়ানো থাকত খদ্দরের ধোকড়।

দেশের বাড়িতে যেতে হলে দুটো পথে যাওয়া যেত, আগে তা বলেছি। একটা পথ রাজবাড়ি-ফরিদপুর হয়ে, অন্যটা খুলনা ঘুরে সিন্দিয়াঘাট হয়ে। আড়িয়ল খাঁ নদীর ধারে এই

গঞ্জ জায়গাটার আসল নাম নাকি সেনদিয়াঘাট। লোকের মুখে-মুখে সেটাই সিন্দিয়াঘাট হয়ে যায়। এই জাহাজঘাটার কথা একটু পরেই আবার আসবে, তার আগে ফরিদপুরের দিককার আর-একটা পথের কথা বলে নিই। এটা জলপথ নয়, স্থলপথ। পুজোর ছুটিতে যখন ফরিদপুর হয়ে যেতুম, তখন গোবিন্দপুর খাল থেকে নৌকোযোগে বাদবাকি পথ পাড়ি দিতুম বটে, তবে গ্রীষ্মকালে আর বড়দিনের ছুটিতে ফরিদপুর শহর থেকে একেবারে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত না হোক, ভাঙ্গা অব্দি স্থলপথেই যাওয়া চলত। ভাঙ্গা থেকে আমাদের চান্দ্রা গ্রামের দূরত্ব মোটামুটি মাইল তিনেক। ওটুকু আমরা হেঁটেই পাড়ি দিতুম।

ফরিদপুর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত যে কুড়ি-মাইল রাস্তা, ছেলেবেলায় তাতে যাত্রিবহনের জন্য খান তিন-চার মোটরগাড়ি চলতে দেখেছি। সেডান-বডি গাড়ি নয়, ভিন্টেজ কার র‍্যালিতে বিশ কিংবা তিরিশের দশকের যে-রকম হুড-খোলা গাড়ি আজও দু'চারখানা দেখতে পাওয়া যায়, সেই রকমের অস্টিন কিংবা ফোর্ড। আজকালকার গাড়ির বডিতে তো টোকা মারলেই টোল পড়ে যায়, সে আমলে তা হবার জো ছিল না। বিদেশি গাড়িগুলো বানানো হত খুবই শক্তপোক্ত করে। তবু যে ওই রুটের প্রতিটি গাড়ি বছর খানেকের মধ্যেই লজ্‌ঝড় দশা প্রাপ্ত হত, তার কারণ আর কিছুই নয়, রাস্তার অবস্থা। শহরেব ভিতরকার রাস্তাটুকু খোয়া-পেটানো ঠিকই, কিন্তু বাদবাকি পথ স্রেফ মাটির। শহরের চৌহদ্দি পার হয়ে গাড়ি যে এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা রাস্তায় নেমেছে, সেটা বুঝবার জন্য চোখ খোলা রাখবার দরকার হত না, কেননা সেই মুহূর্তটি থেকেই গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় নাচন শুরু হয়ে যেত যাত্রীদেরও। ছাত-খোলা গাড়ি বলেই রক্ষে, সেডান-বডি হলে আর দেখতে হত না, ছাতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে প্রতিটি যাত্রীরই যে মাথা ফাটত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে মাথা না ফাটলেও, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে, বছর তিনেকের একটা বাচ্চা ছেলেকে যে একবার তাব মায়ের কোল থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ির বাইরে ছিটকে পড়তে দেখেছিলুম, সেটা মনে আছে। নিতান্ত দৈববলে সে রক্ষা পেয়ে যায়।

পথের মধ্যে-মধ্যে পড়ত খাল। ব্রিজ না থাকায় গাড়ি পার করতে হত নৌকাযোগে। পরস্পরের সঙ্গে খুব শক্ত করে বাঁধা আড়াআড়ি দুটি বেশ বড়-মাপের ছাঁদি নৌকো, তার উপর পুরু কাঠের পাটাতন। খালের ঢাল দিয়ে আস্তে করে গড়িয়ে এসে মোটরগাড়ি সেই পাটাতনের উপরে উঠে পড়ত। তারপর লগি ঠেলে নৌকো দুটিকে নিয়ে যাওয়া হত ওপারে। যাত্রীরা অবশ্যই এই পারাপারের সময় গাড়ির মধ্যে বসে থাকতেন না। বাহনটিকে অন্য পারে পৌঁছে দিয়ে সেই একই নৌকো চলে আসত এ পারে। তখন তাঁরা সেই নৌকোয় চড়ে খাল পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠতেন।

পুখুরিয়া, বাসুন্দিয়া, বেশ কয়েকটা জায়গায় এইভাবে খাল পেরোতে হত। তাতে সময় নেহাত কম যেত না। তবে তা নিয়ে যে কেউ আক্ষেপ করতুম না, তার কারণ, অন্তত ওই সময়টুকুর জন্য ঝাঁকুনির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। ঝাঁকুনির চোটে শরীরের ভিতরকার লিভার কিডনি ইত্যাদি যে-সব যন্ত্র সম্ভবত স্থানচ্যুত হত, সেগুলি আবার সুযোগ পেত নিজের নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে গিয়ে সুস্থিত হবার।

ভাঙ্গায় আগে মোটরগাড়ির স্ট্যান্ড ছিল মুন্সেফ আদালতের সামনের খোলা জায়গায়। তার সামনেই খেয়াঘাট। ফলে, মোটরগাড়িতে করে যাঁরা ফরিদপুর থেকে এলেন, তাঁদের এই একটা সুবিধে হত যে, নদী পেরুবার দরকার থাকলে, গাড়ি থেকে নেমেই তাঁরা খেয়ানৌকোয় উঠে পড়তে পারতেন। আদালতের কাজকর্মের অসুবিধে হওয়ায় স্ট্যান্ড ওখান থেকে সরিয়ে ইস্কুল বাড়ির কাছে নিয়ে আসা হয়।

বীরেশ্বরকাকা স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মোটরগাড়ি থেকে নামবামাত্র আমাদের

পাকড়াও করে নিয়ে যেতেন তাঁর বাড়িতে। কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যেত না। বাবা যত বলতেন, 'ওরে, মাত্তর তো তিন মাইল পথ, দেখতে-দেখতে পৌঁছে যাব, বাবা আর মা কত আশা করে বসে রয়েছেন,' বীরেশ্বরকাকা তত বলতেন, 'চান করে, খেয়ে দেয়ে আগে একটু সুস্থ হ, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নে, গায়ের ব্যথাটা একটু মরুক, রাত্তিরটা আজ আমাদের এখানেই থাক, যেতে হয় তো কাল যাবি।' কাকিমাও ছাড়তে চাইতেন না। মা বলতেন, 'কী করে থাকব? বাবা আর মা ভাববেন না?' তাতে কাকিমা বলতেন, 'সে উনি লোক পাঠিয়ে মেসোমশাইকে খবর পৌঁছে দেবেন।'

পুরো একটা দিন অবশ্য থাকতুম না, তবে একটা বেলা ভাঙ্গায় ঠিকই কাটিয়ে যেতে হত। বেলা একটু গড়িয়ে আসতেই খেয়ানৌকোয় নদী পার হয়ে হাঁটাপথ ধরতুম আমরা, যাতে বেলাবেলি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারি। মালপত্তর বইবার লোক বীরেশ্বরকাকাই ঠিক করে দিতেন। তাঁর আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ ছিল না। আদরযত্ন যৎপরোনাস্তি করতেন। তবু যে আমরা গ্রামের বাড়িতে চলে যাবার জন্যে ছটফট করতুম, তার কারণ আর কিছুই নয়, ভাঙ্গায় যতক্ষণ আটকে থাকতুম, ততক্ষণই মনে হত যে, ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন।

তো সে কথা থাক। পথের কথা বলছিলুম, সেই পথের কথাতেই ফিরে যাই। ফরিদপুর থেকে ভাঙ্গা, পথ নেহাতই মাইল কুড়ি, কিন্তু সেইটুকু পথ পেরিয়ে আসতেই তা অন্তত ঘণ্টা আড়াই লেগে যেত। যদ্দুর যা খবর পাই, তাতে আজকাল মনে হয় এক ঘণ্টাও লাগে না। পথ পাকা হয়েছে, তা ছাড়া প্রতিটি খালের উপরে হয়েছে ব্রিজ। তা হোক, সে তো ভালই। তবে কিনা, হুড-খোলা অস্টিন কি ফোর্ড গাড়িতে বসে, সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে, সারাটা পথ ঝাঁকুনি খেতে খেতে সেই যে আমরা ভাঙ্গায় এসে নামতুম, তার যে একটা রোমাঞ্চ ছিল, সেটাও মানতে হবে। মূল্য বোধহয় তারও কিছু কম নয়।

খুলনা হয়ে আসবার যে পথ, সেটাকে খুব রহস্যময় ঠেকত। পুজোর সময়ে ও-পথে আমরা মাঝে-মধ্যে যেতুম। শেয়ালদা ইস্টিশান থেকে যে বরিশাল এক্সপ্রেস ছাড়ত, তাতে খুলনা পৌঁছতুম মোটামুটি সন্ধে নাগাদ। ইস্টিশানের কাছে ভৈরব নদ। তাব ধাবে জাহাজঘাটা। সেখান থেকে আমরা সিন্দিয়াঘাটের ইস্টিমারে উঠতুম। ওই ইস্টিমারে ওঠাটাই ছিল একটা ধুন্ধুমার ব্যাপার। আমরা ডেকের যাত্রী, রিজার্ভেশনের বালাই নেই। এদিকে যে যত তাড়াতাড়ি উঠে ডেকের উপরে সতরঞ্চি বিছিয়ে ফেলতে পারবে, তার তত সুবিধে। এই অবস্থায় ইস্টিমার এসে জাহাজঘাটায় লাগবামাত্র একটা ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি লেগে যাবে না, তাও কি হয় নাকি? ওটা বেশ ভালভাবেই লেগে যেত। তারই মধ্যে আমার একবার প্রাণসংশয়ের উপক্রম হয়েছিল। কীভাবে সেটা হয়েছিল, বলি।

জাহাজঘাটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কুলির মাথায় মালপত্র। আমার বয়স তখন বছর-চারেকের বেশি হবে না। গায়ে জ্বর ছিল বলে বাবা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। তাঁর অন্য হাতে ভাঁজ করা বেশ বড় সাইজের একটা সতরঞ্চি। দেখতে পাচ্ছি, মাঝ-নদী থেকে একটা ইস্টিমার ধীরে-ধীরে জেটির দিকে এগিয়ে আসছে। জেটিতে এসে ভিড়বার পর গ্যাং প্ল্যাঙ্ক পেতে দেওয়া হবে, যাতে যাত্রীরা তার উপর দিয়ে ইস্টিমারে গিয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু ডেকের যাত্রীদের অনেকেরই অত তর সয় না। তাড়াতাড়ি গিয়ে জায়গা দখল করবার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। একটু বাদেই যে ঘোর বিশৃঙ্খলা শুরু হবে, এটি তার পূর্বমুহূর্ত।

তবে জায়গা নিয়ে বাবা বিশেষ ভাবিত নন। এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু আশ্বাস পাওয়া গেছে। আমাদের কুলিটির নাম ওসমান। বাবাকে সে বলে রেখেছে যে, যতই ভিড় হোক, ঘাবড়াবার

কিছু নেই, ডেকের যাত্রী হলেও রাত্তিরটা আমরা যাতে ঘুমিয়ে কাটাতে পারি, তার ব্যবস্থা সে করে দেবে। কী করে সেটা সম্ভব ? না এই জাহাজে যারা খালাসির কাজ করে, তাদের একজন তার বড় ভাই। একতলার ডেকের রেলিংয়ের ধারে সে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইস্টিমার এসে জেটির গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই সে 'ওসমান' বলে চেঁচিয়ে উঠবে, "আর বাবু, আপনিও অমনি সতরঞ্চিডা তারে ছুড়ে দেবেন। তার জন্যি আমারে আট গণ্ডা পয়সা বেশি দিতে হবে কিন্তুক।"

ইস্টিমার তখন জেটি থেকে সাত-আট ফুট দূরে। ঠিক সেই সময়ে ডাক শোনা যায় 'ওসমান' ! আর বাবাও অমনি...

না, বাবার একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে সতরঞ্চিটা নয়, তার বদলে আমাকেই তিনি ইস্টিমারের একতলার রেলিংয়ের ধারে দাঁড়ানো লোকটির দিকে ছুড়ে দেন। বড় মারাত্মক ভুল। জলের মধ্যে পড়ে গেলে আর বাঁচতে হত না ; জলে না-পড়ে যে ডেকের উপরে এসে আছড়ে পড়েছিলুম, সে নেহাতই এই জন্য যে, আমার আয়ুষ্কাল তখনও পূর্ণ হয়নি। মাথার উপরে তৎক্ষণাৎ একটা বেশ বড় সাইজের নৈনিতালি আলু গজিয়ে যায়। হাত-পায়েরও নানান জায়গা ছড়ে গিয়েছিল। এক সহযাত্রীর কাছ থেকে টিংচার আয়োডিন চেয়ে নিয়ে সে-সব জায়গায় লাগাতে লাগাতে মা যে সেদিন বাবাকে খুব ভর্ৎসনা করেছিলেন, সেটা মনে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বাবা একেবারে মৌনীবাবা হয়ে যান। কথা বলবার মতন অবস্থাই তাঁর ছিল না।

খুলনা থেকে যে-সব ইস্টিমারে চড়েছি, তার প্রতিটিরই নাম ছিল বিদেশি পাখির নামে। তার মধ্যে চারটি নামের কথা মনে পড়ে : পেঙ্গুইন, অস্ট্রিচ, ফ্লেমিংগো আর কিউয়ি। জেটিতে দাঁড়িয়ে যখন দেখতুম যে, রাত্রির নদীর বুক তোলপাড় করে তারই কোনও একটা ধীরে-ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে যেন ধকধক করে শব্দ হতে থাকত।

আমরা নাবাল অঞ্চলের মানুষ। স্যাঁতসেঁতে জোলো জায়গায় পানকচু, হিঞ্চে কি দলকলমির ঝাড় যেভাবে ফনফন করে বাড়তে থাকে, জলের দেশে ঠিক সেইভাবেই আমরা বেড়ে উঠেছি। পুকুর, হাওড়, খালবিল আর নদীনালা নিয়েই তো আমাদের জগৎ। সেই জগৎকে আমরা চিনব না, তা কি হয় নাকি ? অথচ সত্যি কথাটা এই যে, আমরাও খুব ভালভাবে চিনি না। কী করেই বা চিনব ? জলের রূপ কি মাত্র একটা ? কিংবা সবসময়ে একই রকম থাকে তার মেজাজমর্জি ? তেমন যদি হত, তা হলে আর কথা ছিল না, হাতের পাতার মতন করে চিনতে পারতুম তাকে। কিন্তু তা তো নয়। যেমন তার চেহারা, তেমন তার চরিত্রও যে ক্ষণে-ক্ষণে পালটে যায়। সেই হয়েছে মহা মুশকিল।

আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরটার কথাই ধরা যাক। সকাল হয়েছে, সূর্য উঠেছে, পুকুরের জলের উপরে হিরের কুচির মতো চিকচিক করছে রোদ্দুর। দেখে কী ভালই না লাগত। মনে হত, এক্ষুনি ছুটে যাই, পুকুরের পাড়ে সিঁদুরে আমগাছটার ডাল থেকে ওই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আবার আকাশ জুড়ে মেঘ করলেই টলটলে সেই জল যখন নিমেষে কালো হয়ে যেত, তখন মনে হত, যার সঙ্গে আমার এত ভাব, এত ভালবাসা, সেই পুকুরটাকে যেন আর চিনতেই পারছি না, সে যেন রাগে থমথম করছে। শুধু কি তা-ই ? সকালে যার বুকের উপরে নিশ্চিন্ত চিত্তে হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কেটে ফিরেছি, রাত্তিরে সেই পুকুরের জলে চট করে যে পা ডোবাতেও একটু ভয়-ভয় করত, তাও কবুল করব। মনে হত, পুকুরের অন্ধকার বুকের তলা থেকে আচমকা কেউ হাত বাড়িয়ে আমাকে জলের মধ্যে টেনে নেবে।

সেই তুলনায় রাত্তিরবেলার নদী আরও অনেক বেশি রহস্যময়। কখনও সে যেমন কাছে টানে, তেমন আবার কখনও ভারী ভয় পাইয়ে দেয়। খেয়ানৌকোর জন্যে অন্ধকারে একলা নদীর পাড়ে

দাঁড়িয়ে আছি। মাথার উপরে অশথগাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে ঝরঝর করে বাতাস বইছে। একই সঙ্গে, রাত যত বাড়ছে, পায়ের কাছে ততই জেগে উঠছে নদীর ছলছল শব্দ। শুনে কখনও মনে হয়েছে, এর চেয়ে শান্ত, এর চেয়ে সুন্দর ধ্বনিতরঙ্গ আর কিছুই হতে পারে না; আবার কখনও মনে হয়েছে, এ তো নিছক শব্দ নয়, এ তো ষড়যন্ত্রের ভাষা। কেমন যেন গা-ছমছম করত। কিন্তু এও ভারী এক মজার ব্যাপার যে, যা কিছু আমাদের ভয় জাগিয়ে দেয়, তারও থাকে আকর্ষণের শক্তি। সেই মোহিনী শক্তিই যেন সেই অন্ধকারের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখত। চিৎকার করে খেয়ানৌকোর মাঝিকে তখন ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারিনি। কিংবা, কে জানে, তেমন করে ডাকতে হয়তো চাইওনি।

রাত্তিরবেলায় শুধু জল কেন, জলযানগুলোর বুকেও যেন বেশ খানিকটা রহস্যের ছোঁয়া লেগে যায়। অন্ধকার রাতে কেরোসিনের কুপি জ্বেলে যে জেলেনৌকোটি মধুমতীর ঢেউয়ের মধ্যে একটা মোচার খোলার মতো ভাসতে-ভাসতে চলেছে, তাকেও যেমন রহস্যময় ঠেকে, তেমন রহস্যময় ঠেকে সেই ইস্টিমারটিকেও, আড়িয়ল খাঁর কালো জল তোলপাড় করে ঘুমন্ত একগাদা যাত্রী নিয়ে মধ্যরাতে যে খুলনার দিকে চলে গেল। এ যখনকার কথা বলছি, ইউফো বা উড়ন্ত চাকি নিয়ে হই-হল্লা তার অনেক পরের ব্যাপার। কিন্তু রাত্তিরবেলা কোনও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে যখনই দেখতুম যে, সেই অন্ধকারের মধ্যে নদীর বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে কোনও ইস্টিমার, আর তার ডেকের উপরে জ্বলছে আলোর মালা, দূর থেকে সত্যিই তখন মনে হত যে, ওর মধ্যে যারা রয়েছে, তারা এই পৃথিবীর মানুষ নয়, অন্য গ্রহের প্রাণী।

ইস্টিমার সম্পর্কে একটা মোহ যে খুব ছেলেবেলাতেই আমার মনের মধ্যে জন্মে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চকিতে একটা আলোর স্তম্ভ আকাশের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল, দেশের বাড়ির উঠোন থেকে কখনও-কখনও এই দৃশ্য আমার চোখে পড়ত। ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম যে, ওটা ইস্টিমারের সার্চলাইটের আলো। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে দূর থেকে ভেসে আসা একটা চাপা গম্ভীর শব্দও মাঝে-মাঝে শুনেছি। গুম গুম গুম! পরক্ষণেই সব আবার শান্ত। মনে হত যেন পৃথিবীর তলায় রয়েছে যে পাতালপুরী, হঠাৎ কেউ তার ফটকে গোটাকয় লাথি কষিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর্দা বলতেন, 'ও হল রবিশাল গান্স!'

সেটা যে কী ব্যাপার, ঠাকুর্দা তা বুঝিয়েও বলেছিলেন। বরিশাল জেলার মাটির বয়স নাকি খুব বেশি নয়। হাজার খানেক বছর আগেও ওখানে ছিল সমুদ্র। তারই থেকে আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে মাটি। তবে জল আর মাটির টানাপোড়েনের পালা তো আর ফুরোয়নি; উপর থেকে কিছু বোঝা না-ই যাক, তলায়-তলায় সেটা সমানে চলেছে। জলের তলা থেকে মাটি কোথাও একটু একটু করে মাথা তুলছে, কোথাও বা ঝুপ করে ফের তলিয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যে। ও নাকি তারই শব্দ।

"দিনের বেলায় ওই শব্দ আমরা শুনি না কেন?"

"দিনের বেলায় তো হাজার রকমের শব্দ আমরা শুনতে পাই," ঠাকুর্দা বলেছিলেন, "তার মধ্যে আর আলাদা করে ওটা ধরা যায় না।"

ভূপ্রকৃতির যে ভাঙাগড়ার খেলা, তা নিয়ে খুব একটা ভাবিত হবার মতো বয়স তখন আমার নয়। 'বরিশাল গান্স' যদি বন্দুকবাজির ব্যাপার হত, তা হলেও না হয় কথা ছিল, ওটা জল-মাটির ব্যাপার জেনে আর ওই নিয়ে বিশেষ উৎসাহিত হইনি, তার বদলে ইস্টিমারের সার্চলাইটের আলোই তখন আমার শৈশব-কল্পনার দখল নিয়ে নিয়েছিল।

সিন্দিয়াঘাটে গেলে ইস্টিমার দেখা যায়। কিন্তু সেও তো খুব কাছের ব্যাপার নয়। আমাদের

বাড়ি থেকে তারও দূরত্ব প্রায় চব্বিশ মাইল। সেইখান থেকে সার্চলাইটের আলো চলে আসছে আমাদের আকাশে, আর দু-একটা মুহূর্তের জন্যে হলেও আমাদের অন্ধকার আকাশ একেবারে আলোয় ঝলমল করে উঠছে। শুধু আকাশ কেন, আমার কল্পনাও যেন সার্চলাইটের ওই আলোর ছোঁয়ায় ঝলমল করে উঠত।

ইস্টিমার ছিল আমার কল্পনার জলযান। খুলনা থেকে সেই জলযানে কীভাবে প্রথম উঠি, তার বর্ণনা একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে সেই প্রথম আরোহণের অভিজ্ঞতা যতই ভীতিপ্রদ হোক, তার কষ্ট ভুলতেও বিশেষ সময় লাগেনি। আমার পিছনে-পিছনে সতরঞ্চিখানাও ঠিকই ডেকের উপরে পৌঁছে গিয়েছিল, ওসমানের দাদা সেই সতরঞ্চি বিছিয়ে জায়গাও রেখেছিলেন, তবে মা তার উপরে শুজনি বিছিয়ে দিয়ে যতই তাঁর অসুস্থ ছেলেকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করুন, ঘুমের ছিটেফোঁটাও তখন আর আমার চোখে ছিল না।

কী করেই বা থাকবে। আমার কাছে এ তো এক নতুন জগৎ। তার মধ্যে এসে ঢুকে পড়বার উত্তেজনায় আমি তখন টগবগ করে ফুটছি। হট্টগোল আস্তে-আস্তে থিতিয়ে এল; জায়গা নিয়ে যাত্রীরা প্রথম প্রথম একটু ঝগড়াঝাঁটি করেছিল বটে, কিন্তু সেটাও একসময়ে থেমে গেল; বউ-বাচ্চা নিয়ে নিজের নিজের সতরঞ্চি কিংবা শুজনির উপবে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ল সবাই; এক হাতে একটা কেতলি আর অন্য হাতে একটা বালতির মধ্যে ডাঁই করা মাটির খুরি নিয়ে যে লোকটা যাত্রীদের বিছানা-বালিশ বাঁচিয়ে ডিং মেরে-মেরে ডেকের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পয়সা দিয়ে কেউ কেউ তার কাছ থেকে চা আর এস-বিস্কুট কিনে খেতে লাগল; তারই মধ্যে গম্ভীর গলার ভোঁ বাজল, ইস্টিমাবের সর্বাঙ্গ হঠাৎ থরথর কবে কাঁপতে থাকল, আর আমি দেখলুম যে, জাহাজঘাটার লোকজন আর আলো যেন আস্তে-আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। বাবা বললেন, "না রে বোকা, জাহাজঘাটা দূরে সরে যাচ্ছে না, আমরাই দূরে সরে যাচ্ছি। ইস্টিমার এবারে মাঝনদীতে গিয়ে পড়বে।"

কোনও-কিছুই ভুলিনি। ইস্টিমারের যে ডিনারের স্মৃতি চট করে কেউ ভোলেন না, বস্তুত ভোলেন না বলেই পূর্ববঙ্গীয় অনেক লেখকের রচনাতেই যার উচ্ছ্বসিত উল্লেখ আমরা ঘটতে দেখেছি, সেই মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার অভিজ্ঞতা যে সেবারই আমার প্রথম হয়েছিল, তাও মনে পড়ে। এটাও মনে পড়ে যে, পরদিন সকালে অনেক লোকের গলার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙেছিল। চোখ কচলে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখি, মা আর বাবা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা বললেন, "আয়, আয়, ব্যাপারটা একবার দেখে যা!"

ব্যাপারই বটে। ইস্টিমারের চারপাশে ভাসছে ছোট-ছোট ডিঙি নৌকো। সেগুলো হরেক রকমের জিনিস দিয়ে বোঝাই। কোনওটায় সন্দেশ-রসগোল্লা, কোনওটায় চিঁড়ে-মুড়ি, কোনওটায় কাঁদি-কাঁদি কলা। ডিঙির লোক আর যাত্রীদের মধ্যে চেঁচিয়ে দামদস্তুর চলছে। দাম ঠিক হবার পরে একটা বাঁশের ডগায় বেঁধে ডিঙি থেকে সওদার জিনিস এমনভাবে উঁচিয়ে ধরা হচ্ছে, ডেক থেকে যাতে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেওয়া যায়। তার দামও দেওয়া হচ্ছে ওই একইভাবে। মা বিস্তর দামদস্তুর করে কলার পাতায় মোড়া দুখানা পাতক্ষীর আর কিছু মুড়ি কিনলেন।

বাবা বললেন, "ওই যা, ফতুল্লার চিঁড়ে আর অমৃতসাগর কলা কিনলে না? ও জিনিস কি সব জায়গায় পাওয়া যায়?"

তাও কেনা হল। রসগোল্লা অবশ্য কেনা হয়নি। আমি বায়না ধরেছিলুম ঠিকই। কিন্তু বাবা বললেন, "একটু সবুর কর। রসগোল্লা কি আর কিনব না? তাও কিনব। তবে এখানে নয়।"

"কোথায় কেনা হবে তা হলে?"

"সিন্দিয়াঘাটে। ওখানকার রসগোল্লা হচ্ছে সেরা রসগোল্লা। চল্, ওখানে পৌঁছে তোকে একটা রসগোল্লার দোকানে বসিয়ে দেব। তারপর দেখব যে, তুই ক'টা খেতে পারিস।"

সিন্দিয়াঘাটে খুব বড় গঞ্জ। সেখানে একটা ভাতের হোটেলে তাড়াতাড়ি চাট্টি ঝোলভাত খেয়ে, দু'হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে, নৌকো কেরায়া করে আমরা বাড়ির পথে রওনা হই। এ পথে যেতে হলে বেশির ভাগটাই যেতে হয় কুমার নদী দিয়ে। এ-যাত্রায় মা যে কোনও তাড়া দিচ্ছিলেন না, তার কারণ এটা শশার চকের পথ নয়। ডাকাতি হবার ভয়ও তাই নেই।

৩৩

বাবা যখন সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন, আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। ইংরিজির পিরিয়ড, যদ্দুর মনে পড়ে সুহৃৎকৃষ্ণবাবু আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন যে, ইনট্রোডাকটরি দেয়ার-এর ভূমিকাটা কী, এবং ইংরিজি বাক্যের মধ্যে কোথায় কীভাবে ওই 'দেয়ার' শব্দটাকে লাগিয়ে দিতে হয়। কলেজের বেয়ারা হরিয়া এই সময়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে নিচু গলায় সুহৃৎকৃষ্ণবাবুকে কিছু বলে। পরক্ষণেই তিনি আমাকে ডেকে বলেন, "হরিয়ার সঙ্গে তুমি কলেজ বিল্ডিং-এ চলে যাও, তোমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

বাড়ি একই। তবে তার পশ্চিম আর উত্তর দিকের ঘরগুলোতে কলেজের ক্লাস নেওয়া হত বলে ওই দুটো অংশকে বলা হত 'কলেজ বিল্ডিং'। বাবার আপিস-ঘর ছিল উত্তর দিকের অংশের দোতলায়। হরিয়ার সঙ্গে সেখানে এসে দেখি, বাবার ঘরের সামনে ভীষণ রকমের ভিড় জমে গেছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই যে, বাবাকে মেঝের উপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রকাকাকে দেখে জিজ্ঞেস করি, "কী হয়েছে?"

ইন্দ্রকাকা বলেন, "সে-সব পরে শুনবি। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গিয়ে তোর মাকে বল যে, জিতেন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তবে জ্ঞান ফিরেছে, এক্ষুনি আর ভয়ের কারণ নেই। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এসে পড়লেই তোর বাবাকে আমরা বাড়িতে পৌঁছে দেব। বউঠানকে একটা বিছানা রেডি করে রাখতে বলবি।"

মা যে ছাতে দাঁড়িয়ে আছেন, গলির মোড় থেকেই তা আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমার উপরে চোখ পড়তেই মা নীচে নেমে এসে সদর-দরজা খুলে দেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, "বেঁচে আছেন তো?"

বাড়ি একেবারে ফাঁকা। বড়কাকা নিত্য ভোরে হাওড়ায় যান, আজও ভাল করে সকাল হবার আগেই তিনি সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। মেজোকাকা দেশের বাড়িতে। ছোটকাকা কলেজে। দিদি ইস্কুল থেকে ফেরেনি। অন্যরাও কেউ এই সময়ে বাড়িতে ফেরে না। বাবা অসুস্থ

হয়ে পড়েছেন, মায়ের তাই তা জানবার কথা নয়। অথচ খবরটা তিনি পেয়েছেন নিশ্চয়। তা নইলে আর বাবা বেঁচে আছেন কি না, আমাকে দেখবামাত্র এই প্রশ্ন তিনি করবেন কেন?

সন্ধে নাগাদ বাবাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাবার জনাকয় ছাত্র তার খানিক আগেই আমাদের বাড়িতে এসে গিয়েছিলেন। স্ট্রেচারটাকে ধরাধরি করে তাঁরাই উপরে নিয়ে আসেন। খাটের উপরে বিছানা করে রাখা হয়েছিল, খুব সন্তর্পণে বাবাকে সেই বিছানার উপরে শুইয়ে দেওয়া হয়। বাবা কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বলতে পারছিলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে চাপা গোঙানির মতন একটা শব্দ শুধু মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসছিল। মা একেবারে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর পায়ের কাছে।

ইন্দ্রকাকা বাবার নাড়ি দেখলেন, প্রেশার নিলেন, তারপর বললেন, "জিতেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, কথা বলবার চেষ্টা কোরো না, তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার।" যাবার সময় মা'কে বললেন, "বউঠান, জিতেনের বাঁ-দিকটা পড়ে গেছে। সাড় ফিরতে সময় লাগবে। কথাও এখন বেশ-কিছুদিন বলতে পারবে না। তবে প্রাণের ভয় এক্ষুনি আর নেই।"

মা যেমন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল, ইন্দ্রকাকার একটা কথাও তাঁর কানে যায়নি।

দিদির বয়স তখন পনেরো, আমার বারো, মন্টুর ছয়, আর আমাদের ছোট বোন মিন্টু তখন সদ্য হাঁটতে শিখেছে। বাবার অসুখটা যে কী, আর সেই অসুখ যে আমাদের সংসারটাকে কীভাবে তচনচ করে দিতে পারে, মন্টু আর মিন্টুর তো কথাই ওঠে না, আমি আর দিদিও— অন্তত তখনও পর্যন্ত— স্পষ্ট করে তা বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা মাত্র এইটুকুই জানতুম যে, মানুষের যেমন অসুখ হয়, তেমন আবার সেরেও যায়, দু'চার দিন শুয়ে থাকার পরে সে আবার উঠে দাঁড়ায়, আগের মতোই তার স্বাভাবিক কাজকর্মের জীবনে সে আবার ফিরে আসে।

এ অসুখ যে তেমন অসুখ নয়, সেটা বুঝতে আমদের ছোটদের একটু সময় লেগে গিয়েছিল। যখন দেখি যে, দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ডাক্তারের পর ডাক্তার আসছেন, টেবিলের উপর স্তূপাকার হয়ে জমে উঠছে অজস্র রকমের ওষুধের শিশি আর বোতল, অথচ রোগশয্যা থেকে বাবার উঠে দাঁড়াবার কোনও লক্ষণই নেই, তাঁর কথা তখনও জড়িয়ে যাচ্ছে, আর হাত-পায়ের সাড়ও ফিরে আসছে না, তখন একটু একটু করে আমরা ধরতে পারি যে, বাবাকে তাঁর সেই আগের চেহারায় আর কখনওই হয়তো আমরা ফিরে পাব না, এই রোগশয্যাতেই হয়তো বাদবাকি জীবনের দিনগুলি তাঁকে কাটিয়ে যেতে হবে।

তা যে তিনি কাটাননি, এটাকেই এখন একটা মস্ত আশীর্বাদের ব্যাপার বলে মনে হয়। একেবারে নিরাময় তিনি হননি, সেটা ঠিক। তবে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি চলাফেরা করতে পারতেন। কথার জড়তাও অনেক পরিমাণে কেটে গিয়েছিল। কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসও নিচ্ছিলেন আগের মতো। বাইরে বেরুলে অবশ্য সারাক্ষণই আমরা কেউ একজন তাঁর সঙ্গে থাকতুম। কেননা, এই ভয়টা আমাদের ছিলই যে, ভারসাম্য হারিয়ে হঠাৎ তিনি পড়ে যেতে পারেন।

এ-সবই অবশ্য পরের কথা। অসুস্থ হয়ে পড়বার পর প্রথম কয়েকটা মাস তাঁকে একেবারেই শয্যাগত হয়ে থাকতে হয়েছিল। ডাক্তারদের সঙ্গে নিচুগলায় তখন বড়দের যে-সব কথাবার্তা হত, তার থেকে আমরা ছোটরা, খুব আবছাভাবে হলেও, এটা বুঝতে পারতুম যে, এই অবস্থায় আর-একটা স্ট্রোক হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, যে-কোনও সময়ে সেটা হতে পারে, আর যদি সেটা হয়ই, বাবা তা হলে বাঁচবেন না। চিৎকার চেঁচামেচি হই-হট্টগোলে যে-বাড়ি অষ্টপ্রহর একেবারে সরগরম হয়ে থাকত, একেবারে হঠাৎই তা একেবারে নিঝ্‌ঝুম হয়ে যায়। সবাই এমন গম্ভীর

মুখে আর এত নিচু গলায় কথা বলত যে, মনে হত, একটা কোনও খারাপ খবর লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। কী যে অস্বস্তি বোধ করতুম, সে আর বলবার নয়।

বিধানচন্দ্র রায় মশাইকে সবসময়েই যে কলকাতায় পাওয়া যেত তা নয়, যখন কলকাতায় থাকতেন, তখন আবার কংগ্রেসের কাজে তাঁকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হত যে, ডাকবামাত্র তাঁকে পাওয়া যাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তার উপরে আবার এ যখনকার কথা বলছি, বিধানচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি কমিটির সভাপতি, নির্বাচনী ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর ফুরসত তখন কমই মিলত। তবু, তারই মধ্যে সময় করে যে বাবাকে তিনি দু'দিন দেখে গিয়েছিলেন, তা মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে বৃদ্ধবয়সী, সৌম্যদর্শন, স্মিতহাস্যময় একজন চিকিৎসকের কথাও। ইস্কুল থেকে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, বাবাকে তিনি পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা শেষ করে, বিধানচন্দ্রের প্রেসক্রিপশন দেখে ছোটকাকাকে তিনি বলেন, "জ্বরের ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। তবে প্রেশারের ওষুধ পালটাবার কোনও দরকার নেই। বিধান যে-ওষুধ লিখে দিয়েছেন, সেটাই চলুক, প্রেশার ওতেই কমে যাবে।"

মাথায় ঘোমটা, দরজার পাশে মা একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘর থেকে বেরুবার সময় তাঁর উপরে চোখ পড়তেই বৃদ্ধ ডাক্তারবাবুটি থেমে দাঁড়ালেন একটুক্ষণের জন্য। বললেন, "ভয়ের কিছু নেই মা। প্রেশার একটু চড়ে গেছে, তবে এটা ঝপ করে নেমে যাওয়াটাও ঠিক নয়, আস্তে আস্তে নামাই ভাল।"

ডাক্তারবাবু নীচে নেমে তাঁর গাড়িতে উঠে চলে যাবার পর ছোটকাকাকে জিজ্ঞেস করলুম, "উনি খুব বড় ডাক্তার?"

ছোটকাকা বললেন, "ওরেব্বাবা, উনি স্যার নীলরতন সরকার!"

স্যার নীলরতন যে বিরাট ডাক্তার, সেটা জানা ছিল। তা ছাড়া বাবার কাছে এটাও শুনেছিলুম যে, 'হাসিখুশি'র লেখক যোগীন সরকার মশাইয়ের তিনি দাদা। দিন কয়েক ধরে বাবার তখন জ্বর চলছে। ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না। বিধানচন্দ্র তখন কলকাতার বাইরে। ফলে, ইন্দ্রকাকার পরামর্শে স্যার নীলরতনকে ডাকা হয়। তিনি যে ওষুধ লিখে দেন, বাবার জ্বর তাতে ছেড়ে যায়, আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ি, কিন্তু একইসঙ্গে এটাও ঠিক হয় যে, এমন কোনও একজন বড়-ডাক্তারের সাহায্য এখন থেকে আমাদের পাওয়াই চাই, ফি সপ্তাহে অন্তত একদিন যিনি বাবাকে এসে দেখে যেতে পারবেন।

নিয়মিতভাবে বাবাকে এসে পরীক্ষা করা আর দরকার-মতো ওষুধ পালটাবার দায়িত্ব তখন থেকে ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের দাদা সুনীলচন্দ্র ছিলেন সেকালের খুবই নামজাদা চিকিৎসক। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান মানুষ। যেমন পোশাকে-পরিচ্ছদে তেমন চালচলনে পুরো সাহেব। অথচ কথাবার্তায় এমন নম্র যে, পরনের সুট-বুট-টাই আর ছটফটে চালচলনের সঙ্গে সেটাকে ঠিক মিলিয়ে তোলা যেত না। শুধু ডাক্তার হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও সুনীলচন্দ্র বসু মশাইকে আমাদের বাড়ির সবাই খুব পছন্দ করতেন। তার একটা কারণ নিশ্চয় এই যে, তিনি গম্ভীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। সুনীলচন্দ্রের মুখে যেমন সবসময়েই একটু হাসি দেখেছি, কথাতেও তেমন লেগে থাকত একটু সহানুভূতির ছোঁয়া। তিনি এসে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে বাবার মুখেও হাসি ছড়িয়ে যেত, আজও তা মনে পড়ে।

চিকিৎসা চলছিল। সেই সঙ্গে চলছিল ম্যাসাজ। রোজ বিকেলে যে ভদ্রলোকটি এসে বাবাকে ম্যাসাজ করতেন, তাঁকে বিধানচন্দ্রই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার শরীরের বাঁ-দিকটা তো পুরোপুরি অসাড় হয়ে গিয়েছিল, বাঁ হাত আর বাঁ পা তিনি একেবারেই নাড়াতে পারতেন না, সম্ভবত

ম্যাসাজের গুণেই মাস-তিনেক বাদে তাতে সামান্য একটু সাড়ের লক্ষণ পাওয়া যায়। বিধানচন্দ্রকে সে-কথা জানাবামাত্র তিনি বলেন, তা হলে আর দেরি না করে বাবাকে যেন পুরীতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সকালে আর পড়ন্ত বিকেলে সমুদ্রতীরের গরম বালির মধ্যে রোজ অন্তত ঘণ্টা দেড়েক তাঁকে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হবে।

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বাড়ির খোঁজ। পুরীর চক্রতীর্থে, সোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরের কাছে, বাড়ি একটা আমরা পেয়েও যাই। বাড়ির নাম 'নন্দী কটেজ'। কাকুন সেই রাত্তিরেই পুরী রওনা হয়ে যান। দু'তিন দিন বাদে ফিরে এসে রিপোর্ট দেন যে, বাড়িটা নেহাত মন্দ নয়, ঘরেও আমাদের কুলিয়ে যাবে, "সামনে আর কোনও বাড়ি নেই বলে সমুদ্দুরের 'ভিউ' একটুও আটকে যাচ্ছে না, তবে কিনা ..."

মা বললেন, "তবে কিনা আবার কী? আটকাচ্ছে কোথায়?"

কাকুন বললেন, "বড্ড ফাঁকা।"

"তা হোক," মা বললেন, "যত তাড়াতাড়ি পারিস, তোর দাদাকে সেখানে নিয়ে চল তো। পঞ্জিকা দেখে দিন ঠিক কর। কাল যদি ভাল দিন থাকে তো কালই রওনা হব।"

এ হল ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকের কথা। মাসটা যদ্দুর মনে পড়ছে ফেব্রুয়ারি। আমি তখন মিত্র ইশকুলে সদ্য ভর্তি হয়েছি। তাই ঠিক হল যে, আমিও পুরী যাব বটে, তবে এ-যাত্রায় খুব বেশিদিন সেখানে থাকব না। হপ্তাখানেক সেখানে থেকে তারপর কলকাতায় ফিরে আসব। কলকাতায় থাকব আমি, বড়কাকা, ছোটকাকা, মণিদা আর ছোড়দা। মণিদা আমার দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো ভাই, আর ছোড়দা আমার মেজোপিসির ছেলে। কলকাতার বাড়িতে হেঁশেলের পাট তুলে দেওয়া হল। ব্যবস্থা হল যে, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটা মেসবাড়ি থেকে দু'বেলা আমাদের খেয়ে আসতে হবে।

সে কথায় পরে আসছি। তার আগে পুরীর কথা বলি। পুরীতে এই যে আমরা প্রথম গেলুম, তা নয়। প্রথম যখন যাই, আমার বয়স তখন পাঁচ-ছ বছরের বেশি হবে না। সেই যাওয়া আর এই যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য যে শুধুই কয়েকটা বছরের নয়, আরও অনেক কিছুর, মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে আমরা সবাই সেটা বুঝতে পারছিলুম। দুটো যাওয়ার উদ্দেশ্যই তো দু'রকম। সেবারে গিয়েছিলুম নিছক বেড়াতে, আর এবারে যাচ্ছি শুধুই এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে যে, বাবা হয়তো সেখানে আর-একটু সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমাদের পরিবারে আসলে বাবা-ই ছিলেন সেই মানুষ, গোটা সংসারের মস্ত-মস্ত সব আনন্দের আয়োজন যাঁকে কেন্দ্র করে একটা অন্য-রকমের পূর্ণতা পেত। সেই আয়োজনের খুঁটিনাটি সব ঝক্কি-ঝামেলা যে যতই সামলাক না কেন, ওই যে তিনি সমস্ত কল-কোলাহলের মধ্যেও ঘরের এক কোণে বসে চুপচাপ একখানা বই পড়ে যেতেন, চটপট জামাকাপড় পালটে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে মা এসে তাঁকে তাগাদা দিতেন বারবার, তবু বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলতেন না তিনি, সেই থাকাটাও যে কত বড় থাকা, বাবা অসুস্থ হয়ে পড়বার আগের দিন পর্যন্ত তা আমরা বুঝিনি। এবারে পুরীতে যাওয়ার দিন বড় মর্মান্তিকভাবে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিছানা থেকে নামিয়ে ধরাধরি করে বাবাকে যখন ট্যাক্সিতে তোলা হয়, মা একেবারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

আগের বারে পুরীতে এসে আমরা 'হার্মিটেজ' বলে যে বাড়িটাতে উঠেছিলুম, সেটাও চক্রতীর্থেরই একটা বাড়ি বটে, কিন্তু জায়গাটা ছিল ফ্ল্যাগ স্টাফের কাছাকাছি। 'নন্দী কটেজ' সেক্ষেত্রে চক্রতীর্থের একেবারে পুব প্রান্তে। কাকুন ঠিকই বলেছিলেন। বড্ড ফাঁকা জায়গা। এখন অবশ্য তেমন ফাঁকা আর নেই। মাস কয়েক আগে পুরী গিয়ে দেখি, চক্রতীর্থ ইতিমধ্যে পুবে আরও অনেকখানি

জায়গা জুড়ে গড়িয়ে গেছে, 'নন্দী কটেজ'-এর আশপাশেও ভিড়ভাট্টা নেহাত কম নয়। এদিকে-ওদিকে বেশ কয়েকটা হোটেল, রেস্তোরাঁ আর হলিডে হোমও চোখে পড়ল। কিন্তু আমি তো আর এখনকার কথা বলতে বসিনি, এ হল চুয়ান্ন বছর আগের কথা। ওদিকে তখন বাড়িঘর সত্যি খুবই কম ছিল। তার উপরে আবার বিজলি বাতিও তখন ছিল না। সন্ধের পরে দূরে দূরে কয়েকটা বাড়িতে টিমটিম করে গুটিকয় হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলত মাত্র। একটু যে ভয় ভয় করত না, এমন বললে ডাহা মিথ্যে কথা বলা হবে। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যেত একেকদিন। তখন মনে হত, সমুদ্রের গর্জন যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 'নন্দী কটেজ'-এর তুলনায় আমাদের ছেলেবেলার সেই 'হার্মিটেজ' বাড়িটা ছিল সমুদ্রের আরও অনেক কাছে। ঢেউয়ের গর্জনও সেখানে তাই রাত্তিরে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে কানে বাজত। সে বাড়িতে দিদি আর আমি যে-ঘরে থাকতুম, তার শিয়রে ছিল মস্ত জানলা। দিদি ছিল আমার চেয়েও ভিতু। সন্ধে লাগতে না লাগতেই বলতে শুরু করত, "শিয়রের জানলাটা বন্ধ করতে ভুলিস না যেন।"

জানলা বন্ধ করতে একদিন ভুলে গিয়েছিলুম। খাওয়া-দাওযার পবে দিদি সেদিন ঘরে ঢুকেই বিষম রেগে যায়। "এ কী, জানালা খুলে বেখেছিস যে?"

"কেন, খোলা রাখলে কী হবে?"

জানলা বন্ধ করতে করতে দিদি বলে, "কী আবার হবে, সমুদ্দুর ওই জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে তোর ঘাড় মটকে দেবে।"

"যাঃ, বাজে কথা বলিস না," আমি বলি, "সমুদ্দুর কি এগিয়ে আসতে পারে নাকি?"

গম্ভীর গলায় দিদি বলে, "শুধু যে পারে, তা নয়, আসেও। রোজ রাত্তিরে আমাদের শিয়রের ওই জানলার ঠিক নীচে এসে দাঁড়ায়। জানলা বন্ধ থাকে তো, তাই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ভোর হবাব একটু আগে আবার ফিবে যায়।"

শুনে যে আমার একটুও ভয় করেনি তা নয়। তবু বলেছিলুম, "তুই কী কবে জানলি?"

"চোখ থাকলেই জানা যায়।" দিদি বলেছিল, "জানলার বাইরে যে বালি ছড়িয়ে রয়েছে, তার উপরে কখনও চোখ বুলিয়ে দেখেছিস?"

"কেন, ওখানে কী আছে?"

"ঝিনুক। গাদা গাদা ঝিনুক।" দিদি বলেছিল, "সমুদ্র যদি না-ই ওখানে উঠে আসবে, তো অত ঝিনুক ওখানে কোত্থেকে এল?"

তাও তো বটে। দিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে-রাত্তিরে আমার ঘুম আসেনি।

তখন আমার বয়স ছিল ছ'বছর। আব এখন আমার তেরো বছর বয়স। মাত্রই তো সাতটা বছর ইতিমধ্যে কেটেছে। অথচ মনে হয় যেন কতদিন আগের কথা। বারান্দার রেলিংয়ে বসে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভিতর-বাড়ি থেকে একটা গুঞ্জন ভেসে আসে। মা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছেন। হঠাৎ-হঠাৎ দু'চোখ যে কেন জলে ভরে যায়, কিছুই বুঝতে পারি না। গোবিন্দ এসে বলে, "দাদাবাবু, মা ডাকছেন, প্রসাদ নিয়ে যাও।" চোখ মুছে বারান্দা থেকে উঠে পড়ি।

গোবিন্দর কথা খুব মনে পড়ে। মিশকালো রোগাপটকা ছেলে, মাথায় একঢাল কোঁকড়া চুল, বয়স বোধহয় আমারই মতো হবে। সকালবেলায় পুরী ইস্টিশানে এসে পৌঁছতেই গোবিন্দ এসে মা'কে টিপ করে একটা প্রণাম করে বলেছিল, "তোমার তো বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানো আর কাপড় কাচার জন্যে লোকের দরকার হবে মা, ওসব আমি করে দিতে পারব।" ব্যস্, ইস্টিশান থেকেই সে কাজে বহাল হয়ে যায়।

কাজ করতে করতেই গোবিন্দ গুন গুন করে গান গাইত। ধর্মের গান, তাই মা সে-সব

গান পছন্দও করতেন খুব। একটা গানের প্রথম কলিটি এখনও মনে আছে; হে দয়াময়ো, গোবিন্দ হে জয়ো, মাধবো গিরিধারী হে।

পান্ডাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল ইস্টিশান থেকেই। পুরীতে যেদিন পৌঁছই, তার পরদিনই মা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। পান্ডার লোক মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে এসে প্রসাদ দিয়ে যেত। ভাত, ডাল, তরকারি, হাঁড়িভর্তি হয়ে সবই এত প্রচুর পরিমাণে আসত যে, আলাদা করে রান্না করবার কোনও দরকারই সেদিন হত না। মা বলতেন, "দেখিস, তোদের বাবা আবার সেই আগের মতোই হাঁটাচলা করতে পারবেন। স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে না? জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে এসে উঠেছি, তিনি কি আর খালি হাতে আমাদের ফিরিয়ে দেবেন?"

তা, বাবা যে ইতিমধ্যে একটু হাঁটাচলা করছিলেন না, তাও নয়। লাঠি হাতে নিয়ে, তার উপরে ভর রেখে, আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে সকালে আর বিকেলে সমুদ্রতীরে চলে আসতেন। সেখানে বালি খুঁড়ে তার মধ্যে তাঁর বাঁ পা ডুবিয়ে রেখে আবার আমরা তপ্ত বালি দিয়ে ঢেকে দিতুম তাঁর পা। এই যে কাজ, এটা আদ্যন্ত হত আমাদের রাঙাকাকার তত্ত্বাবধানে।

রাঙাকাকার নাম খগেন্দ্রনাথ। বাবার তিনি মামাতো ভাই। আমাদের চাঁপাতলার বাড়িতে থেকে তিনি আই. এ. থেকে ল অব্দি পাশ করেছিলেন। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়বার পর তাঁর সেবাশুশ্রূষার দায়িত্ব তিনি মায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেন। তার জন্য তাঁকে কিছু বলতেও হয়নি। সকালবেলায় বাবার ঘুম ভাঙার পর থেকে স্নান করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত যে পর্ব, সেটা সামলাতেন মা। বাদবাকি পর্ব রাঙাকাকার হাতে। সেই যে ভদ্রলোকটিকে বিধানচন্দ্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ম্যাসাজ করবার সূক্ষ্ম কায়দা-কৌশলগুলিও রাঙাকাকা তাঁর কাছ থেকে শিখে নেন।

আমার কাজ ছিল সকালবেলায় কাকুনের সঙ্গে গিয়ে বাজার করে আনা, আর বিকেলবেলায় বাবা যখন সমুদ্রতীরে গিয়ে বসেন, তখন সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে থাকা। বাজার আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরের পথ। কাকুনের সঙ্গে গল্প করতে-করতে চলে যেতুম বলে দূরত্বটা খুব গায়ে লাগত না। ফিরতি পথে অবশ্য রোদ চড়ে যেত বলে একটু কষ্ট হত। তবে সব কষ্টটাই দূর হয়ে যেত বিকেলবেলায়। বালিতে পা ডুবিয়ে বসে বাবা কথা বলছেন, আমি চুপ করে তাঁর কথা শুনছি, মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করছি, বাবা উত্তর দিচ্ছেন, অমন সুন্দর একটা সময় তার আগেও কখনও পাইনি, পরেও না।

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে যায়। আগেই ঠিক ছিল যে, দিদি, মণ্টু আর মিণ্টুকে নিয়ে বাবা, মা, কাকুন আর রাঙাকাকা এখন বেশ কিছুদিন পুরীতে থাকবেন, আমি একা কলকাতায় ফিরে যাব। আমার যাবার দিন এসে পড়ে। কাকুন আমার সঙ্গে ইস্টিশানে গিয়ে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন।

একা-একা কলকাতায় ফিরছি, মায়ের তাই দুশ্চিন্তা বড় কম ছিল না। কিন্তু বাবা আর মা'কে প্রণাম করে যখন বাড়ি থেকে বেরোই, সমস্ত দুশ্চিন্তা চেপে রেখে মা তখন হাসি মুখে বলেন, "ভয় কী, তুই তো এখন বড় হয়ে গেছিস।"

মা যে চেষ্টা করে হাসছেন, সেটা কি আর বুঝতে পারিনি? পেরেছিলুম। কিন্তু ট্রেন যখন আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এল, আর জানলায় মুখ রেখেও কাকুনকে আর দেখতে পেলুম না, তখন হঠাৎই আমার মনে হল যে, মা যা বলেছেন, তা নেহাত স্তোকবাক্য নয়, সত্যিই যেন আমি বড় হয়ে গেছি।

৩৪

কলকাতায় বেড়াতে এসে বায়োস্কোপ যখন প্রথম দেখি, তখন আমার বয়স খুবই কম। বইটার নাম অবশ্য ভুলে যাইনি। 'চাষার মেয়ে'। নির্বাক ছবি। গল্পটা কী তা বলতে পারব না, কেননা ঘটনার পরম্পরা অনুসরণ করবার মতো বয়স তখনও হয়নি, তবে তার একটা সিকোয়েন্সে দুই বালক-বালিকা যে ধানখেতের পাশ দিয়ে খুব দৌড়চ্ছিল, এই দৃশ্যটা এখনও চোখে লেগে আছে। এরপরে যে ছবিটি দেখি, তার আবার নাম মনে নেই। তবে কাহিনীটা ছিল খুব দুঃখের। সেও নির্বাক ছবি। তবে ছবির মধ্যে কে কী বলছে, ছাপার অক্ষরে ছবিতে সেটা সঙ্গে-সঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই রকম একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একটি বউ চুপচাপ বসে আছে, এমন সময় পিছন থেকে পা টিপে-টিপে এসে একটা লোক—সম্ভবত তার স্বামী—বউটির চোখ টিপে ধরল। পরক্ষণেই চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে লোকটা একেবারে বউটির সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটার মুখে হাসি। বউটি মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়। তাব ঠোঁটও একটু নড়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে ছবির নীচে ছাপার অক্ষরের লেখা ফোটে: বাবা, কী দুষ্টু!

বাংলা সাইলেন্ট মুভির তখন সম্ভবত শেষ পর্যায় চলছিল। ছবির মানুষগুলো যে স্থির নয়, তারা যে উঠছে, বসছে, হাঁটছে, লাফাচ্ছে, এতেই সবাই খুশি থাকত, একই সঙ্গে তাদের যে কথাবার্তাও বলতে হবে, অন্তত দর্শকদের মধ্যে এমন কোনও চাহিদা তখনই জন্মেছিল বলে আমার মনে হয় না। কথা ফোটাবার কাজ অবশ্য তার আগেই শুরু হয়ে যায়। নির্বাক ছবিকে বিদায় দিয়ে সবাক চলচ্চিত্র এসে বাজারের দখল নেয়। দর্শকদেরও মনে হতে থাকে যে, তাই তো, এমনটা হবারই তো দরকার ছিল। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, ছেলেবেলায় ওই যে আমরা শিখেছিলুম, "নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অভ্ ইনভেনশন", ও কথা সব সময় খাটে না। ইনভেনশনই অনেক ক্ষেত্রে নেসেসিটির জন্ম দিয়ে থাকে। মোটামুটি এই সময়েই আর-একটা চলচ্ছবি দেখি। সেও বড় দুঃখের ছবি। খিদের জ্বালায় একটা ছেলে রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সাপের ছোবল খায়, ছবির মধ্যে এই রকমের একটা দৃশ্য ছিল। সেটা নির্বাক যুগের শেষ-পর্বের ছবি, না সবাকযুগের প্রথম-পর্বের, তা অবশ্য বলতে পারব না।

শেয়ালদা-পাড়ায় উঠে আসবার আগে পর্যন্ত নেহাত কালেভদ্রে সিনেমা দেখবার সুযোগ ঘটত, পরে ওটার মাত্রা একটু বৃদ্ধি পায়। মির্জাপুর স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে তখনও 'অরুণা' তো দূরের কথা, 'পূরবী' হল্‌টারও পত্তন হয়নি, ধারেকাছে একমাত্র সিনেমা-হল তখন 'ছবিঘর'। ফ্লাই-ওভারের যে-বাহুটা হ্যারিসন রোডের দিকে নেমে এসেছে, তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় 'ছবিঘর' এখন আর তেমন স্পষ্ট করে চোখে পড়তে চায় না, কিছুকাল আগেও কিন্তু ওটার অস্তিত্ব বেশ প্রকট ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় ওখানে বিলিতি বই আসত প্রচুর। বিশেষ করে

চ্যাপলিন আর লরেল-হার্ডির গোড়ার দিককার ছবি ওখানে কম দেখিনি। সবই নির্বাক ছবি। উপরন্তু মাপে একটাও বড় নয় বলে একই শোয়ে এঁদের একাধিক ছবি দেখানো হত। একটা ছবি শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে পর্দায় 'দ্য এণ্ড' ফুটত বটে, কিন্তু তার পরক্ষণেই শুরু হয়ে যেত পরের ছবির টাইটেল। সে নেহাত কম মজার ব্যাপার ছিল না। চ্যাপলিনের 'দ্য ম্যাসক্যারেডর' ইত্যাদি ছবি ওখানেই দেখেছিলুম, যেমন দেখেছিলুম লরেল-হার্ডির ছবি 'চাম্‌প অ্যাট অক্সফোর্ড'।

এ সবই নির্বাক যুগের ছবি। তাই বলে যে সবাক ছবির তুলনায় কিছু কম উপভোগ্য, এমন কথা মানব না। ছবির মানুষ তখন কথা বলত না। না-ই বলুক, কথার অভাবটা যে আমাদের কাছে তখন স্পষ্ট হতে পারেনি, তার কারণ, এঁদের অভিনয়ের গুণে সেটা চাপা পড়ে যেত। আর তা ছাড়া, মুখের কথাটাই তো সব নয়, হাঁটাচলার কায়দা, মুখের ভাব, ঠোঁটের ভঙ্গি আর চোখের চাউনিরও রয়েছে নিজস্ব ভাষা। সে-ভাষা যে মুখের কথার চেয়ে অনেক বেশি বাঙ্ময়, তা-ই বা কী করে অস্বীকার করব। চলচ্ছবির এই যে ইঙ্গিতময়তা, ছবির মুখে কথা ফুটবার পর এটা চাপা পড়ে যায়। চ্যাপলিনের কথা আলাদা। মুখের ভাষার কাছে তিনি মাথা নোয়ালেন না, ছবি মুখর হবার পরেও ইঙ্গিতের ঐশ্বর্যকে সম্বল করে তৈরি করে যেতে থাকলেন তাঁর অবিস্মরণীয় সব চলচ্চিত্র, যার আবেদন এখনও কিছুমাত্র কমেনি, কখনও কমবে বলেও মনে হয় না।

ইঙ্গিতময়তার এই যে আবেদনের কথা বলছি, তখন কি আর এই ব্যাপারটাকে এমন করে ভেবেছিলুম? তা নিশ্চয় ভাবিনি। যা শুধুমাত্র নাড়াচড়া করেই আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, উপরি-আকর্ষণ হিসাবে তার মুখে যে বোল ফুটেছে, স্রেফ এই আনন্দেই তখন আমরা মশগুল। নদীর জলধারা প্রবল বেগে ধাবিত হচ্ছে, আর সেই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য ছুটে আসছে আলুলায়িতকুন্তলা এক নারী, আগের যুগে তো এইটুকু দেখেই আমরা যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। এরপরেও যে কিছু থাকতে পারে, তা আমরা ভাবতে পর্যন্ত পারতুম না। কিন্তু এখন দেখলুম, তাও থাকতে পারে। আর-কিছু না হোক, 'কপালকুণ্ডলে, কপালকুণ্ডলে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওই যুবতীর পিছন-পিছন ছুটে আসতে পারে উদ্‌ভ্রান্ত এক যুবক। অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের খিদে একেবারে একই সঙ্গে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা। এ ছবি যখন দেখি, শৈশব থেকে সদ্য তখন আমি বাল্যাবস্থায় প্রবেশ করেছি। বাড়ি ফিরে খুব 'কপালকুণ্ডলে; কপালকুণ্ডলে' বলে চেঁচিয়েছিলুম। ফলে ছোটকাকার কাছে কড়া রকমের বকুনি খাই। 'ছবিঘর'-এ ওই একই সময়ে দেখেছিলুম 'সং অব সংস'। ইংরেজি বই। নায়িকার নাম—যদ্দুর মনে পড়ে—মার্লিন ডিয়েট্রিখ। পরবর্তী কালের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর একেবারে প্রথম পর্যায়ের ছবি। প্রথম-আবির্ভাবের দৃশ্যে তাঁর মুখখানা যে আগেভাগেই দেখা যায়নি, বইয়ের দোকানের একটা উপরের তাক থেকে একখানা বই হাতে নিয়ে মই বেয়ে নামছিলেন বলে তাঁর পা দুখানাই সর্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, এটা মনে আছে। তবে তাবৎ কথাবার্তা যেহেতু ইংরেজিতে হচ্ছিল, তাই তার একবর্ণও বুঝতে পারিনি। (বছর কয়েক আগে একটা বিদেশি ম্যাগাজিনে মার্লিন ডিয়েট্রিখের খবর পড়ি। তাঁর বয়স তখনই নব্বই ছাড়িয়েছে। তবে খবর পড়ে মনে হল, বয়সটা অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে কোনও ব্যাপারই নয়।)

তার কিছুদিন বাদেই দেখি 'সোনার সংসার'। সবাক বাংলা ছবি। সেই আমলে বেশ নামও হয়েছিল। ফাউ হিসেবে তার সঙ্গে একটা ছোট্ট মাপের ছবিও ছিল। টাকমাথা এক ভদ্রলোক তাতে বাঙালের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, এটা ভুলিনি। বেসুরো গলায় গাওয়া তাঁর একটা গানের কথাও মনে পড়ে। তার আরম্ভটা এইরকম: 'দ্যাশের শিল্প দ্যাশেতে রাখিব, আমরা তাহারে ছাড়িব না।' হাসির ছবি। এটাই গোড়ার দিকে দেখানো হয়। দেখতে-দেখতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল

বলে মূল ছবিটা আর আদ্যন্ত ভাল করে দেখাই হয়নি। হাসির ছবির প্রসঙ্গে বলি, বাঙাল কিংবা হোমিওপ্যাথ চরিত্র ছাড়া সম্ভবত হাসির ছবির কথা সেকালে কেউ ভাবতেই পারতেন না। ফলে, রসিকতা আর ভাঁড়ামির ভেদরেখা প্রায়ই মুছে যেত এবং সবই হত একটু মোটা দাগের। যদি বলি যে, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমথেশ বরুয়া মশাইয়ের 'রজত জয়ন্তী'ই প্রথম সার্থক হাসির ছবি, তা হলে বোধহয় খুব অন্যায় বলা হবে না।

আমরা যখন ইস্কুলের ছাত্র, নিউ থিয়েটার্সের রমরমা শুরু হয় তখন থেকেই। 'চণ্ডীদাস' ছবিতে কৃষ্ণচন্দ্র দে মশাই তাঁর দরাজ গলায় যে গান গেয়েছিলেন, সেই 'ফিরে চলো'র রেশ আমাদের কান থেকে তখনও মুছে যায়নি এবং 'আকাশে পাখি কহিছে গাহি/মরণ নাহি মরণ নাহি' এই কলি দুটো গাইবার পরে প্রথম কলিতে ফিরে এসে 'আকাশে পাখিইইইই...' বলে টান মেরে আমরাও তখন বুঝে নেবার চেষ্টা করছি যে, কার কতটা দম। সেই অবস্থায় মুক্তি পায় 'দিদি', 'দেবদাস', 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে' ইত্যাদি সব ছবি। এদের কাল-পরম্পরা এতদিন বাদে আর নির্ভুল মনে নেই, তবে সব ছবিরই গান যে আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সেটা ঠিকই মনে আছে। সায়গলের 'স্বপন দেখি প্রবালদ্বীপে', কিংবা 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' আর 'বিদ্যাপতি'তে পাহাড়ি সান্যালের গান আমাদের একেবারে মাতিয়ে ছেড়েছিল। 'সাপুড়ে' আর 'সাথী'র গান শুনেও কম চঞ্চল হইনি। 'মুক্তি' সম্ভবত এর আগেই মুক্তি পেয়েছিল। কিংবা যদি শুনি যে, না, ও-ছবি এর পরে মুক্তি পায়, তাতেও অবাক হব না, কেননা এ-সব ছবির স্মৃতি আমার মাথার মধ্যে একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করেও এখন আর তার জট ছাড়ানো যাবে না। পঙ্কজ মল্লিক মশাইয়ের সেই যুগে গাওয়া অনেক বিখ্যাত গান রয়েছে ওই ছবিতে। তার মধ্যে 'কোন্ লগনে জনম আমার' গানটি যে তিনি দু'বারে দুই আলাদা লয়ে গেয়েছিলেন, এটা স্পষ্ট মনে করতে পারি। 'আমি কান পেতে রই' আর 'আজ সবার রঙে রঙে মেশাতে হবে', এ দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতও ও-বইয়ে চমৎকার গাওয়া হয়েছিল। প্রথমটি পঙ্কজকুমার গেয়েছিলেন, দ্বিতীয়টি কানন দেবী।

সমবয়সী এক বন্ধু সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হ্যাঁ রে, 'দেশের মাটি'র নাম মনে পড়ে?"

বললুম, "তা আর পড়বে না? 'নূতনের স্বপন দেখি বারে-বারে।' ও কি ভোলা যায়?"

বন্ধু বললেন, "সুর মনে আছে?"

বললুম, "তাও আছে। চাস তো গেয়ে শোনাতে পারি। কিন্তু তোর হল কী বল্ তো? অ্যাদ্দিন বাদে আজ আবার আমাদের সেই ছেলেবেলার গান শুনতে চাইছিস কেন? এত পিছুটান কি ভাল?"

"ভাল যে নয়, সে তো আমিও জানি," করুণ হেসে বন্ধুটি বললেন, "কিন্তু যেটা সত্যি কথা, সেটাই বা কেন স্বীকার করব না? এখন যে-সব গান শুনি, তা যেন কানেই লাগে না; যেমন শুনি, তেমন ভুলে যাই। অথচ কই, তখন যে-সব গান শুনেছি, তা তো ভুলে যাইনি। সে-সব গান তো এখনও কানে লেগে আছে। রহস্যটা কী বল্ তো?"

হেসে বলি, "রহস্য আবার কী, বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে পিছুটানও প্রবল হচ্ছে।"

কথাটা কিন্তু সর্বাংশে সত্যি নয়। ছবির গানে সেই যে যুগ গিয়েছে, তার তুলনা আজও খুঁজে পাই না। 'ডাক্তার'-এর পরে নিউ থিয়েটার্সও সেটাকে আর শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারেনি। পরে অন্য দু-একটি প্রতিষ্ঠানও এমন দু-চারখানা ছবি তৈরি করেছিল ঠিকই, যার গানের ঐশ্বর্য কিছু কম ছিল না, কিন্তু ছবির গানে সব মিলিয়ে যে একটা এলেবেলে ব্যাপার ক্রমেই ঢুকে পড়ছিল, তাও অস্বীকার করবার নয়।

সেকালে প্লে-ব্যাকের কারবার ছিল না। যিনি ঠোঁট নাড়ছেন, তিনি গাইছেন না, তিনি লিপ্ দিচ্ছেন মাত্র, গান গাইছেন আর-একজন, এ-সব কায়দা-কৌশল তখনও উদ্‌ভাবিত হয়নি। যেমন থিয়েটারের গান, তেমন চলচ্ছবির গানও অভিনেতাকেই গাইতে হত। সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ি সান্যাল, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন গায়ক-অভিনেতা। সবাই যে সমান দাপটে অভিনয় করতেন, তা নিশ্চয় নয়, তবে ছবির দর্শকদের কাছে এঁদের গানও ছিল মস্ত আকর্ষণ। যেমন ছবিতে, তেমন রেকর্ডেও এঁদের গান তখন আমরা বিস্তর শুনেছি। পাশের বাড়ির মেজোকর্তার কাছে এঁদের ফিল্মে-গাওয়া গানের রেকর্ড ছিল প্রচুর। জানলায় মুখ রেখে মেজোগিন্নিকে একবার শুধু বলবার অপেক্ষা যে, ও মেজোকাকিমা, আজ আমরা 'মুক্তি'-র গান শুনব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কলের গানে বেজে উঠত 'ওগো সুন্দর, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি...'। বারবার শুনে-শুনে সে-সব গানের কথা আর সুর আমাদের মুখস্থ হয়ে যেত। সুরটা ঠিকমতো তুলতে পারলুম কি না, তা নিয়ে কোনও সংশয় দেখা দিলে তক্ষুনি আবার জানলায় মুখ রেখে বলতুম, "ও মেজোকাকিমা, এই গানটা গোড়ার থেকে আর-একবার চালাও না।" আর-একবার কেন, আমাদের পাল্লায় পড়ে একই রেকর্ডের একই পিঠ কখনও-কখনও উপর্যুপরি তিন-চারবারও তাঁকে চালাতে হয়েছে। তবে কিনা গান শোনার আবদার তিনি হাসিমুখেই মেটাতেন, এই নিয়ে কখনও তাঁকে রাগ করতে বা ক্ষুন্ন হতে দেখিনি। কাজে ব্যস্ত থাকলে মেয়েকে ডেকে বলতেন, "ওরে কম্‌লি, পাশের বাড়ির খোকাদা কী গান শুনতে চাইছে, একবার দ্যাখ্ তো মা।" অগত্যা কম্‌লিকে এসে কলের গানের হাতল ঘোরাতে হত।

বায়োস্কোপের বাইরের জগতেও ছিল এমন সব আশ্চর্য গান, সেই বয়সেও যা শুনবামাত্র একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করত। তার মধ্যে রেণুকা দাশগুপ্তার গাওয়া 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ্' আর 'যোগিনী হইয়া যাব সেই দেশে যেখায় নিঠুর হরি'র কথা কখনও ভোলা যাবে না। অমন সুরেলা গলা, অমন দরদ আর গানের মধ্যে অমন আকূতি-ভরা নিবেদনের কোনও তুলনা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। বছর দশ-বারো আগে কলকাতার এক সান্ধ্য আসরে সামনাসামনি বসে তাঁর গান শুনবার একটা সুযোগ ঘটে যায়। কথা ছিল তিনি অতুলপ্রসাদের নির্বাচিত দু-তিনটি গান গেয়ে শোনাবেন। কিন্তু, অতুলপ্রসাদের গান কেউই নির্ভুল গাইতে পারেন না, জনৈক বৃদ্ধ বোদ্ধা সেখানে অগ্রিম এই মন্তব্য করে বসায় রেণুকা দেবী এতই ক্ষুব্ধ হন যে, বিস্তর সাধ্যসাধনা করেও সেদিন আর তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ানো যায়নি। তাঁর ক্ষুব্ধ হবার কারণ ছিল, তাতে সন্দেহ করি না, তবে একটা দুর্লভ সুযোগ যে হাতে এসেও ফশকে গেল, তাতে বড় হতাশ হয়েছিলুম।

তিরিশের দশকের মাঝ-বরাবর পঙ্কজকুমার মল্লিক মশাইকে নিয়ে আমাদের ছাত্র-মহলে খুব মাতামাতি শুরু হয়ে যায়। তাঁর 'ও কেন গেল চলে' আর 'আমারে ভালবেসে আমারই লাগিয়া'র উল্লেখ আগেই করেছি, সেই সঙ্গে তাঁর যে হিন্দি-গানখানার রেকর্ড সেই সময়ে বিক্রির ব্যাপারে একটা রেকর্ড করে ফেলেছিল বলে শুনতে পাই, ভুলভাল্ সুরে আমার সহপাঠীদের অনেককেই সেই 'পিয়া মিলনকে যানা' গাইতে শুনতুম। গানের জগতে মোটামুটি এই সময় থেকেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে শচীন দেববর্মন মশাইয়ের। তাঁর প্রথম জীবনের দু'খানা গান 'যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে' আর 'আলোছায়া দোলা' সমঝদার-মহলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেও তরুণদের খুব একটা মাতাতে পারেনি, কিন্তু তার বছর কয়েক বাদে 'প্রেমের সমাধিতীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল' বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখলুম, ছাত্রমহলেও সে-গান একেবারে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গানখানা শৈলেন রায় মশাইয়ের লেখা। তিনি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর

পাশে ন্যায়রত্ন লেনে থাকতেন। যখন কলেজে পড়ি, তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। জিজ্ঞেস করেছিলুম, "গানখানা যে এত জনপ্রিয় হবে, তা আপনি জানতেন?" উত্তরে তিনি হেসে বলেন, "পাগল! ভাবতেই পারিনি।" বেশ কয়েক বছর ধরে এই গান সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিল। এ-গানের প্রতিটি স্তবকের শেষে রয়েছে 'তাজমহল, তাজমহল।' তবে সব স্তবকেই যে একইভাবে এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করতে হবে, তা নয়। গলা কখনও খাদে নামবে, কখনও চূড়ায় উঠবে। ইস্কুলের বন্ধুবান্ধবদের অনেককেই তখন দুই পিরিয়ডের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে খাদ ও চড়ার সেই ব্যাপারটাকে রপ্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় মত্ত থাকতে দেখতুম।

আমাদের ক্লাসে দুটো দলও গজিয়ে উঠেছিল। এক দল পঙ্কজকুমার মল্লিকের ভক্ত, অন্য দল শচীন দেববর্মনের। ভক্ত না-বলে অন্ধভক্ত বললেই ঠিক হয়। কেননা, দুজনেই যে গুণী মানুষ এবং কাউকে দেবতা আর কাউকে দানব না বানিয়ে একই সঙ্গে যে এই দুই গায়কেরই অনুরাগী হতে কোনও বাধা নেই, এটা তারা মানত না। দুই দলের রেষারেষি ছিল প্রচণ্ড রকমের। এক দল বলত, আরে দূর দূর, হেঁড়ে গলায় কি গান হয়? অন্য দল বলত, গান বলতে যে নাকিসুরের কান্না বোঝায় না, এটা মনে রাখিস। বিরোধী পক্ষ দুটির ঝগড়া বাধত কথায়-কথায়। সে একেবারে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া! পরস্পর সম্পর্কে যে-ভাষা তখন ব্যবহৃত হত, সে আর কহতব্য নয়। যাঁদের নিয়ে ঝগড়া, ভক্তদলের কথা শুনলে তাঁরা নিশ্চয় কানে আঙুল দিতেন।

ঝগড়া যে শুধু ইশকুলেই চলত, তা নয়। ইশকুলের গণ্ডির বাইরেও এটা ছড়িয়ে যায়। রাস্তাঘাটে আর হাটে-বাজারেও এই নিয়ে তখন তুমুল তর্ক চলতে দেখেছি। এই নিয়ে একটা কমিকও তৈরি হয়েছিল। 'মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি, একবার দাঁড়াও না ভাই'—আমাদের সকলেরই পরিচিত এই যে পদ্য, দুই গায়কের কোন জন এটা কীভাবে গাইবেন, ইশকুল-কলেজের ফাংশানে সেকালের এক কমেডিয়ান তার ডিমনস্ট্রেশন দিতেন। প্রথমে তিনি পঙ্কজকুমারের গম্ভীর গলা নকল করে এটা গাইতেন, আর তার পরে গাইতেন একটু নেজাল টোনে শচীন দেববর্মনের গলা নকল করে। শুনে আমরা হেসে গড়াগড়ি যেতুম। ঝগড়া-বিরোধ মেটাবার ব্যাপারে বোধ করি হাস্যরসের তুল্য দাওয়াই আর কিচ্ছু নেই। কথাটা এইজন্য বলছি যে, দুই গায়ককে কেন্দ্র করে মোহন বাগান-ইস্ট বেঙ্গলি স্টাইলে যে ঝগড়া আমরা পাকিয়ে উঠতে দেখেছিলুম, কমিকটা জনপ্রিয় হবার পর আস্তে-আস্তে সেটা মিলিয়ে যায়।

কলেজের বার্ষিক বিচিত্রানুষ্ঠান সাধারণত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ হত। আমি ইশকুলে পড়তুম বটে, কিন্তু বাবার নামে যেহেতু বেশ-কিছু গেস্ট-কার্ড আসত, তাই সেখানে যেতে কোনও বাধা ছিল না। নামজাদা কোনও শিক্ষাব্রতীকে সাধারণত সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথি করে আনা হত এবং মোটামুটি এই রকমের গুটিকয় কথা তিনি বলতেন যে, লেখাপড়া তো করাই দরকার, কিন্তু মাঝেমধ্যে এই রকম সব গান-বাজনার অনুষ্ঠানও করা চাই, তা নইলে আমাদের জীবন বড্ডই একপেশে হয়ে যায়। ছাত্ররা সেটা বক্তার চেয়ে কিছু কম বুঝত না বলে বক্তৃতা শেষ হবার আগেই অনেকে হাততালি দিতে আরম্ভ করত। এর পরে আর বক্তৃতা শেষ না-করে উপায় থাকত না। পর্দা পড়ে যেত। তার আড়াল থেকে কেউ-একজন চেঁচিয়ে বলত: সাইলেন্স, সাইলেন্স। আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠান আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই শুরু হবে। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম।

অনুষ্ঠান শুরু হবার পরেও কিছুক্ষণ হই-হট্টগোল চলত বটে, কিন্তু আস্তে-আস্তে সেটা থিতিয়েও আসত। কলেজের এইসব অনুষ্ঠানে সেকালের নামজাদা অনেক গায়ককেই আমরা তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে একটার-পর-একটা গান শোনাতে দেখেছি। সকলেই তার প্রিয় গান

শুনতে চাইত। তখনকার বিখ্যাত শ্যামাসংগীত-গায়ক মৃণালকান্তি ঘোষ মশাই মঞ্চে এসে ঢুকবামাত্র সবাই সমস্বরে চেঁচাতে থাকত, 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।' ঠিক তেমনই জ্ঞান গোঁসাই মশাইও 'পাবলিকের ডিমাণ্ডে' শেষ পর্যন্ত 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়' গানখানি না শুনিয়ে নিস্তার পেতেন না। পঙ্কজ মল্লিককে শোনাতেই হত 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' এবং শচীন দেববর্মন মশাই তাঁর হারমনিয়ামটিকে টেনে নিয়ে একটু গুছিয়ে বসবামাত্র চিৎকার উঠত 'তাজমহল, তাজমহল'!

মেজোমামা মাঝে-মাঝে রাজবাড়ি থেকে কলকাতায় আসতেন। দু-চার দিনের বেশি থাকতেন না। কিন্তু তারই মধ্যে রোজ অন্তত একটা করে বায়োস্কোপ তাঁর দেখা চাই। বড়কাকাকে সঙ্গে নিয়ে সাধারণত নাইট-শোতে ছবি দেখতেন। দুজনেই ছিলেন কাননবালার পরম ভক্ত। জোরজার করে এক আধবার যে আমিও তাঁদের সঙ্গে যাইনি তা নয়। সিনেমা-হলে একেবারে সামনের দিকের আসনগুলোর মাসুল তখন ছিল চার আনা। বউবাজার স্ট্রিট আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে 'রূপম' বলে যে হল রয়েছে, তার সামনের দিকের আসন অবশ্য তিন আনাতেই পাওয়া যেত। তবে 'রূপম'-এ তখন নতুন ছবি সাধারণত দেখানো হত না। অন্যান্য হলে যা একবার দেখানো হয়ে গিয়েছে, তা-ই দিয়েই তখন এই হলটির কাজ চলতে দেখেছি। তা হোক, মাসুলও তো অন্যান্য হলের তুলনায় কম, এক-আনার ফারাকটাও সেকালে উপেক্ষা করবার ব্যাপার ছিল না।

'রূপম'কে যে ছানাপট্টির হল্ বলা হত, তার কারণ কারও না-বুঝবার কথা নয়। বউবাজার এলাকার ছানার আড়ত তো ওইখানেই। ইশকুল-পালানো দুষ্টু ছেলেরা ছানা কেনবার ছল করে ওখানে দোকানে-দোকানে ছানা চেখে বেড়াত; চালাক দোকানির কাছে কখনও-কখনও তাদের দাবড়ানি খেতেও দেখেছি। ছানাপট্টির ওই হল্-এ, তিন-আনার সিটে বসে, ছারপোকার কামড় খেতে-খেতে আমি যে দুটো ছবি দেখেছিলুম, তার একটা হল 'টকি অব টকিজ'। এ হল শিশির ভাদুড়ি মশাইয়ের অভিনীত নাটক 'রীতিমত নাটক'-এর চিত্র-সংস্করণ। যেমন শিশির ভাদুড়িকে তেমন রানিবালাকেও চলচ্চিত্রে সেই আমি প্রথম দেখি। 'রূপম'-এ দেখা অন্য ছবিটি 'চন্দ্রগুপ্ত'। শিশির ভাদুড়ি তাতে ছিলেন চাণক্যের ভূমিকায়। 'আয় রে বসন্ত তোর কিরণমাখা পাখা তুলে', ছায়ার এই বিখ্যাত গানটি যে তাতে কে গেয়েছিলেন তা বলতে পারব না, তবে তার রেশ এখনও কানে লেগে আছে।

যাঁরা বলেন যে, সেকালের সব কিছুই ভাল ছিল আর একালের সবকিছুই খারাপ, আমি তাঁদের দলে পড়তে রাজি নই। তবে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের মান যে একালের তুলনায় সেকালে অনেক উঁচু ছিল, সেটা বোধহয় স্বীকার করাই ভাল। সিনেমার গানের সত্যিই সেটা ছিল স্বর্ণযুগ। সায়গল, পঙ্কজকুমার, পাহাড়ি তখন যে-সব গান আমাদের শুনিয়েছেন, তার কথা কি কখনও ভোলা যাবে? কিংবা কানন দেবীর গানের জাদুর কথা? এখন প্লে-ব্যাকের সুবিধে রয়েছে, কিন্তু নেপথ্য থেকে যাঁরা গান শোনাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেই বা এই মুহূর্তে তেমন শিল্পী কোথায়? কণ্ঠের মাধুর্যে শেষ আমাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন গায়ক-অভিনেতা অসিতবরণ আর রবীন মজুমদার। তার পরেও তো অনেক বছর কাটল। কিন্তু তাঁদের জায়গাই বা ইতিমধ্যে ভরাট হল কই?

৩৫

শৈশবে সেই যে শ্যামাপদ চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে মাস কয়েকের জন্যে গানের তালিম পেয়েছিলুম, সুরের প্রতি সেই তখন থেকেই একটা মোহ জন্মে যায়। কিন্তু সুরেরও আছে একটা ভিতর-বাড়ি। তার মধ্যে কখনও ঢোকা হয়নি। তা নিয়ে তখন যে কোনও আক্ষেপ ছিল, তাও নয়। অন্দরমহল থেকে যে ধ্বনি-তরঙ্গ বাইরে এসে ছিটকে পড়ত, প্রত্যাশার পাত্র যেন তাতেই ভরে যেত কানায়-কানায়, তাতেই নিজেকে ধন্য মানতুম। অভিনয় সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার ছিল না, তবু যে নাটক কিংবা ছবি দেখবার জন্য ছটফট করতুম, সে ওই গানের টানে। সদ্য যে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, প্রথমেই খোঁজ নিতুম যে, তাতে সায়গল, পঙ্কজকুমার, পাহাড়ি সান্যাল কিংবা কানন দেবী আছেন কি না। থাকলে সে-ছবি দেখাই চাই। কেন? না তা হলে তাঁদের গলায় নতুন কিছু গান শোনা যাবে। অর্থাৎ অভিনয়, স্টোরি-লাইন ইত্যাদি সব ব্যাপাব নয়, গানই ছিল ছবি দেখাব প্রধান আকর্ষণ। কবিতাব সঙ্গে গানের যে একটা গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, এটা বুঝতে পারায় গানেব প্রতি টান দিনে-দিনে বেড়েই যায়। যে-গান সদ্য তুলেছি, বলতে গেলে প্রায় সারাক্ষণই সেটা গুনগুন কবে গাইতুমও।

দিদি একদিন বলেছিল, "এ কী বে, ভাত খেতে বসেও তুই গান গাইছিস?"

বলেছিলুম "কেন, তাতে কী হয়?"

"তাও জানিস না?" দিদি বলেছিল, "মুখে ভাত নিয়ে যাবা গান কবে, তাদের বউ নির্ঘাত পাগল হয়ে যায। তাই না মা?"

মা বলেছিলেন, "অতশত জানি না। তবে খেতে বসে গান করলে যে বিষম খেয়ে মরতে হয়, সেটা জানি।"

ঘুড়ি ওড়াতে-ওড়াতে তখন গুনগুন কবে গান করেছি, লাট্টু ঘোবাতে-ঘোরাতে তখন গুনগুন করে গান কবেছি, আবার ইশকুলে যাবার পথে আর ইস্কুল থেকে ফেরার পথেও তখন গুনগুনানির কামাই ছিল না। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই গানের স্রোত একেবারে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে যায়। আমাদের বাড়ি অনেক লোকেব বাড়ি। বাড়িতে একগাদা ছাত্র। যতক্ষণ না তারা খেয়ে-দেয়ে ইস্কুলে-কলেজে রওনা হচ্ছে, চিৎকারে-চেঁচামেচিতে গোটা বাড়ি ততক্ষণ সরগরম হয়ে থাকত। বাবা যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন, শুধু আমার গান কেন, গোটা বাড়িটাই সেদিন থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবাই কথা বলছে নিচু গলায়, হাঁটাচলাও করছে পা টিপে-টিপে, দেখে কী যে অস্বস্তি হত, সে আর বলবাব নয়।

ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা একেবারেই অনাত্মীয়, বাবার অবস্থা দেখেই তাঁরা বুঝতে পেরে থাকবেন যে, অচিরে তাঁর সেরে উঠবার সম্ভাবনা যখন নেই বললেই হয়, তখন আর তাঁর আশ্রিত হয়ে

থাকাটা তাঁদের উচিত হবে না। তাঁদের কিছু বলতেও হয়নি। আমাদের বাড়ি থেকে একে-একে তাঁরা হস্টেলে কিংবা মেস-বাড়িতে চলে যেতে থাকেন। বাবাকে নিয়ে মা পুরী চলে যাওয়ায় হেঁশেলও বন্ধ হয়ে গেল। পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে দেখি, ঘরের মেঝেয় ধুলোর পুরু সর পড়েছে, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে জঞ্জাল। দেখেই বোঝা যায়, মা চলে যাবার পরে আর কোথাও ঝাঁটপাট পড়েনি। ছোটকাকা আর ছোড়দা যে-যার কলেজে চলে গিয়েছেন। ঘরে-ঘরে তালা ঝোলানো। বাড়িতে তখন মণিদা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। মনে হল যেন ভূতের বাড়িতে এসে ঢুকেছি।

মণিদা ভাবতেই পারেননি যে, সত্যি-সত্যি ঠিক এক হপ্তা বাদেই আমি কলকাতায় চলে আসব। বললেন, "কান্ড দ্যাখো! তুই আসবি জানলে তো আমি হাওড়া ইস্টিশানে যেতুম। পথ চিনে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

বললুম, "অসুবিধে আবার কিসের? হাওড়া ইস্টিশান থেকে কোন্ বাসে উঠলে শেয়ালদায় চলে আসা যায়, তা কি আমি জানি না নাকি?"

"তা বটে," মণিদা বললেন, "তেরো বছর বয়েস হল, তুই তো এখন বড় হয়ে গিয়েছিস।"

মনে পড়ল, পুরী থেকে যখন রওনা হই, মা'ও তখন এই কথাটা বলেছিলেন। বললুম, "এখানে আমি কোন্ ঘরে থাকব?"

মণিদা বললেন, "গোটা বাড়িই তো এখন ফাঁকা। যেখানে তোর থাকতে ইচ্ছে হয়, সেইখানেই থাকবি। এখন তো তোর সুটকেসটা রেখে চান করে আয়। তারপর চল্ কেস্টো কাফে থেকে তোকে কিছু খাইয়ে আনি।"

"দুপুরে কোথায় খাব?"

"দুপুরে আমার সঙ্গে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটা মেস-বাড়িতে যাবি। দুপুরে আর রাত্তিরে আজ থেকে সেখানেই খেতে হবে।"

হ্যারিসন রোড আর সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের মোড়েই তখন আমাদের মিত্র ইন্সটিটিউশন। মণিদাকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, "সেইজন্যই তো কাছাকাছি একটা মেসে দু'বেলার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বইপত্তর গুছিয়ে নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এই ধর্ পৌনে দশটা নাগাদ মেসবাড়িতে খেতে চলে যাবি, তারপর সেখান থেকেই চলে যাবি তোর ইস্কুলে।"

বললুম, "সে তো আজও যাওয়া যায়। এখনও তো ন'টাই বাজেনি।"

মণিদা বললেন, "আজ আর ইস্কুলে যেতে হবে না। রাত্তিরে তো ভাল ঘুম হয়নি। বারোটা নাগাদ খেতে যাব। তারপর বাড়িতে ফিরে একটু ঘুমিয়ে নে। কাল থেকে ইস্কুলে যাবি।"

আমাদের শেয়ালদা-পাড়ার গলিতে-গলিতে মেসবাড়ি তখন যেন গিসগিস করত। সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, বৈঠকখানা রোড, পটুয়াটোলা লেন, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন ইত্যাদি সব রাস্তা ছিল মেসবাড়ির আড়তের মতো। এ-সব বাড়িতে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের মধ্যে পুব-বাংলার মানুষ তো ছিলেনই, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার মানুষও কিছু কম ছিলেন না। কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকতে হয়, অথচ সপরিবারে এই শহরে থাকবার মতো সুযোগ কিংবা সঙ্গতি নেই, এই অবস্থায় জনাকয় মানুষ মিলে একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকা ছাড়া আর উপায় কী। মেসবাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে যাঁরা পুব-বাংলার মানুষ, চাকুরিয়া হলে বছরে সাধারণত একবারের বেশি দেশের বাড়িতে যাওয়া তাঁদের ভাগ্যে ঘটত না, পশ্চিমবঙ্গীয় বাসিন্দারা সেক্ষেত্রে ফি শনিবার বিকেলবেলার ট্রেন ধরে গাঁয়ের বাড়িতে চলে যেতেন, তারপর শনি আর রবি এই দুটো রাত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ভোরের ট্রেন ধরে তাঁরা কলকাতায় চলে আসতেন। সোমবার

তাঁদের অনেকেই অবশ্য যথাসময়ে আপিসে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারতেন না, হাজিরা দিতে একটু লেট হয়ে যেত।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পরিণামে এ দেশের মানচিত্র থেকে পুব-বাংলা খসে পড়ল। ফলে বাঙালদের মধ্যে আমরা যারা এ-পারে রয়ে গেলুম, তাদের সেই 'পুব বাংলার দেশের বাড়ি' বলতে আর কিছু রইল না। সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিশেষ করে কলকাতার সামাজিক জীবন ও জনবিন্যাসে এটা যে কী বিরাট ও বিচিত্র সব পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, এক্ষুনি আর সেই প্রসঙ্গে যাবার দরকার নেই। তবে যে-কথা বলছিলুম, তারই সূত্র ধরে অন্তত এটুকু এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, জনাকয় মানুষ মিলে মেসিং করে থাকার যে ব্যবস্থা এখানে দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এদিকে এসে পড়ায় সেই প্রথম সেটা মস্ত একটা ধাক্কা খায়। মেসিং সিস্টেমের উপরে দ্বিতীয় ধাক্কা মেরেছে ইলেকট্রিক ট্রেন। ওদিকে বর্ধমান আর এদিকে রানাঘাট থেকে বিস্তর লোক আজকাল বৈদ্যুতিক লোকাল ট্রেনে চড়ে কলকাতায় এসে আপিস-কাচারি করছেন, তারপর এখানকার কাজকর্ম সেরে, যতই রাত্রি হোক, নিত্য আবার ফিরেও যাচ্ছেন যথাস্থানে। ফলে, মেসবাড়িতে থাকবার কোনও দরকারই আর এঁদের হচ্ছে না।

অবস্থা যে এমনভাবে পালটে যাবে, তিরিশের দশকে তা কেউ কল্পনাও করেনি। ইস্কুলে যারা আমার সহপাঠী ছিল, এটা জানতুম যে, জ্যাঠা বাবা কি কাকার সঙ্গে তাদের অনেকেই থাকে মেসবাড়িতে। শনিবার-শনিবার তারা মেমারি কি শক্তিগড় কি শান্তিপুর কি কেষ্টনগরে তাদের দেশের বাড়িতে চলে যায়, আবার সোমবার সকালে এখানে ফিরে আসে। কলেজের ক্যাশিয়ারবাবুর এক ছেলে আর এক ভাইপো ইস্কুলে আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত। শনিবারের শেষ পিরিয়ড শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হত তাদের ছটফটানি, তারপর ঘণ্টা পড়তেই ক্যাশিয়ারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তারা বলতে গেলে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে শ্যামবাজারের বাসে উঠত। তারা যেত বসিরহাটে। বেলগাছিয়া ব্রিজের তলায়, রাস্তার পুবদিকে ছিল লাইট রেলওয়ের স্টেশন। বেলগাছিয়া রোড ছাড়িয়ে যশোর রোড হয়ে ঝিকঝিক করতে-করতে, ছোট্ট শরীরের তুলনায় অনেক বেশি ধোঁয়া উড়িয়ে, সেই লাইট রেলওয়ের ট্রেন একেবারে বসিরহাট পর্যন্ত চলে যেত। লোকে বলত 'ছানার গাড়ি'। তার কারণ দত্তপুকুর থেকে, বাঁকভর্তি ছানা নিয়ে, বিস্তর ব্যাপারী তখন ওই খেলনা-রেলগাড়িতে চড়েই কলকাতায় আসত। তবে শুধু ছানা কেন, উত্তর চব্বিশ পরগনার সবজিও ওই গাড়িতে করে কিছু কম আসত না। শীতকালে আসত বসিরহাটের খেজুর-পাটালি আর নলেন গুড়ের ঠিলে। সেই রেলগাড়ি উঠে যাবার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত বেলগাছিয়া রোড আর যশোর রোডের ধার দিয়ে পাতা রেললাইন তার সাক্ষ্য বহন করত। আপার সার্কুলার রোড অর্থাৎ এখনকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সরণির জমিতেও ওই রকমের রেললাইন অনেকে দেখে থাকবেন। সরু লাইন নয়, চওড়া রেলপথ। ও-পথে অবশ্য যাত্রিবাহী ট্রেন চলত না, ওটা ছিল জঞ্জালবোঝাই মালগাড়ির পথ। সেই লাইনও অনেককাল আগেই অদৃশ্য হয়েছে। যদি শুনি যে, চোর-ডাকাতের হাত ঘুরে সে-সব লাইনের লোহা শেষ পর্যন্ত জলের দরে কালোয়ারদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল, একটুও অবাক হব না।

মেসবাড়ির কথা হচ্ছিল, সেই কথাতেই ফিরে যাই। শেয়ালদা অঞ্চলে যে বিস্তর মেসবাড়ি গজিয়ে উঠেছিল, তার একটা কারণ এই যে, এটা মধ্যবিত্ত গেরস্ত-পাড়া। অন্য কারণ, ইস্টিশানটা একেবারে হাতের কাছে। উপরন্তু, কলকাতার আর-পাঁচটা বাজারের তুলনায় বৈঠকখানা-বাজারে আনাজ আর মাছ কিছুটা শস্তায় পাওয়া যেত। তা ছাড়া, আপিস-পাড়া অর্থাৎ ডালহৌসি স্কোয়ার ওখান থেকে এত দূরে নয় যে, হেঁটে যাতায়াত করা চলবে না। এটাও বিবেচনার বিষয় ছিল

বই কী। সরবরাহ কম ছিল বলে টাকাপয়সা তখনও খোলামকুচি হয়ে যায়নি। বাজার ছিল শস্তাগণ্ডার, কিন্তু মাইনেও তো ছিল আজকের দিনের তুলনায় যৎসামান্য। সবাইকেই তাই প্রতিটি পয়সা খরচ করবার আগে তিনবার ভাবতে হত।

মেসবাড়ির যা মাসিক ভাড়া, বাসিন্দারা সবাই মিলে সেটা মেটাতেন। সবার হিস্যা অবশ্য সমান হত না। একতলার তুলনায় দোতলা-তিনতলার ঘরে আলোবাতাস বেশি খেলে, সুতরাং তার ভাড়াও বেশি। যে-ঘরে দুটো তক্তপোশ, তার তক্তপোশ-পিছু ভাড়ার পরিমাণ যে-ঘরে তিনটে তক্তপোশ পড়ে তার তক্তপোশ-পিছু ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। সবচেয়ে বেশি ভাড়া সিঙ্গল-তক্তপোশের ঘরের। তিনতলার সিঙ্গল-ঘরের সর্বোচ্চ মাসিক ভাড়া তখন দশ টাকা পর্যন্ত ধার্য হতে দেখেছি। একতলার তিন-তক্তপোশের ঘরের একটা তক্তপোশ সেক্ষেত্রে কখনও-কখনও দুই কিংবা আড়াই টাকাতেও দখল করা যেত। এঁদো গলির মধ্যে চুনবালির-আস্তর-খসা পুরনো বাড়ির একতলার ঘর। তাও আবার ভাগের ঘর। নেহাত আতান্তরে না-পড়লে অমন ঘরে কে থাকতে যাবে। ভাড়া তো তাই কম হবেই।

মেস বলতে অবশ্য বাসস্থানের কথা বোঝায় না, নিছক আহার্যটাই বোঝায়। তবে আমাদের কাছে ও দুটো মিলিয়েই মেসবাড়ি। তা থাকার ব্যবস্থাটার কথা তো সবিস্তার বললুম, এবারে আহার্যের কথা বলি। মেসবাড়িতে দু'বেলার জলখাবারের ব্যবস্থা যার-যার নিজের-নিজের। শুধু ভাতের ব্যবস্থাটাই সর্বজনীন। এক্ষেত্রে অবশ্য 'ভাত' নয়, 'মিল্' কথাটাই সকলের মুখে শোনা যেত। কেউ বলতেন, "ঠাকুর, রাত্তিরের মিল্-এ কি আবার এই পচা-পোনামাছ খেতে হবে?" কেউ বলতেন, "কাল শনিবার রাত্তির থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত যে আমার নো মিল্, সেটা মনে রেখো।" দু'বেলার এই মিল্-এর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করবার এবং সেই সঙ্গে ঠাকুর-চাকর-ঝি-জমাদারের মাইনে থেকে শুরু করে বাড়িওয়ালা ও মুদির পাওনাগণ্ডা মেটাবার দায়িত্ব যে বরাবর একই লোকের হাতে থাকত, তা নয়। মেসের বাসিন্দাদের এক-একজনকে এক-এক মাসে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হত। তবে দায়িত্বটা যিনিই নিন, সমালোচনার হাত থেকে তাঁর পরিত্রাণ ছিল না। আমরা তো মেসবাড়ির বাসিন্দা নই, পরিচিত এক বাসিন্দার 'গেস্ট' হয়ে দু'বেলা সেখানে গিয়ে খেয়ে আসতুম মাত্র। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, খাওয়া চুকিয়ে চলেও আসতুম সেখান থেকে। কিন্তু তারই মধ্যে লক্ষ করতুম যে, সেই মাসের জন্য যিনি ম্যানেজার, তাঁর উদ্দেশে চোখা-চোখা সব বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

কেউ বলতেন, "রামোঃ, আজও আবার সেই শুকতোর মতো করে মাংস রেঁধেছ? ওহে ঠাকুর, এ তো মুখেই তোলা যায় না! রান্নাবান্না কি সব ভুলে গেলে নাকি?"

ঠাকুর বলত, "কী করব বাবু, ম্যানেজারবাবু তো শুকনো-লঙ্কা দিতে বারণ করে দিলেন!"

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একজন কেউ মন্তব্য করত, "নাঃ, এই পেটরোগা ম্যানেজারকে নিয়ে আর পারা যায় না!"

অন্য রকমের ইঙ্গিতও কানে আসত বই কী। একদিনের কথা বলি। কেউ একজন ব্যাজার মুখে বলেছিলেন, "ব্যাপার কী ঠাকুর, বড়ি-বেগুন আর সজনে-ডাঁটার এই লম্বা ঝোল আর কত খাওয়াবে?"

ঘরের আর-এক দিক থেকে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ চোখ টিপে বলেন, "খাওয়াতেই হবে। পায়রাডাঙায় আমাদের শচীনবাবুর দোতলা বাড়ি উঠছে না?"

এক-টুকরো পাতিলেবু চেয়ে পাননি বলে এই মেসবাড়ির এক পককেশ বৃদ্ধকে একবার ভাতের থালা উলটে দিয়ে রাগমাগ করে খাওয়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলুম। ভাত বাড়তে

সামান্য দেরি হয়ে যাওয়ায় আর-একজনকে একবার আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মেসের ঠাকুরের গলা টিপে ধরতে দেখি। যত এ-সব দেখতুম, তত আমার একটা কথাই মনে হত। সেটা এই যে, মানুষ হিসাবে এঁরা বড়ই অসহিষ্ণু। এক জায়গায় আছেন বটে, কিন্তু এঁরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না।

তবে প্রতিটি মেসবাড়িই যে এইরকমের মানুষ দিয়ে ঠাসা ছিল, তা নয়। একটু বড় হবার পর তো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আরও অনেক মেসে গিয়েছি। সেখানে বরং এর উলটোটাই চোখে পড়ত। দেখতুম, বাসিন্দারা সবাই বেশ মিলেমিশে আছে, একজনের কোনও বিপদ ঘটলে অন্যেরা 'আমার তাতে বয়েই গেল' বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকছে না। মেসবাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের অনেকেরই যে একটা মস্ত বড় কষ্টের দিক রয়েছে, সেটাও অবশ্য মানতে হবে। কষ্টটা শুধু অর্থাভাবের নয়। বস্তুত সেটা কষ্টের কারণ মাত্র। অর্থাভাবের কারণে গোটা পরিবারকে কলকাতায় এনে একসঙ্গে জীবনযাপন করতে পারছেন না, বউ-বাচ্চার কাছ থেকে দিনের পর দিন দূরে থাকতে হচ্ছে, এই কষ্টটাই আসল কষ্ট। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটা তাঁদের মানসিক গঠনকেও অল্পবিস্তর বদলে দেয় বই কী। এমনিতে যিনি প্রসন্ন মানুষ, হঠাৎ-হঠাৎ তিনি রেগে উঠতে থাকেন ; গাঁয়েব প্রতিবেশীরা যাঁকে হাসিখুশি মানুষ বলে জানত, তাঁরও কথাবার্তায় খানিক পরিমাণে খিটখিটে-ভাব এসে যায়।

তা এই হলেন সেকালেব মেসবাড়িব বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যে এঁদের নিয়ে এককালে বিস্তর গল্প লেখা হয়েছে। সে-সব গল্পেব অধিকাংশই ককণবসে আর্দ্র। আমি সেক্ষেত্রে বৌদ্রবসের আধিক্য দেখে এতই ভড়কে গিয়েছিলুম যে, মেসবাড়ি ছেড়ে পাইস হোটেলের শরণাপন্ন হই। সেও ছিল এক মজাব জগৎ।

শেয়ালদা-এলাকায় যেমন মেসবাড়ি, তেমন পাইস হোটেলও ছিল অগুন্তি। মির্জাপুব স্ট্রিট অর্থাৎ এখনকাব সূর্য সেন স্ট্রিট হলে তো কথাই নেই, ওই রাস্তাব যে অংশটা পুবে আমহার্স্ট স্ট্রিট অর্থাৎ রামমোহন সবণি থেকে পশ্চিমে গোলদিঘির মধ্যে পড়ে, তার দু'দিকেই ছিল বিস্তব পাইস হোটেল। সবই যে 'বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল', সাইনবোর্ডে সে-কথার উল্লেখ থাকত বেশ বড়-বড় হরফে, অর্থাৎ সেখানে অন্নগ্রহণ করলে কোনও হিন্দু-সন্তানের যে জাত যাবার ভয় নেই, এই আশ্বাসটা বেশ স্পষ্ট কবে দেওয়া হত।

ভিতরে ঢুকলে একটা ব্ল্যাকবোর্ডও চোখে না-পড়ে পারত না। প্রবেশপথেব ডাইনে কিংবা বাঁয়ে ছোট একটা টেবিলেব সামনে টিনের চেয়াবে যাঁকে উপবিষ্ট থাকতে দেখা যেত, বুঝতে অসুবিধে হত না, যে, তিনিই ম্যানেজার। সাধারণত তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে একটা খবরের কাগজ পড়তেন। খেতে কীরকম খবচ হবে, জিজ্ঞেস করলে, কাগজ থেকে মুখ না তুলে, ব্ল্যাকবোর্ডটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন। মুখ পালটাবার জন্য সেই সময়ে আমি ও-পাড়াব পাইস হোটেলগুলিতে ঘুরে-ঘুরে খেতুম। তখন এত হোটেলে এত ম্যানেজার দেখেছি যে, সেই অভিজ্ঞতাব জোরে বলতে পারি, সব হোটেলের সব ম্যানেজারই দেখতে ছিলেন প্রায় একইরকম। তাঁদের ভাবভঙ্গিতেও কোনও পার্থক্য চোখে পড়ত না। তাঁরা প্রত্যেকেই খুব মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ায় ব্যস্ত থাকতেন এবং আহার্যের দাম জিজ্ঞেস করলে, কাগজ থেকে মুখ না তুলে, প্রত্যেকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। এর ফলে এক-এক সময়ে আমার মনে হত যে, হোটেল অনেক বটে, কিন্তু ম্যানেজার মাত্র একটিই। কিন্তু একই সময়ে কী করে যে তিনি একাধিক হোটেলের প্রবেশ-পথের পাশে একই রকমের টিনের চেয়ারে বসে কাগজ-পড়েন, সেটা বুঝে উঠতে পারতুম না।

এটা জানিয়ে দিদিকে একটা চিঠি লিখি। তার উত্তরে পুরী থেকে দিদি জানায় যে, এ আর কিছুই নয়, পাগল হবার পূর্বলক্ষণ। "পিছনের দেওয়ালে ম্যানেজারের ছায়া পড়ে কি না, সেটা নজর করে দেখবি। ছায়া না-পড়লে কিন্তু ভয়ের কথা।" কথাটা দিদি মা'কেও নিশ্চয় জানিয়েছিল। মায়ের কাছ থেকে সেই সময়ে যে চিঠি পাই, তাতে অন্তত সেই রকমই মনে হয়। মা লিখেছিলেন, "তোমার ছোটকাকাকে বলিয়া ভাল কোনও ডাক্তারকে দিয়া চক্ষু পরীক্ষা করাইবা। ইহার অন্যথা হইলে পরে অনেক ভুগিতে হইবে।"

পাইস হোটেলের ব্ল্যাকবোর্ডের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ওতে ভাত-ডাল থেকে শুরু করে সেদিনকার প্রতিটি আইটেমের নাম চকখড়ি দিয়ে লেখা থাকত। পাশে থাকত দামের উল্লেখ। কোনও আইটেম—ধরা যাক লাউঘণ্ট কি মাছের ঝাল—ফুরিয়ে গেলে সেটা মুছে দেওয়া হত। সর্বনিম্নে উল্লেখ করা হত যে, কেউ যদি কলার পাতায় খেতে চান ও তাঁকে যদি জল দিতে হয় মাটির গেলাশে, তা হলে তার জন্য তাঁকে আহার্যের দামের উপরে বাড়তি আরও একটি পয়সা দিতে হবে। তারও নীচে থাকত একটি ঘোষণা : পাঁচ পয়সার নীচে খাওয়া হয় না।

অর্থাৎ মাত্র পাঁচটি পয়সা খরচ করলেই সেকালে একবেলার মতো ভরপেট খাওয়া হয়ে যেত। এটা অবশ্য নিরামিষ খাওয়া ; ভাত ডাল আর একটা সবজি। ভাত আর ডাল যদৃচ্ছ খাওয়া চলত, তার জন্য বাড়তি পয়সা দেবার দরকার হত না। প্রথমবার যে ভাত-ডাল দিয়ে গেল, তাতে যদি পেট না ভরে তো ও-দুটো আইটেম আবার নেওয়া চলবে। যেহেতু ফ্রি, তাই অনেকে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিতেনও। মাছ-মাংস নিতে হলে বা ডিমের ডালনা সম্পর্কে লোভ থাকলে পাঁচ পয়সায় চলত না, গাঁট থেকে আরও চার-ছ' পয়সা খসাবার দরকার হত। পাইস হোটেলগুলিতে রান্নাবান্নার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্ভবত সর্বত্র ছিল একইরকম। আমি তো অন্তত স্বাদের কোনও পার্থক্য বুঝতে পারতুম না। মাছের ঝোলে মাঝে-মাঝে মাংসের গন্ধ পাওয়া যেত। তাতে সন্দেহ হত, মাছের ঝোলে টান পড়ায় হয়তো মাছের গামলার মধ্যে খানিকটা মাংসের ঝোল ঢেলে সেটাকে বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। ডালের মধ্যে যে ভাতের ফ্যান মেশানো হত, এ তো হলফ করেই বলতে পারি।

কিন্তু এতসব কথা বলবার পরেও একটা কথা থেকে যায়। সেটা এই যে, অল্প বিত্তের বিস্তর মানুষকে কলকাতার এই পাইস হোটেলগুলিই একদা বাঁচিয়ে রেখেছিল। এগুলির সংখ্যা এখন আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, চাল ডাল আনাজ ডিম মাছ মাংস জ্বালানি ইত্যাদি সব কিছুই তো অগ্নিমূল্য। এই অবস্থায় পাইস হোটেল আর কাকে বাঁচাবে, তার নিজেরই তো নাভিশ্বাস উঠবার জোগাড়। পাঁচ পয়সা তো দূরের কথা, পাঁচ টাকাতেও কাউকে ভরপেট খাওয়াবার সাধ্য আর তার নেই।

৩৬

বাবার বন্ধু সত্যানন্দ রায় মশাইয়ের কথা আগে বলে থাকব। একে ইনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, তায় আমাদের প্রতিবেশী। নুর মহম্মদ লেনের একটা মাথা যেখানে একটু সরু হয়ে পিছন দিকে মোড় নিয়ে গুটিকয় খোলার চালের বাড়ির সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে, আগে সেখানে একটা দোতলা বাড়িতে এঁরা থাকতেন। বাড়িটি ছিল ভারী সুন্দর। সত্যানন্দ রায় মশাইকে আমরা কাকাবাবু বলতুম। তাঁর ছেলে কামাখ্যাপ্রসাদ রায় ইশকুলে আমার চেয়ে দু'তিন ক্লাস উপরে পড়তেন। ডাকনাম তিনু। এই তিনুদা পরে ডাক্তারি পাশ করে কোলিয়ারির চাকরি নিয়ে বঙ্গ-বিহার সীমান্তের কয়লাখনি-এলাকায় চলে যান। বছর দশ-পনেরো আগেও যখন মাঝে-মধ্যে ওদিকে গিয়েছি, সাঁকতোরিয়া হাসপাতালের বড়-ডাক্তারবাবু কামাখ্যাপ্রসাদ রায়ের সুনামের কথা তখন খুব শুনতুম। লোকে যা বলত, তাতে বুঝতে পারতুম যে, শুধু একজন দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে নয়, সহানুভূতিশীল একজন মানুষ হিসাবেও তিনুদা সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

তিনুদার পরে ছিল দুটি যমজ বোন, পারুল আর মুকুল। তারও নীচে ছিল আরও একটি বোন, টুকু। এই টুকু আমার ছোট বোন মিন্টুর সমবয়সী। এদিকে আবার তিনুদার খুড়তুতো বোন রেণু ছিল আমার দিদির একেবারে প্রাণের বন্ধু। দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধনটা ছিল শক্ত রকমের, দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াতও তাই ছিল অবাধ। এদের বাড়িটা ছিল আমাদের বাড়ির ঠিক পিছনে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে হলে যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়ও আমরা বাজে-খরচা করতুম না, ওদের বাড়ির জানলা থেকে তিনুদা একবার ডাকলেই হল, তক্ষুনি আমাদের একতলার পিছন দিককার রান্নাঘরের টিনের ছাত থেকে ওদের উঠোনের উপরে লাফিয়ে পড়তুম। ও-বাড়ির একমাত্র ছেলে তিনুদা। কাকাবাবু আর কাকিমা সম্ভবত সেই কারণেই তার ছেলেবেলার কোনও শখ মেটাতে কখনও কার্পণ্য করেননি। তার গল্পের বইয়ের ভাঁড়ার দেখে যেমন আমার তাক লেগে যেত, তেমন আবার তার খেলনার সরঞ্জামও ছিল অফুরন্ত। 'বনে জঙ্গলে', 'টমকাকার কুটির' ইত্যাদি সব বিখ্যাত বই আমি ওই বাড়িতেই প্রথম পড়ি। 'ক্যারম' খেলাতেও ওই বাড়িতেই আমার হাতে খড়ি হয়। 'ব্যাগাটেলি' বলে যে একটা খেলা থাকতে পারে, শৈশবে সেটাও আমার জানা ছিল না। তিনুদার কল্যাণে জানা হয়ে যায় যে, কাঠি দিয়ে ঠেলা মেরে ছোট ছোট বলগুলোকে বড় বড় অঙ্কের ঘরগুলোতে পৌঁছে দেবার কাজটা যতই সহজ মনে হোক, আসলে সেটা মোটেই সহজ নয়। ক্যাভেন্ডার সিগারেট কোম্পানি থেকে কুপনের বিনিময়ে পাওয়া চমৎকার একটা খেলনা জাহাজও তিনুদার ছিল। কাকাবাবুকে কখনও সিগারেট খেতে দেখিনি। অবাক হয়ে তাই ভাবতুম যে, কুপন কী করে জোগাড় হল। তিনুদাকে অবশ্য এই প্রশ্নটা কখনও করা হয়নি। সত্যানন্দ-কাকাবাবুরাও, আমাদেরই মতো, ফরিদপুরের মানুষ। তফাত এই যে, আমরা গ্রামে

থাকতুম, আর ওঁদের বাড়ি ফরিদপুর-শহরে। বড়দের মুখে অবশ্য 'শহর' নয়, 'টাউন' কথাটাই বেশি শোনা যেত। গোবিন্দপুর খাল থেকে নৌকো কেরায়া করতে একবার এতই দেরি হয়ে যায়, এবং শশার চকে পৌঁছতেই রাত হয়ে যাবে বলে সত্যানন্দ কাকাবাবু আর কাকিমা মাকে এতই ভয় দেখাতে থাকেন যে, একটা রাত সেবারে আমরা ওঁদের টাউনের বাড়িতে কাটাতে বাধ্য হই। সময়টা অবশ্য মন্দ কাটেনি। তখন দুর্গাপুজোর আর বড় বেশি বাকি নেই। ওঁদের বাড়িতে যে পুজো হত, তার প্রতিমার উপরে কুমোর তখন রং ধরাচ্ছে। সে-সব দেখেই দিনটা দিব্যি কেটে গিয়েছিল।

মা আর বাবার একসঙ্গে কোথাও যাবার থাকলে, বিশেষ করে যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফিরতে দেরি হবার সম্ভবনা থাকলে, তাঁরা দিদিকে আর আমাকে অনেক সময় সত্যানন্দ-কাকাবাবুদের বাড়িতে রেখে যেতেন। এ যখনকার কথা, আমার ছোট বোন মিন্টুর তখনও জন্মই হয়নি, আর ছোট ভাই মণ্টু তখন এতই ছোট যে, তাকে সঙ্গে না-নিয়ে আমার মায়ের কোথাও যাবার উপায় ছিল না। সঙ্গে যেতে পারছি না বলে আমি যে খুব দুঃখিত হতুম, তাও নয়। বরং এই ভেবে খুশি হতুম যে, সময়টা একেবারে আমার ইচ্ছেমতো কাটাতে পারব। দিদি ও-বাড়ির মেয়েদের দলে ভিড়ে যেত। আমি ক্যারম কিংবা ব্যাগাটেলি খেলতুম। তবে বেশির ভাগ সময়টাই যে গল্পের বই পড়ে কাটাতুম, সেটা মনে পড়ে। তিনুদা যে তাই নিয়ে আমাকে খুব ঠাট্টা করত, তাও ভুলিনি। একবার দেখলেই হল যে, ঘরের এককোণে বসে চুপচাপ আমি কোনও বই পড়ছি, ব্যস্, অমনি তিনুদা হাত নেড়ে বলতে শুরু করত: 'বুদ্ধিমান রামধন সাবধানে থেকো,/ নাকে-মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো।' শুনে যে কী রেগে যেতুম, সে আর বলবার নয়। যোগীন সরকার মশাইয়ের 'রামধন' গল্পটি যাঁরা পড়েছেন, আমার রেগে যাবার কারণ তাঁরা ঠিকই ধরতে পারবেন।

এর বছর কয়েক বাদেই সত্যানন্দ-কাকাবাবুরা বাড়ি পালটান। তবে রাস্তা পালটান না। ছিলেন আমাদের পিছনের বাড়িতে, এবারে আমাদের ঠিক সামনের বাড়ির দোতলাটা খালি হতেই তাঁরা সেখানে উঠে এলেন। একতলায় প্রেস, দোতলায় পাশাপাশি খানকয় ঘর। সেই সঙ্গে একটা ছাদ। সামনে চলে আসায় দু'বাড়ির মধ্যে যাতায়াতও বেড়ে যায়। পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে আমি যে মেসবাড়িতে খেতে শুরু করেছি, ও-বাড়ির কাকিমা সেটা জানতেন না। জানতে পেরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব বকেন। বলেন, "আজ থেকে তুই এখানেই খাবি।"

আমি বলি, "তা কী করে হয়, মেসের টাকা তো আগেই জমা রাখতে হয়েছে। তা তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না।"

"ঠিক আছে," কাকিমা বললেন, "তা হলে এ-মাসটা ওখানে খা। কিন্তু সামনের মাস থেকে এখানেই খেতে হবে। আর সকাল-বিকেলের জলখাবার ? সেটা কোথায় খাচ্ছিস ?"

"কেষ্টো কাফেতে।"

"তার মানে ছাইভস্ম খাচ্ছিস। ওতে শরীর টিকবে না। জলখাবার আজ থেকে এখানেই খাবি।"

সেদিন খেয়েছিলুম। কিন্তু পরদিন থেকে আর ও-বাড়ি যাইনি। কেমন যেন লজ্জা করত। ওই যে মা বলেছিলেন, আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি, তা বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গে বোধহয় লজ্জা আর সংকোচের মাত্রাও বাড়তে থাকে। তিনুদাকেও এড়িয়ে চলতুম। রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করবার সময় ভয়ে ভয়ে থাকতুম, পাছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনুদা তখন আর ইস্কুলের ছাত্র নয়, কলেজে ঢুকেছে। তাকে এড়িয়ে চলবার ওটাও একটা কারণ হতে পারে। আমি ইস্কুলে পড়ি, কে জানে ভাল করে আমার সঙ্গে কথা বলবে কি না, হয়তো বলবে, "কীরে, পড়াশুনোয় কি এখনও ফাঁকি দিচ্ছিস ?" তার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল।

ছাত্র হিসেবে আমি যে মহা ফাঁকিবাজ, পরিচিত মহলে এই কথাটা এতই চালু হয়ে যায় যে, সর্বদা আমার একটু সংকুচিত হয়ে থাকার সেটাও হয়ে দাঁড়ায় একটা মস্ত কারণ। এখন বুঝতে পারি, স্রেফ এই কারণেই ইন্দ্রনারায়ণ-কাকাবাবুর বাড়িতেও আমি বড়-একটা যেতে চাইতুম না। নয়তো ও-বাড়ির লোকজনেরা যে আমাকে কিছু কম স্নেহ করতেন, তা তো নয়। ছেলেবেলায় বাবার যে দুই ডাক্তার-বন্ধুর ওষুধ খেয়ে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি মিলেছিল, তাঁদের একজন ডাঃ যোগেন্দ্র মৈত্র। ইনি কংগ্রেস করতেন, পুর নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরও হয়েছিলেন। অন্যজন ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্রনারায়ণ-কাকাবাবুর সঙ্গে বঙ্গবাসী কলেজের যোগাযোগ ছিল। তা ছাড়া বিকেলের দিকে খানিকক্ষণের জন্য তিনি বউবাজার স্ট্রিটের বর্মন ফার্মেসিতেও বসতেন। দরকার হলে আমরা অবশ্য ও-সব জায়গায় না গিয়ে সরাসরি তাঁর বাড়িতেই চলে যেতুম। বাড়িটা ছিল স্কট লেনে। সে-বাড়ি ছেড়ে পরে ওঁরা বউবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণে উঠে যান। স্থানিক দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় দুই পরিবারের যোগাযোগও ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে থাকে।

যেখানে আমার ছেলেবেলায় প্রায়ই যেতুম, ওঁদের সেই স্কট লেনের লাল বাড়িটার কথা কিন্তু ভুলিনি। ও-বাড়ির কাকিমার কথাও খুব মনে পড়ে। কাকিমা ছিলেন টকটকে ফর্সা রঙের মানুষ, কথা বলতেন কম, কিন্তু মুখখানি সর্বদাই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। খুব স্নেহশীলা ছিলেন। যখনই যাই না কেন, পেট ভরে মিষ্টি না-খাইয়ে ছাড়তেন না। তবু যে ইন্দ্রনারায়ণ-কাকাবাবুর বাড়িতে যেতে ভয় পেতুম, তার কারণ, ওঁর দুই ছেলেমেয়ে—ছানাদা আর তুতিদি—বড্ড বেশি আমার পড়াশুনোর খবর জিজ্ঞেস করতেন। ভাল নাম বললে এঁদের দুজনকেই সবাই চিনতে পারবেন। ছানাদা হচ্ছেন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সরসীলাল মুখোপাধ্যায়, জীবনের শেষ পর্যায়ে বেশ কয়েক বছর তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর তুতিদি হচ্ছেন রসায়ন-বিজ্ঞানের খ্যাতনাম্নী অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। কাগজে তাঁর নানান কৃতিত্বের খবর পড়ি, আর ভাবি, একদিন গিয়ে একটা প্রণাম করে আসব। কিন্তু ভরসা হয় না। ভয় হয় যে, তিরিশের দশকে যে রোগা ভিতু ছেলেটি তাঁদের স্কট লেনের বাড়িতে যেত, এতদিন বাদে তার কথা তাঁর মনেই নেই। কিংবা, মনে যদি বা থাকে, দেখা হওয়ামাত্র আজও হয়তো তাকে তিনি ঠিক তখনকার মতো করেই কষে ধমক লাগাবেন। 'অ্যাই, অঙ্কে নাকি এবারও তুই চল্লিশ পেয়েছিস? খুব ফাঁকি দিচ্ছিস বুঝি?' মাঝখানে পঞ্চান্ন বছরের ব্যবধান, কিন্তু তুতিদির সেই তিরস্কার এখনও ভুলতে পারলুম না।

ছানাদার কাছেও যে বকুনি খেতুম না, তা নয়, তবে কিনা তুতিদি যেহেতু ছানাদারও দিদি, তাই আমার ভয়টাও বোধহয় তাঁরই সম্পর্কে বেশি ছিল। ওঁদের জ্যাঠতুতো ভাই অম্বর ছিল আমার সহপাঠী। ক্লাসের পড়ায় যে আমার একটুও মনোযোগ নেই, আর অ্যালজেব্রা কি জিওমেট্রির পিরিয়ড যে আমি স্রেফ বইয়ের পাতায় জলছবি সেঁটে আর কড়িকাঠ গুনে কাটিয়ে দিই, এই খবর সম্ভবত অম্বরের কাছ থেকেই ওঁরা পেয়ে যেতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অজিতকুমার সরকারের নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। বঙ্গবাসী ইস্কুলে একেবারে ক্লাস টু থেকেই এই অজিতকে আমি আমার সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলুম। অজিতরা থাকত বউবাজার পাড়ার ব্যানার্জি লেনে। মেধাবী ছাত্র। তবে বড্ড বেশি ছটফটে। গোড়ার দিকে সে-ই ছিল ক্লাসের ফার্স্ট বয়। পরে অম্বর তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। যদ্দুর মনে করতে পারি, অম্বরও কিছু কম চঞ্চল ছিল না। অজিত কিছুদিন আগে মারা গেল। মাঝেমধ্যে এখানে-ওখানে তার সঙ্গে দেখা হত। যা বলত, তাতে বুঝতে

পারতুম যে, শরীর নিয়ে সমস্যা চলছে। ইস্কুল-জীবন শেষ হবার পরে অম্বরের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। শুনেছি পাটনায় থাকে। কলকাতা ছেড়ে কবে যে পাটনায় পাড়ি দিল, আর সেটা দিলই বা কেন, কিছু জানি না।

অম্বরের বাবা ননীগোপাল মুখুজ্যে মশাই বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। ছোটভাই ইন্দ্রনারায়ণ মুখুজ্যের মতো তিনি মধ্য-কলকাতার বাসাবাড়িতে থাকতেন না, বালিগঞ্জের ওদিকে তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিল। তবে বালিগঞ্জ তখনও জনাকীর্ণ লোকালয় হিসেবে গড়ে ওঠেনি, তিরিশের দশকের মাঝ-বরাবরও ওখানে জায়গার তুলনায় মানুষজন আর ঘরবাড়ি ছিল অনেক কম। সন্ধের পর রাস্তাঘাট একেবারে নির্জন হয়ে যেত। হাট-বাজার আর দোকানপাটের অসুবিধেও ছিল খুব; পারতপক্ষে তাই সেই সময়ে ওদিকে কেউ বাড়ি করে উঠে যেতে চাইতেন না। চাহিদা ছিল না বলে ওখানকার বিস্তর জমিজায়গাও তাই তখন প্রায় জলের দরে বিক্রি হয়েছে। সূর্যাস্তের পর থেকেই ওখানে তখন ঝিঁঝির কনসার্ট আর শেয়ালের কোরাস শুরু হয়ে যেত। চোর ডাকাতের ভয়ও নেহাত কম ছিল না।

যানবাহনের অসুবিধাও ছিল খুব। বাস চলত ঠিকই, কিন্তু তার সংখ্যা ছিল এতই কম যে, তাতে প্রয়োজন মিটত না। অম্বর তাই শেয়ালদা সাউথ সেকশনের মান্থলি টিকিট করিয়ে নিয়েছিল। বালিগঞ্জ ইস্টিশান তাদের বাড়ির কাছে। সেখান থেকে রেলগাড়িতে চেপে সে শেয়ালদা ইস্টিশানে এসে নামত। আর আমাদের ইস্কুল তো শেয়ালদা ইস্টিশান থেকে মাত্র মিনিট তিনেকের হাঁটাপথ। বড় রাস্তা পার হয়ে বৈঠকখানা বাজারের ভিতর দিয়ে স্কট লেনে এসে পড়লেই হল। মোড় ফিরলেই ইস্কুল বাড়ি। অম্বর যে একাই রেলগাড়িতে চেপে নিত্যি-নিত্যি ইস্কুল করতে আসে, আমাদের সেই দশ-এগারো বছর বয়সে এটাকে আমরা খুব বাহাদুরির ব্যাপার বলে মনে করতুম। ওই বয়সে এতটা স্বাধীনতার কথা আমরা ভাবতেও পারতুম না। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পাদানি থেকে পা হড়কে যাবার ফলে রেল-লাইনের উপরে ছিটকে পড়তে-পড়তেও দরজার হাতলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কীভাবে একজন যাত্রী একদিন বেঁচে গিয়েছিল, কিংবা রেলগাড়ির কামরার মধ্যে হাতের মুঠোয় ব্লেড লুকিয়ে পকেটমাররা কীভাবে ভিড়ের ভিতরে মিশে থাকে, আর কোনও প্যাসেঞ্জার একটু অন্যমনস্ক হবামাত্র তারা কুচ করে কীভাবে কেটে নেয় তার পকেট, এ-সব গল্প যত শুনতুম, ততই আমার চোখ দুটো ক্রমশ গোল হতে থাকত। ভাবতুম, বাস্, রে, এতসব বিপদের ভিতর দিয়ে ও কিনা ইস্কুল করতে আসে! সাহস তো কম নয়।

অম্বর বলত, "চল্ না, আজ তো শনিবার, হাফ-ইস্কুল, আমাদের বাড়িতে যাবি তো আমার সঙ্গে চল। ওখান থেকে আমিই আবার তোকে রেলগাড়িতে উঠিয়ে দেব। যাবি?"

কখনও যাওয়া হয়নি। যাবার ইচ্ছে হত খুব। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ে যেত যে, না-জানিয়ে যদি যাই, তো বাড়িতে ফিরে বিপদে পড়তে হবে। ফলে আর যাওয়া হত না। মা'কে একবার বলেছিলুম, "মা, আমার এক বন্ধু তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে। এই শনিবার যাব?" মা তাতে প্রথমটায় আপত্তি করেননি। কিন্তু যেই শুনলেন যে, বন্ধুর বাড়ি বালিগঞ্জে, অমনি আঁতকে উঠে বললেন, "ওরে সর্বনাশ! বালিগঞ্জ! সে তো মরুভূমির মতো জায়গা!"

মায়ের কথায় আতিশয্য ছিল। কিন্তু সেটুকু যদি বাদ দিই, তবে তখনকার বালিগঞ্জ সম্পর্কে মা যে একেবারে ভুল কথা বলেননি, বছর কয়েক বাদেও ওই এলাকায় গিয়ে তার প্রমাণ পাই। বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠবার পরে ডাক্তারের পরামর্শমতো মাঝে-মাঝে তাঁকে একটু খোলামেলা জায়গা থেকে ঘুরিয়ে আনা হত। তখনও আমাদের সেই ঢাউস অস্টিনগাড়িটা কেনা হয়নি, তাই ঘন্টাপিছু ভাড়ায় একটা ফিটন ঠিক করা হয়, সপ্তাহে দু'দিন সেই ফিটনে করে বাবাকে নিয়ে

আমরা ঘুরতে বেরোতুম। সাধারণত যাওয়া হত উট্রাম ঘাটের গঙ্গার ধারে। বিকেল-বিকেল যেতুম। ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ড স্ট্যান্ডের সামনের কোনও একটা বেঞ্চিতে বসে বাবা খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। তারপর আকাশের আলো আস্তে-আস্তে মিলিয়ে আসত। বাতিস্তম্ভগুলোয় আলো জ্বলে উঠত। তখন আবার বাড়ি ফেরার পালা। যে ব্যান্ড স্ট্যান্ডের কথা বলেছি, স্কটিশ হাইল্যান্ডার রেজিমেন্টের চকরা-বকরা স্কার্ট পরা গোরা সৈন্যরা যে নিত্য বিকেলে সেখানে ব্যান্ড বাজাত, সেটা মনে আছে। এ হল ১৯৩৮ সালের কথা।

ওই সময়েই ফিটন চড়ে একদিন বালিগঞ্জের দিকে হাওয়া খেতে যাওয়া হয়েছিল। জনবসতি তখনও ওদিকে খুবই কম। দোকানপাটও বিশেষ চোখে পড়েনি। বিকেলবেলাতেই দেখলুম মশার ঝাঁক আমাদের মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে। সন্ধে না-লাগতে শেয়ালের ডাকও শুনতে পেয়েছিলুম। মা সেদিন সঙ্গে ছিলেন। ফলে খুব বেশিক্ষণ ও-তল্লাটে থাকা হয়নি। মশার উৎপাত দেখে মা বললেন, "ঢের হয়েছে, এখন গাড়ি ঘোরাতে বল্, নইলে নির্ঘাত ম্যালেরিয়া ধরবে!"

ওদিকে তখন যাঁরা থাকতেন, দোকানপাটের অভাবে তাঁদেব যে কী অসুবিধে ভোগ করতে হত, এরও বছর কয়েক বাদে সে-কথা উপেন গাঙ্গুলি মশাইয়ের কাছে শুনি। কলেজে পড়বার সময় তাঁর দৌহিত্র ললিত মুখুজ্যেকে আমার বন্ধু হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। সেও কবিতা লেখে, আমিও কবিতা লিখি, ফলে বন্ধুত্বটা বেশ জমাট বেঁধে যায়। ললিতরা থাকত দমদম এয়ারপোর্টের কাছে গৌরীপুরে। সেখানে তাদের বাড়িটা যেমন ছিল প্রাসাদতুল্য, বাড়ির সামনের বাগানও তেমন ছিল বিরাট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাবার পরে ইংরেজ সরকার সে-বাড়ি কেড়ে নেওয়ায় ললিতরা সেখান থেকে ল্যান্সডাউন রোডের একটি ভাড়াবাড়িতে উঠে আসতে বাধ্য হয়। উপেন গাঙ্গুলি মশাইও তখন বালিগঞ্জের বাসিন্দা। মাঝে-মাঝে ল্যান্সডাউন বোডে তিনি তাঁব কন্যা-জামাতাকে দেখতে আসতেন। এদিকে আবার আমাদের রবিবারেব আড্ডা জমত ওই বাড়িতেই। ললিতের মা আমাদের খুব স্নেহ করতেন। আমরা মাসিমা বলতুম। বিকেলেব জলখাবার সাজিয়ে মাসিমা যখন আমাদের ডেকে পাঠাতেন, তখন একতলার আড্ডা থেকে দোতলায় উঠে আসতে-আসতে প্রায়ই চোখে পড়ত যে, বারান্দার একদিকে একটি ইজিচেয়ারে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনিই যে সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তা অবশ্য তখন জানতুম না।

ললিতই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। উপেন্দ্রনাথ যে শুধুই সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন, তা নয়, সম্পাদক হিসেবেও ছিলেন রীতিমতো নামজাদা। তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'র খ্যাতির কথা কে না জানে। তবে, এ যখনকার কথা বলছি, 'বিচিত্রা'র প্রকাশ তার বেশ কিছুকাল আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বয়সে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও সম্পর্কে যে তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা, সেটাও জানতুম। ফলে তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম-পরিচয়েব মুহূর্তে আমার কথাবার্তায় যে একটু আড়ষ্টতার ভাব এসে গিয়েছিল, সেটা স্বীকার করব। খানিক বাদেই সেটা অবশ্য কেটে যায়।

তার কারণ, উপেন্দ্রনাথ আদৌ গম্ভীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। হাসিখুশি প্রসন্ন চিত্তের মানুষ। তা ছাড়া খুব জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। তাঁর বালিগঞ্জ-বাসের প্রথম দিককার কাহিনীও সেদিন শুনিয়েছিলেন। "সদর-দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই প্রথমে দোতলার বারন্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখে নিতে হবে যে, লোকটা কে। যদি দ্যাখো যে, লোকটা একেবারেই অচেনা, দেখা করতে এসেছে বটে, কিন্তু থাকবে হয়তো মেরেকেটে মাত্র পাঁচ মিনিট, তা হলে এক রকমের হিসেব, আর লোকটা যদি চেনা হয়, মানে আত্মীয়স্বজন কি ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু, অর্থাৎ কিনা এমন মানুষ, অন্তত আধ ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট যে এখানে থাকবে বলে আশা করা যেতে

পারে, তা হলে আবার আর-এক রকমের হিসেব।...এনট্রান্স আর একজিটের ব্যাপারটা বোঝো তো?"

বলি, "নাটকের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। প্রবেশ ও প্রস্থান। আগমন ও নির্গমন। প্রথম হিসেবে শুধুই আগমন, তাতে নির্গমনের কোনও ব্যাপার নেই। দ্বিতীয় হিসেবটা একটু গোলমেলে। স্টেজ-ম্যানেজারকে তাতে একজনের আগমন ও আর-একজনের নির্গমনের ঘটনা একই সঙ্গে ঘটাতে হয়। কিছু বুঝলে?"

বিভ্রান্ত হয়ে বলেছিলুম, "আজ্ঞে না।"

"তোমরা যেখানে থাকো, সেখান থেকে মিষ্টির দোকান কত দূরে?"

"দূরে কেন হবে, বাড়ির বলতে গেলে সামনেই তো মিষ্টির দোকান।"

"সেইজন্যেই বোঝোনি।" উপেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "বালিগঞ্জ পাড়ায় প্রথম যখন বাস করতে আসি, ধারেকাছে তখন কোনও মিষ্টির দোকান ছিল না। সবচেয়ে কাছের দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসতে হলেও যাতায়াতে তা অন্তত মিনিট চল্লিশ লেগে যেত। এদিকে অতিথি-আপ্যায়নও তো করা চাই। তাই, বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে যখনই দেখতুম যে, পরিচিত কেউ এসেছেন, তখন সদর-দরজা খুলতে যাকে পাঠানো হত, তারই হাতে দিয়ে দিতে হত মিষ্টি কিনে আনবার পয়সা। যাতে বাইরের মানুষটিকে ভিতরে ঢুকিয়েই সে নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে-ছুটতে মিষ্টির দোকানে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ এনট্রান্স আর এগজিট একেবারে একইসঙ্গে ঘটত। একজন ঢুকছে তো একজন বেরিয়ে যাচ্ছে।"

তা তিরিশের দশকের বালিগঞ্জের এই ছিল অবস্থা। মা বলেছিলেন, ও হচ্ছে 'মরুভূমির মতো জায়গা'। খুব একটা ভুল বলেননি।

৩৭

নতুন ছাত্রদের অবস্থা অনেকটা নববধূর মতো। ভিতরে-ভিতরে যে যতই নচ্ছার হোক, পরিবেশটা যতদিন পর্যন্ত না ঠিকমতো অনুধাবন করা যাচ্ছে, অন্তত ততদিন পর্যন্ত তাদের একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকতেই হয়। মিত্র ইস্কুলে আমি তখন নতুন ভর্তি হয়েছি, কোন্ মাস্টারমশাইয়ের মেজাজ কীরকম, কার পিরিয়ডে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে রহস্য-লহরি সিরিজের বই পড়া চলবে এবং কার পিরিয়ডে টু-শব্দটি করা চলবে না, সে-সব কিছুই আমার জানা নেই, ফলে গোড়ায়-গোড়ায় আমাকে খুবই আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হত এবং মুখের মধ্যে এমন একটা ভ্যাবলা ভাব ফুটিয়ে বসে থাকতে হত যেন ভাজা মাছটিকে উলটে খাবার মতো বুদ্ধিও আমার নেই। এদিকে আবার ক্লাস শুরু হবার কিছুদিন বাদেই পুরী চলে গিয়েছিলুম বলে সেখান থেকে ফিরে আসবার পরেও সেই আড়ষ্টতার জের চলতে থাকে। পরের দিকে আস্তে-আস্তে সেটা কেটে যায়। কিছু বন্ধুবান্ধবও পেয়ে যাই।

আমাদের বাড়ির কাছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দক্ষিণ দিক থেকে দক্ষিণমুখো যে গলিটা বেরিয়েছে, তার নাম রজনী গুপ্ত রো। আমার সহপাঠী নীলাদ্রি এই গলিতে থাকত। নীলাদ্রির বাবা জিতেন্দ্রনাথ বসু মশাইকে সবাই চিনতে পারবেন। নামজাদা মানুষ ছিলেন, অনেকে বলত যে, তিনিই হচ্ছেন 'ফাদার অভ কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি ইন ইন্ডিয়া'। নীলাদ্রিও পরবর্তী কালে কিছু কম প্রতিষ্ঠা পায়নি। তার কর্মস্থল ছিল ম্যাকনিল ম্যাগর কোম্পানি। সেখানে ডিরেক্টর পদে উন্নীত হবার কিছুকাল পরে সে অবসর নেয়। তবে বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক নানা সমিতি-সংস্থা থেকে তখনও তাকে নিয়ে যে-রকম টানাটানি চলতে দেখেছি, তাতে বুঝতে পারতুম যে, তার সাংগঠনিক কৌশল ও কর্মদক্ষতার খ্যাতি শুধুই দেশের সীমানায় আবদ্ধ নয়, বিদেশেও সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল। রজনী গুপ্ত রো'তে তারা খুব বেশি দিন থাকেনি। দক্ষিণ কলকাতার সুইনহো স্ট্রিটে বাড়ি করে নীলাদ্রিরা সেখানে উঠে যায়। মাঝখানে দু'জনে দু'দিকে ছিটকে গিয়েছিলুম। পুরনো বন্ধুত্বের ছেঁড়া সুতো যখন আবার জোড়া লাগে, একান্নবর্তী পরিবারের সেই জমজমাট বাড়িতে তখন মাঝেমধ্যে গিয়েছি। যখনই যেতুম, ছেলেবেলার গল্প সহজে ফুরোতে চাইত না। নীলাদ্রি একেবারে হঠাৎ চলে গেল। স্বাস্থ্য কিছুদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছিল না, সেটা জানতুম। কিন্তু তাই বলে যে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবে, তা ভাবতে পারিনি। তড়বড় করে কথা বলত, সারাক্ষণ হাসত। তার কথা যখন ভাবি, ওই হাসিটাই তখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

নীলাদ্রির দাদা ডঃ অমিয়কুমার বসুও বিখ্যাত মানুষ। তিনিও মিত্র ইস্কুলের ছাত্র। আমি যে-বছর ওই ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই সেই বছরই তিনি ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বেরোন। তখন তো টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, ওঁরাও তাই আর ইস্কুলে যেতেন না, বাড়িতে বসে ফাইনাল

পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতেন। ফলে ইস্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে অমিয়দাকে সেখানকার ছাত্র হিসেবে দেখতে পাইনি। পাড়ার মধ্যে অবশ্য দেখতে পেতুম, তবে লেখাপড়ায় যিনি আমার চেয়ে পুরো দু'বছর এগিয়ে আছেন, মুখ তুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সাহস হত না। সুইনহো স্ট্রিটের বাড়িতে আবার নতুন করে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কুমার আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত। সেই সময়ে যে তার সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল, এমন মনে পড়ে না। তবে যেমন লেখাপড়া তেমন দুষ্টুমিতেও যে কুমার খুব দড় ছিল, সেটা মনে আছে। ইস্কুল ছুটি হয়ে যাবার পরে শুরু হত কোচিং ক্লাস। হ্যারিসন রোড থেকে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে ঢুকে অপরিচিত এক ভদ্রলোক যে নিত্য সেই সময়ে আমাদের একতলার ল্যাভেটরিটি ব্যবহার করেন, কুমার এটা পছন্দ করত না। নিঃশব্দে সে একদিন বাইরে থেকে ল্যাভেটরির শিকল তুলে দেয়। ভদ্রলোক সেদিন পুরো দু'ঘণ্টা সেই অন্ধকূপের মধ্যে বন্দি হয়ে ছিলেন।

ইস্কুল-জীবনে কুমারের সঙ্গে ক্বচিৎ-কখনও কথা বলেছি, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় প্রবীণ বয়সে। আমি তখন একটি পত্রিকা সম্পাদনা করি, আর কুমার তখন কোল ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর। দেখা হয়ে যায় 'মিত্র-মহল'-এর সভায়। এককালে যারা মিত্র ইস্কুলের ছাত্র ছিল এবং ম্যাট্রিক পাশ করেছিল ১৯৪০ সালে, 'মিত্র-মহল' নামক এই মিলনকেন্দ্রটি স্থাপিত হবার ফলে পরস্পরের সঙ্গে তাদের যোগরক্ষার একটা ব্যবস্থা হয়। ইস্কুলের কাছেই অলঙ্কার-ব্যবসায়ী শীলেদের বাড়ি। সেই বাড়ির ছেলে আমাদের সহপাঠী বীরেন শীলকে করা হয় 'মিত্র-মহল'-এর সভাপতি। গোড়ায়-গোড়ায় সকলেরই এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখতুম, বছরে অন্তত একবার বেশ ঘটা করে একটা মিলনোৎসব হতই। যারা কর্মব্যস্ত মানুষ, নামজাদা চিকিৎসক কি বিখ্যাত ব্যবহারজীবী কি কোনও মস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, উৎসবে যোগ দেবার ডাক পেয়ে তাদেরও তখন সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে আসতে দেখেছি। মাস্টারমশাইদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন, উৎসবের আঙিনায় তাঁদের আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হত। তা ছাড়া উদয়াস্ত থাকত খাওয়া-দাওয়া আর গল্পগুজবের ব্যবস্থা। বীরেন শীলের তাবৎ উদ্যম সত্ত্বেও ইদানীং এই উৎসবে যে একটু ভাটা পড়েছে, তার কারণ অবশ্য সহজেই বুঝতে পারি। বন্ধুদের অনেকেই গত কয়েক বছরের মধ্যে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছেন। যাঁরা বেঁচেবর্তে আছেন, তাঁদের বয়সও সত্তর হতে চলল, সুতরাং তাঁরাও বোধহয় খুব একটা বহাল তবিয়তে নেই। এই বয়সে সংসারের ভারই দুর্বহ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আর ছেলেবেলার বন্ধুদের বাড়িতে-বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে তাদের এক জায়গায় এনে জড় করবার ঝক্কি এখন কে সামলাতে যাবে!

'মিত্র-মহল'-এর ডাক পেয়ে যেবার প্রথম এই মিলনোৎসবে যাই, সেবারে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে যাদের দেখা মেলে, তাদের সকলেই পক্বকেশ এবং অনেকেই গুম্ফবান। উৎসবের ব্যবস্থা যেখানে হয়েছিল, সেখানে গিয়ে আমি ঢুকবামাত্র তারা হই-হই করে ওঠে ঠিকই, কিন্তু তাতে আমি আরও হকচকিয়ে যাই। ইতিমধ্যে একটি বৃদ্ধ এগিয়ে এসে আমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "এই যে চাঁদু, শেষ পর্যন্ত তা হলে এলে!" বিভ্রান্ত হয়ে বীরেনকে জিজ্ঞেস করি, "বীরেন, ইনি কে?" তাতে বীরেন হোহো করে হেসে উঠে বলে, "যাচ্চলে, ক্লাসে ও তো তোর সঙ্গে এক বেঞ্চিতেই বসত। ও হল লক্ষ্মীকান্ত। ....ও হচ্ছে দুর্গা, আমরা যাকে বাবা-দুর্গা বলে খেপাতুম। ...ও হচ্ছে সত্যেন। নামজাদা ল-ইয়ার। ...ও হচ্ছে লাহাবাড়ির শচীন। ...ও হচ্ছে সনৎ। পোর্ট কমিশনার্সের মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। ও হচ্ছে ..."

বীরেন শীল একটার-পর-একটা নাম বলে যায়। নামগুলির প্রত্যেকটাই আমার চেনা। কিন্তু

নামগুলির যারা অধিকারী, তারাই যে আমার সেই ছেলেবেলার সহপাঠী, সেটা যেন আর বিশ্বাসই হতে চায় না। ক্রমাগত মনে হতে থাকে যে, এরা আমার সেই ইস্কুল-জীবনের বন্ধু নয়, এরা সেই বন্ধুদের বাবা কিংবা জ্যাঠামশাই। বীরেনকে বলি, "হ্যাঁ রে বীরেন, তোকে দেখে তো বুড়ো বলে মনে হয় না, তা হলে এদের এত বুড়ো-বুড়ো ঠেকছে কেন?"

বীরেন বলে, "আমাকে তো মাঝেমধ্যেই দেখিস, তাই বুঝতে পারিস না। এদের অ্যাদ্দিন বাদে দেখছিস, তাই বুড়ো বলে মনে হচ্ছে। নইলে তুই নিজেই কি কম বুড়িয়ে গিয়েছিস নাকি?"

তো এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। বীরেনের কথায় মনে পড়ে যায় যে, তাই তো, আমিও তো এখন আর সেই ১৯৩৮ সালের কচি খোকাটি নই, চুল আমারও ইতিমধ্যে বিলকুল পেকে গিয়েছে। ব্যাস্, তারপরে আর কোনও সমস্যা থাকে না, হাসতে-হাসতে বুড়োর দঙ্গলে ভিড়ে যাই। আমাদের ফার্স্ট বয় অমূল্যর কাঁধে হাত রেখে বলি, "কী রে কেমন আছিস?" পটলডাঙার কমলাক্ষের পিঠে থাপ্পড় মেরে বলি, "কী রে, এখনও কি সেই বাড়িতেই থাকিস নাকি?"

'মিত্র মহল'-এর উদ্যোগে যেবার আমাদের অঙ্ক-স্যার রাজেনবাবুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়, বুদ্ধির দোষে সেবারে আমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলুম। বন্ধুরা বলেছিলেন, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের যে পর্ব, তার সূচনায় আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। তা সেই বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলুম যে, আমি ওঁর খুবই ওঁচা ছাত্র, ওঁর মতো গুণী শিক্ষকের সাহায্য পেয়েও আমি অঙ্কটা একেবারে কিছুই শিখতে পারিনি।

ব্যাস্, ওটাই আমার কাল হয়ে দাঁড়াল। বক্তৃতা শেষ করে, রাজেনবাবুকে প্রণাম করে বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ খপ্ করে রাজেনবাবু আমার হাত চেপে ধরে গম্ভীর গলায় বললেন, "কোথায় থাকো?"

ঠিক এই রকমের গম্ভীর গলাতেই রাজেনবাবু বলতেন, "স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ।" কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, "কেন স্যার? আমার বাড়িতে একদিন যাবেন?"

"একদিন কেন, রোজ যাব। রোজ গিয়ে তোমাকে আবার অঙ্ক শেখাব। মোট কথা, আমার কোনও ছাত্রকেই আমি এমন কথা বলতে দেব না যে, সে অঙ্ক শেখেনি। দাও, ঠিকানাটা আমাকে দাও।"

আমার গলা শুকিয়ে যায়, চোখে অন্ধকার দেখি। অস্ফুট গলায় আমতা-আমতা করে বলি, "কিন্তু স্যার, সে যে অনেক দূরের পথ। আপনি থাকেন বেহালায় আর আমি থাকি দমদমে।"

"ঠিক আছে," রাজেনবাবু বলেন, "ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। দমদমে যখন থাকো, তখন দমদমেই যাব। রোজ যাব। কিন্তু তোমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে ছাড়ব যে, অঙ্কটা তুমি শিখতে পেরেছ।"

হাপুস নয়নে সেদিন যে আমি কেঁদে ফেলিনি, কিংবা 'বাবা গো' বলে চেঁচিয়ে উঠিনি, তার একমাত্র কারণ, ও-সব করলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সেই সভা নিমেষে পণ্ড হয়ে যেত। তবে আমার কান যে ঝাঁঝাঁ করছিল এবং বুকের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলুম মুহুর্মুহু হাতুড়ি পিটবার শব্দ, তা একেবারে তামা-তুলসী ছুঁয়ে কবুল করতে পারি। রাজেনবাবুর হাত ছাড়িয়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সেদিন আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। আসর থেকে চলে আসবার আগে অবশ্য প্রতিটি সহপাঠীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম যে, আমার বাড়ির ঠিকানা কী, রাজেনবাবুকে কেউ তা জানাবে না।

নীলাদ্রি হেসে বলেছিল, "কায়দা করে কথা বলতে গিয়েছিলি, এখন ঠ্যালা বোঝ্!"

আমি বলেছিলুম, "ঘাট হয়েছে ভাই। তাই বলে যেন ঠিকানাটা জানিয়ে দিস না। এই বয়সে

উনি যদি রোজ বেহালা থেকে দমদমে যেতে শুরু করেন, তা হলে উনি তো বাঁচবেনই না, আমিও একেবারে বেঘোরে মারা পড়ব।"

অমূল্য বলেছিল, "অ্যালজেব্রার ফর্মুলাগুলো মনে আছে?"

"শিখলে তবে তো মনে থাকবে," আমি বলেছিলুম "ও-সব আর শিখলুম কোথায়। স্রেফ তো ফাঁকি দিয়ে কাটিয়েছি।"

কমলাক্ষ বলেছিল, "এবারে উনি গিয়ে সব শেখাবেন।"

আমি বলেছিলুম, "শেখাবেন আর ধমকাবেন। ওরে বাবা, ভাবতেই তো আমার হাত-পা একেবারে পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এটাও ভেবে দ্যাখ্ যে, ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়েছে। বাবাকে ধমক খেতে দেখলে তারা কী ভাববে, বল্ তো!"

বন্ধুরা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বলে সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যাই। নইলে নিশ্চয় স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে হত। রাজেনবাবু যে-রকম জেদি মানুষ, নিত্য না হলেও প্রায়ই যে তিনি বেহালা থেকে দমদমে এসে আমাকে পাকড়াও করতেন, আর ঘাড় ধরে বসিয়ে দিতেন অ্যালজেব্রার অঙ্ক কষতে, তাতে সন্দেহ করি না। সেই সময়ে কয়েকটা দিন খুব ভয়ে-ভয়ে কেটেছিল। খিদে চলে গিয়েছিল, রাত্তিরে ভাল করে ঘুম হত না, সদর-দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই চমকে-চমকে উঠতুম। ছেলেপুলের মা'কে বলে রেখেছিলুম, "খুব লম্বা, খুব রোগা আর খুব বুড়োমতন কোনও ভদ্রলোক যদি বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করেন, তা হলে প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কোত্থেকে আসছেন। যদি বলেন যে, বেহালা থেকে আসছেন, তা হলে খুব যত্ন করে তাঁকে চা-জলখাবার খাওয়াবে, আর ..."

ছেলেপুলের মা অবাক হয়ে বলেন, "আর কী?"

"আর হ্যাঁ, বাড়িতে তখন যদি আমি থাকিও, তবু তাঁকে বলে দেবে যে, আমি বাড়িতে নেই।"

"কেন, ও-কথা বলতে যাব কেন?" সন্দিগ্ধ গলায় গৃহিণী বলেন, "ওঁর কাছে টাকাপয়সা ধার করোনি তো?"

শুকনো মুখে বলি, "এটা ধারকর্জের ব্যাপার নয়।"

"তা হলে কিসের ব্যাপার?"

এবারে আর ধৈর্য রাখতে পারি না। বলি, "অন্তত তোমার না-জানলেও চলবে! শুধু এইটে জেনে রেখো যে, উনি যদি টের পান যে আমি বাড়িতে আছি, তা হলে আমি ঘোর বিপদে পড়ে যাব।" বিপদ মানে যে অ্যালজেব্রার ফর্মুলা মুখস্থ করা, সেটা অবশ্য ফাঁস করি না।

এসব কথা ঢাক পিটিয়ে বলবার মতো নয়। যে বোকামি করেছিলুম, সেটা চেপে গেলেই ভাল ছিল। তবু যে সব খুলে বললুম, তার কারণ, রাজেনবাবু যে কীরকম শিক্ষক ছিলেন, এই একটা ঘটনা থেকেই তার আন্দাজ মিলবে। শুধু রাজেনবাবু কেন, সেকালের শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন এই রকমের জেদি মানুষ। তাঁর কাছে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করেছে, অথচ যা তাঁর শেখাবার ছিল, তা সে শিখতে পারেনি, এমন ঘটনাকে তাঁরা শিক্ষক হিসাবে তাঁদের ব্যর্থতা বলে গণ্য করতেন। তাঁরা বকাঝকা করতেন, মারধরও করতেন বই কী, কিন্তু যে-ছাত্রটি নিতান্তই অমনোযোগী, তার ক্ষেত্রে অসাফল্যের দায় পুরোপুরি তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। রাজেনবাবুর কথায় সেটা স্পষ্ট বুঝেছিলুম। আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পরে তিনি বলেছিলেন, "যিনি আদর্শ শিক্ষক, তাঁর ছাত্র কখনও অমনোযোগী হয় না। ছাত্ররা যদি অমনোযোগী হয়, তা হলে বুঝতে হবে যেভাবে শিক্ষাদান করলে তাদের মনোযোগ পুরোপুরি আকর্ষণ করা যেত, সেভাবে তিনি

তাঁর শিক্ষাদানের কাজটা করতে পারেননি।"

এমন শিক্ষক যে একালে নেই, তা বলব না, তবে এঁদের সংখ্যা যে এখন আগের তুলনায় অনেক কম, তাও স্বীকার করতে হবে। "আমার কাজ শেখানো, আমি শেখাচ্ছি। তোমার কাজ শেখা, তা তুমি যদি না শেখো তো তুমিই পস্তাবে। তা নিয়ে আমার কিছু করবার নেই"—এই যে মনোভাব, এক হিসাবে এর মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নেই। কিন্তু শিক্ষকসমাজের মধ্যে এই রকমের নির্লিপ্ত মনোভাব যত বাড়বে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধাও যে ততই লোপ পাবে, তা-ই বা কী করে অস্বীকার করি? লোপ যে ইতিমধ্যেই অনেকখানি পেয়েছে, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাই। সেকালের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা তাঁরা পুরোমাত্রায় পেতেন। একালেব শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভাল, কিন্তু সেই রকমের শ্রদ্ধা আর তাঁরা পান না।

দোষ অবশ্য শুধু শিক্ষকসমাজেরই নয়, লেখাপড়ার কাজটার সঙ্গে নানাভাবে তো আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছেন, বণিকবৃত্তি তাঁদের একটা মস্ত অংশের মধ্যেই আজ অতি প্রবল। আমাদের সারস্বত সমাজের শরীরে এই বৃত্তি যেভাবে পচন ধরিয়ে দিচ্ছে, তাতে ভয় না পেয়ে পারি না। কিন্তু একথা বলছি বলে যেন কেউ আবার না ভেবে বসেন যে, যে ব্যবস্থায় 'বুনো রামনাথ' অর্থাৎ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের মতন নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে তেঁতুলপাতা-সিদ্ধ খেয়ে তাঁর চতুষ্পাঠী চালাতে হত, তাকেই আমি একটা আদর্শ ব্যবস্থা বলে মনে করি। না, তা আমি মনে করি না। পণ্ডিতের যেখানে হাঁড়ি চড়ে না, আর সাহিত্যস্রষ্টাকে যেখানে খিদের জ্বালায় ছটফট করতে হয়, আমার কাছে সেটা কোনও সমাজই নয়, জঙ্গল মাত্র। শুধু শিক্ষক আর সাহিত্যিক বলেই বা কথা কী, প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটা চাই এবং সে যাতে সভ্যভাবে জীবনযাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা হওয়াই চাই, এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। এটাও যেখানে হয় না, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র বলে গণ্য হবার কোনও যোগ্যতাই তার নেই। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। যাদের আমরা কিছুই দিইনি, তাদের কাছ থেকে কিছু পাবাব অধিকারও আমাদের থাকতে পাবে না।

কিন্তু এইটুকু বললেই যে সবটা বলা হয়ে যায়, তাও নয়। প্রশ্ন জাগে, সেকালের সারস্বত সমাজ তো, একমাত্র শ্রদ্ধাটুকু ছাড়া, বলতে গেলে প্রায় কিছুই পেতেন না। তা হলে তাঁরা এত দিতেন কেন? আসলে কি এই রকমেব একটা সদর্থক অভিমান ছিল তাঁদের যে, যদিও তাঁরা আমাদের সঙ্গে এই একই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে জীবনযাপন করছেন, তবু তাঁবা ঠিক আমাদের মতন নন, তাঁরা একটা আলাদা গোত্রের মানুষ? এবং সেই কারণে তাঁদেব কাছে সমাজের এই বাড়তি প্রত্যাশাটুকু থাকবেই যে, দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে অন্যেবা যতই নিক্তি ধরে হিসাব-নিকাশ করুক, অন্তত তাঁরা তা কিছুতেই করবেন না? এমন একটা ধারণাও কি তাঁদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করত যে, সমাজকে যা তাঁরা দিতে পারেন, কড়ি কিংবা কাঞ্চনে তার মূল্য কিছুতেই নিরূপিত হওয়া সম্ভব নয়? এবং সেইজন্যই কি—প্রতিদানে কী পাওয়া যাচ্ছে না-যাচ্ছে, সে-কথা চিন্তা না করেই—তাঁরা উজাড় করে বিলিয়ে দিতেন তাঁদের তাবৎ বিদ্যার ঐশ্বর্য?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে, গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, যেখানে সবকিছুরই দাম কষা হয় কড়ি-কাঞ্চনের হিসাবে, সেই কলকাতা শহরেও মাস্টারমশাইদের সেকালে একটা আলাদা রকমের সম্মান পেতে দেখেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই যে সেই সম্মানের উপযুক্ত ছিলেন, এমন কথা বলব না। ব্যতিক্রম সেকালেও ছিল। বস্তুত, এমন দু'চারজন শিক্ষক সেকালেও দেখেছি, বিদ্যালয়ের বদলে শেয়ার-মার্কেটে ঢুকলেই যাঁদের প্রতিভা সম্ভবত সম্যক স্ফূর্তি পেত। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। যেটা সাধারণ নিয়ম, গুটিকয় ব্যতিক্রম দিয়ে তার বিচার চলে না। এখন সেক্ষেত্রে

অবস্থা একেবারে অন্যরকম। এককালে যা ব্যতিক্রম বলে গণ্য হত, গত কয়েক দশকে তার সংখ্যা এমন হুহু করে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আশঙ্কা হয়, সেটাই হয়তো সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে। তা যদি দাঁড়ায়, তবে শিক্ষকের বৃত্তি সম্পর্কে সমাজের যে শ্রদ্ধাবোধ এককালে ছিল, সেটাই বা হুহু করে কমে যাবে না কেন? ইতিমধ্যেই সেটা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। আর কিছুদিন বাদে বোধহয় ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না।

স্নেহভাজন এক বন্ধুর কথা বলি। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট, কলকাতার এক বিখ্যাত বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষকতা করেন। যে বিষয়ের শিক্ষক, এঁর কাছে তার পাঠ নেওয়া যে অতি বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দোষ মাত্র একটাই। ক্লাসে যে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে, এ যুগেও এটা ইনি সহ্য করতে পারেন না। সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দু'চার কথার পরে বললেন, "বড় বিপদে পড়েছি নীরেনদা।"

বললুম, "কী হয়েছে?"

"একটি ছাত্রকে দিন কয়েক আগে গোটাকয় চড়-চাপড় মেরেছিলুম, কাল বিকেলে তার বাবার কাছ থেকে উকিলের চিঠি পেয়েছি।"

ইস্কুলে আমি যে একদিন অকারণে মার খেয়েছিলুম, সেই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করি, "একটা কথা বলো তো, মারবার কি সত্যি কোনও কারণ ঘটেছিল?"

"কী বলছেন নীরেনদা," বন্ধুটি অবাক হয়ে বলেন, "অকারণে মারব কেন? আমি যখন ব্যাকরণ পড়াচ্ছি, তখন পিছনের বেঞ্চি থেকে ভীষণ গোলমাল করছিল। দু-দু'বার সাবধানও করে দিয়েছিলুম, কিন্তু শোনেনি। তারপরেও না-মেরে পারা যায়?"

না, তা পারা যায় না। বলি, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওরা যখন উকিলের চিঠি দিয়েছে, তখন তোমাকেও উকিলের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু ছাত্রটি, মানে সেদিন যাকে মারধর করেছিলে, মার খেয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো?"

বন্ধুটি বলেন, "না না, তেমন-কিছু মারিনি। তারপর মাত্র একদিনই ইস্কুল কামাই করেছিল। এখন আবার রোজই আসছে।"

"তা হলে চিন্তার কিছু নেই," আমি বলি, "ওরা যদি মামলা করেও, সে-মামলা ধোপে টিকবে না।"

বন্ধুটি বিদায় নেন, কিন্তু আমি বড় ভাবনায় পড়ে যাই। ইস্কুলে মার খেয়েছে বলে ছাত্রের বাবা মাস্টারমশাইয়ের নামে উকিলের চিঠি পাঠিয়ে মামলার ভয় দেখাবেন, এ তো আমরা কল্পনাও করতে পারতুম না। মাস্টারমশাইরা যা-ই করুন, সেটা যে ছাত্রের মঙ্গলের জন্যই করেন, অভিভাবকদের চিত্ত থেকে এই বিশ্বাসটাও ইতিমধ্যে মুছে গিয়েছে নাকি?

৩৮

বঙ্গবাসী ইস্কুলে যামিনীবাবু আমাদের অঙ্ক শেখাতেন। মানুষটি ছিলেন সৌম্যদর্শন, বিষয়টার উপরে দখলও ছিল পাকাপোক্ত, ছাত্ররা প্রশ্ন করলে তাই বিরক্ত হতেন না। কথাটা এইজন্যে বলছি যে, প্রশ্ন-টশ্ন করলে দেখেছি সেইসব মাস্টারমশাই-ই কথায়-কথায় চটে যান, বিষয়ের উপর দখল না-থাকায় গুছিয়ে একটা উত্তর দেবার মতন ক্ষমতাও যাঁদের নেই। অর্থাৎ তাঁরা সেই 'বানানের দিনে বানান আর মানের দিনে মানে'র দলের মাস্টারমশাই। যেটুকু জানেন, ক্লাসে এসে গড়গড় করে সেইটুকু বলে যান, কিন্তু তার বাইরে কেউ কোনও প্রশ্ন করলেই তাঁদের বিপদ ঘটে, তখন যে তাঁরা বকাঝকা করতে শুরু করে দেন, সেটা আসলে আপন অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখবার একটা ফিকির মাত্র। ছাত্ররা যে সেটা বোঝে না, তাও নয়। সত্যি বলতে কী, সেইসব মাস্টারমশাইয়ের পিরিয়ডেই গোলমালও হয় সবচেয়ে বেশি। পিছনের বেঞ্চি থেকে কিছু-কিছু ছাত্র বেড়ালের ডাক ডাকে, কিংবা মেঝেতে জুতো ঘষে।

যামিনীবাবুর পিরিয়ডে সে-সব হবার জো ছিল না। নেহাতই অঙ্কে মতি না থাকায় দু'চারটি ছেলে একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে কাটাকুটি খেলত কিংবা ইতিহাসের বই খুলে শিবাজির দাড়িতে রং-পেনসিল বুলোত বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দুষ্টুমি কখনও কাউকে করতে দেখিনি। যামিনীবাবু এমনিতে ছিলেন খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তাঁর পড়াবার সময় যে কেউ ফাঁকি দিচ্ছে, এটা বুঝতে পারলে একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠতেন। এই প্রসঙ্গে আমার এক সহপাঠীর কথা মনে পড়ছে। শান্ত মানুষ রেগে গেলে যে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে, এই সহপাঠী ছেলেটির দুষ্টুমির কারণেই সে-বিষয়ে আমার জব্বর রকমের অভিজ্ঞতা হয়। অ্যালেজেব্রার ক্লাসে যামিনীবাবু যখন বোর্ডে একটা অঙ্ক কষে দেখাচ্ছেন, পিছনের বেঞ্চিতে বসে সে তখন তার বাংলা পাঠ্যবইয়ে জলছবি সাঁটছিল। স্রেফ চালাকি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। যা করছিল, সেটা নিঃশব্দে করলে কোনও বিপদ ঘটত না। কিন্তু তার বদলে, জলছবি সাঁটতে-সাঁটতেই সে খুব মনোযোগী ছাত্রের মতন বলে বসে, "স্যার, আপনার অঙ্কের এই শেষের স্টেপটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

আসলে, শেষের স্টেপটা ছিল খুবই সোজা। এত সোজা যে, সেটা না-বুঝবার কোনও কথাই নয়। ফলে, যামিনীবাবুর সন্দেহ হয় যে, ছেলেটি তাঁকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "ঠিক আছে, শেষের স্টেপটা না হয় বোঝোনি, কিন্তু তার আগেও তো দশ-বারোটা স্টেপ রয়েছে, তার মধ্যে যেটা তুমি বুঝেছ, সেইটে আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

ছেলেটি স্রেফ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বার হয় না।

আমরাও একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। বুঝতে পারছি, যে কোনও মুহূর্তে ঝড় উঠবে। আর একবার যদি ঝড় ওঠে, তো সব যে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, তাতেও সন্দেহ নেই।

যামিনীবাবু গম্ভীর গলায় বলেন, "কী হল? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যে কোনও একটা স্টেপ আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

সহপাঠী চুপ।

যামিনীবাবুর প্রশ্ন এবারে অন্যদিকে ঘুরে যায়। "আমি যখন অঙ্কটা দেখিয়ে দিচ্ছিলুম, তখন তুমি কী করছিলে?"

ছেলেটি এবারে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে-কাঁদতে বলে, "জলছবি সাঁটছিলুম স্যার।"

শান্ত মানুষ খেপে গেলে যে কী কাণ্ড হয়, সেদিন সেটা চাক্ষুষ করি। সহপাঠীর নামটা আর বলছি না, এই লেখা যদি তার চোখে পড়ে, তা হলে এই বুড়ো বয়সেও সে ছেলেপুলেদের কাছে লজ্জায় পড়ে যাবে। শুধু এইটুকু বলি যে, অঙ্কের ক্লাসে অমনোযোগী হয়েও তার খুব-একটা ক্ষতি হয়নি। সরকারি চাকরি নিয়ে সে কর্মজীবনে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বলে শুনতে পাই।

মিত্র ইস্কুল কড়া ইস্কুল। তবে ফাঁকিবাজ ছেলে সেখানেও কিছু কম দেখিনি। আমিও ঘোর ফাঁকিবাজ ছাত্র। প্রকৃতিগত এই মিলের কারণে দু'চার দিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছিল। তখন যেটা লক্ষ করেছিলুম, সেটা এই যে, পাঠ্য বিষয়ে যতই অমনোযোগী হোক, জাগতিক আর-পাঁচটা বিষয়ে এদের জ্ঞানের পরিধি মোটেই ছোট নয়। দু'চার জন তো সেকালের নামকরা সব অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও বিস্তর খবর রাখত। তাদের কাছে সে-সব গল্প শুনতুম, আর এই কথা ভেবে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করতুম যে, যাক, সত্যিকারের কিছু গুণী বন্ধু লাভ করেছি।

মনোযোগী ছাত্রদের মধ্যেও বেশ কয়েকজনকে এই নতুন ইস্কুলে আমার বন্ধু হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। তাদের মধ্যে হাফিজুর রহমান, নির্মল বসু আর সুজিত পালের কথা খুব মনে পড়ে। হাফিজুরের টিফিন বাক্সের মধ্যে বিলিতি চকোলেটের মস্ত-মস্ত স্ল্যাব থাকত। আমরাও যে তার ভাগ পেতুম, তা ভুলিনি। মেধাবী ছাত্র ছিল, দেশ ভাগ হবার পরে সে বোধহয় পাকিস্তানে চলে যায়। অঙ্কে নির্মলের খুব মাথা খেলত। আমি যে রুল অভ থ্রি'র অঙ্ক টকাটক করি, এইটে দেখে নির্মল একদিন বলেছিল, "তা হলে তুই অ্যালজেব্রার পিরিয়ডে অমন সিঁটিয়ে থাকিস কেন?" ক্লাসে আমি প্রথম-প্রথম নির্মলের পাশে বসতুম, কিন্তু একই প্রশ্ন পাছে আবার উঠে পড়ে, এই ভয়ে তার পরদিনই আমি অন্য বেঞ্চিতে সরে যাই।

নতুন-পাওয়া বন্ধুদের মধ্যে সুজিতকে খুব সমীহ করে চলতুম। সেটা তার কবিপ্রতিভার কারণে। মিত্র ইস্কুল থেকে সেই সময় ছাত্রদের লেখা নিয়ে একটা ম্যাগাজিন বার হত। ভর্তি হয়ে তার যে সংখ্যাটা আমি পাই, তাতে একটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। লেখকের নাম সুজিত পাল। কবিতার প্রথম দুটি লাইন পড়েই আমি চমৎকৃত। "উচ্ছল জল কল্লোলময়ী চঞ্চল গিরিনন্দিনী/অলকনন্দা রম্যা রূপসী মর্মর-কারাবন্দিনী।" একে তো আগাগোড়া নির্ভুল ছন্দে লেখা, তার উপরে আবার আদ্যন্ত এই রকমের শব্দের ঝংকার। এই কবিতা কে লিখেছে? না ক্লাস এইটের একটি ছাত্র। ভাবা যায়? কবিতা তো আমিও লিখি, কিন্তু কই, তার মধ্যে তো এর অর্ধেক ঝংকারও আমি জাগিয়ে তুলতে পারি না। লেখালিখির কাজটা গোপনে করতুম বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে এই নিয়ে একটা অহংকার তো ছিলই, সেটা এবারে ভেঙে চুরমার হয়। অন্যদিকে আবার এই কথাটা ভেবে খুব গৌরববোধ হয় যে, এমন চমৎকার কবিতা যার হাত থেকে বেরিয়েছে, সে আমার সহপাঠী।

কিন্তু সুজিতকে সে কথা জানাতে সে যা বলে, তাতে আমি হতবাক। তারই নামে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু ওটা নাকি তার লেখা নয়। "আরে দূর, তুইও যেমন, আমি কি পদ্য লিখতে পারি নাকি? ও সব আমার আসে না।"

"ওটা তা হলে কার লেখা?"

"কোনও বিখ্যাত লোকের নিশ্চয়ই," সুজিত হেসে বলে, "আমার নামে কেউ দুষ্টুমি করে ছাপিয়ে দিয়েছে।"

তো এই হল সুজিত। শক্তিধর কবি হিসেবে তাকে সমীহ করতে শুরু করেছিলুম, এবারে নির্ভেজাল সত্যবাদী হিসেবে সে আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়। তবে যে কবিতাটিকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত, সেই 'উচ্ছল জল কল্লোলময়ী...'র প্রকৃত লেখক যে কে, সেটা আজও জানতে পারিনি।

সুজিতদের পৈতৃক ব্যবসা। ছাত্রজীবন শেষ করে তাকে সেই ব্যবসার ভার নিতে হয়েছে। কাজকর্মে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকতে হয়, তবু তারই মধ্যে মাঝেমধ্যে ফোন করে আমাব খবর নেয়। পুরনো বন্ধুকে সে ভুলতে পারেনি।

যেমন বঙ্গবাসী, তেমন মিত্র ইস্কুলেও দুঁদে ছাত্র বেশ কয়েকটি ছিল। এরা যে লেখাপড়ায় খারাপ ছিল, তা নয়, তবে যেটা উচিত-কথা, সেটা বলতে এরা ভয় পেত না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। হ্যারিসন রোড আর সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ের যে-বাড়িতে তখন মিত্র ইস্কুলের ক্লাস বসত, সেটা ছিল ভাড়া করা বাড়ি। বিখ্যাত যে বাঙালি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তার মালিক, তাঁদের পরিবারের ছেলে শচীন ছিল আমাদের সহপাঠী। ক্লাস-টিচার একদিন তাকে বলেন, "শচীন, তোমার তিন মাসের মাইনে বাকি পড়েছে, বাবার কাছ থেকে টাকাটা এনে কালই তোমার মাইনে মিটিয়ে দিয়ো।" ক্লাসের মধ্যে কথাটা বলায় শচীন নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবে। ফলে সেও ক্লাসের মধ্যেই মাস্টারমশাইকে বলে, "মাইনে বাকি পড়ার কথাটা বাবাকে জানিয়েছিলুম স্যার। তাতে বাবা বললেন, ইস্কুলেবও ছ'মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে, আপনারা সেটা মিটিয়ে দিলেই বাবা আমার মাইনে মিটিয়ে দেবেন।"

এর পরে আর মাস্টারমশাইয়ের বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি। শচীনকে দোষ দিতে পারছি না। একঘর সহপাঠীর সামনে মাইনে বাকি পড়ার কথাটা ওইভাবে বলায় সে অপমান বোধ করেছিল; সেও তাই প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, দোষটা একতরফা নয়।

মোটামুটি এই সময়েই ছোটদের জন্য নতুন একটি মাসিক পত্রিকা বার হয়। নাম 'পাঠশালা'। আগেই বলেছি, বাল্যবয়সে আমরা 'সন্দেশ' পাইনি, আমাদের অক্ষর-পরিচয় ঘটবার আগেই ওই বিখ্যাত কাগজের প্রথম পর্যায়ের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটাকে ভরাট করে তুলবার আয়োজনে অবশ্য কোনও ত্রুটি ছিল না। ছিল সুধীরচন্দ্র সরকার মশাইয়ের সম্পাদিত 'মৌচাক', ছিল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মশাইয়ের সম্পাদিত 'রামধনু', ছিল প্রভাতকিরণ বসু মশাইয়ের সম্পাদিত 'খোকাখুকু', ছিল ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য মশাইয়ের সম্পাদিত 'মাসপয়লা'। তা ছাড়া 'শিশুসাথী', 'ভাইবোন' ইত্যাদি আরও কিছু শিশু- ও কিশোর-পাঠ্য পত্রিকা তখন নিয়মিত প্রকাশিত হত। আমি ছিলুম 'মৌচাক', 'রামধনু', আর 'মাসপয়লা'র ভক্ত। কাগজগুলির জন্যে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতুম, আর এক-একখানা কাগজ হাতে এসে পৌঁছবা মাত্র সেই যে তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়তুম, একেবারে শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত যতক্ষণ না পড়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎ-সংসার সম্পর্কে কোনও হুঁশ থাকত না। 'রামধনু'র সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মশাই নিজেও ছিলেন শক্তিমান লেখক। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা-চরিত্র হুকাকাশির কাণ্ডকারখানা

ছিল তাক লাগিয়ে দেবার মতো। একালের ছেলেমেয়েরা যে 'রামধনু' কাগজখানা আদৌ দেখেনি, আর 'মৌচাক' ও 'রামধনু'কেও একেবারে পড়তি দশায় দেখেছে, এই কথাটা ভাবলে বড় দুঃখ হয়। বাংলা শিশুসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে এ-তিনটি কাগজ একসময়ে কী ভূমিকা নিয়েছিল, তার যথার্থ হিসেব এখনও হয়নি। তবে একদিন নিশ্চয় হবে।

কিছুদিন পরে বেরয় 'পাঠশালা'। সেও ছিল বড় সুন্দর কাগজ। শিক্ষা ও আনন্দ, এই দুটি দিকের কোনওটিকেই 'পাঠশালা' উপেক্ষা করেনি, বরং বলা যায় যে, শিক্ষাকে সে আনন্দের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিল। কাগজটির সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্র দেব মশাই। তবে আমরা মিত্র ইস্কুলের ছাত্ররা জানতুম যে, আমাদের 'বাংলার স্যার' কৃষ্ণদয়াল বসু মশাইও এর সম্পাদনা-কর্মের সঙ্গে খানিকটা যুক্ত আছেন। অন্তত এই কাগজের ক্রস ওয়ার্ডের ছকটা যে তিনিই করে দেন, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। সেটা অবশ্য স্পষ্ট করে তিনি কখনও স্বীকার করেননি, এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করলে তিনি মৃদু হেসে পাশ কাটিয়ে যেতেন। যদ্দুর মনে পড়ে, ন'অক্ষরের একটা শব্দের সূত্র ছিল 'প্রতিভার বিশেষণ'। শব্দটা যে 'নবনবোন্মেষশালিনী', এটা বলতে পারায় কৃষ্ণদয়ালবাবু যে দারুণ খুশি হয়েছিলেন, তাও ভুলিনি।

এ তো গেল ছোটদের কাগজের কথা। বড়দের মাসিক পত্রিকাও কম ছিল না। আমাদের বাড়িতে 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' আর 'বসুমতী' তো আসতই, উপরন্তু আসত 'বঙ্গশ্রী' আর 'বিচিত্রা'। মা, কাকা ও দাদারা প্রখর নজর রাখতেন যাতে বয়স্কজনের পাঠ্য এ-সব পত্রিকা পড়ে আমরা ছোটরা গোল্লায় না যাই। কিন্তু লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়তুম ঠিকই। কিছুটা বুঝতুম, কিছুটা বুঝতুম না। বাদবাকি কিছুটা যে আধাআধি বুঝতুম, সেটাই ছিল বিপজ্জনক ব্যাপার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের যে ধারাবাহিক কাহিনী বেরোত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, মাঝে-মাঝেই তাতে 'কাট', 'ডিজলভ', 'ফেড ইন', 'ফেড আউট' ইত্যাদি সব লেখা দেখে ধাঁধা লেগে যেত। ওগুলোর দ্বারা যে কী বোঝানো হচ্ছে, বড়দের সেটা জিজ্ঞেস করবারও জো ছিল না। জিজ্ঞেস করলেই তো ধরা পড়ে যাব যে, বারণ করা সত্ত্বেও আমি নিষিদ্ধ ফলে দাঁত বসিয়েছি।

কলকাতার বাড়িতে এত যে বড়দের কাগজ আসত, বাবা আর মা পুরী চলে যাওয়ার পরে এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। আসবার মধ্যে আসত শুধুই দৈনিক পত্রিকা দুটি, বাংলা আনন্দবাজার পত্রিকা আর ইংরেজি অমৃতবাজার পত্রিকা। তবে বাংলা বই তো বাড়িতে কিছু কম ছিল না। মণিদা, ছোড়দা, বড়কাকা আর ছোটকাকার বাড়িতে ফিরতে রাত হত। সেই ফাঁকে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের গ্রন্থাবলিগুলো একে-একে শেষ করতে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আর বিজ্ঞাপনে যাঁকে 'বাংলার মপাসাঁ' বলা হত, সেই প্রভাত মুখুজ্যে মশাইয়ের বেশ-কয়েকখানা উপন্যাস আর বিস্তর গল্প যে সেই বয়সেই পড়ে ফেলতে পেরেছিলুম, তার কারণ আর কিছুই নয়, বাড়িতে তখন বেশিরভাগ সময়ই একা থাকতুম, ফলে ইচ্ছেমতো বই পড়বার ব্যাপারে কোনও বিঘ্ন ঘটত না। 'দেবগণের মর্তে আগমন'ও সেই সময়েই পড়ি। দেবতারা মর্তভূমিতে এসে মনুষ্যদেহ ধারণ করে তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর নানান পরিবেশে নানানভাবে নাকাল হচ্ছেন, এই যে কাহিনী, এটা আসলে উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্যটা হল তীর্থের বর্ণনা। বিশাল বই, তবে এত সব মজার ঘটনায় ভরা যে, আদ্যন্ত পড়তে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিনি।

বাঁধানো কয়েক খণ্ড 'মানসী ও মর্মবাণী'ও বাড়িতে ছিল। আগে তাতে হাত দেবার উপায় ছিল না। বিকেলে এখন আমার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। ফলে তাও হাতের নাগালে এসে যায়। পুরনো পত্রিকার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় কৈফিয়ত দেখে পড়েছিল, তার উল্লেখ করবার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠকরা প্রভাত মুখুজ্যে মশাইয়ের গল্প ছাপার

জন্য ক্রমাগত তাগাদা দিচ্ছেন, অথচ সম্পাদকমশাই কিছুতেই জোগাড় করতে পারছেন না তখনকার আমলের সেই বিখ্যাত লেখকের গল্প, এই অবস্থায় কী আর করবেন, তাঁর তরফে যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই, পাঠকদের এটা জানাবার জন্য তিনি এই কৈফিয়তটা ছেপে দেন। 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদক ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যা বলেছিলেন, তার মোদ্দা কথাটা এই যে, মুখুজ্যেমশাইয়ের গল্প আদায় করবার জন্য হাইকোর্টের বার লাইব্রেরি পর্যন্ত ধাওয়া করতেও তিনি ছাড়েননি, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হচ্ছে না। গল্পের প্রসঙ্গ তুললেই তিনি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, শরৎ-নামের এক তরুণ লেখক এখন চমৎকার লিখছে, তোমরা বরং তার কাছে যাও।

এই তরুণ লেখকটি আর কেউ নন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সন-তারিখ মিলিয়ে দেখছি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মাত্রই সাড়ে তিন বছরের বড়। তবু যে শরৎচন্দ্রকে তরুণ লেখক বলে উল্লেখ করতে তাঁর আটকায়নি, তার কারণ বোঝা শক্ত নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল একটু দেরিতে; তা ছাড়া দু'জনের সাক্ষাৎ-পরিচয়টা সম্ভবত তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। শরৎচন্দ্রের বয়স সম্পর্কে প্রভাতকুমার তাই হয়তো ভুল করে থাকবেন। আবছামতো মনে পড়ে যে, প্রভাতকুমার তাঁকে তরুণবয়সীও বলেননি, 'ছোকরা' বলে-উল্লেখ করেছিলেন। জগদিন্দ্রনাথের কৈফিয়তের মধ্যে এই ঘটনাবলির উল্লেখ দেখে খুব মজা পাই।

আমাদের বাড়িতে আরও যে-সব পুরনো পত্রিকা ডাঁই করা ছিল, তার মধ্যে খানকয় 'সচিত্র শিশির'ও খুঁজে পেয়েছিলুম। কাগজখানার সাহিত্যের দিকটা যে খুব জোরদার ছিল, তা নয়, কিন্তু প্রতি সংখ্যাতেই কার্টুন থাকত প্রচুর। একবিংশ শতাব্দীর নারীচরিত্র কেমন হতে পারে, স্রেফ তাই নিয়েই যে খানকয় ব্যঙ্গচিত্র এর একটি সংখ্যায় দেখেছিলুম, সেটা ভুলিনি। স্ত্রী-স্বাধীনতাকে বিদ্রূপ করে এই ধরনের মোটা রুচির কার্টুন ও লেখা এখনও নানা কাগজে দেখতে পাই। প্রায় পঞ্চাশটি বছর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। কিন্তু এ সব দেখলে আর তা বোঝা যায় না। মনে হয়, পরিবর্তন যা ঘটেছে, সেটা একেবারেই কসমেটিক। প্রসাধনের অন্তরালবর্তী ব্যাপারগুলোর বোধহয় খুব একটা অদল-বদল ঘটেনি।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হতেই সেবারে পুরী চলে গিয়েছিলুম। বাবার খবর দিয়ে মা সেখান থেকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। আমাকে দেখে মা একেবারে আঁতকে উঠে বললেন, "এ কী চেহারা হয়েছে তোর! দেখে তো চেনাই যায় না! এখনও কি পাইস হোটেলেই খাচ্ছিস নাকি?"

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলি, "বাঃ, পড়াশুনোর চাপ বেড়ে গিয়েছে না?"

দিদি বলে, "আসল ব্যাপারটাই তো তোমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, মা। খোকা যে চশমা নিয়েছে, সেটাই তো তুমি দেখতে পাওনি!"

মা বলেন, "তাই বল, সেইজন্যেই তোর চেহারাটা একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। তা কই, চশমা নেবার কথাটা আমাকে জানাসনি তো। গত হপ্তাতেই তো তোর চিঠি পেয়েছি, তাতে তো কিছু লিখিসনি।"

বললুম, "কী করে জানাব। চশমা তো সবে পরশু নিয়েছি। তুমি চোখ দেখাবার কথা লিখেছিলে না? তাই ছোটকাকা আমাকে ধর্মতলার ওদিকে এক চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে, আরও আগেই চশমা নেওয়া উচিত ছিল।"

বাবার শরীর শুনলুম পুরীতে এসে মোটামুটি ভালই আছে। বাঁ হাত আর বাঁ পায়ের সাড় পুরোপুরি ফেরেনি ঠিকই, কিন্তু ডান হাতে একটা লাঠি নিয়ে, তার উপরে ভর রেখে, আস্তে-আস্তে চলাফেরা করতে পারেন। একজন কাউকে তাঁর পাশে অবশ্য তখন থাকতেই হয়। গরমের ছুটিটা

সেবারে বাবা মা আর দিদির সঙ্গে পুরীতে কাটাই। সকালে আর বিকেলে বাবার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসতুম। রোজ সমুদ্রে নেমে সাঁতার কাটতুম। বাড়ির কাছেই সোনার গৌরাঙ্গের মন্দির। সন্ধের সময় মা সেই মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসে থাকতেন। চট করে সেখান থেকে উঠে আসতে চাইতেন না। বুঝতে পারতুম যে, মা আর সেই আগের মতো নেই, অনেকটাই বদলে গেছেন।

একটু-একটু করে আমিও বোধহয় বদলে যাচ্ছিলুম। ভিতরে ভিতরে শুরু হয়ে গিয়েছিল একটা ভাঙচুরের পালা। কিন্তু সেই অদল-বদলের প্রকৃতি যে ঠিক কীরকম, সেটা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করবার মতো বয়স তখনও আমার হয়নি। গরমের ছুটি দেখতে-দেখতে কেটে যায়। আবার আমি কলকাতায় ফিরে আসি।

৩৯

ছোটকাকার যে-সব বন্ধু আমাদের চাঁপাতলার বাড়িতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে দুজনকে আমরা ছোটরা খুব পছন্দ করতুম। এঁদের নাম নিখিলকুমার নন্দী ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা বলতুম নিখিলকাকা আর ধীরেনকাকা। নিখিলকাকা আইন পড়তেন। থাকতেন হার্ডিঞ্জ হস্টেলে। আইন পাস করে ইনি মানিকগঞ্জে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। এঁর দাদা ঢাকার বিখ্যাত ডাক্তার মন্মথকুমার নন্দীকে হয়তো অনেকেই চিনতে পারবেন। ধীরেনকাকা থাকতেন সিসিল হোটেলে। তবে কেউ সিসিল হোটেল বললে আর রক্ষে ছিল না, তক্ষুনি তাকে শুধরে দিয়ে বলতেন, 'ওটার নাম সিসিল হোটেল নয়, হোটেল সিসিল।' সম্ভবত তিনি ভাবতেন যে, নামটা ওইভাবে বললে হোটেলের মর্যাদা আর একটু বৃদ্ধি পায়। জেনারেল সেক্রেটারি না-বলে সেক্রেটারি জেনারেল বললে পদাধিকারীর মর্যাদা বাড়ে, এও অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার।

ধীরেনকাকাও আমাদের মতো ফরিদপুরের মানুষ। গ্রামের নাম মানিকদি ; আমাদের চান্দ্রা গ্রাম থেকে তার দূরত্ব নেহাতই মাইল চারেক। তাঁর বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল। চাকরি-বাকরি করতেন না, ওটা যে করাই চাই তাও বোধহয় বিশ্বাস করতেন না। তা ছাড়া, অল্প বেতনের চাকরিতে যে তাঁর ঘোর বিতৃষ্ণা, সেটা তাঁর কথাবার্তা শুনলেই মালুম হত। মানুষটি ছিলেন একইসঙ্গে সরল প্রকৃতির ও কল্পনাবিলাসী। বাস্তব পৃথিবী থেকে একটু উপরে পা ফেলে চলতেন। এ যখনকার কথা বলছি, চাকরির বাজার তখন দারুণ টাইট, তিরিশ টাকা মাস-মাইনের একটা চাকরি জোটাতে পারলেই মানুষ তখন বর্তে যেত। অথচ সেই সময়েও ধীরেনকাকাকে নাক সিঁটকে বলতে শুনেছি, 'আরে দূর দূর, ফোর ফিগারের কম মাইনেয় চাকরি করার কোনও মানে হয় নাকি?' ফোর ফিগার কথাটা সেই প্রথম শুনি। ওর মানে যে অন্তত এক হাজার, তা তখন জানতুম না।

এই সরল স্বভাবের মানুষটিকে বাবা আর মা খুব স্নেহ করতেন। আবার এই সরলতার জন্যই

অনেকে যে তাঁর পিছনে লাগেন, আড়ালে-আবডালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তো করেনই, সামনাসামনিও রঙ্গ-তামাশা করতে ছাড়েন না, সেটাও আমি বুঝতে পারতুম। ব্যাপারটা যে আমার একটুও ভাল লাগত না, তার কারণ, আমার ছেলেবেলায় এই মানুষটির স্নেহ আমি পুরোমাত্রায় পেয়েছি। আমি যে পদ্য লিখি, এটা জানবামাত্র ধীরেনকাকা আমাকে এক কপি 'আবোল তাবোল' কিনে দেন। তা ছাড়া 'আবার যকের ধন' বইখানাও তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বড়দের অনেকের মধ্যেই এই একটা বদভ্যাস দেখেছি যে, ছোটদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁরা একটু উঁচু জায়গা থেকে কথা বলেন; মনে হয় যেন পুলপিটে দাঁড়িয়ে ধর্মবিষয়ক লেকচার ঝাড়ছেন। ধীরেনকাকার মধ্যে এই মুরুব্বি-ভাবটা কখনও দেখিনি। বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের আচার-আচরণে যে কাপট্যের বিস্তার ঘটতে থাকে, সেটা তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই ছোটদের সঙ্গে খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। এমন মানুষকে ভাল না-বেসে পারা যায়?

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর কাকুন চলে গিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে। জমিজমাব দেখাশুনোর জন্য সেখানেই তাঁকে স্থায়ীভাবে থাকতে হত। এদিকে ছোটকাকা রাগী স্বভাবের মানুষ বলে যথাসম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলি। ফলে, সেই সময়ে আমাদের যা কিছু আবদার, তার একটা মস্ত অংশ মেটাতেন বড়কাকা। বাকিটা ধীবেনকাকাই মিটিয়ে দিতেন। এই ধীরেনকাকার বিয়ে উপলক্ষে বরযাত্রী হয়ে বেনারস গিয়েছিলুম। জায়গাটা সেই প্রথম দেখি। গোধুলিয়ায় মোড়েব কাছে একটা ধর্মশালায় আমাদের থাকবাব ব্যবস্থা হয়েছিল। পরে আবও অনেকবাব কাশী গিয়েছি, তবে সেই প্রথম অভিজ্ঞতার স্বাদটা ছিল একেবারে অন্য রকমেব। গঙ্গাব উপরকার ব্রিজ দিয়ে বেলগাড়ি যখন বেনারস স্টেশনে ঢুকতে চলেছে, বেণীমাধবের ধ্বজা চোখে পড়বামাত্র গোটা কামবার যাত্রীরা যে তখন 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সেটা এখনও মনে পড়ে।

নিখিলকাকা ছিলেন একটু লাজুক স্বভাবের মানুষ। ছোটকাকার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে চলে যেতেন। বাড়ির অন্য সব লোকের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। তবে ওদের হার্ডিঞ্জ হস্টেলে খুব ঘটা করে যে সরস্বতী পুজো হত, ফি বছর তাঁব সঙ্গে সেই পুজো দেখতে গিয়েছি। নিখিলকাকার দুই বোনও মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমরা বলতুম শান্তিপিসি আর বীণাপিসি। বীণাপিসি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। খুব ধীরস্থিব ও শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন, কথা বলতেন মৃদু গলায়, চোখে ছিল পুরু কাচের চশমা। আমি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, তখন এই বীণাপিসির সূত্রেই বেলা দত্তগুপ্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তাকে আজ শিক্ষিত সমাজে কে না চেনেন। তবে এ যখনকার কথা, তখন তিনি এত খ্যাতনাম্নী হননি। অন্তত আমি তাঁর অনুরাগী হয়েছিলুম মূলত এই কারণে যে, যেমন তাঁর লেখার হাত তেমন হাতের লেখাটাও ছিল দারুণ ভাল। সেই সঙ্গে কথাবার্তায় ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন চমৎকার। বয়সে আমার চেয়ে সামান্যই বড় ছিলেন, কিন্তু 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেও নাম ধরে ডাকবার উপায় ছিল না। বলতে হত 'বেলাপিসি'। এই বেলাপিসির কথা পরে আবার আসবে।

আমার ছেলেবেলায় আর যে দু'জন পিসিকে মাঝে-মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখতুম, তাঁদের একজনকে আমরা বিলিতিপিসি বলতুম, অন্য জনকে অরুপিসি। এঁরা বাবার কাছে আসতেন। আমরা পিসি বলতুম বটে, কিন্তু বাবাকে এঁরা কেউই দাদা বলতেন না। আমার বাবাকে আমি ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য কোনও পোশাক কখনও পরতে দেখিনি, অথচ এঁদের দুজনের কাছেই বাবা ছিলেন 'প্রোফেসরসাহেব'। বিলিতিপিসি শ্রীমতী লতিকা ঘোষকে সবাই চিনবেন, ইনি

শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা। পরবর্তী কালে ইনি বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন। প্রথম যেবার আমরা পুরীতে যাই, বিলিতিপিসি আর অরুপিসিও সেবার পুরীতে গিয়ে কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসেন। বিলিতিপিসির শিক্ষা-জীবনের একটা অংশ বিলেতে কেটেছিল, চেহারাও ছিল মেমসাহেবদের মতো। সম্ভবত সেইজন্যেই তাঁকে আমরা বিলিতিপিসি বলতুম।

অরুপিসি ছিলেন ইন্সপেকট্রেস অভ্ স্কুলস। পুরো নাম অরু সেন। এঁর কথাবার্তায় যে একটা বাঙাল টান ছিল, সেটা কখনও গোপন করবার চেষ্টা করতেন না। অরুপিসি খুব মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বাবার সঙ্গে কাজের কথাটা শেষ করেই যে চলে যেতেন, তা নয়, রান্নাঘরে ঢুকে একটা পিঁড়ে পেতে বসে আমার মায়ের সঙ্গে বেশ-কিছুক্ষণ গল্প করে তবে বিদায় নিতেন। অমর দত্ত নামে এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে আসতেন। শ্যামবর্ণের এই মানুষটি যে দেখতে ভারী সুন্দর ছিলেন, আর কথাও বলতেন চমৎকার, সেটা ভুলিনি। শেয়ালদার কাছে যেখানে লোয়ার সার্কুলার রোড শুরু হয়েছে, সেইখানে একটা দোতলা বাড়িতে অরুপিসিরা থাকতেন। ছেলেবেলায় সেই বাড়িতে আমরা মাঝে-মধ্যে গিয়েছি। সেখানেই ছোনে মজুমদারকে দেখেছিলুম। একে তো ফুটবল জগতের অবিস্মরণীয় পুরুষ দুখিরামবাবুর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র, তার উপরে নিজেও সেকালের বিখ্যাত ফুটবলার। খুবই যে আপ্লুত বোধ করেছিলুম, সেটা মনে পড়ে।

এটাও মনে পড়ে যে, বাবা আর মা যখন পুরীতে রয়েছেন, আর আমাকে থাকতে হচ্ছে কলকাতায়, বিলিতিপিসি আর অরুপিসি তখনও মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে কড়া নাড়তেন। খোঁজ নিয়ে যেতেন, বাবা কেমন আছেন, পুরী থেকে বাবার খবর জানিয়ে কোনও চিঠি এল কি না। বাবার মৃত্যুর পরে অরুপিসি আমাদের জীবন থেকে একেবারেই হারিয়ে যান। বিলিতিপিসির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রটাও ছিঁড়ে গিয়েছিল। তবে অনেকদিন বাদে সেটা আবার জোড়া লাগে। ১৯৬৯ সালে মনোমোহন ঘোষের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। তার উদ্যোগ-পর্বে বিলিতিপিসি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন। তিনি তখন দক্ষিণ কলকাতার লেকের কাছে এস আর দাশ রোডে থাকতেন। সেখান গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জানান যে, শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে কমিটি হচ্ছে, তাতে আমাকে থাকতে হবে। শুনে আমি হকচকিয়ে যাই। বলি, "দেশজোড়া যাঁদের খ্যাতি, তাঁদের নিয়ে আপনি কমিটি করছেন। তো আমার মতো অখ্যাত একটা লোককে তার মধ্যে রাখতে চাইছেন কেন?"

বিলিতিপিসি বলেন, "বাজে কথা বোকো না, যা বলছি শোনো। প্রোফেসরসাহেবকে আমার বাবা যে কী ভালবাসতেন, তা তুমি জানো না, জানবার কথাও নয়। তুমি এটাও জানো না যে, আমার বাবা যখন মৃত্যুশয্যায়, প্রোফেসরসাহেব একেবারে তাঁর ছেলের মতোই রাতের পর রাত জেগে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। তিনি বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর বংশের কারও-না-কারও এর মধ্যে থাকা দরকার। তুমি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এই কমিটির মধ্যে থাকো, নইলে আমি শান্তি পাব না।"

মস্ত করে জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল। বিলিতিপিসির সঙ্গে প্রায়ই তখন দেখা হত। উৎসব শেষ হবার পরেই কিন্তু সম্পর্কের সুতোটা ফের ছিঁড়ে যায়। তারপরে আর দেখা হয়নি।

বিলিতিপিসির কথা যখন ভাবি, তখন একটু বিস্ময়বোধ না করে পারি না। একে তো অত বড় বংশের মেয়ে, তার উপরে যেমন বিদুষী, তেমন সুন্দরী। অথচ তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল, উটকো-ছুটকো কাগজে তা নিয়ে যে এক ধরনের মশলাদার গবেষণা চলত না, তাও নয়, সেই বয়সেও আমাদের কানে সেসব উড়ো

খবর কখনও কখনও ছিটকে আসত বই কী, কিন্তু কে কী বলল না-বলল, তা নিয়ে তিনি যে আদৌ মাথা ঘামাতেন, এমন মনে হয় না। আমাদের তালতলার বাসায় মনোমোহন ঘোষের একটা ছবি ছিল। পরনে সাহেবি পোশাক, মনোমোহন একটা চেয়ারে বসে আছেন। পিছনে দুই কন্যা। বিলিতিপিসির দিদি আর বিলিতিপিসি। বাড়ি বদলে যখন চাঁপাতলায় চলে আসি, ছবিটা তখন হারিয়ে যায়। তবে মাথার মধ্যেও তো বিস্তর ছবি ধরা থাকে। আমার ছেলেবেলার সঙ্গে সে-সব ছবি একেবারে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে।

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই যে পুরী থেকে একা আবার কলকাতায় চলে এসেছিলুম, সেবারে কিন্তু খুব বেশিদিন কলকাতায় থাকা হয়নি। পাইস হোটেলে খেতে-খেতে জব্বর রকমের অসুখ বাধিয়ে বসি, ওষুধ বিষুধ খেয়েও কোনও কাজ হয় না, ফলে আবার মা-বাবার কাছে ফিরে যাই। পুরীতে তখন বর্ষা নেমেছে। যেমন পাহাড়ে তেমন সমুদ্রের ধারেও ওর চেয়ে খারাপ সময় আর কিছু হয় না। ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। তার সঙ্গে বইছে এলোমেলো জোলো বাতাস। সমুদ্রটাও যেন ফুলে-ফেঁপে গজরাচ্ছে আর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। মা একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন যে, এর মধ্যে কারও সমুদ্রে নামা চলবে না। এদিকে বৃষ্টির কামাই নেই বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোরও কোনও মজা নেই। তারই মধ্যে বাবা একদিন বললেন, "তোর তো পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হচ্ছে রে, এদিকে আবার পুজোও তো প্রায় এসে গেল, তার পরেই তো তোর অ্যানুয়াল পরীক্ষা। তা এক কাজ কর। এখানকার জেলা ইস্কুল খুব ভাল ইস্কুল। সেখানে গিয়ে একটা খোঁজ নিয়ে আয়।"

বললুম, "কিসের খোঁজ নেব?"

"আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেই চিঠি নিয়ে জেলা-ইস্কুলের হেড মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করবি যে, তিনি তোকে এখানে ক্লাস করতে দেবেন কি না। ... না না, ভর্তি হবার কথা হচ্ছে না, সেটা সম্ভবও নয়, তবে ভর্তি না-কবেও যদি ক্লাস কবতে দেন, তবে তাতেও অনেক উপকার হবে। অন্তত ইস্কুলে গিয়ে ক্লাস করবার অভ্যাসটা তো বজায় থাকবে। তা-ই বা কম কী।"

"কিন্তু আমি তো এখানকাব ভাষা জানি না।"

"ভাষা জানিস না মানে যে-লিপিতে এটা লেখা হয়, সেই স্ক্রিপটটা পড়তে পারিস না। ভাষাটা বলতেও পারিস না। কিন্তু অন্যেরা যখন এই ভাষায় কথা বলে, তখন বুঝতে পাবিস ঠিকই। তা মাস্টারমশাইরা ক্লাসে যা বলবেন, সেটা শুনে যাবি। তাতেও অনেকটা কাজ হবে। যা যা, কালই চলে যা।"

পরদিনই বাবার চিঠি নিয়ে জেলা-ইস্কুলে চলে যাই। হেড মাস্টারমশাই দেখলুম অতি ভাল মানুষ। চিঠি পড়ে তিনি বললেন, "তোমার বাবা ঠিক কথাই লিখেছেন। ভর্তি করার সত্যি অনেক অসুবিধা আছে। তবে ভর্তি না-হয়েও তুমি যদি ক্লাস করতে চাও তো আমি আপত্তি করব কেন? চাও তো কাল থেকেই আসতে পাবো।"

খুব বেশিদিন ক্লাস করতে পারিনি। যা পড়ানো হত, মোটামুটি বুঝতে পারতুম। যেমন মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে, তেমন ছাত্রদের কাছ থেকেও যে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলুম, সেটা কখনও ভোলা যাবে না। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে আমার শরীরও অনেকটা সেরে উঠেছিল। এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় পুজোর ছুটি। ঠিক হয়, ছুটি ফুরোলে প্রবাসের পাট তুলে সবাই মিলে কলকাতায় ফিরব। মা আর আমাকে একা-একা কলকাতায় থাকতে দিতে চাইছিলেন না।

পুরীতে থাকতে সেখানকার ইস্টিশানের হুইলার স্টল থেকে বাবার জন্যে মাঝে-মাঝে বইপত্তর

কিনে আনতে হত। পুজোর কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে বললেন, "যা, একবার হুইলারে থেকে ঘুরে আয় তো। যদি দেখিস এ মাসের কোনও বাংলা কাগজ বেরিয়েছে তো কিনে আনবি।" শুনে, মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ইস্টিশানে চলে যাই। গিয়ে দেখি, সে-মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকা এসে গেছে।

বি. এন. আর. হোটেলের পুব দিক দিয়ে একটা রাস্তা করে দেওয়ার ফলে চক্রতীর্থ থেকে খুব তাড়াতাড়ি এখন ইস্টিশানে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেকালে এই পথটা ছিল না। ফ্ল্যাগ স্টাফ ঘুরে অনেকটা পথ তাই হাঁটতে হত। সেদিন 'প্রবাসী' কিনে ফ্ল্যাগ স্টাফ পর্যন্ত এসে আর বাঁ দিকের রাস্তা ধরিনি। দুপুরবেলায় খুব একচোট বৃষ্টি হয়েছিল। এখন আর বৃষ্টি নেই। বিকেলবেলা। মোড় থেকেই দেখতে পেয়েছিলুম যে, সমুদ্রের ধারে আবার বাচ্চা-বুড়োদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। বয়স্করা হাঁটছেন, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বালি দিয়ে দুর্গ কিংবা মন্দির বানাচ্ছে। কেউ-কেউ যে স্নান করতে নেমেছে, তাও চোখে পড়েছিল। রাস্তা ছেড়ে আমিও তাই সমুদ্রের ধারে নেমে গিয়ে বালির উপর দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতেই সেদিন 'প্রবাসী'র সেই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গল্প আমি পড়ে ফেলি। হাসির গল্প। একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু দু'বাড়ির অভিভাবকদের তাতে মত নেই। মেয়েটির বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক হয়, আর ছেলেটি পাছে কোনও গন্ডগোল করে, তাই বিয়ের দিনে তাকে আটকে রাখা হয় একটা ঘরের মধ্যে। দেনাপাওনা নিয়ে গন্ডগোল বাধায় বিয়েটা কিন্তু ভন্ডুল হয়ে যায়। আসর থেকে বরকে তুলে নিয়ে বরপক্ষ ইস্টিশানে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠে পড়ে। ফলে, যাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল, তাকেই আবার বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এনে বরাসনে বসিয়ে দিতে হয়।

গল্পটার নাম, যদ্দুর মনে পড়ে, 'উপবাসী'। সেই গল্পের মধ্যে ক্রুদ্ধ বরপক্ষকে যখন রেলগাড়ির কামরা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে, সেই জায়গার কথাবার্তাই ছিল সবচেয়ে মজার। কন্যাপক্ষের লোকরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গার্ডসাহেবকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, বিয়ে না-করেই বর পালাচ্ছে, সুতরাং কিছুতেই তিনি যেন না গাড়ি ছাড়বার হুইসল বাজান, কিন্তু বর যে কী বস্তু, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গার্ডসাহেব সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। কন্যাপক্ষীয় যে ছেলেটি ইংরেজি সবচাইতে ভাল জানে, শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে, 'আনম্যারেড হাজব্যান্ড অভ আনম্যারেড ওয়াইফ' স্যার! শুনে গার্ডসাহেব যাও-বা কিছুটা আঁচ করেছিলেন, তাও একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায়।

হাসতে-হাসতে বাড়ি ফিরেছিলুম। মা বলেছিলেন, "কী রে, অত হাসছিস কেন?"

বলেছিলুম, "হাসব না? যা মজার গল্প!"

হাত বাড়িয়ে 'প্রবাসী'খানা আমার হাত থেকে নিতে-নিতে বাবা বললেন, "কার গল্প?"

"বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের।"

মা বললেন, "অ্যাঁ, বলিস কি! তুই ওই বড়দের গল্প পড়লি?"

বাবা বললেন, "তা পড়লই বা। তাতে দোষটা কী হল? বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প পড়বে না? অমন চমৎকার হাসির গল্প এক পরশুরাম ছাড়া আর কেউ লিখতে পারেন নাকি?"

মায়ের শেষ কথাটা আমার উদ্দেশে নয়, বাবার উদ্দেশে বলা। "ছেলেটাকে তুমিই দেখছি উচ্ছন্নে ছাড়বে!

বাবা এ-কথার উত্তর দেননি। কাগজখানা ফের আমার হাতে তুলে দিয়ে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, "এক কাজ কর তো! গল্পটা তুই আমাকে আর তোর মাতৃদেবীকে একবার পড়ে

শোনা। তোর দিদিকে আর ছোট ভাইটাকেও ডেকে আন। বিভূতিভূষণের হাসির গল্প সবাই মিলে শুনতে হয়।"

প্রথম যেবার ঘাটশিলায় গিয়ে বিভূতিভূষণের বাড়িতে উঠি, সেও নেহাত আজকের কথা নয়। তখন আমার ছেলেবেলার এই ঘটনার কথাটা তাঁকে জানাই। শুনে তিনিও খুব হেসেছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গ পরে আবার আসবে। ইতিমধ্যে পুরীর প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পুজোর ছুটিতে মণিদা দিন-কয়েকের জন্যে পুরীতে এসেছিলেন। সেই সময়ে আমি আর মণিদা একদিন চক্রতীর্থ থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্বর্গদ্বার পর্যন্ত চলে গিয়েছি, হঠাৎ কবি জসিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। জসিমুদ্দিনও সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তিনিও ফরিদপুরের লোক, টাউনের কাছে কমলাপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। বাবাকে দাদা বলতেন। আমরাও বরাবর তাঁকে কাকা বলেই ডেকেছি। আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেশ-কিছুদিন তিনি ছিলেনও। যেমন বাবা, তেমন ঠাকুর্দা আর ঠাকুমাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। আমরাও যে পুরীতে রয়েছি, জসিমকাকা তা জানতেন না। সেইদিনই রাত্তিরের গাড়িতে তিনি কলকাতায় ফিরবেন, তাই সে-যাত্রায় আর আমাদের চক্রতীর্থের বাড়িতে এসে বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেননি।

সেবারই পুরীর লক্ষ্মী টকিজ-এ গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' দেখেছিলুম। নরেশ মিত্রের করা সেই চলচ্চিত্রে গোরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জীবন গাঙ্গুলি, আর সুচরিতার ভূমিকায় রানিবালা। নরেশ মিত্র নিজে নেমেছিলেন পানুবাবুর ভূমিকায়। ললিতার ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রতিমা দাশগুপ্তা নামে এক নবাগতা অভিনেত্রী। শো শেষ হবার পর সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে দেখি, আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে, গাছপালা আর রাস্তাঘাট জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। নির্জন পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা বাড়ি ফিরেছিলুম। পরদিন লক্ষ্মীপুজো। পুরীতে আসবার পর বাবার স্বাস্থ্যে আর নতুন করে কোনও গন্ডগোল ঘটেনি বলে মা একটু বড় করে পুজোর আয়োজন করেছিলেন। পাঁচালি পড়া শেষ হবার পরে প্রসাদ পেলুম। দেশের বাড়ির মতন রাত্তিরে এখানেও লুচি আর মোহনভোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিছু ভুলিনি।

পুজোর ছুটি দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে গেল। শেষ হল প্রবাসে দিনযাপনের পালা। এবারকার যাত্রায় আর আমি একা নই। সবাই মিলে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

৪০

কলকাতায় ফিরে মা আবার সংসারের হাল ধরলেন। বাড়িটা তো একেবারে আঁস্তাকুড় হয়ে উঠেছিল, ঝাঁটপাট পড়ত না, মেঝের উপরে কাগজের কুচি আর ধুলোর পুরু আস্তরণ, দেওয়াল জুড়ে মাকড়সার জাল। সে-সব সাফ-সুতরো হবার পরে আবার মনে হতে লাগল যে, হ্যাঁ, এটা গেরস্তবাড়িই বটে, তিনতলা একটা ডাস্টবিন নয়। দালাল লাগিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড অস্টিন গাড়িও তার দিন কয়েক বাদে কেনা হয়। বাবা সেই গাড়িতে করে আবার কলেজে যেতে শুরু করলেন। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, পুরোপুরি যদিও সুস্থ হয়ে ওঠেননি, তবু আস্তে আস্তে ওঁকে আবার ওঁর স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা দরকার, তা নইলে ওঁর মন একেবারে ভেঙে পড়বে। সেদিক থেকে ওঁর এই কর্মজীবনে ফিরবার দরকার নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আমি তো তখন তেরো পেরিয়ে চোদ্দোয় পড়েছি, সব কিছু পুরোপুরি না-বুঝলেও এটুকু আন্দাজ করবার বয়স হয়েছে যে, বাবার রোজগার যদি বন্ধ হয়ে যায় তো ইস্কুলের মাইনেটা পর্যন্ত জোটাতে পারব না। এটা যখন ভাবতুম, মন তখন কী যে খারাপ হয়ে যেত, সে আর বলবার নয়। মাঝে-মাঝেই মনে হত, এই যে একজন অশক্ত মানুষকে রোজ তাঁর কর্মস্থলে যেতে হচ্ছে, এ শুধুই এই সংসারটাকে চালু রাখবার জন্য। খাইয়ে পরিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। ভাবতে-ভাবতে মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জন্ম নেয়। এমনিতেই আমি মনোযোগী ছাত্র নই। তার উপরে আবার এই অপরাধবোধ দেখা দেওয়ায় লেখাপড়ার ব্যাপারে যেন আরও উদাসীন হয়ে যেতে থাকি। সকালে সন্ধ্যায় বই খুলে বসতুম ঠিকই, কিন্তু তার পৃষ্ঠাগুলি ঝাপসা ঠেকত। ইংরেজি বাংলা ইতিহাস ভূগোল—কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারতুম না।

দিদি আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত। কিন্তু ওই যে প্রায় একটা বছর বাবা-মা'র সঙ্গে তাকে পুরীতে গিয়ে থাকতে হয়েছিল, তার ফলে কলকাতায় ফিরে সে আর টেস্ট পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পায় না। পুরো একটা বছর তার নষ্ট হয়। অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে ক্লাস টেনে উঠে আমি তাকে ধরে ফেলি। দিদি খুব কান্নাকাটি করেছিল। তাতে মা তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "এতে এত দুঃখের কী আছে, ভাইবোন একই বছরে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ঢুকবি, এ তো ভালই হল।"

মিত্র ইস্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল, ইস্কুল পালটে আমারও বিশেষ সুবিধে হয়নি। অন্যান্য বিষয়ে চলনসই গোছের নম্বর পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু অঙ্কের নম্বর সেই চল্লিশ তো চল্লিশই, আর এক ক্রান্তিও বেশি নয়। প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখে ছোটকাকা বললেন, 'তবে আর ইস্কুল পালটে লাভ কী হল ?

আমি বললুম, "কিচ্ছু লাভ হয়নি, ছোটকাকা। অঙ্ক আমার দ্বারা হবে না। যেখানেই ভর্তি

করো, ওই চল্লিশই পাব।”

ছোটকাকা বললেন, “তবে আর বঙ্গবাসী ইস্কুলের দোষ কী!”

“কিচ্ছু দোষ নেই,” আমি বললুম, “তোমরা বরং কেন বঙ্গবাসীতেই আমাকে ভর্তি করে দাও।”

বড়দিনের ছুটিতে সেবারে আমরা সবাই মিলে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলুম। সেইবারই সেখানে এক ফকিরের আবির্ভাব ঘটে। যদ্দুর মনে পড়ে, সেদিন ছিল অমাবস্যা। হপ্তাখানেক বাদে শুক্লপক্ষের চাঁদের জোর খানিকটা বাড়বে। তখন শুরু হবে ধানের মলন। বিকেলবেলায় বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠাকুমা আর কাকুন তাই নিয়ে আইনদ্দিকাকার সঙ্গে কথা বলছিলেন। হাতে লাঠি, কাঁধে ঝোলা, ঢ্যাঙামতো একটি লোক সেই সময়ে মাঠ থেকে আমাদের বাড়িতে উঠে আসে। সরাসরি সে ঠাকুমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, “আপনার ছেলের খুব শক্ত অসুখ?”

আমিও তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। লোকটির গায়ের রং যে মিশমিশে কালো, চুলদাড়ি যে ধবধবে সাদা, শরীর যে দড়ি-পাকানো আর কোটরে বসা চোখ দুটি যে ভীষণ উজ্জ্বল, এটা এখনও ভুলিনি। হঠাৎ একজন বাইরের লোক এসে পড়ায় ঠাকুমা প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, “হ্যাঁ, আমার ছেলে খুবই অসুস্থ। তার বাঁ হাত আর বাঁ পায়ে সাড় নেই। কিন্তু তুমি কে বাবা?”

“আমি ফকির। আমার থাকবার কোনও জায়গা নেই। আমি আজ এখানে থাকি, কাল সেখানে। আমি গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে অসুখ সারাই। আমি তোমার ছেলের অসুখ সারিয়ে দিতে এসেছি।”

এর পরে আর কথা কী? কাচারিঘরের বারান্দায় একটা জলচৌকি পেতে তাকে বসতে দেওয়া হয়। গোটা বাড়ি সেখানে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। উত্তর আর মধ্যের বাড়ির লোকেরাও ছুটে আসে। বাচ্চা বুড়ো মেয়ে পুরুষ, কেউই বাদ থাকে না।

পৌষের সংক্ষিপ্ত বিকেল আর সন্ধ্যা কেটে গিয়ে ঝুপ করে ততক্ষণে রাত নেমে এসেছে। অমাবস্যার রাত। কাচারি ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফকিরের তেষ্টা পেয়েছিল। ঠাকুর্দার আমলের গৃহভৃত্য উজাগির সিং পড়িমরি দৌড়ে গিয়ে এক ঘটি জল এনে তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, “পিয়ে লিন বাবা।”

জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ফকির বলে, “সব সারিয়ে দেব, সব।”

কাতর গলায় ঠাকুমা বলেন, “আমার ছেলেকে একবার দেখবে না, বাবা?”

ফকির বলে, “পরে হবে, পরে হবে। আগে তো ভূতগুলোকে ঠাণ্ডা করি। বাড়িতে দুধ থাকে তো নিয়ে এসো।”

“কতটা দুধ?”

“ভূত তো একটা দুটো নয়, তিনটে। দুধ খাইয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে হবে। এক গামলার কমে হবে না।”

অতটা দুধ তখন বাড়িতে ছিল না। ফলে সেই রাত্তিরে গোয়াল ঘরে ঢুকে দুধ দুইয়ে এক গামলা দুধ এনে তার সামনে রাখা হল। ফকির সেই দুধ নিয়ে নেমে গেল অন্ধকার মাঠের মধ্যে। এটাও শুনলুম যে, অন্ধকারের মধ্যে সে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকছে। মিনিট দশেক বাদে সে ফিরেও এল। দাড়ির উপরে হাত বুলোতে-বুলোতে হেসে বলল, “মাঠের মধ্যে দুধ রেখে এসেছি। এক ব্যাটা তো সঙ্গে-সঙ্গেই এসে গেল, অন্য দুটোও এসে যাবে। যাও বুড়ি মা, ভূত যখন দুধ খেতে এসেছে, তখন আর কোনও ভয় নেই, তোমার ছেলেকে এবারে নিয়ে এসো।”

বাবা কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না। বারবার বলছিলেন, “দুর দুর, তোমরা কি পাগল

হয়ে গেলে? দুধ খাবে ভূতে, আর অসুখ সারবে আমার? তাও কি হয় নাকি? তোমরা ঠগের পাল্লায় পড়েছ।"

কিন্তু মা এমন কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আসতেই হল। কাচারিঘরের বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে বাবা সেখানে এসে বসলেন। ফকির তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী-সব বলতে লাগল। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে একটা চামর বার করে তাঁর গায়ে-মাথায় বুলিয়ে দিল বারকয়েক।

তারও পরে, তা প্রায় মিনিট পনেরো কুড়ি ধরে, যা ঘটতে লাগল, অতি বড় সাহসী লোককেও ঘাবড়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। ফকিরের কাণ্ড-কারখানা দেখে মনে হতে লাগল, সে একেবারে খেপে গেছে। 'চলে যা, চলে যা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এই যদি সে মাঠের দিকে ছুটে যায়, তো অন্ধকারের মধ্যেই ফের দৌড়তে-দৌড়তে উঠোনে ফিরে আসে। একবার ছুটে যায় পুকুরের ধারে, একবার ছুটে যায় আমাদের লিচুগাছটার দিকে। আর সেইসঙ্গে ক্রমাগত চেঁচিয়ে বলে, "যা যা, চলে যা!" বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করেছে। মায়েরা তাদের মুখের ওপর হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলছেন, "চুপ চুপ!" বড়দের মুখে কথা সরছে না।

তবে ফকিরও যে ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আরও খানিকক্ষণ এইভাবে দৌড়োদৌড়ি করবার পরে হঠাৎই একটা হুঙ্কার ছেড়ে সে বারান্দায় উঠে এসে বাবার সামনে একেবারে ঝিম মেরে বসে রইল মিনিট খানেক। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে একগাল হেসে বাবাকে বলল, "যা বেটা, এবার শুয়ে পড় গিয়ে। আর ভয় নেই, ভূতগুলোকে খেদিয়ে দিয়েছি, কাল সকালেই তোর অসুখ সেরে যাবে।"

রাত্তিরটা সেদিন সকলেরই খুব ভয়ে-ভয়ে কেটেছিল। ফকিরের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল কাচারিঘরের বারান্দায়। সূর্য উঠবার আগেই ঘুম থেকে উঠে সেখানে ছুটে যাই। তবে মানুষটিকে আর দেখতে পাইনি। মা আর ঠাকুমা বড় আশা করেছিলেন যে, বাবার হাতে-পায়ে এবারে পুরোপুরি সাড় ফিরে আসবে। সেটা না-আসায় তাঁরা দুজনেই একেবারে গুম মেরে যান। উজাগির সিং বলল, "আরে উ তো জাল আদমি। ফকির সেজে মানুষকে ধোঁকা লাগিয়ে বেড়ায়। আমার খুব ভালই জানা আছে। তিন বরষ আগে উ তো মাদারিপুরে থাকত।"

বড়কাকা বললেন, "এত কথাই যদি জানো তো, আগে বলোনি কেন? তখন তো দেখলুম ভক্তিতে একেবারে গদোগদো ভাব!"

কাকুন বললেন, "মাঠের মধ্যে ওই যে দুধ রেখে আসা হল, সেটা তা হলে খেল কে?"

বাবা বললেন, "ভূতে না খেয়ে ও নিজেই যদি খেয়ে থাকে তো কাজটা কিছু খারাপ করেনি।"

মাঠে লোক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পেতলের গামলাটাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বাবা কোনও আশা করেননি, তাই হতাশও হননি। মা কিন্তু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই এর দিন কয়েক বাদে আমাদের বাড়িতে রামায়ণ গানের আসর বসানো হয়। গোটা শীতকালটা জুড়ে আমাদের ওদিকে যেমন রামায়ণ গান, তেমন কৃষ্ণলীলার ধুম লেগে যেত। মুসলমান বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে চাঁদোয়ার তলায় বসে যে 'গুনাবিবির গান' শুনেছি, তারও আখ্যানভাগের আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। গ্রামের বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরেও অনেকে, সামান্য সুর লাগিয়ে, শোনাত পদ্যে-বাঁধা নানা সুখ দুঃখের কাহিনী। এই রকমের একটা কাহিনী ছিল এক বড় মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে। তার গুটিকয়েক লাইন এখনও মনে পড়ে। 'মকিমবাবু ছান করতেছিল গান-বাজাইনা ঘাটে,/চাইরজন চাপরাশি আইসা রশি দিল হাতে।/হাতে দিল হাতকড়ি, পায়ে দিল বেড়ি,/টানতি টানতি লইয়া গেল ফৈরাদপুরের বাড়ি।' ফৈরাদপুর হল ফরিদপুরের স্থানীয়

উচ্চারণ। সদর-শহরে টেনে নিয়ে একজন গণ্যমান্য মানুষকে কীভাবে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ হল তারই করুণ বৃত্তান্ত।

রামায়ণ গানের কথায় বলি, আমার মেজোপিসির বাড়ি যে আলগি গ্রামে, সেখানকার অবনী সমাদ্দারমশাই এই গানের যে দল গড়েন, তার বেশ খ্যাতি হয়েছিল। সমাদ্দারমশাই সুদর্শন পুরুষ। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন কথক ও গায়ক। তাঁর বাচনভঙ্গি যেমন চিত্তাকর্ষক, গলা তেমনই সুরেলা। কথা বলতে বলতে তিনি যখন গান ধরতেন, আর বাজনদারেরাও তাঁর ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র কেউ-বা বেহালায় ছড় টানত, কেউ বাজাত বাঁশি, অনুষ্ঠান জমে যেতে তখন আর দেরি হত না। অবনী সমাদ্দারমশাইকে আমরা বলতুম অবনীদা। সিচুয়েশন যা-ই হোক, অবনীদা তার মেজাজটা ঠিক ধরতে পারতেন। শক্তিশেলে বিদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, আর রাম হাহাকার করছেন, এই সিচুয়েশনে অবনীদার গান শুনে যেমন ছেলেবুড়ো সকলের চোখেই জল এসে যেত, তেমন আবার রাত্তির থাকতে থাকতেই বিশল্যকরণী সংগ্রহ করতে হবে বলে হনুমান যখন সূর্যদেবকে বগলদাবা করে ফেলেছে, অবনীদার গান শুনে তখন বাচ্চারা তো হো-হো করে হাসতই, বৃদ্ধেরাও হাসি সামলাতে পারতেন না।

অবনীদা বলতেন, "অবস্থাটা একবার বুঝুন। অমন তেজীয়ান যে-সূর্যদেব, ইচ্ছে করলেই এই পৃথিবীকে যিনি ছারখার করে দিতে পারেন, তিনি কিনা একটা বানরের বগলে আটকে আছেন! নাঃ, সেই তেজ আর তাঁর নেই, তাঁর প্রাণ এখন একেবারে ওষ্ঠাগত। করুণ গলায় তিনি কাকুতিমিনতি করতে শুরু করেছেন। কী বলছেন তিনি?"

জিজ্ঞাসাটাকে ঝুলিয়ে রেখেই অবনীদা শুরু কবতেন গান। "ছাড় ছাড় নাছোড় ব্যাটা ছেড়ে দে আমায়।/তুই কখনও পান করিস না চর্বণ,/তোর মুখে মাছি করে ভনভন,/তোর হাত ধরে মিনতি করি একবার মুখখান ধুযে আয়।/ছাড় ছাড় নাছোড় ব্যাটা...'

গান শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত। অবনীদা বলতেন, "তা 'ছেড়ে দে' বললেই ছেড়ে দেবে, হনুমান কি অত কাঁচা ছেলে নাকি? সূর্য ওঠার আগেই তাকে বিশল্যকরণী নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচাতে হবে না? চোখ পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সূর্যদেবকে সে তাই বললে, 'হুপ হুপ!' অর্থাৎ 'চুপ চুপ'!" শুনে শ্রোতাদের মধ্যে আবার ওঠে হাসির হুররা। হাসি থামতে অবনীদা ফের গান ধরেন।

রামায়ণ কিংবা কৃষ্ণলীলার সবখানি তো আর একই দিনে শোনানো সম্ভব নয়। তার আলাদা আলাদা অংশ নিয়ে বাঁধা হত আলাদা আলাদা পালা। আমাদের বাড়িতে সেবার রামায়ণের দুটো পালা হয়েছিল। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' আর 'সীতার বনবাস'। দ্বিতীয় পালাটা বড্ড করুণ। তবে তার মধ্যেও, ঘন জমাট মেঘপুঞ্জের জানলাতেও যেমন সূর্যদেবের মুখ এক-আধবার উঁকি মারে, তেমনই করে ছড়িয়ে পড়ত হাস্যরসের রৌদ্রধারা। যেমন ধরা যাক, সেই যেখানে বাল্মীকির আশ্রমে কুশ আর লব আটকে রেখেছে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে, আর রামচন্দ্রের বন্ধু গুহক তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই ঘোড়াকে উদ্ধার করতে এসেছেন, সেখানে খুব একটা মজার গান ছিল। গুহক তো নিষাদরাজ, অরণ্যচারী। তাঁর সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রও সেই রকমের। তারা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আসেনি, এসেছে স্রেফ দা-কুড়ুল নিয়ে। একজনের হাতে কোঁচও ছিল একটা। এ হল মাছ মারবার অস্ত্র। মস্ত একটা লাঠির ডগায় লোহার একগুচ্ছ ছুঁচলো শলাকা বাঁধা থাকে, তাক করে ছুড়ে মারলে মাছের গায়ে গেঁথে যায়। তা অমন অস্ত্র লব তার আগে কখনও দেখেনি। তার ধারণা হল, এ নিশ্চয় এমন কোনও বাণ, যা ছুড়লে আর রক্ষে নেই, প্রাণ বাঁচানো শক্ত হবে। ঘাবড়ে গিয়ে সে তাই কুশকে বলছে, 'দাদা দ্যাখো, একটা বাণের দশ-বারোটা মাথা!'

অবনীদা এ-গানটা খুব জমিয়ে গাইতেন। আসরের একধারে বাবা একটা চেয়ারে বসে গান শুনছিলেন। দেখলুম, আমাদের মতো তিনিও প্রাণ খুলে হাসছেন।

দেশের বাড়িতে সেবারে কৃষ্ণলীলার আসরও একদিন বসেছিল। কৃষ্ণলীলার যে গান, তাতে কথার বৈচিত্র্য আছে ঠিকই, তবে সুরের বৈচিত্র্য খুবই কম। 'আজ কেন গো নিধুবনে/কিশোর কিশোরী সনে/পুষ্পশয্যায় সুখে-এ-এ নিদ্রা যায়...'এই যে শুরু হল বাঁধি গত্, এই সুরটাই বারবার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ছেলেবেলায় অবশ্য সুরের এই একঘেঁয়েমি নিয়ে কোনও আক্ষেপ ছিল না। অত সব বুঝবার মতো বয়সও তখন হয়নি। যেখানে যা-কিছু পাওয়া যেত, তাতেই ধন্য হয়ে যেতুম।

এমনিতে তো পৌষমাসে ঠাঁইনাড়া হতে নেই, তবে কিনা সেবারে আমরা পৌষমাসের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়িতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলুম, তাই মাস ফুরোবার আগেই কলকাতায় ফিরতে হল। ফলে পৌষ সংক্রান্তির পিঠে-পায়েস আর খাওয়া হল না। ঠাকুমা তাই নিয়ে দুঃখ করছিলেন। বারবার মাকে বলছিলেন,"ও বড়বউমা, সঙ্গে এক বস্তা ঝুনো নারকোল আর খান দশ বারো পাটালি দিয়ে দিয়েছি। খেয়াল রেখো, ওগুলো যেন রেলগাড়িতেই পড়ে না থাকে।"

কলকাতায় পৌঁছে ফের ইস্কুল পালটে বঙ্গবাসীতে এসে ভর্তি হই। অর্থাৎ ঝাঁকের কই ফের ঝাঁকের মধ্যে ফিরে এলুম। প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল বিমিশ্র ধরনের। পুরনো বন্ধুদের ফিরে পেয়ে যে খুব খুশি হয়েছিলুম, সে-কথা না-বললেও চলে। আবার নতুন ইস্কুলে নতুন যে-সব বন্ধু পাওয়া গিয়েছিল, তাদের ছেড়ে আসতে কষ্টও হচ্ছিল খুব। এ হল ১৯৩৯ সালের কথা। সদ্য ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছি, নাকের নীচে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, নিচু ক্লাসের ছাত্রেরা রীতিমতো সমীহ করে কথা কয়, মাস্টারমশাইরা আর কথায়-কথায় বকাঝকা করেন না, বাড়িতে মারধরের পালা এর বছর খানেক আগেই চুকেছে, এক মা'ই মাঝেমধ্যে চড়টা-চাপড়টা কষিয়ে দিতেন, ইদানীং তিনিও দেখছি চড় মারতে গিয়েও হঠাৎ হাত নামিয়ে নেন, এদিকে আবার আমার গলার আওয়াজও যে সেই আগের মতো মিহি নেই, অনেকখানি পালটে গেছে, তাও বুঝতে পারি। আগে ধুতির সঙ্গে শার্ট পরতুম, ইদানীং এক-আধ দিন পাঞ্জাবি পরছি। তাতেও যেন নিজেকে একটু অন্যরকম মনে হয়।

ইস্কুলে এটাই আমার শেষ বছর। মাঝে-মাঝে ভাবি, এই শেষ বছরটা আর ফাঁকি না দিয়ে যত্ন করে পড়াশুনো করব। কিন্তু ওই ভাবা-ই সার। পড়াশুনো যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকে। ফাঁকির বহর আর কমে না। ঘুড়ি ওড়ানো আর লাট্টু ঘোরানো অবশ্য বন্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে কবিতা লেখাও যদি বন্ধ হত, তা হলে বাঁচা যেত। কিন্তু তা আর হয় না, খাতার পর খাতা শুধুই অক্ষম সব পদ্যের ভারে বোঝাই হতে থাকে। রক্ষে এই যে, তার একটাও অদ্যাবধি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়নি।

সেই বছরেই যুদ্ধ বেধে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে গোটা ইউরোপ জুড়ে আগুন জ্বলে ওঠে। তক্ষুনি-তক্ষুনি যে এ-দেশে তার আঁচ এসে পৌঁছেছিল, তা নয়। কিছু কিছু জিনিসপত্রের দাম বাড়া ছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের কোনও ধকলই তো আমাদের সামলাতে হয়নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও প্রথম দিকটা আমাদের জীবন মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটেছিল। অধিকাংশ মানুষই ডিমোক্রেসি, ফ্যাসিজম ইত্যাদি সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। যাকে তারা সাক্ষাৎ শত্রু বলে জানে, অন্যের হাতে তাকে বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেতে দেখলেই তারা খুশি হয়। জার্মানদের হাতে 'ব্যাটাচ্ছেলে ইংরেজরা' যে বেধড়ক ঠ্যাঙানি খাচ্ছে, এটা বুঝে তারা খুশি হয়ে যেত। কাগজে অবশ্য ঠ্যাঙানি খাওয়ার কথাটা থাকত না। রেডিয়োর খবরেও সেটা চেপে যাওয়া হত। বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে

ইংরেজরা যে হেরে গিয়ে পালাচ্ছে, এটাকে বলা হত 'গ্লোরিয়াস রিট্রিট'। এই যে আজকাল 'গৌরবজনক পশ্চাদপসরণ' বলে একটা কথা ব্যঙ্গার্থে খুব ব্যবহৃত হতে দেখি, এটার সৃষ্টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে।

'আ গিয়া, আ গিয়া' চিৎকারটা সেই সময়ে খুব শোনা যেত। ওটা ছিল খবরের কাগজের হকারদের চিৎকার। একে তো কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, তার উপরে উত্তেজনা ছড়াতেও ওর জুড়ি নেই, ফলে 'কে আ গিয়া', 'কোথায় আ গিয়া,' 'কেনই বা আ গিয়া', সে-সব খোঁজ নেবার কোনও দরকার হত না, সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আর তারস্বরে 'আ গিয়া আ গিয়া' বলতে বলতে কাগজের হকার একবার গলির মধ্যে এসে ঢুকলেই হল, পাড়ার লোকেরা অমনি তাকে ঘিরে ধরত।

কিন্তু পাড়ার জীবনের যেটা দৈনন্দিন ছন্দ, এটুকু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, তাতে যে তখনই মস্ত কোনও পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, তা বলতে পারব না। বাবুরা সেই আগের মতোই টাইমের ভাত খেয়ে আপিসে বেরুচ্ছেন, ছেলেমেয়েরা নিত্য নিয়মিত ইস্কুল-কলেজে যাচ্ছে, দেশ জুড়ে যে বড় কোনও আন্দোলন শুরু হবে, তখনও তার আভাস নেই, দুপুরবেলায় ফিরিওয়ালারা একের পর এক গলিতে এসে ঢুকছে, গিন্নিরা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চারটে নাগাদ উঠে আটা ময়দা ঠাসতে বসে যাচ্ছেন, হারমনিয়ামে সারেগামা টানতে টানতে আর তারই সঙ্গে গলা মেলাতে মেলাতে পিছনের বাড়ির মেয়েটা খুবই বিরক্তিকরভাবে তার বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে, বিকেলবেলায় আমার প্রাণের বন্ধু কড়াই আর বড়াই আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে তাদের রং-বেরঙের ঘুড়ি। সন্ধেয় সেই নিত্যকার মতোই তোলা-উনুনের ঘুঁটে আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় গলিটার দম বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছে, আর তারই মধ্যে পাশের বাড়ির মেজোকর্তার কলের গানে বেজে উঠছে কানাকেষ্টর গলা।

এমনকি, রাত-বারোটায় বাড়ি ফিরে যে মাতালবাবুটি নিত্য তাঁর বউকে ধরে ঠেঙান, আর ঠেঙাতে-ঠেঙাতেই মাঝে-মাঝে হাঁকার ছেড়ে বলেন 'মিছরির দমদম', তখনও তিনি নিয়মিত তাঁর বউকে ধরে ঠেঙিয়ে চলেছেন। না, কোথাও কোনও পরিবর্তন তখনও আমাদের চোখে পড়েনি। তারই মধ্যে টেস্ট পরীক্ষায় বসি। তারই মধ্যে এসে যায় ১৯৪০ সাল। ম্যাট্রিক পরীক্ষাও একেবারে নির্দিষ্ট দিনে এসে হাজির হয়। রেজাল্ট ভাল হয়নি। তবে ভাল যে হবে না, সে তো জানা ছিল। আমি গিয়ে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলুম, দিদি বেথুন কলেজে।

আসলে যে একটা আগ্নেয়গিরির উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর অগ্ন্যুদ্গারের সময়টা যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, এবারে যে-কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে একটা প্রচণ্ড রকমের বিস্ফোরণ, অন্তত সেই মুহূর্তে তা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতুম না।

চল্লিশের গোটা দশকটাই আসলে একটার পর একটা বিস্ফোরণের দশক। এই শহরের চেহারা আর চরিত্রকে যা একেবারে আদ্যন্ত পালটে দিয়েছিল। কিছুই তো ভুলিনি, সবই যেন চোখের সামনে ভাসছে। যদি বেঁচে থাকি, তো পরে কখনও সেই বিস্ফোরণ আর বিপর্যয়ের গল্প শোনাব।